হেমচন্দ্রের নির্বাচিত রচনাবলী

প্রকাশক
শ্রীঅনিল সরকার
এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ
১৩৫৩

মুদ্রক
শ্রীধনঞ্জয় রায়
মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

মূল্য—নয় টাকা

নিবেদন

সাহিত্যচর্চার আলো মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-প্রতিভার পর্বতচূড়া ঘিরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তা-ই স্বাভাবিক। কিন্তু যে-সব লেখক সমতলভূমির কাছাকাছি, জনমনের সাময়িক রসনিবৃত্তিতে যাঁদের মুক্ত হস্তের উদার দান ছিল অকুণ্ঠিত তাঁদের কথাও যেন ভুলে না যাই। আজ সাধারণ পাঠকের রসোপভোগের আয়োজনে হেমচন্দ্রের কবিতা স্থান পাবে না ঠিকই। কিন্তু সাহিত্যের চর্চা যাঁরা করবেন তাঁদের দৃষ্টি মাঝারি শক্তির লেখকদের উপরেও পড়ুক। আমাদের সাধনায় জাতির সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সামগ্রিক পরিচয় যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্ধকার সমুদ্র-ঘেরা নিরাবলম্ব পর্বতশীর্ষ নন মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ। যুগের যে তপস্যার এঁরা অমৃতসিদ্ধি তার নিদর্শন আছে বহুসংখ্যক সাহিত্যিকের অস্তিত্বে। বহুসংখ্যার মধ্যে হেমচন্দ্রের নামটি অবশ্য চিহ্নিত হবার মত।

হেমচন্দ্রের নির্বাচিত কবিতাবলী প্রকাশ করে তাঁর সাহিত্য যে আমাদের সাধনসীমার বহির্ভূত নয় সে কথাটাই স্মরণ করতে চেয়েছি।

বন্ধুবর শ্রীঅনিল কুমার সরকার গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশ-পারিপাট্য সাধনে প্রভূত যত্ন নিয়েছেন। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মুদ্রণ-প্রমাদ সংশোধন এবং সম্পাদনার নানা কাজে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

২৮ এ মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট
কলকাতা-৯
১৫ অগস্ট ১৯৫৬

ক্ষেত্র গুপ্ত

সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প

নাট্যকার মধুসূদন

কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী

মধুসূদন-রচনাবলী (সমগ্র, ইংরেজি রচনাবলী সহ সম্পাদনা

মধু-বিচিত্রা

প্রাচীন কাব্য-সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার

কবি মুকুন্দরাম

সেকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা (সম্পাদনা)

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

যুগ : জীবনী : জীবনভাষ্য : গ্রন্থপরিচয়

এক

মধুসূদন বাংলা কাব্যে যুগান্তর ঘটালেন। জাতীয় শিল্পসৃজনীশক্তি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মুক্ত হল। কবি হিসেবে হেমচন্দ্রের আবির্ভাব তারই অন্যতম ফলশ্রুতি। ১৮৬২ সালে মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের টীকা এবং ভূমিকা লিখে দিতে গিয়ে নবীন কাব্য রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। রামগতি ন্যায়রত্নের অনুমান—

> "হেমবাবু যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদবধের টীকা লেখেন, বোধ হয়, তৎকালেই ঐরূপ প্রণালীতে কাব্য লিখিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে—বৃত্রসংহার সেই ইচ্ছার ফল।"

বৃত্রসংহার কাব্য লিখেই হেমচন্দ্র খ্যাতির শীর্ষে উঠলেন। বৃত্রসংহার প্রকাশের আগে হেমচন্দ্র সমালোচক মহলে বিশেষ স্বীকৃতি পান নি। ১৮৭১ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে বেনামীতে লেখা এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "যদিও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেমন খ্যাতিলাভ করেন নাই…।" ১৮৭২ সালে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্গভাষার ইতিহাস" পুস্তকে হেমচন্দ্রের নামও ছিল না। ১৮৭৩ সালে রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" অন্যান্য লেখকদের মধ্যে হেমচন্দ্রের নামটির মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭৩ সালে মধুসূদনের মৃত্যু উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র অকস্মাৎ হেমচন্দ্রের সোচ্চার প্রশংসা করেন।

> "কিন্তু বঙ্গকবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক!"

সন্দেহ নেই এই সমালোচনায় কাব্য বিচারের চেয়ে ভাবোচ্ছ্বাসই বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু জনমনে এবং সমালোচকদের উপরেও বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের গুরুতর প্রভাব সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু হেমচন্দ্রকে নিয়ে গুরুতর উত্তেজনা দেখা দিল আরও কয়েক বছর পরে "বৃত্রসংহার" প্রকাশের ফলে। বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনে" সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলেন প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সঞ্জীবচন্দ্র সেই রীতি অনুসরণ করলেন দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরে। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ইংরেজি সমালোচনার বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। রামগতি প্রথম সংস্করণের ত্রুটী সামলে নিলেন।

রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৮ সালে "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা"য় লিখলেন,

> "এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত!"

ঐ একই বক্তৃতায় মধুসূদনের ব্যক্তিগত সুহৃদ এবং তাঁর রচনাবলীর অন্যতম প্রধান সমালোচক মধুসূদনের কবিতার বিজাতীয়ত্বের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ "ভারতী" পত্রিকায় মধুসূদনের সঙ্গে তুলনায় হেমচন্দ্রকেই জয়মাল্য দিলেন।

হেমচন্দ্র বাঙালিকে জয় করলেন। জয় করলেন প্রধানত বৃত্রসংহারের অস্ত্রে। কবিতাবলীর রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতার প্রতিও পাঠক সমালোচকদের আগ্রহ সৃষ্টি হতে দেরী হল না। বিশেষ করে মধুসূদনের সঙ্গেই তাঁর প্রতিভার তুলনা চলতে লাগল। কেউ তা প্রকাশ করে বললেন, কেউ তা মনে ভাবলেন। ফল হল মধুসূদনের মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে বিজাতীয় ভাবের কবি হিসেবে তিনি গৌরব হারাতে বসলেন, হেমচন্দ্র নূতন যুগের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে অভিনন্দিত হতে লাগলেন। হেমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের উত্তেজনা বাঙালি সাধারণ পাঠককে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করল। বৃত্রসংহারের অনাহত হিন্দু সংস্কার, অগভীর রসাবেদন এবং বিপুলতা সমালোচকদের খুশি করল। অহিন্দু মধুসূদনকে মুখের মত জবাব দেবার সুযোগ পেয়ে তুষ্ট হলেন অনেকেই।

কিন্তু মহাকাল নির্মম বিচারক। এযুগের রসিক পাঠকের কাছে হেমচন্দ্র নিন্দিত অথবা অবহেলিত; ক্বচিৎ স্বল্পস্বীকৃত। সে স্বীকৃতিও যতটা ঐতিহাসিক ততটা কাব্যিক নয়।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই হেমচন্দ্রের স্তুতিগানে উল্টো সুর বাজল। মধুসূদনের শিল্পমাহাত্ম্য নূতন করে স্বীকৃতি পেতে লাগল। "সাহিত্য" পত্রিকার লেখকদের এ বিষয়ে কিছু বিশেষ ভূমিকা ছিল। সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মধুসূদন বিষয়ক প্রবন্ধটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাহিত্য পত্রিকায় হেমচন্দ্র সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে দুই কবির তুলনার কথা না তুলে পারেন নি—

> "মধুসূদন গুরু, হেমচন্দ্র শিষ্য; মধুসূদন ওস্তাদ, হেমচন্দ্র সাকরেদ। কিন্তু হেমচন্দ্র এক গুরুর শিষ্য নহেন—তিনি ভারতচন্দ্রকেও গুরু করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বগামী কবিগণের ছন্দের ও ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাই হেমচন্দ্র পুরাদস্তুর মধুসূদনের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই; তাই 'বৃত্রসংহার' ভাষায় ও ছন্দে কতকটা জগাখিচুড়ি হইয়া গিয়াছে; তাই 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য হইলেও জাতি-বৈরের ব্যাখ্যা পুস্তক হইলেও, ভাষার বাঁধুনীর হিসাবে, ভাষার

জমাট হিসাবে, মেঘনাদের নিম্নস্তরে অবস্থিত। মেঘনাদে মিল্টনের গন্ধ পাইলেও সে গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া মনে হয় না। কবির শব্দসম্পদে ও ভাবৈশ্বর্য্যে সে-গন্ধ তীব্র ও মনোমোহন বলিয়া বোধ হয়। 'বৃত্রসংহারে' তেমনই দান্তের ইনফার্ণোর গন্ধ পাওয়া যায়; সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি যেন সে গন্ধ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; পদে পদে যেন সেই ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম্ম হইয়াছেন। এইখানে ওস্তাদে ও সাকরেদে পার্থক্য; এইখানে কে ছোট, কে বড় স্পষ্ট বুঝা যায়।"

পরবর্তী কালে সুর আরও চড়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অতিপ্রশংসার প্রতিক্রিয়ায় বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কখনও অতিনিন্দা হয় নি এমন কথা জোর করে বলব না। উত্তরকালের প্রতিক্রিয়া তীব্র হয় প্রধানত সমকালের প্রগল্ভ অতিভাষণের প্রতিক্রিয়ায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমালোচকেরা তাঁকে নির্দ্বিধায় সেক্‌সপিয়রের চেয়ে উচ্চে স্থান দিয়েছিলেন বলেই উত্তরকালে শিল্পরসিকের মনে প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়ে উঠেছিল। এই মনোভাব গিরিশচন্দ্রের সত্যকার মূল্য আবিষ্কারেও অনীহা প্রকাশ করেছে। শরৎচন্দ্রের ভক্তেরাও এক সময়ে বঙ্কিমকে নস্যাৎ করেছিলেন। একালের সমালোচকের সিদ্ধান্তের উষ্মা শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে সেকারণেই এত বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের প্রতি অতিশ্রদ্ধায় যাঁরা বিচারহীন স্তুতির বন্যা বহিয়েছেন তাঁরা সমকালে কবিকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে বসালেও তাঁর বিশেষ উপকার করেন নি। আজকের সমালোচকের শিল্পবোধের বিচারে হেমচন্দ্রের কাব্য সেই বিশেষণগুলির কোনো শর্তই পুরণ করে না। হেমচন্দ্র তাঁর ভক্ত সমালোচকদের জন্য একালে বিবেচিত হলেন শ্রেষ্ঠ কাব্যগুণের মাপকাঠিতে—তুলিত হলেন মধুসূদনের সঙ্গে। তার ফলে অকিঞ্চিৎকরতাই বড় হয়ে দেখা দিল। এবং তা-ই অনিবার্য। খুব বড় কবির রচনারীতিকে আদর্শরূপে ধরে বিচার করলে অল্পশক্তির লেখকদের ভরাডুবির আশঙ্কা। যে প্রশংসাবাক্য কবির সৌভাগ্য সূচিত করেছিল শেষ পর্যন্ত তাই হল কবির দুর্ভাগ্যের কারণ। হেমচন্দ্রের প্রতি যে সব কঠোর নিন্দাবাক্য আধুনিক সমালোচকেরা বর্ষণ করেছেন তার কিঞ্চিৎ নিদর্শন মোহিতলালের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধার করা হল।

"হেমচন্দ্র, কি প্রাচীন কি নবীন—কোন বিশিষ্ট কাব্যরীতির অনুসরণ করেন নাই; কাব্য-কলা বলিয়া কোনও বস্তুর চেতনা বা সাধনা তাঁহার ছিল না। তিনি পুরাতন কবিগণের ছন্দমাত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন—অতিশয় সহজ, সুলভ ও অভ্যস্ত বলিয়া। তৎকালে যে নূতন সুসংস্কৃত গদ্যভাষা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাকেই একটি সহজ ছন্দঃ-স্রোতে গতিমান করিয়া, তিনি কতকগুলি ইংরেজী

ভাব ও ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, বাঙ্গালীর সংস্কার ও সেন্টিমেণ্টের উপযোগী করিয়া কবিতার আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝারি শক্তির কবি। এই কথা মনে রেখে তাঁর সাহিত্যসাধনার বিচারই সঙ্গত। কোনো কবির মূল্য নিরূপণে কাল্পনিক প্রত্যাশার পেছনে না ছোটাই ভালো। তাছাড়া ভাষার সব সাহিত্যিক মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ হবেন এরূপ ভেবে নেবারই বা কি কারণ আছে?

দুই

হেমচন্দ্র ছাত্রজীবনের কালপর্ব মোটামুটিভাবে ১৮৫০ থেকে ৬০ সাল। পরবর্তী কুড়ি বাইশ বছর তাঁর সৃষ্টির স্বর্ণযুগ। এই কালের বাংলাদেশের জীবনে ভাবান্দোলনের যে পটভূমি বিস্তৃত হয়েছিল হেমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং কাব্যগঠনে তার প্রতিফলন পড়া স্বাভাবিক। এবং সে প্রতিফলনের গতি অনেকটা সরল রেখায়; কারণ হেমচন্দ্রের মন ছিল মূলত বহির্মুখি এবং অগভীর।

হেমচন্দ্র হিন্দুকলেজের (পরিবর্তিত নাম হিন্দু স্কুল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ) ছাত্র ছিলেন। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এই কলেজ বাংলাদেশের বৈপ্লবিক নব্যভাবনার ধাত্রীর ভূমিকা পালন করেছে। পরের বছরগুলিতে প্রতিষ্ঠানটি একটি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে আপনার গৌরব বজায় রাখলেও, পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের একটি প্রধান উৎস হিসেবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রইল না। সে আদর্শ তখন আরও বহু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ৫০ সাল পর্যন্ত নবজাগৃতির যে মানসপ্রবণতা গড়ে উঠছিল তারই শৈল্পিক প্রকাশ ঘটতে আরম্ভ করল এই পর্বে।

বস্তুগত ভাবে এই কালপর্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাঞ্চল্যে পূর্ণ। এই সময়ে রেললাইনের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় শিল্পযুগের আবির্ভাব ঘটল। এবং বিপুল দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও দেখা দিল। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ফলে জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নূতন পদক্ষেপ ঘটল। অন্যদিকে ঐ একই বছরে সিপাহী বিদ্রোহের দেশ জোড়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপুল আলোড়ন দেখা দিল। সমকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর জাতীয়তাবোধের কাছে তা শুধু বিরূপতাই সৃষ্টি করল। বাংলার কৃষকশ্রেণীর এই পর্বে নীল ধর্মঘট, ফরিদপুরের ফারজি আন্দোলন, কোলবিদ্রোহ প্রভৃতির মাধ্যমে বৃটিশ শাসনের প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু একমাত্র নীলান্দোলনই সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের সহযোগিতায় বুদ্ধিজীবীদের মনে কিছুটা ইংরেজ-বিরোধিতার খোরাক জোগাল।

প্রত্যক্ষ ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে এই পর্বে কতগুলি প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক

সমাজনৈতিক চেতনা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। নবগোপাল মিত্র পরিচালিত "হিন্দুমেলা" (১৮৬৭), কেশবচন্দ্র সেন স্থাপিত "ভারত সংস্কার সভা" (১৮৭০), "ভারতীয় বিজ্ঞান সভা" (১৮৭৬) সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহন-শিবনাথ-দ্বারকানাথের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" (১৮৭৬), অবশেষে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫) উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জাতীয় জাগরণই এই যুগের বিশিষ্ট রাগিণী এবং হিন্দু পুনরুত্থানের সুর তার মধ্যে বিশেষ প্রবলভাবে বেজেছে।

এই ভাবপরিমণ্ডলেই হেমচন্দ্রের কবিমনের বিকাশ।

তিন

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির মামুলী জীবন। মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত "হেমচন্দ্র" (তিন খণ্ড) এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সাহিত্য সাধক চরিতমালা"র অন্তর্ভুক্ত কবিজীবনী থেকে তাঁর চরিতকথা সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।

হেমচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮২৮ সালের ১৭ এপ্রিল মাতুলালয়ে, হুগলী জেলার রাজবল্লভহাটে। পিতা কৈলাসচন্দ্র এবং মাতা আনন্দময়ী। পিতৃভূমি ছিল উত্তরপাড়া। দরিদ্র কৈলাসচন্দ্র শ্বশুরালয়ে বাস করতেন।

কবির মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্তী মধ্য অবস্থার মানুষ। মোক্তারি করে খিদিরপুরে ছোট একটি বাড়ী করেছিলেন। হেমচন্দ্র শৈশবে রাজবল্লভহাটের পাঠশালায় লেখাপড়া শুরু করেন। নয় বৎসর থেকে তিনি খিদিরপুরে মাতামহের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। দুর্লভ উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহনের ক্ষমতা কবির পিতা বা মাতামহের ছিল না। প্রতিবেশী সহৃদয় শিক্ষক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী হেমচন্দ্রের মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। কলেজের বেতনও তিনিই দিতেন। হেমচন্দ্র তখন পনেরো বছরের কিশোর।

ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী ছিলেন। হেমচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হল। স্কুল বিভাগের নামকরণ হল হিন্দুস্কুল। হেমচন্দ্র হিন্দুস্কুলের ছাত্র হলেন। জুনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় তিনি দশটাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন। ১৮৫৫ সাল থেকে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে লাগলেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি শিক্ষকতার যোগ্যতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায়ও তিনি সাফল্য লাভ করে মাসিক পঁচিশটাকা বৃত্তি পেলেন।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে হেমচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় এবং ১৮৫৯ সালে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৮৬১ সালে আইন পরীক্ষা দিয়ে তিনি এল, এল এবং ১৮৬৬ সালে বি. এল. উপাধি লাভ করেন।

বি. এ. পরীক্ষার কিছুদিন আগে হেমচন্দ্র একটি কেরাণীর কাজ পেয়েছিলেন। বি. এ. পাস করে তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা পেলেন। কিন্তু এই কাজটি গ্রহণের আগেই তিনি "ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের" প্রধান শিক্ষকের পদটি লাভ করলেন। শিক্ষকতা করতে করতে তিনি আইনের প্রথম উপাধি পেলেন। শিক্ষকবৃত্তি ত্যাগ করে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করলেন। ভালো পসার না হওয়ায় ওকালতি ছেড়ে দিয়ে মুন্সেফের চাকরি নিলেন। অল্পদিনের মধ্যে সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার হাইকোর্টে ফিরে এলেন। ক্রমে আইন ব্যবসায়ে উন্নতি হতে লাগল। মাসিক আয় দু হাজার আড়াই হাজারে গিয়ে পৌছল। পরিণত বয়সে তিনি প্রধান উকিলের পদটি লাভ করেছিলেন।

হাইকোর্টে প্রবেশের সময় থেকেই হেমচন্দ্র কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৬১ সালে তাঁর প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়। তাঁর শেষ কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৯৮ সাল। দীর্ঘকাল তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন এবং মোট আঠারোখানা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। হেমচন্দ্রের কবি জীবনের শুরুতে মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের সম্পাদনা একটা গুরুতর ঘটনা। অপর ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চকণ্ঠ প্রশংসালাভ। বৃত্রসংহার প্রথম খণ্ড প্রকাশের পরে হেমচন্দ্রের খ্যাতি বিস্তৃত হতে থাকে এবং অল্পকালের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন।

হেমচন্দ্রের শেষজীবন খুবই দুঃখে কেটেছে। বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে তিনি দেহ-মনে একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন।

১৯০৩ সালে ২৪ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

চার

হেমচন্দ্রের কাব্য গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রকাশকালসহ দেওয়া হল।

এক. চিন্তাতরঙ্গিণী ১৮৬১
দুই. বীরবাহু কাব্য ১৮৬৪
তিন. কবিতাবলী ১৮৭০
চার. বৃত্রসংহার ১ম খণ্ড ১৮৭৫
পাঁচ. ভারতভিক্ষা ১৮৭৫
ছয়. আশাকানন ১৮৭৬
সাত. বৃত্রসংহার ২য় খণ্ড ১৮৭৭
আট. কবিতাবলী ২য় খণ্ড ১৮৮০

নয়. ছায়াময়ী ১৮৮০
দশ. দশমহাবিদ্যা ১৮৮২
এগারো. হুতোমপ্যাঁচার গান [বাংলা] ১২৯১
বারো. ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার
জুবিলী উৎসব ১৮৮৭
তেরো. চিত্তবিকাশ ১৮৯৮

এদের মধ্যে "ভারতভিক্ষা", "হুতোম প্যাঁচার গান", "ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব" কবিতামাত্র, পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ হয় নি এমন অনেকগুলি কবিতাও মাসিকপত্রে ছড়িয়ে ছিল। "বিবিধ" নাম দিয়ে সজনীকান্ত দাস মহাশয় তাদের গ্রন্থবদ্ধ করেছেন "হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী"তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড।

এছাড়া হেমচন্দ্র "নাকেখৎ" নামে একটি ছন্দোবদ্ধ কৌতুকনাট্য লিখেছিলেন ; সেক্‌সপিয়রের টেম্পেস্ট অবলম্বনে "নলিনিবসন্ত নাটক" এবং রোমিও জুলিয়েতের ছায়া অবলম্বনে "রোমিও জুলিয়েট" নামে অপর একটি নাটকও লিখেছিলেন। উভয় নাটকের সংলাপই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। হেমচন্দ্রের অপর রচনাগুলি অকিঞ্চিৎকর এবং অনুল্লেখ্য।

পাঁচ

হেমচন্দ্রের জীবনকথা এবং কাব্যগ্রন্থাবলী বিশ্লেষণ করে তাঁর অন্তর্জীবন তথা কবিপ্রাণের একটি রূপের আভাস পাওয়া যেতে পারে। কবিশিল্পীর অন্তর্জীবনের পরিচয় পেলে তাঁর সৃষ্টিরহস্যের অনেকটাই ব্যাখ্যাগম্য হয়ে পড়ে।

হেমচন্দ্রের জীবনে কোনোরূপ নাট্যচমক নেই, প্রবল অস্থিরতা নেই। অন্তর্লীন শক্তির অগ্ন্যুদগার তাঁর কর্মে ও ভাবনাকে আর্ত করে তোলে নি। দূরের রহস্য, অতীতের বর্ণাঢ্যতা তাঁর কাছে ব্যর্থ। নিজেকে ছাপিয়ে যাবার বীর্য নেই, প্রাণকে বাজি রাখবার দুঃসাহস নেই।

হেমচন্দ্র একান্ত সাধারণ বাঙালি ভদ্রলোক। প্রথম জীবনে দারিদ্র্য-দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু দৃষ্টিকে তা বক্র করে নি, মনকে শাণিত ও আক্রমণোদ্যত করে তোলে নি। বৃত্তিপাওয়া ভালো ছাত্র, পরীক্ষার গণ্ডিগুলো সহজে ডিঙিয়ে গিয়েছেন। প্রথম কয়েক বছরের অনিশ্চয়তার পরে ওকালতিতে সাফল্য পেয়েছেন। কাব্য লিখে খ্যাত হয়েছেন। চোখে ছানি পড়ে অন্ধ হয়ে শেষ জীবনে কিছু দুঃখ পেয়েছেন। এর মধ্যে বড় শক্তির, বড় প্রতিভার, বড় কামনার, বড় ব্যর্থতার পরিচয় নেই। এ জীবন একান্ত নিয়মিত, বৃত্তাকার পথের নিশ্চিত যাত্রী।

উত্তেজনাহীন সে-জীবনে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ভাবধারা বিক্ষোভ সৃষ্টি করত; কিন্তু আন্দোলনের আবর্তে তা কবিকে টেনে নেয় নি। বার এসোসিয়েশনের টেবিলের চারপাশে উচ্চকণ্ঠ তর্কেই তার সমাপ্তি ঘটত। সাময়িক বিচিত্র ঘটনা—ভবানীপুরে মুখুজ্জেদের বাড়িতে যুবরাজের জানানা দর্শন বা মিউনিসিপাল আইন সংস্কার, ইলবার্ট বিল প্রভৃতি থেকে শুরু করে বন্ধু বিশেষের পাঁচশ টাকার নোট হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বড় ছোট নানা প্রসঙ্গ আশ্রয় করে উকিলদের আসরে যে হট্টগোল জমে উঠত তার আগুন পোহানোর মাধ্যমে হেমচন্দ্রের কবিমন মধ্যবিত্তের একঘেয়ে জীবনাবর্তনে বৈচিত্র্যের সন্ধান পেত।

আর ছিল ইংরেজি ভাষায় য়ুরোপীয় কাব্যচর্চা। তাতেও কিছু স্বাদবদল ঘটত। হেমচন্দ্র এটুকুতেই তৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু এ শুধুই মুখ বদল, অন্তরের গভীরে মধ্যবর্গীয় জীবন থেকে মুক্তির তীব্র কামনা তাঁর ছিল না; ছিল না মনোজগতের গভীরে রহস্যবিজড়িত নিভৃত রাজ্য গড়ে তুলে আশ্রয় নেবার বাসনা—বস্তুজীবনের সামান্যতার জন্য কোনো ক্ষোভ, তা থেকে মুক্তির কোনো আন্তরিক ইচ্ছা।

সত্য-মিথ্যা-পাপ-পুণ্য, মানব-কল্যাণ বিষয়ে কতগুলি সাধারণ মোটা ধরনের ভাবনা তাঁর ছিল, কিন্তু তাতে বিশ্বজিজ্ঞাসার সুর বাজে নি। সাধারণ শিক্ষিত মানুষের নিয়ম মাফিক ভাবনার সঙ্গে দেশিবিদেশি কাব্য চিন্তার মিশ্রণের ফলেই এই সব নৈতিক চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে।

যে জাতীয়তার প্রচারের জন্য তাঁর এত খ্যাতি সে-ক্ষেত্রেও তাঁর ভাবনায় কোনো মৌলিকতা প্রকাশ পায় নি। বঙ্কিমের দূরদৃষ্টি ও সামগ্রিক চেতনা কিংবা নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। মহাকাব্যিক জীবন বোধের গভীরতা ও ব্যাপকতায় এই মনের স্বাভাবিক অধিকার থাকবার কথা নয়।

হিন্দু ধর্মাচরণের প্রতি হেমচন্দ্রের সুগভীর শ্রদ্ধা তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং কবিত্বের একটি বিশেষ উপাদান ছিল। কেশবচন্দ্র তাঁর ন্যায় শিক্ষিত হিন্দুর ব্রাহ্ম পন্থা গ্রহণ করার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে একবার মন্তব্য করেছিলেন। হেমচন্দ্র তার উত্তরে এক ইংরেজি পুস্তিকা লিখে ফেললেন, "Brahmo Theism in India". শিক্ষিত ভারতবাসীর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের বিরুদ্ধে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। হেমচন্দ্রের এই হিন্দুত্ব জাতীয়তা-বাদের সঙ্গে মিশে হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। অবশ্য হেমচন্দ্রের হিন্দু জাতীয়তাবাদ বঙ্কিমোচিত মৌলিক প্রতিভায় ভাস্বর হয়ে জাতির জীবন-সত্য অনুধ্যানের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায় নি। উভয়ের শক্তির তারতম্য মনে রাখলে সেরূপ প্রত্যাশা করাও উচিত হবে না

আসলে হেমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কবি—মধ্যবিত্ত কবি,—যাঁর জাতীয়তার উত্তেজনা বক্তৃতামঞ্চে কথার ফুলঝুরি ফোটায়, তটস্থ মন নিয়ে শাণিত ব্যঙ্গেই যাঁর সামাজিক চেতনা নিবৃত্ত, কল্পনা যাঁর বস্তুলোকের বন্ধন কেটে ভাবের স্বাধীন লোকে উড়তে জানে না, চায়ও না ॥

ছয়

হেমচন্দ্রের নির্বাচিত রচনাবলীতে তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক কাব্য-কবিতাগুলি সঙ্কলিত হয়েছে। উল্লিখিত রচনাগুলিকে কি কারণে সর্বোৎকৃষ্ট এবং কবির প্রতিভার যোগ্য প্রতিভূ বলে মনে করেছি পরবর্তী আলোচনায় তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই রচনাগুলি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এখানে প্রদত্ত হল।

বৃত্রসংহার

মহাকাব্যটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দুই খণ্ডের প্রকাশকালের ব্যবধান প্রায় তিন বৎসর। আখ্যাপত্র দুটি এখানে উদ্ধৃত হল।

বৃত্রসংহার। [কাব্য।] প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত (৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।) ১২৮১ সাল।

বৃত্রসংহার। [কাব্য।] দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের লেন, ১৭ সংখ্যক ভবনে প্রকাশিত। ১২৮৪।

প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভে কবি যে বিজ্ঞাপনটি লিখেছিলেন কবির মনোভাব বুঝবার দিক থেকে তার প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞাপনটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হল।

"কতিপয় কারণবশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এই পুস্তক প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধ প্রথার অন্যথাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, পাঠকবর্গ আমার এ দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর, উভয়বিধ ছন্দঃই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই।

তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিল্টন্ প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজি ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সমধিক নৈকট-সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় লঘু গুরু উচ্চারণ-ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই, কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশ অক্ষরবিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি। পয়ারের যতি সংস্থাপনার যেরূপ প্রথা আছে, তাহার অন্যথা করি নাই; কেবল শেষ ছয় অক্ষর সম্বন্ধে একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। প্রথম কিংবা তৃতীয় চরণের শেষে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর থাকিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে দুই চারি, চারি দুই, অথবা দুই দুই দুই করিয়া ছয় অক্ষর বিন্যস্ত করিতে হইয়াছে। তদ্রূপ প্রথমে দুই চারি, চারি দুই ইত্যাদি অক্ষর থাকিলে তাহার পরবর্ত্তী চরণে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর সন্নিবেশিত করিয়াছি। যে যে স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেইখানেই কিঞ্চিৎ দোষ জন্মিয়াছে। কেবল তাদৃশ স্থলে যেখানে সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করিয়াছি, সেই সকল পদ ততদূর দোষাবহ হয় নাই।

শিক্ষাভেদ অনুসারে গ্রন্থকারের রুচি ও রচনার প্রভেদ হইয়া থাকে। বাল্যাবধি আমি ইংরেজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরেজী গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

সর্ব্বত্র সম্বোধনপদে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করি নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালাভাষায় সম্বোধনপদ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু পূর্ব্ব লেখকদিগের প্রদর্শিত পথ একেবারে পরিত্যাগ করিতেও পারি নাই।

এ পুস্তকে বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে দেখিয়া পাঠকবর্গের আপাততঃ বিস্ময় জন্মিতে পারে। অধুনাতন বিজ্ঞান-শাস্ত্র অনুসারে বিদ্যুচ্ছটার প্রকাশ ও বজ্রধ্বনির উৎপত্তি একই কারণ হইতে হইয়া থাকে; একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র বিজ্ঞানশাস্ত্র-নিরূপিত বজ্র নহে। অতএব ইন্দ্রের বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করা বোধ হয় তাদৃশ উৎকট হয় নাই।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, সকল বিষয়ে কিংবা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ স্থলে কৈলাসের উল্লেখ করিতেছি। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কৈলাসের অবস্থিতি হিমালয় পর্ব্বতের উপর না করিয়া অন্যত্র কল্পনা করিয়াছি। ইহার দোষগুণ পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

খিদিরপুর
১৮ পৌষ ১২৮১ সাল

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দশমহাবিদ্যা

দশমহাবিদ্যা কাব্যটি ক্ষুদ্র। কিন্তু এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। কাব্যটি হেমচন্দ্রের পরিণত মনের মৌলিক সৃষ্টি।

কাব্যটির প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ।

দশমহাবিদ্যা। গীতিকাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

"Where shall I grasp thee, infinite Nature, where ?

... ...

How all things live and work, and ever blending
Weave one vast whole from Being's ample range !"

Goethe's *Faust*.

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯নং ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৯ সাল, ইং ১৮৮২।

[All rights reserved.]

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়,

"ইহাতে গুটি কত নূতন ছন্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও সংস্কৃত অথবা প্রচলিত বাঙ্গলা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে। আপাততঃ দুই একটিকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠন-প্রণালী এবং লক্ষণ অন্যরূপ। সেই সকল ছন্দের অক্ষর যোজনা এবং আবৃত্তির নিয়ম সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই; কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। অপিচ, কতিপয় ছন্দের নিম্নভাগে সে বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে এবং ছন্দোবিশেষে দীর্ঘ উচ্চারণের স্থান নির্ণয় জন্য মাত্রার উপরিভাগে গুরুতাজ্ঞাপক (—)

এইরূপ চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে অন্য দোষের সংশোধন না হউক, সেই সকল ছন্দের গঠন বুঝিবার এবং পাঠ করিবার সুবিধা হইবে, মনে করিয়াছি।

গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দগুলি সম্বন্ধে এই কয়টি স্থূল কথা মনে রাখা আবশ্যক —সংস্কৃত ব্যাকরণ-নির্দ্দিষ্ট সকল গুরু বর্ণেরই সর্ব্বত্র, গুরু উচ্চারণ না করিয়া কেবল চিহ্নিত স্থানগুলিতে স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের গুরু উচ্চারণ করিলেই চলিবে। চিহ্নগুলিও সেইভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংযুক্ত বর্ণের সর্ব্বত্র যথাযথ উচ্চারণ হইবে। আর একটি বিশেষ নিয়ম, অকারান্ত পদের অন্তেস্থিত অকার হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে, উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। কেবল কয়টি গুরু উচ্চারণ-মূলক ছন্দ সম্বন্ধে এই নিয়ম, অন্যত্র নহে।

দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল স্থানে ঠিক্ ঠিক্ অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের প্রশস্ততার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।

খিদিরপুর।
অগ্রহায়ণ। ১২৮৯ সাল

কবিতাবলী

দুই খণ্ডে প্রকাশিত "কবিতাবলী" এবং "চিত্তবিকাশ" প্রধানত এই দুটি কাব্যে হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতাগুলি ধৃত হয়েছে। এই কাব্য দুটি থেকে, এবং কাব্যে গ্রথিত হয় নি এমন কবিতাসম্ভার থেকেও কয়েকটি কবিতা গ্রহণ করে বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে বর্তমান সঙ্কলনে।

"কবিতাবলী" থেকে সঙ্কলিত—ভারত-সঙ্গীত, ভারত-বিলাপ, বিধবা রমণী, ভারত-কামিনী, ভারতে কালের ভেরী, ইউরোপ এবং আসিয়া, বাঙালীর মেয়ে, জীবন-মরীচিকা, পরশমণি, জীবন-সঙ্গীত, পদ্মের মৃণাল, লজ্জাবতী লতা, চাতক পক্ষীর প্রতি, পদ্মফুল, গঙ্গা, যমুনা-তটে, অশোকতরু, কোন একটি পাখীর প্রতি, প্রিয়তমার প্রতি, রেলগাড়ী, শিশুর হাসি এবং হতাশের আক্ষেপ।

"চিত্তবিকাশ" থেকে সঙ্কলিত—কল্পনা, অতৃপ্তি এবং বিভু, কি দশা হবে আমার।

গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ হয়ে প্রকাশ পায় নি. সাময়িক পত্রাদিকাদিতে প্রকাশিত এরূপ কবিতাভাণ্ডার থেকে—জীবনের লীলা ফুরালো, দূর কাননের কোলে

পাখী এক ডাকিছে, দেশলাইএর স্তব, নেভার-নেভার, বাজিমাৎ, সাবাস হুজুক আজব সহর, হায় কি হলো ?

"কবিতাবলী"র আখ্যাপত্র এখানে দেওয়া হল।

কবিতাবলী। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেট ও অবোধবন্ধু হইতে পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৭ সাল।

কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রথম সংস্করণ। "The soul is dead that slumbers"। *Longfellow*. কলিকাতা। ৩৫ বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, রায়যন্ত্রে, শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত। এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস ডিপজিটরীতে প্রকাশিত। ১২৮৬ সাল।

কবিতাবলীতে গ্রন্থকারের লেখা কোনো ভূমিকা ছিল না।

"চিত্তবিকাশ" কবিতা সঙ্কলনটির প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ।

চিত্তবিকাশ। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

Renounce all strength but strength divine ;
And peace shall be forever thine.

—Cowper.

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভেলুপুরা, বেনারস সিটি। ৺কাশীধাম। ১৩০৫ দশাশ্বমেধ ঘাট, অমর যন্ত্রালয়। শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।৴ ছয় আনা।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখকের স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপন ছিল।

"শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য্য হয় না, বিশেষতঃ গ্রন্থপ্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হইলে ঐ দুইটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঐ দুইটিরই অভাব হইয়াছে. তথাচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া আত্মকল্পনা ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কবিতাকারে নিবন্ধ করিলাম। উপরিলিখিত অবস্থাক্রমে ইহা যে সকল সহৃদয় মহাত্মাগণের চিত্তবিনোদক হইবে, ইহার আশা নাই। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কিছু উপকারে আসিতে পারে, এই ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম।

ইং ১৮৯৮। ২২ ডিসেম্বর
বাং ১৩০৫। ৯ পৌষ } শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সঙ্কলনে পাঠনির্ণয়ের ব্যাপারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত দুই খণ্ড "হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী"কে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছি। মুদ্রণ সৌকর্যের জন্য কোথাও কোথাও চরণ ভাঙা হয়েছে বা ত্রিপদীর মধ্য চরণের দুটি অংশ কাছে আনা হয়েছে। অবশ্য কবির ব্যবহৃত ছন্দের কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়ে এরূপ করা হয়নি। বৃত্রসংহারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে চৌপদীগুলি স্বতন্ত্র করে দেখিয়েছিলেন কবি। আমি অপ্রয়োজনীয় বোধে এবং মুদ্রণের সুবিধার জন্য সেই ভাগ তুলে দিয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাব্য-সৌন্দর্যের কথা : গৌণ কাব্যগ্রন্থাবলী

হেমচন্দ্র নানা জাতের কাব্য লিখেছেন। আখ্যানকাব্য কিংবা খণ্ডকাব্য উভয় ধারার রচনায় তাঁর সমান আগ্রহ। বিষয় হিসেবেও পৌরাণিক, তান্ত্রিক, ছদ্ম-ঐতিহাসিক, কাল্পনিক অথবা সাময়িক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রসঙ্গের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন। তাঁর কবিচিত্তের কেন্দ্রবিন্দুটি খুব স্থির অথবা একাগ্র ছিল না। অথবা তার মধ্যে এমন পরিণতি ছিল না যাতে দৃষ্টিভঙ্গিতে সুস্পষ্ট প্রবণতা দানা বাঁধতে পারে।

চিন্তাতরঙ্গিণী

সাময়িক ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে লেখা তাঁর কবিতার সংখ্যা অনেক। সেখানে অবশ্য প্রসঙ্গগুলির সাময়িকতা সত্ত্বেও গোটা সমাজজীবন হয়েছিল আন্দোলিত। কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চাঞ্চল্যও হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রেরণা হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রথম কাব্য "চিন্তাতরঙ্গিণী" বন্ধুর আত্মহনন উপলক্ষে লেখা। একান্ত অপরিণত ভাবোচ্ছ্বাস একটা ক্ষীণ কাহিনীসূত্রে গাঁথা হয়ে এ-কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত এই কাব্যের ভূমিকায় তিনি বাঙালি কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর অনতিক্রমণীয় ক্ষমতার কথা বলেছেন। তখন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রকাশিত হয়েছে, সম্ভবত মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম খণ্ডও। চারদিকে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা তেইশ-চব্বিশ বছরের এই ইংরেজি শিক্ষিত তরুণের মন ভারতচন্দ্রের সীমা ছাড়াতে পারে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর রায়গুণাকরের কাছে কবির ঋণের পরিমাণ অল্পই। ভাষার মার্জিত ভঙ্গিতেই মাত্র তার প্রতিফলন। ভারতের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য যুগান্তরের এবং প্রতিভার স্বরূপেও। তাঁর তীক্ষ্ণ ভাষা-বৈদগ্ধ্য চিন্তাতরঙ্গিণীতে নেই, নেই তাঁর অলঙ্করণাতিরেক এবং শব্দ-শ্রুতিবিলাস। ভারতের রুচিশিথিলতাও উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবির রচনায় প্রত্যাশিত নয়। কবির ভাষা ও মিত্রাক্ষর রীতিতে গুরুর চিক্কণ সৌন্দর্যের সিদ্ধি নেই। বরং শ্রুতিসৌকর্যহীন ক্রিয়াপদের মিলসৃষ্টি এই প্রথম কাব্য থেকেই লক্ষ্য করা যায়—

না ফুরাতে কথা, সুবর্ণের লতা,
ধীরে আঁখিপাতা মুদিল।
রাজার ভবন বিজন কানন,
পিতা পুত্র বধূ মরিল ॥

আরও ছয়টি ত্রিপদী জুড়ে এই একই জাতের -ইল অন্তক মিল চলেছে। অন্ত্যানুপ্রাসের এই বিশেষ রীতিটি হেমচন্দ্রের বড়ই প্রিয় ছিল। বাংলা পয়ারের চরণে চরণে যে মিলের মঞ্জীর বেজে আসছে মধ্যযুগের মধ্যন্তরের বহু কবির রচনা থেকেই, হেমচন্দ্রের কানে তা সাড়া তোলে নি। আসলে শব্দ-সঙ্গীতে ইন্দ্রিয়-বিকলতাই হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার প্রধান দুর্বলতা বলে মনে হয়। চিন্তাতরঙ্গিণী থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

চিন্তাতরঙ্গিণীতে স্বভাবতই ভারতচন্দ্র-যুগের ভাবকল্পনা এবং বিশ্বাসের পরিচয় নেই। একান্ত তরল ভাবোচ্ছ্বাসের অসংযমের মধ্য থেকেও আধুনিকতার কিছু স্পর্শ এ-কাব্যে অনুভব করা যায়। অবশ্য নায়কের আত্মহত্যার পরিণাম যে নরকের প্রায়শ্চিত্তভোগ, মধ্যযুগীয় সে বিশ্বাস থেকে হেমচন্দ্র মুক্ত নন। তাই তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য—

> ভ্রান্ত হয়ে, অহে নর, কুমার্গে পশিলে।
> কেমন করাল পরকাল না বুঝিলে॥
> ... .
> কোটি কোটি পাপী তথা কৃতাঞ্জলি করে।
> 'ক্ষমা কর ক্ষমা কর' ডাকিছে কাতরে॥
> নিকটে যাইবা মাত্র নহিবে নিস্তার।
> আগে হবে প্রায়শ্চিত্ত পরেতে উদ্ধার॥

কিন্তু আধুনিক নিসর্গমুগ্ধতা এবং নিসর্গভাবুকতার কিছু চিহ্ন এই একান্ত দুর্বল এবং কাব্যমূল্যে অকিঞ্চিৎকর রচনাটিতেও আছে। হৃদয়যন্ত্রণা এবং দৈনন্দিন পারিবারিক কর্তব্য-কর্মের বন্ধন থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশে মুক্তি খোঁজা, প্রকৃতিকে আপনার বেদনাসূত্রের সঙ্গে যুক্ত করার মধ্যে নবীনতা আছে, এবং তা নিঃসন্দেহে ইংরেজি কবিতাপাঠের ফলে কবিচিত্তে বর্তেছে।

আর আছে কিছু কিছু আধুনিক সমাজ-ভাবনা, এ-সমাজে নারীর বন্দীদশা সম্বন্ধে আক্ষেপ—

> একে ত নারীর জাতি পরের অধীনা।
> তাহাতে অভাগা দেশে দাসী মত কেনা॥
> পৃথিবী ভিতরে জানে পরিবার জন।
> রন্ধনশালার সীমা ভিতরে ভ্রমণ॥

আছে বিদ্যাহীনতার দুঃখ অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার মূল্যবোধ, দেশাচার-রাক্ষসীর প্রতি ক্রোধ এবং ধর্মভাবনায় প্রত্যক্ষত ব্রাহ্ম মনোভাবের প্রভাব—

> দুর্ব্বল মানব-মন সেই সে কারণ।
> পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন॥
> সাকার স্বরূপে তাই নিরাকারে ভাবে।
> মাটি পূজা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে॥

একবার এরা যদি প্রকৃতি মন্দিরে।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগতবন্ধুরে ॥
শিব-দুর্গা-কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল ॥

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে ১৮৬১ সালে এ জাতীয় ভাবনা প্রকাশে কিছু একটা যুগসৃষ্টির মহিমা নেই। তাছাড়া আছে শিল্পরূপের দৈন্য ; ভাবনা প্রায় কোথাও ভাবকল্পনা হয়ে ওঠে নি। তবুও হেমচন্দ্রের সমাজচেতনার এই চিহ্নগুলি অবহেলার বস্তু নয়।

বীরবাহু কাব্য

বীরবাহু কাব্য প্রকাশের দুবছর আগে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের টীকা ও ভূমিকা লিখেছিলেন। কিন্তু এ-কাব্যে একটি স্তবকও অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা নেই। মেঘনাদবধের অনুসরণের চেষ্টা নেই। শুধু "বীরচূড়ামণি বীরবাহু"র নামটি কাব্য-শিরোনামে গ্রহণ করেই কি মহাকবিকে প্রণামী দিলেন হেমচন্দ্র ? সম্ভবত মধুসূদনের কাব্যাদর্শ গ্রহণে সচেতন ভাবেই সঙ্কুচিত ছিলেন হেমচন্দ্র। অর্ধচেতনায় হয়তো আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধেই তাঁর সংশয় ছিল। তাছাড়া তাঁর কাব্যরসবোধে তখনও মধুসূদনের তুলনায় বিদ্যাসুন্দরের কবিরই শ্রেষ্ঠত্ব অবিচল ছিল।

এ-কাব্যেও তাঁর গুরু মুখ্যত ভারতচন্দ্র এবং কতকাংশে রঙ্গলালও। কবির ছন্দে মাঝে মাঝে ভারতের পদধ্বনি নিশ্চিত বেজেছে। যেমন—

করিছে ঝম্প, ধরণী কম্প,
করাল কৃপাণ ধরে রে ॥
যেন কৃতান্ত, করিতে অন্ত,
শূলপাণি শূল ধরে রে।
যেন চামুণ্ডা, ঘুরায়ে খাণ্ডা,
রক্তবীজাসুরে মারে রে ॥

অথবা,

কেহ করে হাহাকার, কেহ বলে মার মার,
ভীম শব্দ কোলাহলে স্বর্গমর্ত্ত পূরিল।
হুয়া রবে ডাকে শিবা বায়সেরা ঊর্দ্ধগ্রীবা,
ভয়ঙ্কর রণভূমি ঘোররূপে ঘেরিল ॥

কিন্তু ভারতের কবিতার ঝঙ্কার এখানে অশ্রুত। ছন্দের বিচিত্রতা সৃষ্টিতেও রায়গুণাকর ছিলেন তাঁর আদর্শ। অবশ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী-কাব্য দুটির কিছু প্রভাবও এই রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা কাহিনী-কাব্যের নবধারার অস্পষ্ট সূচনা "পদ্মিনী"তে (১৮৫৮ সাল) এবং শিল্পসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠা "তিলোত্তমাসম্ভব"-এ (১৮৬০)। মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" (১৮৬১) আধুনিক কাহিনী-কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। রঙ্গলালের "কর্ম্মদেবী"ও ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদনের প্রভাব তিনি সযত্নে এড়িয়েছেন। অবশ্য যোগিনীর কথায় প্রমোদবিলাস-মগ্ন বীরবাহুর বৃহত্তর জাতীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হবার প্রসঙ্গ প্রভাসা-রূপিণী রাজলক্ষ্মীর কাছে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মেঘনাদের কুসুমদাম ছিঁড়ে ফেলে যুদ্ধযাত্রার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মধুসূদন থেকে তিনি দূরে থাকতেই চেয়েছেন। রঙ্গলাল সম্বন্ধে কবির সাবধানতা ছিল না। সহজেই তাঁর কাব্যভাবনার কিছু আদর্শ হেমচন্দ্রের বীরবাহুতে বর্তেছে। রঙ্গলালের পূর্বের দুটি কাব্যই রাজস্থানী ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির স্বাজাত্য চেতনা মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে রাজপুতদের স্বাধীনতারক্ষার সংগ্রামের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। চিন্তাতরঙ্গিণীতে ছিল প্রথম তারুণ্যের অকস্মাৎ উচ্ছ্বাস-তারল্য; বীরবাহুতে এসে তা সমকালীন যুবজন-চিত্তজয়ী তিনটি প্রত্যয়—প্রণয়, বীরত্ব ও জাতীয়তার চারপাশে আবর্তিত হয়েছে।

তিলোত্তমাসম্ভবে কল্পনার যে গভীরতা এবং বর্ণনার যে সৌকর্য আছে, তার তুলনায় বীরবাহু অকিঞ্চিৎকর হলেও রঙ্গলালের কাব্য দুটির চেয়ে হেমচন্দ্রের এই প্রথম উল্লেখ্য রচনায় কিছু বেশি গুণপনা প্রকাশ পেয়েছে। রঙ্গলালের কাব্য ঘটনার বিবরণে পূর্ণ, বর্ণনায় দীন এবং রচনা-দৌর্বল্যে বর্ণনার চেষ্টাও বর্ণহীন তালিকা নির্মাণে পর্যবসিত। হেমচন্দ্র ঘটনা বর্ণনা ও সংলাপের একটা আনুপাতিক সামঞ্জস্যের কথা অন্তত মনে ভেবেছেন এরূপ চিহ্ন পাওয়া যায়। বর্ণনার প্রতি তাঁর প্রবণতা, কিন্তু ঘটনার প্রাচুর্যও লক্ষ্য করবার মত। (তুলনায় তিলোত্তমাসম্ভবে ঘটনার বিরলতা এবং বর্ণনার আধিক্যে কিছু সামঞ্জস্য-চ্যুতি ঘটেছে। মধুসূদন রচনার শক্তিতে তা পূরণ করেছিলেন।) বীরবাহুর প্রণয় বিহার—যোগিনীর উপদেশে জাতীয় ভাবের উদ্দীপন ও যবন বিমুখতা—যবনাক্রমণের সংবাদ ও যুদ্ধযাত্রা। আহত বীরবাহুর পরাজয়—শত্রুসৈন্যের হাতে কনৌজ ধ্বংস—বন্দিনী হেমলতা দিল্লী প্রেরিত—বাদশাহের অন্তঃপুরে বান্ধবী প্রাপ্তিতে আসন্ন সঙ্কট থেকে ত্রাণ। বীরবাহুর কনৌজ গমন ও প্রতিজ্ঞা। কলিঙ্গ গমন—সৈন্যসজ্জা—ঝটিকায় সৈন্যবাহিনীর সমুদ্র নিমজ্জন। মায়াবনে বীরবাহু—ছয় নারীর সহায়তা—যবনাধিপতির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ। যবনপরাজয় ও দম্পতিমিলন। এরূপ ক্ষুদ্র কাব্যে এতগুলি প্রসঙ্গের সমাবেশ

ঘটনাবহুলতার প্রমাণ দেয়। কবি এর মধ্যেই বহু প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র করে সেইসব বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন যেখানে বিস্তৃত বর্ণনার সুযোগ আছে। বর্ণনার মধ্যেও কবির বিশেষ আকর্ষণ কমনীয় মাধুর্য, প্রণয়লীলা, বর্ণাঢ্য রূপাঙ্কনের দিকে। তাই বীরবাহু-হেমলতার উপবন-বিলাসের কথা এত বহুলতা পেয়েছে। কতকটা সাফল্যও।

এস প্রিয়ে দুই জনে,
গিয়ে গ্রীষ্ম উপবনে,
মিথুন দম্পতি সম বনে বনে ভ্রমিব।
মালতীর মালা প'রি,
পদ্মপাতে ছত্র করি,
দোঁহে মেলি ফুলকুল পরিমল লুটিব॥
স্রোতকূলে দোঁহে মেলি,
করিব সলিল কেলি,
বাহুতে বাহুতে বাঁধি স্রোতধারা ধরিব।
রাজহংস পিছে পিছে,
যাব বারি সিঁচে সিঁচে,
পদ্মবন মাঝে গিয়া সরোবরে ভাসিব॥

এসব বর্ণনায় উচ্চস্তরের নিসর্গকল্পনার রূপসিদ্ধি না ঘটলেও প্রকৃতি-ভাবুকতা এক ধরনের রসনিবিড় প্রণয়মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছে। তার স্বাদুতা একান্ত অস্বীকার্য নয়। যুদ্ধবর্ণনায় কবির আকর্ষণ এখনও তুলনামূলকভাবে গৌণ। ভারতচন্দ্রের কাছ থেকে ধার করা ছন্দে প্রত্যাশিত গাম্ভীর্য প্রকাশ পায় নি। রঙ্গলালও তাঁরই মত এ-পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যর্থ হয়েছেন।

সংলাপের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের কারণ প্রায়ই জাতির অতীত মাহাত্ম্যের কীর্তন এবং স্মৃতিরোমন্থন তথা বক্তৃতার ঢঙে স্বাদেশিক উত্তেজনার প্রকাশ। পুরাণ-ইতিহাসের রূপচিত্রনিরপেক্ষ বহুল উল্লেখে এবং যাত্রাসুলভ ফাঁকা দম্ভ প্রকাশের ফলে এর কাব্যমূল্য সঙ্কুচিত—প্রচারমূল্য যত বেশিই হোক না কেন।

মাত্র একটি ক্ষেত্র ছাড়া বীরবাহু কাব্যে পাত্র-পাত্রীদের স্পর্শযোগ্য বা ধ্যানগম্য কোন মূর্তি প্রকাশ পায় নি। নায়ক বীরত্ব এবং প্রেম উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতা দেখিয়ে হাততালি পেয়েছে। কিন্তু তার দম্ভে এবং লীলালাস্যে, অতিস্ফীত আত্মবোধে এবং ক্লান্ত হতাশ জীবননাশের চেষ্টায় কাল্পনিক জগতের বর্ণবস্ত আয়োজন ভেদ করে বাঙালি তরুণের রূপ ফুটে উঠেছে।

সবশেষে কাব্যের সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের কথা। সমগ্রত কাহিনীটি কল্পনাশ্রয়ী হলেও একটা ছদ্মইতিহাসের ছাপ থাকায় একেবারে দেশকালচ্যুত নয়। সমুদ্রদ্বীপের ছয় নারীর রূপকথাসুলভ গল্পকল্প আখ্যানটিকে মৃত্তিকাভ্রষ্ট

করেছে। এই অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থি কাহিনী-বিকাশে যেমন প্রকৃত সহায়ক হয় নি, তেমনি তরল কল্পজগৎ গড়ে তুলে রচনাবন্ধকে আরও শিথিল করেছে। বোধ হয় স্বাভাবিক কল্পনাদৈন্য কবিকে অন্তরের গভীরে পীড়িত করেছে। অথচ ক্লাসিকতার দিগন্তও দেখা দেয় নি। তাই এই আত্মছলনা।

আশাকানন

বীরবাহু রচনার কিছু পরে এবং বৃত্রসংহারের কিছু আগে এই কাব্যটি লেখা হয়। প্রকাশিত হয় বৃত্রসংহার প্রথম খণ্ড প্রকাশের কিছু পরে। ইংরেজি এলিগরি জাতীয় কাব্যের রীতি অনুসারে গ্রন্থটি রচিত। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে সাঙ্গরূপকধর্মী রচনা অপ্রচলিত ছিল না। দয়া-মায়া-লোভ-বিবেক প্রভৃতি মানব-বৃত্তিগুলিকে ব্যক্তিমূর্তি দান লৌকিক যাত্রার একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি ছিল। প্রত্যক্ষত নব্যশিক্ষিত হেমচন্দ্র এর অনুসরণ করতে চান নি, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে এর কিছু প্রভাব সঞ্চিত হয়ে থাকবে। তাছাড়া অক্ষয়কুমার দত্তের "চারুপাঠ"-এর (১৮৫৩-৫৯) অন্তর্গত স্বপ্নদর্শন প্রসঙ্গগুলির আদর্শ কবির সামনেই ছিল।

আশাকানন বর্ণনাপ্রধান রূপককাব্য, স্পেনসরের "ফেয়ারি কুইন"-এর ন্যায় আখ্যানধর্মী নয়। দশটি কল্পনায় বিন্যস্ত এই কাব্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। আশাদেবীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ এবং তাঁর সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ। কর্মক্ষেত্রের ছয় দ্বারে শক্তি, অধ্যবসায়, সাহস, ধৈর্য, শ্রম, উৎসাহের পাহারা, পুরীমধ্যে যশঃশৈল। রত্নমণ্ডিত আকাঙ্ক্ষাভবন, দুরাকাঙ্ক্ষার রূপ। যশঃশৈলে আরোহণপ্রথা—ভিন্ন ভিন্ন শিখর দর্শন, স্নেহ ভক্তি বাৎসল্য প্রণয় প্রভৃতির নিবাস—পরিণয়-সেতু। প্রণয়োদ্যান—সতী-নির্ঝর—প্রণয়ের মূর্তি দর্শন। স্নেহ-উপবন—সান্ত্বনা মন্দির—দ্বারদেশে ভ্রান্তির অবস্থান। বিবেকের আগমন, আশার অন্তর্ধান—শোকারণ্যে প্রবেশ এবং শোকের মূর্তিদর্শন। নৈরাশ্যক্ষেত্র—মধ্যভাগে মরুপ্রদেশে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড—হতাশের মূর্তিদর্শন। কবির এ ভাবনার মধ্যে মৌলিকতা নেই। রচনাটি আদ্যন্ত সুপরিকল্পিত—এলিগরিতে সচেতন ও নিপুণ পরিকল্পনা না থাকলে চলে না। খাঁটি কাব্যকল্পনা এবং তার আনন্দ শ্রেষ্ঠ এলিগরিগুলিতেও প্রাপ্তব্য নয়। যদি রূপজগৎ ভাবলোককে সম্পূর্ণ আবৃত করতে পারে তবে সেই রূপের স্বাদে কিছু আনন্দ পাওয়া সম্ভব। আশাকাননে ভাবনাকে একটা স্বচ্ছ রূপাবরণ দেবার চেষ্টা হয়েছে। রূপ যে গৌণ প্রতি মুহূর্তে তার প্রমাণ মিলেছে। তা ছাড়া বর্ণনাংশগুলি মামুলি এবং ভাষাশিল্পের উপরে কবির অধিকারের বিশেষ প্রমাণ মেলে নি।

কাব্যহিসেবে মূল্যহীন হলেও আশাকানন কবির মনোলোকের কিছু

গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় বহন করে। হেমচন্দ্র যে-সব কারণে আলোচ্য কাব্যটি রচনার তাগিদ অনুভব করেছিলেন তা হল—প্রথমত, ইংরেজি কাব্যধারা থেকে বাংলা কবিতায় একটি বিশেষ রূপাকর্ষণের বাসনা; দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী কাব্য বীরবাহুতে বাঙালির স্বাদেশিকচিন্তা ব্যক্ত করার পরে মানবভাগ্যের এবং জীবনের সর্বজনীন এবং সর্বকালীন সত্য প্রকাশ করার ইচ্ছা। মানুষের পাপপুণ্য, আশা-নৈরাশ্য সম্বন্ধে কিছু ভাবনা কবির চিন্তালোককে দীর্ঘকাল ধরে আলোড়িত করেছে। কবিতাবলীর মননপ্রধান (Reflective) কবিতাগুলি থেকে শুরু করে আশাকানন, ছায়াময়ী এবং দশমহাবিদ্যা পর্যন্ত সে ভাবনাধারার একটি ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। আশাকাননে কবি আশার মায়ালোকে ভ্রমণের পরে নৈরাশ্যমরুতে যন্ত্রণাদাহে নিপতিত হয়েছেন এবং তখনই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। এই ভাবনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। আশা-কাননে শেষপর্যন্ত কবি নিরাশার অন্ধকারেই নিমজ্জিত হয়েছেন। এখান থেকে ছায়াময়ীর দূরত্ব বেশি নয়।

ছায়াময়ী

আশাকানন এবং ছায়াময়ীর মধ্যে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার মহাকাব্যটি রচিত। বৃত্রসংহারে কবি দীর্ঘকাল কাব্যরীতি, রূপ ও রসের একটি স্বতন্ত্র জগতে বিচরণ করলেও ভাবনার সে গ্রন্থি মোচিত হয় নি। আশাকাননে আশার স্বপ্ন ভীষণ নৈরাশ্যে সমাধি লাভ করেছিল। এ হল জীবনযন্ত্রণা। আর জীবনাবসানে মানবাত্মার পার্থিব কর্ম ও বাসনার ফলে যে নরকভোগ তারই বিবরণ সঙ্কলিত হল ছায়াময়ী কাব্যে। দান্তের "ডিভাইন কমেডি"র ভাবাবলম্বনে আলোচ্য গ্রন্থ রচিত।* তবে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের যথাযথ অনুসরণ না করে কবি মাঝে মাঝে হিন্দুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। এ কাব্যের মোট কথা শশাঙ্কমোহন সেনের সমালোচনায় ধরা পড়েছে।

> "ছায়াময়ীতে সংসারের এক ভয়াবহ নিয়তি চিত্রিত! এই চিত্রে কুত্রাপি অণুমাত্র সান্ত্বনা নাই। জীবরঙ্গভূমে, ষড়রিপুর এই অনিবার্য্য সংগ্রাম এবং ভীষণ কোলাহলের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও স্খলিতপদ

* আলিঘিয়েরি দান্তের "ডিভাইন কমেডি' চিরায়ত সাহিত্যরূপে মহিমান্বিত হয়েছে। এই গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে Encyclopaedia of Literature (Vol. I)-এ বলা হয়েছে, "The Commedia, probably begun in 1307/10—though some scholars say 1313/14—was finished shortly before Dante died. Its literal sense is a journey made by the poet through Hell, Purgatory and Heaven ; its spiritual sense is mankind as answerable to divine justice. Divided into three parts of 33 cantos each, with one introductory canto, its intricate logical and imaginative construction reflects a mind of wonderful richness, simplicity and depth."

> দুর্ব্বল মনুষ্যের জন্য কোন্ বিভু এই ভীষণ নরকযন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, জানি না। কিন্তু হেমচন্দ্র উহার চিত্র অনুপমভাবে বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন।"

সমালোচকের সব কথা মানা যায় না। কারণ চিত্র মোটেই অনুপম নয়। বিশেষ করে বীভৎস রসের রূপনির্মিতি সচরাচর কাব্যসৌন্দর্যের বাহন হয়ে ওঠে না। লৌকিক জুগুপ্সার ভাবকে রসে রূপান্তরিত করা সহজ নয়, বাংলা কাব্যপাঠে মনে হয় আদৌ সম্ভব নয়। মধুসূদন সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন, হেমচন্দ্রও। তাছাড়া গোটা ভাবনার পেছনেই মধ্যযুগীয় নরকভীতি এবং পাপপুণ্যমূলক নীতিবোধ সক্রিয় থাকায় আধুনিক মনের কাছে তা তাৎপর্যহীন এবং আবেদনহীন। হেমচন্দ্রের চিন্তালোকের এক পা নব্য ভাবনার দিকে প্রসারিত কিন্তু অন্য পা মধ্যযুগের বিশ্বাসে বদ্ধ। মধুসূদন মেঘনাদের অষ্টম সর্গে নরক বর্ণনায় বর্ণনারস বিস্তার করতে তথা প্রাচীনের স্বর বাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বৃত্রসংহারে বজ্রনির্মাণ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রেরও ছিল ঐ একই লক্ষ্য। কিন্তু ছায়াময়ীর নরকচিত্রণের পেছনে কবির গূঢ়তর জীবনভাবনা ছিল সক্রিয়।

তৃতীয় অধ্যায়

বৃত্রসংহার

এক

হেমচন্দ্র বৃত্রসংহার নামে হঠাৎ একটি মহাকাব্য লিখে ফেললেন। মহাকাব্য অবশ্য কোনো কবিই অনেকগুলি করে লেখেন না। এক একটি মহাকাব্য দীর্ঘ সাধনার ফলশ্রুতি। তবে খাঁটি মহাকবির মহাকাব্যিক মেজাজটি অন্যান্য রচনার মধ্যেও নানারূপ ছায়া ফেলে। হেমচন্দ্র সারা জীবনে আখ্যান-কাব্য লিখেছেন একটি আর এই মহাকাব্য বৃত্রসংহার। চিন্তাতরঙ্গিণীতে আখ্যানধর্ম নেই বললেই চলে। কাব্যভাষায় কাহিনীকথন এবং চরিত্র গঠনে হেমচন্দ্রের কোনো স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল না। তাঁর গ্রন্থতালিকার দিকে লক্ষ্য করলে এ সত্যে সংশয় থাকবে না। নানা জাতের খণ্ডকবিতা, বিদেশি কাব্য-কবিতার ভাবাকর্ষণ ও রূপানুকরণ, বর্ণনাধর্মী আখ্যানবিরহিত রচনার সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তবুও তিনি মহাকাব্য লিখলেন। মহাকাব্যের কাঠামোটি দাঁড়িয়ে থাকে কাহিনী সংগঠনের উপরে, চরিত্র এর প্রাণস্বরূপ। অবশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়েই আখ্যান ও ব্যক্তি উভয়ের প্রকাশ। কিন্তু হেমচন্দ্র ঐ দুটি বিষয়ে পরিণতি লাভের জন্য বিশেষভাবে সাধনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। বীরবাহুর পরে তিনি লিখলেন কবিতাবলী, তারপর আশাকানন (পরে মুদ্রিত)। অথচ ১৮৭২ সালেই মধুসূদনের মেঘনাদ-বধকাব্যের টীকা ও ভূমিকা লিখতে গিয়েই এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। ১৮৬২ সালে প্রথমবার এবং ১৮৬৭ সালে দ্বিতীয়বার মেঘনাদের সম্পাদনা করেন হেমচন্দ্র। প্রথমবারের ভূমিকাটি পরে পরিবর্তিত হয়। এই পাঁচ বছরের মধ্যে হেমচন্দ্রের কবিপ্রকৃতি তথা কাব্যরসবোধে যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, পূর্বোক্ত সমালোচনা দুটির অংশ বিশেষের তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে।

প্রথমবারে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন,

> "সত্য বটে, ভারতের তুল্য সুলেখক আজ পর্যন্ত এ দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, এবং বোধ হয় আর জন্মিবে না। তেমন মধুমাখা কথা বুঝি আর কেহ কখন গৌড়বাসীদের শুনাইতে পারিবে না।…প্রাত্যহিক ব্যাপার সমস্ত সুন্দররূপে সাজাইয়া, তাহাতে বাক্যামৃত বর্ষণ করাই তাঁহার সাধ্য ছিল, এবং তাহাতেই তিনি অপ্রমেয় দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উৎপাদিকা শক্তি এত দুর্ব্বল ছিল……। রসিকতা চতুরতা ও মনুষ্যপ্রকৃতিতে দৃষ্টি তাঁহার বিলক্ষণরূপ ছিল। …যেখানে যে কথাটি খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন্ উৎপ্রেক্ষা কোন্ কালের উপযোগী, কোন্ শব্দটি, কোন্

পদটি উচ্চারণ করিলে কোন্ রসের উদ্দীপন করে, এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট হয়। কবি মাইকেলের কি এসকল গুণ নাই—এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, যেন তিনি পদবিন্যাসকালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন; তাহাদের উপযোগিতা অনুপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু যে কথাটি না হইলে নয়, সেই কথাটি প্রয়োগ করা আছে; সুতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য। মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, কোটালের প্রতি মালিনীর ভর্ৎসনা, রাজার প্রতি রাণীর গঞ্জনাভাস, কি চমৎকার কুহকিনীশব্দে বিন্যস্ত হইয়াছে।"

মোট কথা সৃজনক্ষমতার অভাব থাকলেও রচনাসৌকর্যের জন্য ভারতচন্দ্রকেই তিনি মধুসূদনের চেয়ে উচ্চতর আসন দিতে চেয়েছিলেন। পাঁচ বছর পরে এই ভূমিকাটি সংশোধন করে তিনি লিখলেন,

"বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুৎছটাকৃত বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায়? তাঁহার কবিতা-স্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়; বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গগর্জ্জন নাই; মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন এবং শ্রবণ তৃপ্তিকর। মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দরদর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, বিদ্যাসুন্দরের প্রথম মিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভর্ৎসনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শব্দপ্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা গর্জ্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়।...বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয় কিন্তু রণতরঙ্গ-বিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য তুরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক;—ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না।"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির সাহায্যে হেমচন্দ্রের মনের ছবিটি ধরা যায়। কবি ১৮৬৭ সালের আগে মহাকাব্যরচনা সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন নি। ভাষা ও সৃজনশীল কল্পনায় গম্ভীর বিপুলের আবেদন সম্বন্ধে এই সময় থেকেই তিনি কতকটা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

কবি নানা ধরনের কাব্যরচনা করেছিলেন অনেকগুলি। তার মধ্যে "রণতরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য তুরী ভেরী এবং

দুন্দুভির ধ্বনি বিদ্যুৎছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা” সৃষ্টির চেষ্টা একমাত্র বৃত্রসংহারেই আছে। দ্বিতীয় পত্রাংশটির মধ্যে মহাকাব্যরচনার প্রেরণাবীজটি কবি কতক ব্যক্ত করেছেন, হয়ত পুরো না জেনেই। মেঘনাদবধকাব্যের ক্রমবর্ধমান খ্যাতি এ-জাতীয় কাব্যের দিকে হেমচন্দ্রকে আকর্ষণ করে থাকবে। ১৮৬৭ সালে মেঘনাদের ভূমিকাটি তিনি পুনর্লিখিত করেন। তখন গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে কাব্যটির তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই সময় থেকেই মেঘনাদের আদর্শে একটি মহাকাব্য রচনা করবার বাসনা তিনি পোষণ করতে থাকেন।

বৃত্রসংহারের আগে নানা জাতের অনেকগুলি কাব্য তিনি লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে ভাবনার বিচিত্রতা এবং আঙ্গিকেরও নানা আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু এই রচনাবলী তাঁকে বিশেষ খ্যাতি দিতে পারে নি। মধুসূদন প্রদর্শিত পথে এই খ্যাতিলাভ সম্ভব বলে তাঁর ধারণা জন্মেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ১৮৬৯ সালের মধ্যে মেঘনাদের ছয়টি সংস্করণ প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

কবির বৃত্রসংহার রচনার প্রেরণা যে অনেকাংশে বাইরের ব্যাপার, কবিপ্রকৃতির মূল থেকে উৎসারিত নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ফলে বৃত্রসংহার হয়ে উঠেছে যতটা গড়ে তোলা জিনিস ততখানি শিল্প-প্রতিভার সৃষ্টি নয়।

দুই

হেমচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করলেন। বিষয়টি বৃত্রসংহার। মহাভারতে এ কাহিনী আছে। অনেক প্রাচীন পুরাণে এর প্রসঙ্গ আছে। এমন কি বৈদিক গ্রন্থাদিতে পর্যন্ত ইন্দ্রের বৃত্রবিনাশের উপাখ্যান স্থান পেয়েছে। এই সব কাহিনীর মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণও কম নয়। কোথাও এর সঙ্গে প্রাকৃতিক তাৎপর্য জড়িত, কোথাও আবার প্রাক্-ঐতিহাসিক।* কেহ বলেন বৃত্র বিশ্বকর্মার সন্তান, কারও মতে বিশ্বকর্মার রচনা বৃত্র-বিনাশের মহা-আয়ুধ বজ্র। তবে সে-সব আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। হেমচন্দ্র যে মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত শততম এবং একাধিকশততম অধ্যায় দুটি থেকে আখ্যানাংশ সঙ্কলন করেছিলেন, অন্যান্য পুরাণ-কথা বা বৈদিক কাহিনীসূত্রের কাছে যে তিনি ঋণী নন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। গ্রন্থশেষে মহাভারত থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত হয়েছে। কাব্যটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বৃত্রসংহারের উৎস কোথায় বোঝা যাবে।

* কোনো কোনো গ্রন্থে বৃত্রাসুর ইরাণীয় আর্যদের প্রতিনিধিস্থানীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং ইন্দ্র ভারতীয় আর্যগণ সেবিত কোনো প্রাচীন পুরুষরূপে বর্ণিত। কোথাও বৃত্র কথার তাৎপর্য মেঘ, বজ্রের সাহায্যে মেঘ বিদীর্ণ করে বারিপাত ঘটান ইন্দ্র।

মধুসূদন প্রাচীন কাহিনীর দিকে ঝুঁকেছিলেন আমাদের পুরাণের অত্যাশ্চর্য আখ্যানগুলির সৌন্দর্যাকর্ষণে। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর সামান্য আকর্ষণ না থাকলেও হিন্দু পুরাণের সৌন্দর্য দিয়ে তিনি আপনার রচনাবলী সজ্জিত করবেন। তাঁর তিনটি কাব্যের কাহিনী-ভিত্তি প্রধানত রামায়ণ-মহাভারত এবং কতকটা ভাগবত পুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্তের কাহিনী। চতুর্দশপদীরও অনেকগুলি কবিতার অবলম্বন পুরাণপ্রসঙ্গ। শর্মিষ্ঠা নাটকটি পুরাণ অবলম্বনে লেখা। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বিষয় মধ্যযুগীয় হলেও পুরাণের যুগের থেকে এর কাল্পনিক কালস্থিতি বড় দূরবর্তী নয়। পুরাণ-প্রসঙ্গ মধুসূদনের কাব্যাদির দেহগঠনে উপমাদির উপাদান রূপে সর্বাধিক ব্যবহৃত। কবি যেন পুরাণের প্রাচীন রাজ্যের রূপরসকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন তাঁর সাহিত্য-সাধনায়। দীর্ঘকাল দেশি বিদেশি প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করবার ফলে মধুসূদন একটি ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর রচনায় তাই "প্রাচীনের কণ্ঠস্বর" ভাষা পেয়েছে। অথচ তাঁর আধুনিকতা সবচেয়ে অমিশ্র। উৎসের রসাবেদন, ঘটনা ও চরিত্রভাবনাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করতে এরূপ নির্দ্বিধা অন্তত আমাদের সাহিত্যে সুলভ নয়। প্রাচীন লোকে পরিক্রমা এবং তার আধুনিকীকরণ দুটি বিপরীত প্রান্তের অদ্বয় সম্বন্ধ মধুসূদনের কাব্যের একটি অতিরিক্ত মূল্য, একটি অভিনব স্বাদ।

হেমচন্দ্রের পুরাতনপ্রীতি এতটা গভীর নয়, আন্তরিকও নয়। তবে নবযুগের বাংলা সাহিত্যে পুরাণ এবং ইতিহাসের নব ব্যাখ্যানের যে ধারাটি আগেই শুরু হয়েছিল হেমচন্দ্রও তাকে অনুসরণ করেছেন। "কবিতাবলী"র কয়েকটি রচনায় (যেমন "ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পুজা", "ইন্দ্রের সুধাপান" প্রভৃতি) কবি পুরাণ জগতকে স্মরণ করেছেন। পরবর্তী "দশমহাবিদ্যা"য় তিনি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ভাবনাকে বরণ করে নিয়েছিলেন। নবজাগরণের ফলে ভাবাবেগ এবং মননে যে মুক্তির আগ্রহ দেখা দেয় তার অন্যতম লক্ষণ পুরাতন কাব্য দর্শনাদির উদ্ধার, মানবিক দৃষ্টি এবং যুক্তিবাদের আলোকে তার নূতন মূল্যায়ন। য়ুরোপেও গ্রীক-রোমক শাস্ত্র ও কাব্যাদির উদ্ধার ও ব্যাখ্যান চলেছে। আমাদের জ্ঞানতপস্বীরা প্রাচীন বৈদিক-ঔপনিষদিক গ্রন্থরাজি বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে খুঁজে বের করেছেন। মূল মহাভারতাদির অনুবাদ করেছেন। আমাদের কবিরা পুরাতন কাহিনীর নবরূপ দান করেছেন। বঙ্কিম-যুক্তিবাদের তীক্ষ্ণতায় জাতীয় আদর্শরচনার নিষ্ঠায় কৃষ্ণচরিত্র গড়েছেন, হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারের প্রাচীন কাহিনীরসে নব্য স্বাদেশিক ভাবনার মসলা মিশিয়ে পরিবেশন করেছেন, নবীনচন্দ্র মহাভারত বিষয়টিকেই নূতন তত্ত্বব্যাখ্যায় একটি অভিনব রূপ দিতে চেয়েছেন।

পুরাণের রসজগৎটি গড়ে তোলা বড় সহজ নয়। ঠাণ্ডা অতীতের ধমনীতে উত্তপ্ত রক্ত চলাচল করানো চাই। না হলে তা সত্য হয়ে উঠবে না। আবার সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎপর্যটি বদলে দেওয়া তো খুবই কঠিন কাজ। অথচ

পৌরাণিক কাহিনীটি যেন রূপক না হয়ে ওঠে। এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন মধুসূদন মেঘনাদবধকাব্যে। এ-বিষয়ে ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের বিশ্লেষণ মনে রাখবার মত।

"The honest reader of Meghnadbadh Kavya, I mean one with no critical axe to grind, must look for the ancientness in the spirit of the whole poem till he believes that the modern age is not so modern and what is ancient is not so archaic, and he is encouraged in this effort by a quick realisation of two very important things about the poem : first, that it does not use mythology as a subtle allegory to dramatize a new social reality and secondly, it is not just mythography in elegant verse. Here the Gods are like the Gods of Homer, not hopelessly divine, and demons shed human tears, here the walls of a city of gold smoulder and fall in a battle-fire raised by the monkey army of a mendicant prince who is clad in bark, and all creation, the waves of the sea or the sands on its shore, the gorgeous throne—room or the bare camps are instinct with a life such as it appeared to the eye of an elder world."

হেমচন্দ্র এই রসজগৎটি পুরো গড়ে তুলতে পারেন নি। পুরাণাশ্রিত উপমাচিত্রের এ-বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কবি মেঘনাদবধের সতর্ক পাঠক হয়েও সে-বৈশিষ্ট্যটির তাৎপর্য ধরতে পারেন নি। রাবণের সভা বর্ণনায় কুড়িটি চরণের মধ্যে এরূপ চিত্রের উদাহরণ মিলবে পাঁচটি ক্ষেত্রে।

এক। শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে।

দুই। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে!

তিন। ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি!

চার। মনোহর, যথা
বাঁশরী স্বরলহরী গোকুল বিপিনে !

পাঁচ। কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে ?

মধুসূদনের কাব্যের প্রথম সর্গের চল্লিশতম-ষাটতম চরণগুচ্ছের মধ্য থেকে উদ্ধৃতিগুলি নির্বাচিত। মুহুর্মুহুঃ পৌরাণিক চিত্রসৃষ্টির রসঘটিত ফলশ্রুতি যে কত গভীর এবং ব্যাপক হতে পারে মেঘনাদবধকাব্যের পাঠকমাত্রের তা অজানা নেই। এ জাতীয় চিত্ররচনা বৃত্রসংহারে খুবই কম। স্বল্প যে কয়েকটি স্থানে আছে তা উল্লেখমাত্রে পর্যবসিত, পূর্ণ নয়নবিনোদন রূপ হয়ে উঠতে পারে নি। হেমচন্দ্র অন্য উপায়ে এই অভাব পূরণ করতে চেয়েছেন। প্রাচীন ভাবপরিবেশ গড়ে তোলায় পৌরাণিক উল্লেখগর্ভ শব্দযোজনার ব্যাপক চেষ্টা করেছেন তিনি এ কাব্যে। টীকা ও মন্তব্য প্রসঙ্গে এ জাতীয় শব্দপ্রয়োগের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ধ্বনি-গম্ভীর তৎসম শব্দ বিশেষ করে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার হেমচন্দ্রে অত্যধিক। বৃত্রসংহারের প্রারম্ভিক একটিমাত্র পৃষ্ঠা থেকে এভাবে প্রযুক্ত শব্দ প্রয়োগের একটি তালিকা প্রস্তুত করা যাক।

আদিত্যগণ। তমঃ আচ্ছাদিত। নির্ব্বাণপ্রায় কলেবর-জ্যোতিঃ। ত্বিষাম্পতি। অদিতি-নন্দনগণ। রসাতলপুরে। আরাব। স্কন্দ। জীমূতবৃন্দ। মন্দ্রিল। দানবারি। সুরভোগ্য। দনুজ। অজর অমর শূর। স্বরভ্রষ্ট। অসুর-মর্দন।

তালিকার দৈর্ঘ্য প্রমাণ করে যে প্রায় এরূপ শব্দ দিয়েই কাব্য-দেহ গঠিত। ফলে একটি প্রাচীনতার পরিমণ্ডল যে রচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারের মূলটি নিয়েছেন মহাভারত থেকে। প্রাসঙ্গিক অংশ গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হয়েছে। বৃত্রকথা বৈদিক সাহিত্য এবং অপরাপর পুরাণ গ্রন্থেও ছিল। ইন্দ্রকে ভারতীয় আর্যদের প্রধান দেবতা এবং বৃত্রকে ইরাণীয় আর্যদের অহুরমুখ্য (দেবরাজ)-রূপে গ্রহণ করে ঐতিহাসিক সংঘর্ষের বীজ কেউ কেউ ইন্দ্র-বৃত্রের সংঘাতের মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। মেঘরূপী বৃত্রকে বজ্রাঘাতে বারিবর্ষণে রূপায়িত করেন দেবরাজ ইন্দ্র এরূপ প্রাকৃতিক ভাবনার ইঙ্গিতও প্রাচীন গ্রন্থে আছে ; কোনো কোনো পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা ইন্দ্রকে নিধন করার উদ্দেশ্যেই বৃত্রকে নির্মাণ করেছিলেন। সে সব কাহিনীর দ্বারা হেমচন্দ্র বিচলিত হন নি। প্রথমোক্ত সূত্র দুটি নিঃসন্দেহে নব্য যুক্তি-বাদীর কাছে খুবই আকর্ষণীয় হবার কথা। প্রসঙ্গত নবীনচন্দ্রের মহাভারতাশ্রয়ী মহাকাব্যত্রয়ীর কথা মনে করা যেতে পারে। নবীনচন্দ্র মহাভারতের কাহিনী-

রসে স্নাত হন নি, তা থেকে ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক তত্ত্ব বের করতে চেয়েছিলেন। অনুমান করা অসঙ্গত নয়, মহাভারতের সহজ কাহিনীর তুলনায় ইতিহাস বা অন্য কোনো জাতীয় ইঙ্গিতগর্ভ কথাই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত। তাঁর বৈরতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের দিকে তাকালেই সে কথার প্রমাণ মিলবে। গল্পরসে ছিল না তাঁর আকর্ষণ—মহাভারতীয় জীবন-রূপের বর্ণাঢ্য প্রাচীনতা ফুটিয়ে তুলবার কিছুমাত্র বাসনা শিল্পী হিসেবে তিনি অনুভব করেন নি। আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক ভারত ঐক্যের ভাবনা এবং হিন্দুপুনরুত্থান-চিন্তার সহিত জড়িত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যান তথা বৈষ্ণবীয় ভাবাতিরেক প্রকাশের একটি কাহিনী-আধার তিনি খুঁজেছিলেন মহাভারতে। এ জাতীয় মন নিয়ে পুরাণ-কাহিনীর অনুবর্তন শিল্পকর্ম হিসেবে তাৎপর্যহীন হতে বাধ্য। হেমচন্দ্রের মনে নব্য ভাবনা ছিল, কিন্তু তিনি বৃত্রের কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন, মহাভারতোক্ত কাহিনীটিকে বিকশিত করে তুলেছেন, পল্লবিত করেছেন, নূতন যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কাহিনীর নিজের আবেদন নষ্ট করে ফেলেন নি। প্রাচীনের রস-সৃষ্টিতে তাঁর সাফল্য সীমাবদ্ধ কিন্তু নবীনের ন্যায় তা নাস্ত্যর্থক নয়।

মহাভারতের কাহিনীটি তিনি অবলম্বন করেছেন। নূতন কল্পনায় অনুক্তকে পূর্ণ করে তুলেছেন—কিন্তু মধুসূদনের মত সে কাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি। মহাভারতের কাহিনীতে নীচের প্রসঙ্গগুলি বর্ণিত হয়েছে। এক। দানবাদির নেতা বৃত্রাসুরের প্রবল পরাক্রম। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের পরাভব ও স্বর্গচ্যুতি। দুই। ব্রহ্মার পরামর্শ। দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্রই বৃত্রাসুরের বধাস্ত্র। তিন। দেবতাদের হিতার্থে দধীচির সানন্দে অস্থিদান। চার। বজ্রশোভিত ইন্দ্রের নেতৃত্বে দেবতাদের দানবাক্রমণ। বৃত্রাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে অপারগ ও ভীত ইন্দ্র-সহায়তা। এবং কোনোক্রমে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রনিধন। এর মধ্যে শেষের সূত্রটিই কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দধীচির আশ্রমের রূপটিও তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে শ্বাপদসঙ্ঘের মৈত্রী আচরণ।

হেমচন্দ্র কাব্যের মূল কাঠামোটি উক্ত চারিটি স্তম্ভের উপরেই বসিয়েছেন। প্রায় কিছু চ্যুতি নেই। বজ্র নির্মাণের পরামর্শ এখানে দিয়েছেন শিব, মহাভারতের মতো ব্রহ্মা নয়—উল্লেখ্য স্বাতন্ত্র্য এইটুকুই। এমন কি বর্ণনায়ও মূলের ছায়াপাত ঘটেছে। ইন্দ্র-বৃত্রের শেষ যুদ্ধের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। মহাভারতে বলা হয়েছে,

> বৃত্রাসুর সুরপতিকে এইরূপ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অতি ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহীতল, দিক সকল, অন্তরীক্ষ ও দেবলোক কম্পমান হইতে লাগিল।

হেমচন্দ্র লিখেছেন,

> সে চীৎকারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
> চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,

ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে ! সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন !—মহাকাল
শিবদূত কৈলাস-দুয়ারে, নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে ! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে !
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার।

কিন্তু কাঠামোটি ঘিরে দেহগঠন করতে গিয়ে আপনার কল্পনাকে কতকটা স্বাধীনতা দিয়েছেন কবি। হেমচন্দ্র-কল্পিত এই স্বাধীন কাহিনী বিন্যাসের মুখ্যগ্রন্থি শচীহরণ। শচীকে সেবিকারূপে দেখতে চেয়েছে ঐন্দ্রিলা। শচী নৈমিষারণ্যে গুপ্তভাবে বাস করছিল। কামদেবের কাছে সংবাদ পেয়ে সে পাতালে পলায়িত পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করে এনেছে। বৃত্রকর্তৃক ভীষণ নামক দানব প্রেরিত হয়েছে। জয়ন্ত তাকে বধ করেছে। পুত্র রুদ্রপীড়কে তখন পাঠানো হয়েছে নৈমিষারণ্যে। কৌশলে স্বর্গবেষ্টিত দেবব্যূহ অতিক্রম করে রুদ্রপীড় অরণ্যে এসেছে। জয়ন্ত পরাভূত হয়েছে। শচী বলপূর্বক নীত হয়েছে স্বর্গে। দ্বিতীয়, অংশত তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অংশত ষষ্ঠ, নবম এই ছয়টি সর্গের বিস্তারিত আয়োজনে শচীহরণ ঘটেছে। চতুর্দশ সর্গে অপহৃতা শচীর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। এর প্রতিক্রিয়াও বহুদূর প্রসারিত। দৈত্যকুলবধূ ইন্দুবালা থেকে রুদ্র মহাদেব—সকলেই এ ঘটনায় বিচলিত। ইন্দুবালায় দেখি বিবেকদংশন, ভীতি, শেষ পর্যন্ত শচীর পায়ে আত্মসমর্পণ (অষ্টম এবং অষ্টাদশ সর্গ)। শচীহরণের ফলেই রুদ্রের ক্রোধ বৃত্রের চরম সর্বনাশে উদ্যত হয়েছে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গে তার ছবি এঁকেছেন কবি। ইন্দ্রের বৃত্র-বিরোধিতায় স্বর্গোদ্ধারের রাজকীয় কর্তব্যের সঙ্গে প্রণয়ীর উদ্বেল উত্তেজনাও যুক্ত হয়েছে (দশম সর্গ)। শেষ পর্যন্ত ঐন্দ্রিলার অপমান ও আঘাতের হাত থেকে শচীকে উদ্ধার করিয়ে সুমেরু শৃঙ্গে স্থাপন করেছেন কবি (অষ্টাদশ সর্গ)। শচীর দৈবী-মর্যাদা বজায় রাখবার অন্য কোনো পন্থা তাঁর জানা ছিল না।

শচীহরণের এই কাল্পনিক প্রসঙ্গ দেবাসুর যুদ্ধের তাৎপর্যকে অনেকটা ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে। দানবীয় শক্তিমত্তার চরম রূপ এই ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। স্বয়ং ইন্দ্রপত্নীকে হরণ করার সাফল্যে তাদের অমোঘ শক্তির দুন্দুভি যেমন বেজেছে, অন্ধ প্রবৃত্তিবেগের আসন্ন পতনের অন্ধকারও করাল ছায়া ফেলেছে।

এই কল্পবৃত্তান্তটি সংযোজিত হয়েছে মধুসূদনের আদর্শে। অবশ্যই সীতার তুল্য আকর্ষণ শচীতে নেই। তবে সীতার পঞ্চবটী বাসের সঙ্গে শচীর নৈমিষারণ্যে অবস্থিতি তুলনার যোগ্য। রক্ষবধূ সরমায় সীতা-সাহচর্যের ন্যায় ইন্দুবালার মধ্যে শচীর প্রতি সেবাপরায়ণতার ভাবটি দেখানো হয়েছে।

সীতাহরণের পাপে রাবণের পতনের ন্যায় (রাবণ নিজে না বুঝলেও মেঘনাদবধ-কাব্যের অনেক পাত্রপাত্রীর মুখেই এরূপ অভিযোগ শ্রুত হয়েছে।) শচী-হরণের ফলেই যে বৃত্রের পতন সম্ভব হল কবি তা দেখিয়েছেন। কিন্তু সীতার সৃষ্টিমাহাত্ম্যের সামান্যই শচীতে বর্তমান।

হেমচন্দ্রের কল্পনায় মানববাদের বিদ্রোহী নবরূপের কোনো গভীর প্রত্যয় ধরা পড়ে নি। কবির একান্ত ভদ্র শান্ত প্রথাবদ্ধ মার্জিত জীবনচর্যা এর জন্য হয়তো কিছুটা দায়ী। মধুসূদনের কাব্যের অনুসরণে তিনি অনুরূপ ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কাব্যে তা পরিকল্পনার স্তর অতিক্রম করে কল্পনার গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি।

বৃত্র ও রুদ্রপীড়ের প্রতি প্রাচীনপন্থীর মতো ঘৃণাবর্ষণ করতে পারেন নি তিনি নির্দ্বিধায়। পিতাপুত্রের উপরে কবির প্রীতি ছিল, ছিল সহানুভূতিও। তাদের বীর্য সম্পর্কে শ্রদ্ধায় কবি উচ্চকণ্ঠ। বীর্যেই মনুষ্যত্ব—মানুষের মুক্তি ভীরুতা, পদলেহী বৃত্তি থেকে, প্রথাবদ্ধ চিত্তধ্বংসী অপমান থেকে—এই ভাবনা সামান্যত হলেও হেমচন্দ্রকে আকর্ষণ করেছিল। মধুসূদনের গভীরতা সেখানে অবশ্যই খুঁজব না।

পাশাপাশি এ কথাও সত্য যে দেবসঙ্ঘই এ কাব্যে দানবদমী কল্যাণ ও সত্যের শক্তিরূপে বৃত। শেষ পর্যন্ত সব বীর্য নিয়েও বৃত্র প্রতিনায়কই হয়ে রইলো।

৩) নূতন যুগভাবনা প্রধানত জাতীয়তাবোধের সত্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল হেমচন্দ্রের কাছে। মধুসূদনের মহাকাব্যে স্বাদেশিকতার অঙ্কুর ছিল। রামচন্দ্র সেখানে পররাজ্য আক্রমণকারী রূপে চিহ্নিত। বিভীষণ দেশদ্রোহী। মধুসূদনের মানব-চেতনার বিদ্রোহী নূতনত্বের সঙ্গে এর সহজ মিলন ঘটেছিল। মেঘনাদ পরিচিত হয়েছিল জাতীয় বীররূপে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে তার সৈনাপত্যলাভে বন্দীদের বন্দনার ভাষা। বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের অনুযোগ ও ভর্ৎসনার কথা। হেমচন্দ্রের যুগে জাতীয় আন্দোলন স্পষ্টতর প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। হেমচন্দ্র নিজেও ব্যাপক ভাবে এর প্রত্যক্ষ চর্চা করেছিলেন কাব্য-কবিতায়। হেমচন্দ্রকে বিশেষ করে জাতিবৈরের কবি বলে অনেকেই সোৎসাহ মন্তব্য করেছিলেন সেকালে। তাঁর পুরাতন কাহিনী-আশ্রয়ী এই মহাকাব্যে নূতনের মুখ্য সুর এই স্বদেশমন্ত্রের উপস্থাপনায়। তবে কাহিনীর স্বাভাবিকতা তা লঙ্ঘন করে নি। গল্পের রসকে নস্যাৎ করে স্বাদেশিক ভাবনাটিকে উঁচিয়ে রাখে নি।

এ কাব্যের স্বর্গচ্যুত দেবতাদের দুরবস্থায়, বেদনায়, অপমানবোধে স্বদেশচ্যুত গৌরবহারা সমকালীন ভারতীয়দের অন্তর বাণীটি বেজেছে। ইন্দ্রের কঠোর সাধনা, দধীচির আত্মদানে হারানো স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরে পাবার কল্পনায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দিগন্তে উঁকি দিয়েছে। কাম-রতি-কুবের এ কাব্যে দানববিজিত স্বর্গে হীন দাস্যে নিযুক্ত থেকেছে। এদের মাধ্যমে হয়তো

আমাদের জাতীয় পরাধীনতা ও দাস্যবৃত্তির গ্লানির প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন কবি। দেশচ্যুতির অগৌরবের মধ্যেও বীর্যবান্ ইন্দ্র ও দেবগণের সাধনায় পৌরুষ আছে। বিজয়ী শত্রুর পদলেহনে আছে শুধুই হীনমন্য লাঞ্ছনা। কাম-রতি-কুবেরই হেমচন্দ্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা। কবিতাবলীতে এদেরই উত্তেজিত করবার জন্য কবির ভাষায় শিঙাধ্বনি শোনা গিয়েছে, ব্যঙ্গের শাণিত তীরে এদেরই চিত্ত ক্ষত করার অভিলাষ প্রকাশ পেয়েছে। এরা ইন্দ্রিয় ও অর্থসর্বস্ব ভোগের দেবতা। বিশেষ করে এদের তিনজনকে দানবদাস রূপে চিত্রিত করার পেছনে কিছু প্রতীকদ্যোতনা আছে। সাঙ্গরূপক কাব্য 'আশাকানন'-এর কবির ভাবনা কখনও কখনও রূপক ও প্রতীক আশ্রয়ী হয়ে ওঠা খুবই সম্ভব। ভোগবাসনায় ও অর্থ বিত্তের লোভেই জাতি নির্বিকার চিত্তে পৌরুষ হারিয়ে পর-পদানত হয়ে থাকছে, এই কথাটিই হেমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন। আর ইন্দ্র-দধীচি কবির স্বপ্ন—যে স্বপ্ন আদর্শলোকের ছবি এঁকে চরম দুর্দিনেও দুরবস্থায় মানবমনকে আশ্বস্ত করে।

শচীকে বন্দী করে স্বর্গে নিয়ে আসা হয়েছে (চতুর্দশ সর্গ)। প্রবাসীর দেশে ফিরবার আনন্দ অনুভব করেছে শচী, দেশের পরাধীনতার বেদনাও।

> কে আছে ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
> সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া.
> (কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
> সে জনমভূমি.তার) নিরখি পুর্ব্বের
> পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর
> নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণিকুল,
> নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হ'য়ে
> "এই জন্মভূমি মম!" কে আছে রে, হায়,
> ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
> হেরে শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ!
> বিজেতা চরণতলে নিত্য বিদলিত,
> বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে!
> বিজন অরণ্যভূমি বনের (ও) কুসুম
> ভুঞ্জিতে পরাণে ভয়! শত্রুর অর্চ্চনা
> দেব-অর্চ্চনার আগে ত্রিসন্ধ্যা সেখানে!
> কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে?

আনন্দ-বেদনার এই মিশ্রসুরে পরাধীন জাতির মনোভাবের ছবিই ধরা পড়েছে, শচী এখানে উপলক্ষ মাত্র। অন্যত্র শচী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণ নিয়ে দানবদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে অস্বীকার করেছে। তার ভাষায় স্বাধীনতাপ্রীতির নবযুগের বাণীই প্রকাশ পেয়েছে (পঞ্চম সর্গ)।

স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা স্বাধীন উল্লাস,
সসর্প গৃহেতে বাস, পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার।
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ,
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ।

এ স্বর্গ চাই না, ঐশ্বর্য চাই না—যদি তার সঙ্গে পারবশ্যের লজ্জা জড়িত থাকে। এ কথা আধুনিক স্বাধীনচিত্ততার কথা।

(২) স্বদেশভাবনার মুখ্য রাগের পাশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গৌণ রাগিণী ও মাঝে মাঝে আলাপিত হয়েছে এ কাব্যে। শচীর চরিত্রাশ্রয়ে তার কিঞ্চিৎ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। দানবাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শচীকে ছদ্মবেশ ধরবার পরামর্শ দিয়েছিল চপলা। শচী তা প্রত্যাখ্যান করে যা বলেছে তাতে তার তীব্র আত্মাভিমান স্ফুরিত হয়েছে (পঞ্চম সর্গ)। রুদ্রপীড়ের ভাবনায় এর স্পষ্টতর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। পিতার বীরখ্যাতি, কুলগর্বে মগ্ন হয়ে থাকায় জীবনের সার্থকতা নেই, আপনার ব্যক্তিগত মহিমা প্রতিষ্ঠায়ই মনুষ্য জন্মের চরিতার্থতা। সে বলেছে (ষষ্ঠ সর্গ)—

জন্ম বৃথা! কর্ম্ম বৃথা! বৃথা বংশ খ্যাতি!
কীর্ত্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা!
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে, জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয়।

আবার কচিৎ ঐন্দ্রিলার কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে নবযুগের নারী মুক্তির ভাবনা (দ্বাদশ সর্গ)—

বামা আমি, দনুজেন্দ্র, রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীটপতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।

হেমচন্দ্রের কাব্যে নব্য ভাবনা অবশ্য দ্বিধাহীন নয়। প্রায়ই তা ব্যক্তির ভাবনা মাত্র—চরিত্রের গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত জীবনমন্ত্র নয়। কিন্তু কাহিনীরসকে বর্জন করে, চরিত্রের স্বাভাবিক প্রাচীনতা ও পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করে আধুনিক চিন্তার আরোপ ঘটান নি কবি।

তিন

৮ বৃত্র সংহারের মুখ্য চরিত্র ইন্দ্র বৃত্র শচী ঐন্দ্রিলা জয়ন্ত রুদ্রপীড় এবং ইন্দুবালা। রতি চপলার চরিত্রাভাস মাত্র প্রকাশ পেয়েছে। দেবতাদের

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আঁকবার চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নি। রুদ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু পার্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কবির ধারণা পৌরাণিক বিশ্বাসের অনুসরণ করেছে।

চরিত্রভাবনায় হেমচন্দ্র ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। মধুসূদনের মেঘনাদবধের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি। কিন্তু মধুসূদনের মন তাঁর নয়। হেমচন্দ্রের মত মধ্যবিত্ত হিন্দুভদ্রলোক ধর্মত্যাগী বিদ্রোহী প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হতে পারেন কিন্তু সেই জীবনদৃষ্টিকে আপনার বলে আত্মসাৎ করতে পারেন না। পৌরাণিক সংস্কার তথা সাধারণ হিন্দু বিশ্বাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হওয়া হেমচন্দ্রের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। বৃত্রের বীর্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলেও তার পাপ এবং পতন কবির মনে কোনো রূপ সমস্যার সৃষ্টি করে নি। দানবেরা পাপাসক্ত। এবং পাপের মূল্য মৃত্যুতে। কবি প্রাচীনপন্থীর এই বিশ্বাসে সংশয় বোধ করেন নি। কিন্তু মধুসূদন এই ভাবনার অনুগামী হতে পারেন নি। রাক্ষসমাত্রকে পাপী বলে ধরে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাই রাবণের সীতাহরণ মেঘনাদবধকাব্যের এক গুরুতর নৈতিক সঙ্কট।

উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি না হলেও হেমচন্দ্রের কাব্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র বৃত্র। বৃত্র মহাবীর। বীরত্বের তুলনায় দেবগোষ্ঠিকে সে কীটের ন্যায় ক্ষুদ্র বলে মনে করে। তার চেহারার বিশালতা কতকটা সফলতার সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন কবি (তৃতীয় সর্গ)।

> ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
> বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
> পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।
> নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
> পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
> নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায় ;
> বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায়।

সোচ্চার তার বীরত্বদর্প (তৃতীয় সর্গ)।

> সঙ্কল্প করিনু অদ্য, শুন, দৈত্যকুল,
> সঙ্কল্প করিনু হের পরশি ত্রিশূল
> সূর্য্যেরে রাখিব করি রথের সারথি ;
> চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি ;
> পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জ্জনী ধরি,
> অমরার পথে পথে রজঃ স্নিগ্ধ করি ,
> বরুণ রজক-বেশে অসুরে সেবিবে,
> দেব সেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে।

বীর-রৌদ্র রসের সমন্বয়ে গঠিত বৃত্রের চরিত্র তার গর্জনে আস্ফালনে যাত্রার

আসরের কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয়। বীরত্বদর্প অত্যুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেই কোনো চরিত্র বীর্যবন্ত হয়ে ওঠে না। কুস্তির আখড়ার বড়ো পালোয়ানের সতেজ মাংসপেশীর আন্দোলন একটা স্থূল বহিরঙ্গ ব্যাপার মাত্র। চরিত্রবীর্য আভ্যন্তরীন্ সত্য। মেঘনাদবধকাব্যের রাবণ আপনার বীরত্ব নিয়ে অহঙ্কার করে নি। বরং পরাজয়ের গ্লানি ও অন্তর্দাহই তার কণ্ঠে বার বার শুনেছি আমরা। কিন্তু তবু বীর্য অপ্রমাণিত থাকে নি। তার বিশালতা দৈহিক নয় এ তার ব্যক্তিত্বের অন্তর-ধর্ম।

বৃত্রকে পরিবার-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছেন হেমচন্দ্র। মানবিক হৃদয় বৃত্তির নানা তরঙ্গভঙ্গ মানুষকে পূর্ণতা দেয়। কবি তাকে পত্নী সংসর্গে দেখিয়েছেন, বৎসলস্বভাব করেও আঁকতে চেয়েছেন। শচীহরণ বৃত্রের ব্যক্তিগত কাম বাসনার ফল নয়। দানব বৃত্রও নীতিবোধের দিক থেকে মধ্যভিক্টোরিয় যুগের ভাবনার বাহিরে নয়। ঐন্দ্রিলার আবদারেই শচীহরণ। হেমচন্দ্রের গার্হস্থ্য ভাবনার প্রতিফলন এখানে পড়েছে। ধনাঢ্য গৃহস্থ দুখানা মূল্যবান অলঙ্কার দিয়ে যেমন স্ত্রীর মনোরঞ্জন করে বৃত্রও স্বর্গাধিকারের আনন্দে ঐন্দ্রিলার জন্য দাসীরূপে শচীকে সংগ্রহ করে দিয়েছে। পত্নীপ্রেম তার চরিত্রের গভীর কোনো প্রত্যয় হয়ে ওঠে নি। বরং দানবীয় বীরত্বের সঙ্গে অতি তরল ইন্দ্রিয়ালুতা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি।

বৃত্রের বাৎসল্য মেঘনাদবধের আদর্শে পরিকল্পিত। পুত্রের বীরত্বে গর্ব, অকালমৃত্যুতে বেদনা ও ক্রোধ বৃত্রকে বিচলিত করেছে। শেষ মুহূর্তেও বৃত্র রুদ্রপীড়ের নাম স্মরণ করেছে কিন্তু এ সবই মামুলি উপলব্ধির ঊর্ধ্বে ওঠে নি। রাবণের বাৎসল্য তার জীবনসাধনার সামগ্রিক সত্যকে ধরে রেখেছিল। মেঘনাদ তার পিতার কামনার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। মেঘনাদের মৃত্যু তাই সেই কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয়। রাবণ বেঁচে থেকেও সে-মৃত্যুশায়কে আমূল বিদ্ধ। রাবণের বাৎসল্য তার ব্যক্তিত্বের এক মূল উপাদান। রুদ্রপীড়ের বীরত্ব ও মৃত্যু বৃত্রের জীবনের প্রাসঙ্গিক বিষয়মাত্র।

বৃত্রের ভাবনাকল্পনার কেন্দ্রটি হেমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। রুদ্রের ক্রোধে তাকে একবার চিন্তিত হতে দেখি (দ্বাদশ সর্গ)। আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কা তাকে ক্ষণকাল সংশয়ান্বিত করে রেখেছিল। কিন্তু বৃত্র চরিত্রে মনোধর্ম একেবারেই অপ্রধান। এ সবই বহিরঙ্গ আয়োজনে সীমিত থেকেছে।

ভাগ্য সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের ধারণা বাঙালি সংস্কারের অনুগামী ছিল, তার ছিল না কোনো বিশিষ্ট রূপ। কারণ কবির ব্যক্তিগত জীবন-জিজ্ঞাসার অংশরূপে একে দেখা হয় নি একবারও। বাঙালি হিন্দুর ভাগ্য-ভাবনার সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্রের কোনোরূপ যোগাযোগ নেই। বৃত্রের ভাগ্য, নিয়তি পুরুষের কল্পনা সবই একান্ত বাহিরের ব্যাপার হয়ে থেকেছে, দানব বীরের চরিত্রের অঙ্গ হয়ে ওঠে নি।

বৃত্রের চরিত্র সবচেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে কাব্যের শেষ সর্গে। তার ক্রোধোদ্দীপ্ত অমানুষী বীর্য দানবীয় ভীষণতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবির কল্পনা এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে বৃত্রের মধ্যে নৈসর্গিক প্রলয় শক্তিকে অনুভব করেছে, মনোধর্মের আবরণটুকু খসে পড়েছে। কবির ভাষাও সর্বোত্তম ফলপ্রসূ হয়েছে কাব্যের এই অংশে।

ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী,
ছুঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁপিল জগৎ,
উজাড় স্বর্গের বন—উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন, প্রলয়ের ঝড়ে।
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ রেণুপ্রায়!

বৃত্রের যদি কোনো বিশিষ্ট পরিচয় হেমচন্দ্রের কাব্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তা এই রুদ্র প্রলয় শক্তিতে। মনোধর্মে নয়। অন্যত্র সে জড় পিণ্ডমাত্র। কবির কথায় জানি সে পরম শক্তিময়, আর জানি তার দম্ভে। কিন্তু ভাষায় তার সমর্থন পাই না। এখানে ভাষার সহযোগে এমন এক বৃত্রকে পাই যা অগ্ন্যুদ্গারে, ভূকম্পনে, দাবানলে, মহাবন্যার উৎসে সক্রিয়—প্রাকৃতিক শক্তির মত সত্য এবং মনোহীন।

রুদ্রপীড়ে মেঘনাদের আদর্শ মনে রাখতে চেয়েছেন কবি। কিন্তু রুদ্রপীড়কে দিয়ে তিনি শচীহরণ করিয়েছেন। অথচ পাপবোধে তার চিত্ত দীর্ণ নয়। ঐন্দ্রিলার প্রতি উক্তিতে প্রকাশ, মাতার আচরণে সে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ অর্থাৎ কবি তাকে ন্যায় অন্যায়ের কোনো স্বতন্ত্র বোধ-পীঠিকায় স্থাপন করতে পারেন নি। যশোলাভের মোহে রুদ্রপীড়ে দেখেছি শচীহরণে সোৎসাহ কর্মতৎপরতা। আবার শচীর দাসীত্ব প্রসঙ্গে মাতার কথা ও কর্মের প্রতি ক্ষীণ সমালোচনা।

রুদ্রপীড় কহে, "মাতঃ, কষ্ট কি কারণে?
দাসী হৈতে আসিয়াছে হইবে সে দাসী;
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি?"

বিবেকের এই কণা থেকে হয় বিদ্রোহ, অথবা অনুশোচনায় আত্মভেদী ট্র্যাজেডি আসতে পারে। আভ্যন্তরীণ এই অসঙ্গতির কথা কবি ভাবেন নি। এই বিবেক নিয়েও রুদ্রপীড় পরম আহ্লাদে শচীহরণ করেছে এবং নীতি-

ভাবনায় বিচলিত হয় নি। মেঘনাদের স্রষ্টা তাকে অপাপবিদ্ধ করে রেখেছেন। তাই পাঠকের ভালোবাসার অনাবিল ধারা কবির ভালোবাসার সঙ্গে সহজে মিলেছে। তার মৃত্যু তাই দুর্দৈব বলে মনে হয়।

রুদ্রপীড় বীর খ্যাতিলাভের জন্য বড় বেশি চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছে। যুদ্ধ তার কাছে খ্যাতির সোপান। পুরাণে বা আধুনিক কাব্যে যে সব বীরদের দেখা পেয়েছি তারা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে—জাতীয় বা ব্যক্তিক স্বার্থে লড়াই করেছে। ফলে যশ পেয়েছে। রুদ্রপীড়ের কাছে যুদ্ধ জয়ে নয়, কোনো বিশেষ লক্ষ্যভেদে নয়, খ্যাতিলাভেই একমাত্র চরিতার্থতা। শচীহরণেও তার দ্বিধা নেই। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য যশোলোলুপ রুদ্রপীড। একারণেই তার বীরত্ব আভিনয়িক বলে সংশয় জন্মে।

মাতাপিতার বাৎসল্যে এবং পত্নীপ্রেমের পরিমণ্ডলে কবি তাকে স্থাপন করেছেন। কিন্তু কারও প্রতি তার ভালোবাসা আন্তরিক বলে মনে হয় না। তাই রুদ্রপীড় যতটা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে ততটা প্রাণোত্তাপপূর্ণ বলে প্রত্যয় জাগায় না।

-

ঐন্দ্রিলার চরিত্রে প্রৌঢ় রাজমহিষীর গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্ব নেই। রূপগর্ব এবং দর্পে সে আত্মহারা। আপন লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য দেহরূপ এবং কামচাতুর্যকে ব্যবহার করায় সে নিপুণা এবং প্রগল্‌ভা। একি শুধুই প্রয়োগচাতুর্য অথবা তার চরিত্রগত অতিরিক্ত কামলোলুপতার প্রতিফলন? বেশে ও ভাবে, স্বামীর প্রতি বারবার কামবাণ সন্ধানে তার একপ্রকার অন্তর দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে। এই দৈন্য নিয়েই সে সত্য এবং সে জীবন্ত তার প্রবৃত্তি-উৎক্ষেপ ও ইন্দ্রিয়তারল্য নিয়ে।

নারীচরিত্রের প্রশান্তরূপেরই প্রাধান্য বাংলা সাহিত্যে। যেখানে সে বীর্যময়ী সেখানেও সে শুভদা। নারীর ঈর্ষা-দর্প-গর্বকে আলোড়িত ক'রে প্রলয়ঙ্করী অকল্যাণী রূপ গড়ে তোলা হয়েছে ঐন্দ্রিলায়। তাকে আমরা পছন্দ না করতে পারি, কিন্তু সে যে একটা ব্যক্তিত্ব পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অতিরিক্ত তরলতার জন্য শিল্পাস্বাদে কিছু বাধা ঘটেছে। কিন্তু ঐন্দ্রিলার চরিত্র রচনায় হেমচন্দ্র ব্যর্থ নন।

ইন্দুবালার কোমল অশ্রুমুখি এবং ভাবাতিরেক কম্প্র মূর্তির সৃষ্টি-উৎসে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। বাঙালি কুলবধূর কল্যাণী রূপটি তার পৌরাণিক পোষাকের স্বচ্ছ আবরণ সহজেই ভেদ করে প্রকাশ পেয়েছে। কোমলতা ও কল্যাণকে ভাবগাম্ভীর্যে মহিমান্বিত করে তোলা হয়েছে। না হলে পুরাণাশ্রয়ী মহাকাব্যের মধ্যে তরল ভাবালুতা রসচ্যুতি ঘটায়। স্বতন্ত্রভাবে ভাবলে ইন্দুবালাকে, কৃত্রিম মনে হয় না। সহজ বুদ্ধির ও মাঝারি শক্তির কবি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পেরেছেন। কিন্তু বৃত্রসংহার কাব্যে

তাকে মানায় নি। ঐন্দ্রিলার একেবারে বিপরীত কোটিতে ইন্দুবালাকে স্থাপন করে রসবৈচিত্র্য ঘটাতে চেয়েছিলেন কবি।

দেবরাজ ইন্দ্র এ কাব্যের নায়ক। বৃত্রের মৃত্যু কাব্যের মুখ্য বিষয় হলেও বৃত্র এর নায়ক নয়। যেমন সংস্কৃত মহাকাব্য 'শিশুপালবধ'-এর নায়ক অবশ্যই নয় শিশুপাল। মহাকাব্যের নায়কের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'সাহিত্য দর্পণ'-এ বিশেষ করে ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন দেবচরিত্র বা উচ্চবংশের ক্ষত্রিয়ের জন্য সুপারিশ করেছেন।

স্বর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ
সদ্বংশ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ।*

ধীরোদাত্তগুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ
স্থেয়াম্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ।

অর্থাৎ নিজের প্রশংসা নিজে করেন না, যিনি ক্ষমাবান এবং অতিগম্ভীর, যিনি হর্ষ বা শোকতাপে অভিভূত হন না, যিনি বিনয়ী কিন্তু হীন বিনয়-সম্পন্ন নন, যিনি সঙ্কল্প ক'রে তা সিদ্ধ করেন এমন ব্যক্তিকেই ধীরোদাত্ত বলা হয়।

নব্য ইংরেজি কাব্যের উৎসাহী পাঠক এই আদর্শের হুবহু অনুসরণ করবেন এরূপ প্রত্যাশিত নয়; কিন্তু হেমচন্দ্র সংস্কৃত মহাকাব্যের এবং তার নায়ক লক্ষণের কথা মনে রেখেছিলেন।

হেমচন্দ্রের কাব্যের অন্যান্য দেবচরিত্রের তুলনায় ইন্দ্র অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ বিশিষ্টতা শুধুমাত্র আপন বীরধর্মের দ্বারা দেবরাজ অর্জন করে নি। আপন দৃঢ়ব্রতের দ্বারা লাভ করেছে। বৃত্রকে হত্যার সঙ্কল্প নিয়ে ইন্দ্র সাধনা করেছে। তার এই সাধনারত রূপটি এবং সমাপ্তির সিদ্ধি কয়েকটি সর্গে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে ইন্দ্রকে দেখতে পাই নিয়তির পূজারত। বৃত্রবধের সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হয়ে সে কৈলাসে গিয়ে শিবের কাছ থেকে বৃত্রবধের উপায় জানতে চেয়েছে (দশম সর্গ)। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্র-চরিত্রের কিছু উজ্জ্বলতর পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। শিবের কাছে ব্যক্ত তার অভিমানের রূপটি প্রশংসার যোগ্য। আপন শক্তিতে তার বিশ্বাস আছে। কিন্তু সব গৌরব আজ বিসর্জিত। পরাজয়ের ধিক্কার স্বর্গচ্যুতির বেদনার মধ্যে অপমানবোধ আরও কঠিন হয়ে বাজছে। আর এই দুর্দৈব ঘটতে পারছে বৃত্রের প্রতি শিবের নির্বিচার আশীর্বাদে। দেবপ্রধান শিব দেবতাদের পিতৃস্বরূপ। তাই ইন্দ্রের কণ্ঠে নিরুপায় সন্তানের অপমানক্ষত নিগূঢ় অভিমানরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই অভিমান বাঙালি পরিবার-ধর্মের অনুবর্তী একটা আশ্চর্য সঞ্চারি ভাব। আধুনিককালে শরৎচন্দ্র নারীব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে এই উপাদানটিকে বিশেষভাবে

*দণ্ডীর গ্রন্থ "কাব্যাদর্শে" বলা হয়েছে : চতুর্বর্গফলায়ত্তং চতুরোদাত্তনায়কম্।

ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয় মহাকাব্যের বিপুল আড়ম্বরের মধ্যেও হেমচন্দ্রের পরিবার-জীবনের অভিজ্ঞতা মাঝেমাঝে কাজে লেগেছে।

ইন্দ্রকে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ভাবনানুযায়ী শোকে সুখে অচঞ্চলচিত্ত রাখেন নি কবি। দশম সর্গে ইন্দ্রের চরিত্রে যে ব্যাকুলতা দেখানো হয়েছে ইন্দ্রের প্রাণবত্তা তাতেই অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। শচীহরণের সংবাদে ক্রোধেক্ষোভে ইন্দ্র দেবাদিদেবের সামনেও আত্মসংবরণে সমর্থ হয় নি।

বাসনা কি, শিব, তব ইন্দ্রের লাঞ্ছনা
না থাকিবে বাকি কিছু বৃত্রাসুর কাছে ?
কেন তবে সৃষ্টিমাঝে রেখেছ অমর ?
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি-বিরচিত
নাহি চূর্ণ কর তবে ?—কেন, হে বিধাতঃ
করিলে দেবের সৃষ্টি যন্ত্রণা ভুগিতে ?
...   .
নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে
বৃত্রবধ কি উপায়ে, ছাড়হ আমায়,
দেখ পশুপতি, এবে কোদণ্ড-সহায়
একা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে।

এবং এখানেই ইন্দ্রের মনুষ্যত্ব পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রকে অবশ্য কবি সদাচঞ্চল ব্যক্তি-রূপে চিত্রিত করেন নি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ধীরভাবে সে সাধনা করেছে। সংযম রক্ষা করে চলেছে সতর্কভাবে। কুমেরু থেকে শিবধামে, কৈলাস থেকে দধীচি-আশ্রমে, সেখান থেকে বিশ্বকর্মার কর্মশালে ইন্দ্র সুপরিকল্পিতভাবে বৃত্রসংহারের সিদ্ধির দিকে এগিয়েছে। দধীচির প্রাণযাত্রায় তার কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ খুবই সঙ্গতভাবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু মুখ্যত ইন্দ্রের ব্যক্তিত্ব স্বল্পবাক্, চিত্ত অনতিচঞ্চল। তার চরিত্র পরিকল্পনার সামগ্রিকরূপের পটভূমিতে শিবসকাশে ক্রোধ ও বেদনামিশ্র অগ্ন্যুদ্গার নিঃসন্দেহে তাৎপর্যবহ।

ইন্দ্রচরিত্র আমাদের মন কেড়ে নেয় না। কিন্তু মোটামুটি তার চিত্র অযথার্থ মনে হয় না। সে কৃত্রিম নয়, অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু কাব্যশেষে বৃত্রের আধিপত্য সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছিল। তার শক্তির ঝঞ্ঝা অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব অকিঞ্চিৎকর করে তুলেছিল। ভীত বিমূঢ় ইন্দ্রের যে ছবি সেখানে প্রকাশ পেয়েছে তাতে নায়কের গৌরব একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবনমুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্বলোপ হয়!"

এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্যোগে
ছিল হতচেতপ্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন, বজ্র দিলা ছাড়ি ;
না ভাবিলা, না জানিলা ছাড়িলা কখন্।

বৃত্র সম্পর্কে কবির বিশিষ্ট ভাবনার সম্যকপ্রকাশ সেখানে ঘটলেও ইন্দ্রের চরিত্রবীর্য বিনষ্ট হয়েছে। মহাভারত কাহিনীর নির্বিচার অনুসরণও এর জন্য অনেকটা দায়ী।

শচীর চরিত্র আঁকতে মেঘনাদবধের সীতার কথা ভেবেছেন কবি। সীতার পঞ্চবটীবাসের সঙ্গে শচীর নৈমিষারণ্যবাস তুলনীয়। শচী হরণের পরিকল্পনা সীতা প্রসঙ্গের আদর্শে ভাবিত। লঙ্কায় বন্দিনী সীতার সরমা-সাহচর্যের ধারায় স্বর্গে শচীর ইন্দুবালার সেবালাভের চিত্র রচিত। কিন্তু দুই চরিত্রের কল্পনামূলে পার্থক্য আছে ; দৃষ্টিক্ষমতার ভিত্তিতে রয়েছে যোজন ব্যবধান। (৬) তবুও শচীর চরিত্রাঙ্কনে হেমচন্দ্র সামর্থ্যানুগ নিপুণতা দেখিয়েছেন। শচীর সৌন্দর্যে গাম্ভীর্য আছে ; তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ এবং ব্যক্তিমহিমার দীপ্তি আছে। নব্যযুগের মানবীর মুক্ত হৃদয় কতকটা তাকে অবলম্বন করেই প্রকাশ পেয়েছে বৃত্রসংহারে। শক্তিমানের আশ্রয় গ্রহণ করে নিশ্চিত নিরাপত্তা সে চায় নি। ছদ্মবেশে আত্মরক্ষার গ্লানি থেকে সে আপনাকে উর্ধ্বে রেখেছে। ফলে তার মধ্যে আত্মার একধরণের দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। ঐন্দ্রিলার প্রবৃত্তিদাহের অতিচাঞ্চল্যের বিপরীতে তার অকম্প্র ব্যক্তিত্ব মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

বৃত্রসংহারে অপর চরিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

শিবের সমাহিত তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে দর্শনের আত্মভোলা বাঙালি অধ্যাপকের প্রতিবিম্বন বলে মনে হয়। বর্ণনা-সৌকর্যের পরিমণ্ডলেও বিশ্বকর্মা পরিচিত কর্মকারের অতিশায়িতরূপ ছাড়া কিছু নয়। দধীচির আত্মবিসর্জনের গৌরব বক্তৃতার তোড়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু চরিত্রটির মধ্যে একটা প্রশান্ত দ্যুতি আছে। একটা জ্বালাহীন আলোকের ব্যঞ্জনা আছে। পাঠকের মনের সেই আরাম কবির পরিবেশ বর্ণনার ভাষায় কমনীয় হয়ে উঠেছে।

আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদগান,
উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচলপবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,

সমুহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বনলতা-তরুকুল শোকে অবনত।

চার

আধুনিককালের পাঠকের কাহিনীকাব্যে রুচি নেই। কাব্য বড় আকারের এবং কবি মধ্যশক্তির হলে বিরুদ্ধতা জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। এর জন্য অভিযোগ বৃথা। যুগধর্মে রুচির পরিবর্তন ঘটবেই। সে পরিবর্তনের ঝড়ে বড় জাহাজ বানচাল হয়। ছোট বোটের ভরাডুবির আশঙ্কা।

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার দীর্ঘকাব্য। খুব উচ্চাঙ্গেরও নয়। সে কাব্যটিকে সৌন্দর্যের বিচার ও আস্বাদের পাত্রে পাঠকদের কাছে নিবেদন করার উদ্দেশ্যেই এ অধ্যায়ের পরিকল্পনা। ফলে কিছু পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি হতেও পারে—এরূপ প্রত্যাশা করি।

কাব্যের প্রথম সর্গ স্বর্গচ্যুত দেবপ্রধানদের সমাবেশের চিত্র। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মধুসূদন অনুরূপ একটি ছবি এঁকেছিলেন। হেমচন্দ্র প্রত্যক্ষত সে-আদর্শের অনুবর্তী হয়েছেন। তিলোত্তমাসম্ভব মধুসূদনের অপরিণত রচনা। তবুও পরাভূত দেবতাদের ক্রোধ ও ক্ষোভের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাদের চরিত্র-পার্থক্য নির্ণয়ের কিছু চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা সামান্যই সফল হয়েছিল। শুধুমাত্র কবির মর্ত্যপ্রীতি কুবেরের ভাষায় আশ্চর্য মধুর সুরে বেজেছিল।

কঠিন হিয়া হেন কার আছে ?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের। তারা-দল যার সখী-দল!
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে।
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায়!

দুর্বল রচনায়ও বড় কবির প্রতিভার ছায়া ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়।

স্কন্দ, অগ্নি, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি দেবগণের উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণের মধ্যে তাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে হেমচন্দ্রও চেয়েছিলেন। স্কন্দে ব্যক্তিত্ব ও বীর্যের সমন্বয়, অগ্নিতে রুদ্র ক্রোধ, বরুণে অপ্রগলভ বিবেচনাবোধ, সূর্যে হিতাহিতবোধরহিত অস্থৈর্য। এভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভব

হয়নি হেমচন্দ্রের পক্ষে। তবে দেবসেনাপতিদের বক্তৃতায় সমকালীন স্বাধীনতা-ভাবনার উত্তেজনা কবি সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। তবুও প্রথম সর্গে হেমচন্দ্র মধুসূদনের অক্ষম অনুকারক মাত্র। বর্ণনায়, ছন্দোসঙ্গীতে বা চরিত্রভাবনায় রূপসিদ্ধি ঘটেনি এখানে।

দ্বিতীয় সর্গে হেমচন্দ্র বৃত্র ঐন্দ্রিলাকে পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। কিন্তু সে প্রথম পরিচয়ে বিস্ময় নেই, নাটকীয় চমৎকারিত্ব নেই। প্রচলিত রীতিতে একটি মদনোৎসবের লঘু তরল চিত্র রচিত হয়েছে। কবি দ্বিতীয় সর্গে মধুসূদন থেকে স্বতন্ত্র পথ ধরতে চেয়েছেন। একটিমাত্র সর্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেই কবি বৈচিত্র্যপ্রয়াসী হয়েছেন। সে-ছন্দ পরিত্যাগ করেছেন। অবশ্য এ সর্গের লঘু চটুল ভাষা এবং তরল ছন্দ ভাবানুযায়ী হয়েছে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে কবির উপরে ভারতচন্দ্রের প্রভাব পড়েছে।

কভু হাস্যরস করে উদ্দীপন, কোথায় বসন কোথায় ভূষণ
ঐন্দ্রিলা উল্লাসে অধীর হয়।
ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে, ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল-অঙ্গে,
উৎফুল্ল বদন লোচনদ্বয়॥
অমনি অপ্সরা হইয়া বিহ্বল, চলে ধীরে ধীরে তনু ঢল ঢল,
নেত্র করতল অলকা কাঁপে।
ঈষৎ হাসিতে অধর অধীর, অঙ্গুলি-অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির,
টানিয়া অধরে ঈষৎ চাপে॥

প্রভৃতি চরণগুলির সঙ্গে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর সাদৃশ্য অনেকেই দেখতে পাবেন। ভারতচন্দ্রের প্রতি হেমচন্দ্রের শ্রদ্ধার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। অবশ্য মধুসূদনের কাব্য একেবারে ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি চান বা না-চান, পারুন বা না-পারুন, মধুসূদনের প্রভাব তাঁকে প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত সর্বদা তাড়া করে ফিরেছে। এ সর্গে মদনের ভূমিকা এবং ঐন্দ্রিলার বিলাসসজ্জার পেছনে মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গের পার্বতী কর্তৃক শিবকে মোহিত করার চেষ্টার ছায়া পড়েছে।

হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারের প্রথম সর্গে দেবদৈত্য সংগ্রামে দেবতাদের পরাভবের পটভূমি এঁকেছিলেন। আলোচ্য সর্গে কাহিনীগত সমস্যার সূচনা ঘটলো শচীকে দাসীরূপে পাবার জন্য ঐন্দ্রিলার দাবিতে।

তৃতীয় সর্গে বৃত্রের সভার বর্ণনায় পয়ার ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন কবি। স্বর্গাভিমুখে দেবসৈন্যের আগমনবার্তায় বৃত্রের বীরত্ব আস্ফালন এবং রুদ্রপীড়ের যুদ্ধোল্লাস প্রকাশ পেয়েছে। সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর রণযাত্রার বর্ণনায় বীররস প্রকাশের কিঞ্চিৎ চেষ্টা আছে।

স্বর্গ-দ্বারে দ্বারে চলে দৈত্য মহারথী,
দুর্দ্দাক্ষ বিপুলবক্ষ পূর্ব্বে কৈলা গতি।
ঐরাবণী—বল যার ঐরাবত প্রায়,
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধায়।
শঙ্খধ্বজ দৈত্য—যার শঙ্খের নিনাদে
অমর কম্পিত হয়—উত্তর আচ্ছাদে।
দক্ষিণেতে সিংহজটা—সিংহের প্রতাপ
চলিলা দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য, ভয়ঙ্কর দাপ।

ছন্দের ভঙ্গি বর্ণনার গতিকে শ্লথ করেছে। শব্দঝঙ্কারের অভাবে রণোন্মত্ত সৈন্যবাহিনীর উল্লাস এবং মেদিনীকম্প্র মত্ততা ভাষাবদ্ধ হয়নি, যদিও মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রথম ও সপ্তম সর্গে রাক্ষস সেনাপতিদের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনায় যে বর্ণাঢ্য গতিময়তা ফুটে উঠেছিল তার সুর হেমচন্দ্রের ভাবনায় বাজছিল।

এ সর্গ বৃত্রসংহারের কাহিনীকে বিশেষ এগিয়ে নেয় নি। চরিত্রের কোনো নূতন পরিচয় এর মধ্যে যেমন উদ্ঘাটিত হয় নি তেমনি কোনো বিশেষ বর্ণনা-সৌকর্যের জন্যও এ সর্গ লোভনীয় হয়ে ওঠে নি।

ত্রিপদীর ঢঙে লেখা চতুর্থ সর্গে দৃশ্যপট নৈমিষারণ্যে স্থানান্তরিত। স্বর্গচ্যুতির যন্ত্রণা এবং মর্তবাসের অস্বস্তি প্রকাশ পেয়েছে শচী-চপলা সংবাদে।

স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবেরে স্বপন নাহি আসে!
জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে!
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া!
ভ্রান্তি, যদি হৈত কভু, কিছুক্ষণ সুখে তবু,
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।
পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই, দেবের কপালে ছাই,
বিধি সৃজে অস্বপ্ন করিয়া!

স্বর্গের দেবতার চোখে স্বপ্ন নেই, বিভ্রম-বিলাস নেই—বাস্তব দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার দুটি গবাক্ষই তার রুদ্ধ। এরূপ চিত্রে রোমান্টিক কল্পনার বীজ আছে। তবে সে কল্পনা অমিশ্র নয়। 'ছাই' শব্দের বার বার ব্যবহারে লৌকিকতা যেমন প্রকট হয়ে পীড়িত করে, তেমনি—

অতি গাঢ়তর বায়ু, আই-ঢাই করে আয়ু,
বুক যেন নিবদ্ধ নিগড়ে!

বস্তু ভাবনার স্থূলতা কল্পনার ভাবময়তাকে একেবারেই ছিঁড়ে ফেলে। এ জাতীয় জ্ঞানক্রিয়া খাঁটি কল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী।

স্বর্গ হারিয়ে শচীর দুঃখপ্রকাশ স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে তা যে ভাব ও রীতি আশ্রয় করেছে তাতে তার চরিত্রের অন্তর্লীন মাহাত্ম্যের ক্ষতি হয়েছে। শচী চরিত্রের সে গম্ভীর দীপ্তির কথা আগে বলেছি।

হেমচন্দ্রের ভাবনার একটা বড় অংশ বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে সঙ্কলিত। যুদ্ধের ঘনঘটা এবং পৌরাণিক ভাব-পরিমণ্ডল ভেদ করে বাঙালির পরিবার জীবনের ছবি মাঝে মাঝে ভেসে এসেছে। তার সাজানো সংসার—সম্পদ, শয্যা, অলঙ্কার—বৃত্রজায়া ঐন্দ্রিলার ভোগে লাগছে—একথা বারবার সে স্মরণ করেছে। তার ভাষায়ও বাঙালির পুরনারীর কথার সুর লেগেছে 'এ নরক মম ভাগে, সখী, নাহি জানি আগে' অথবা 'রতির কপাল ভাল' প্রভৃতি চরণগুলি এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে।

মদনের কাছ থেকে বৃত্রের শচীহরণ বাসনার সংবাদ পেয়েছে সে এ-সর্গে। কাহিনী ঐক্যের সুকঠিন নীতির দিক থেকে এ ঘটনার অপরিহার্যতায় প্রশ্ন তোলা চলে। তবে মোটামুটি ভাবে এ সর্গ কাহিনী-বৃত্তের বাইরে নয়।

পঞ্চম সর্গের প্রারম্ভে শচীর চরিত্র ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে স্বাধীনচিত্ততা কতকটা সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন কবি। জয়ন্ত প্রসঙ্গে শচীর মাতৃমূর্তি কিছু অসাধারণ নয়। তবে দু-একটি উপমা-চিত্রে গৌরব আছে, আছে কল্পনার বিস্তার।

> তরু যথা নবোদ্গত কিসলয়রাজি,
> বসন্ত-প্রারম্ভে ধরে নীলপীতে সাজি ;
> নিদ্রা যথা ভুজদ্বয় প্রসারণ করি,
> ক্লান্ত পরাণীরে রাখে বক্ষস্থলে ধরি ;
> শুক্রতারা ধরে যথা নিশান্তে যামিনী ;
> সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।

কবি একান্তভাবে শব্দচেতনাহীন ছিলেন না, 'ইন্দ্রের কামিনী' কথাটির ব্যবহারে তা প্রমাণিত হয়।

এ সর্গে নৈমিষারণ্যের সৌন্দর্য বর্ণনায় বিশিষ্টতা আছে, 'মানস-মোহকর নবদ্রুমরাজি' ইত্যাদি। চপলা মায়াবলে মর্তের অরণ্যে নন্দন-তুল্য সৌন্দর্য প্রকটিত করে তুলল। বনস্থলের আকস্মিক রূপান্তরের ছবি আঁকতে গিয়ে কবি অক্ষরবৃত্ত ত্যাগ করে কিছুক্ষণের জন্য মাত্রাবৃত্তের মহলে পা দিয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় কাব্যরীতির আদর্শ এর পেছনে সক্রিয়। সে বর্ণনা প্রথানুগ এবং জীর্ণ।

পঞ্চম সর্গের কাহিনী-অংশ শচীহরণে আগত দৈত্য সেনাপতি ভীষণের

জয়ন্ত-হস্তে মৃত্যু বিবৃত হয়েছে। সে প্রসঙ্গে কিছু মামুলি বীর ও রৌদ্ররসের প্রবেশ ঘটেছে। তবে তা অনুল্লেখ্য।

চার সর্গ পরে ষষ্ঠ সর্গে আবার অমিত্রাক্ষর ছন্দ। সর্গের আরম্ভেই দেবদানব যুদ্ধ। দেবসৈন্য নেতাদের বক্তৃতা শুনে নূতন উদ্যমে অসুরাধিকৃত স্বর্গ আক্রমণ করেছে। এ সংবাদে বৃত্র প্রচুর উত্তেজনা প্রকাশ করেছে। রুদ্রপীড় উল্লসিত হয়েছে। বীরখ্যাতি লাভের জন্য সে যেন দিশাহারা। এমন সময়ে ভীষণের পতন-সংবাদ এল। বৃত্র রুদ্রপীড়কে শচীহরণের জন্য প্রেরণ করল। রুদ্রপীড় দ্বিধাহীন চিত্তে, বরং সানন্দে এই পাপকর্মে নিযুক্ত হল এবং মিথ্যাচারের সাহায্য নিয়ে অবরোধী দেবসৈন্যদের বিভ্রান্ত করে নৈমিষারণ্যে চলল। রুদ্রপীড়কে মহাশক্তিধর রূপে আঁকা হয়েছে। কিন্তু এই তরুণ অসুরকুমারের প্রতি কবির কিছুমাত্র প্রীতি ছিল না। তাহলে হেমচন্দ্র তাকে এত অনায়াসে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হতে দিতেন না। অবশ্য রুদ্রপীড়ের মুখে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাণী ভাষায় কিছু প্রাণচাঞ্চল্য এনেছে।

এ সর্গের শ্রেষ্ঠ অংশ বৃত্রের আত্মবিশ্লেষণ। বৃত্রের রণলিপ্সা যশোলিপ্সা নয়।

অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া!
অনন্ত তরঙ্গময় সাগর গর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর;
গভীর সর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে সে সুখ—

তখন অন্তর যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত,
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মোর হয় রে উত্থিত।

বৃত্রের এই ভাবনায় বৈশিষ্ট্য আছে। মনোহীন প্রাকৃতিক ধ্বংসশক্তির সঙ্গে তার যে চরিত্র-সাদৃশ্যের কথা চরিত্র-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছি, এখানে তার প্রমাণ মিলবে।

উল্লিখিত অংশ ছাড়া এ সর্গে বর্ণনায় প্রাণ নেই, ছন্দ গতিহীন এবং সঙ্গীতহীন।

সপ্তম সর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে পাঠকদের প্রথম পরিচয়। নায়ক ইন্দ্র। তার এই বিলম্বিত আবির্ভাবের কারণ দুরধিগম্য। প্রথম ছয় সর্গ জুড়ে ইন্দ্রের জন্য যদি কোনোরূপ আগ্রহ সৃষ্ট হত পাঠকের মনে তবে তার একটা অর্থ পাওয়া যেত।

ইন্দ্রের নিয়তিপূজা, নিয়তির দর্শনদান এবং বৃত্রসংহারের কালনির্দেশ। নিয়তির পরামর্শে বৃত্রবধের উপায় জানতে ইন্দ্রের কৈলাসযাত্রা—এ সর্গের কথাবস্তু। সুক্ষ্মদর্শী অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন, এ সর্গের অবতারণা কেন? নিয়তি কোন্ কার্য সাধন করল? দীর্ঘদিন ধরে তার পূজার সত্যাই কোনো প্রয়োজন ছিল কি? এতদিন ইন্দ্রের কৈলাসে যাবার বাধা ছিল কোথায়? ইন্দ্র-নিয়তি-সংবাদ নিরপেক্ষ ভাবেই শিবের কাছ থেকে বৃত্রবধের উপায় জানা যেত। কাহিনীর দেহবিস্তার ছাড়া এ অংশের সার্থকতা প্রশ্নের বিষয়।

একটি কারণ অনুমান করা যায়। হেমচন্দ্র কোনো সুযোগে নিয়তি চরিত্রকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন কাব্য মধ্যে। মেঘনাদবধকাব্যের ট্র্যাজেডি-কেন্দ্রেও নিয়তিবাদ রয়েছে, কিন্তু তাকে মূর্ত করেন নি কবি। নিদ্রা তন্দ্রা স্বপ্ন—অনেককে দেহ দিলেও মধুসূদন নিয়তি বা বিধিকে রেখেছেন, দেহহীন, অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। হেমচন্দ্র নিয়তিকে দেবীরূপে মূর্ত করে তুলেছেন। বাংলাদেশের লোকাশ্রিত যাত্রায় আলুলায়িতকুন্তলা নিয়তি এবং তার গানের সঙ্গে অল্পাধিক অনেকেই পরিচিত। নিঃসন্দেহে সেখানে থেকে প্রেরণা পেয়েছেন হেমচন্দ্র। অবশ্য নিয়তির একটি নিরাসক্তরূপ গড়তে চেয়েছিলেন তিনি:

> আবির্ভাব হৈলা আসি সম্মুখে তাঁহার
> পাষাণমূরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয়।
> মাধুর্য্য কি সহৃদ্যতা কিম্বা দয়ালেশ,
> বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র কি ললাটে,
> ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র,

এ রূপ-ভাবনায় অভিনবত্ব আছে। কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার, দেবরাজ বলে ইন্দ্রের প্রতি তার পক্ষপাত ঘটেছে:

> কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার;
> তুমি না হলেও অন্যে জানিত না কিছু।
> তুমি সুরপতি ইন্দ্র—তোমায় কিঞ্চিৎ
> ভবিতব্য গূঢ় লিপি করি প্রকটন।

কবি আপনার পরিকল্পনাটি আপনিই খণ্ডিত করেছেন।

অষ্টম সর্গে ইন্দুবালার পরিচয়। রুদ্রপীড় সম্বন্ধে চিন্তা, শচীর ভবিষ্যৎ ভেবে করুণা খুবই ইনিয়ে-বিনিয়ে-ফেনিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। কোমলতা, দয়া প্রভৃতি নানা সদ্গুণে কবি তাকে ভূষিত করেছেন। ইন্দুবালার চরিত্র বিশ্লেষণ অন্যত্র করেছি। বর্ণনার দিক থেকে এ সর্গে উল্লেখ্য কিছু নেই।

নবম সর্গে শচীহরণ। রুদ্রপীড়ের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জয়ন্তের পতন। যে যুদ্ধবর্ণনায় বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। কাশীরামদাসে, ধর্মমঙ্গলকাব্যে, ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলালে যুদ্ধের যে বর্ণনা পড়েছি হেমচন্দ্র তা থেকে স্বতন্ত্র নন, উন্নত তো

নন‌ই। মেঘনাদবধের সপ্তম সর্গে এ বিষয়ে মধুসূদন সীমাবদ্ধ সাফল্য লাভ করেছিলেন। বাংলা কাব্যে যুদ্ধ প্রসঙ্গে তা-ই সাফল্যের সীমা। হেমচন্দ্রকে তা প্রভাবিত করতে পারে নি। বর্ণনা এত মামুলি এবং মৌখিক আস্ফালন এত বেশি যে পেশাদারি যুদ্ধ-খেলা বলে মাঝে মাঝে মনে হয়। বর্ণনায় কবি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমণ্ডল রচনা করে বীর-রৌদ্র-ভয়ানক রসের আবেদন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

উদ্গিরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল

অথবা

নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া-অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব

এরূপ দুএকটি শব্দঝঙ্কারময় চরণ সাধারণ বর্ণহীনতার মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেমচন্দ্র মধুসূদনের ন্যায় পৌরাণিক প্রসঙ্গ উল্লেখের সাহায্য নেন নি। দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে একবার গরুড়-সর্পকুলের সংঘর্ষের কথা, অন্যবার সমুদ্রজলে ভীমের সন্তরণের প্রসঙ্গমাত্র এসেছে।

দুই দিনব্যাপী যুদ্ধে সুরের একঘেয়েমী দূর করে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলেন কবি। শচীর বাৎসল্য-কোমলতা সে সুযোগ দিয়েছে। এ জাতীয় অতি-সরল চেষ্টার ফলশ্রুতি অগভীর হতে বাধ্য। সর্গের সমাপ্তিতে শচী মূর্ছিত পুত্রের জন্য যে শোকপ্রকাশ করেছে তা-ও প্রকাশভঙ্গির জীর্ণ প্রথানুগত্যে পাঠকহৃদয় স্পর্শ করতে পারে নি।

দশম সর্গ বৃত্রসংহারের অন্যতম প্রধান অংশ। ইন্দ্রচরিত্র ব্যাখ্যান কালে সে কথা অনেকটা বলা হয়েছে।

এ সর্গে বর্ণনা-সাফল্যের নিদর্শন আছে। রামগতি ন্যায়রত্ন হেমচন্দ্রকে 'অন্তরীক্ষের কবি' অভিধা দিয়েছিলেন। প্রবীণ সমালোচকের আলোচনায় শিল্পবোধের বিশেষ পরিচয় না থাকলেও এ মন্তব্যটিতে যাথার্থ্য আছে। হেমচন্দ্র মহাশূন্যের বর্ণনায় সত্যই আসক্তি দেখিয়েছেন। বৃত্রসংহারে একাধিকবার এবং দশমহাবিদ্যায় মহাবিশ্বের চিত্রাঙ্কন মাঝে মাঝে 'সাব্‌লাইম'কে স্পর্শ করেছে। ইন্দ্র সুমেরু শৃঙ্গ ছেড়ে কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করেছে। অন্তরীক্ষ পথের বর্ণনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল।

অদৃশ্য ধরণী শেষ—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌরজগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে।
শব্দশূন্য, বর্ণশূন্য, প্রশান্ত, গভীর,
ব্যাপৃত সে ব্যোমদেশ, ব্যাস অন্তহীন,

বিকীর্ণ তাহার মাঝে ছায়ার আকার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মূর্তি কোটি কোটি কত !
বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশদিক্ যুড়ি
বিরাজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে, অনন্ত শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কোটি জলবিম্ববৎ।

এ চিত্র ব্যাপ্ত এবং গম্ভীর। মানবভাবনাকে স্তম্ভিত এবং বিস্ময়বিমূঢ় করে। কবির ভাষার স্বাভাবিক জড়তা কতকটা দূর হয়েছে এখানে। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ স্বভাবত গতিহীন। উদ্ধৃত অংশে তা অনেক পরিমাণ গতিময় ও প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

রুদ্র ভয়ঙ্কর দৃশ্যের বর্ণনায়ও কবির আগ্রহ ছিল। সন্দেহ নেই শিবের নিম্নোদ্ধৃত প্রলয়মূর্তি ভাষারূপসিদ্ধ।

ব্রহ্মাণ্ডের বিম্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজুট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।
গর্জ্জিলা তেমতি, যথা হিমাদ্রি বিদারি
ভাগীরথী ধায় মর্ত্তে গোমুখী-গহ্বরে ;
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত-শিখায়—
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ।
ধরিলা সংহার মূর্ত্তি রুদ্র ব্যোমকেশ
গর্জ্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ,
তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে—দীপ্ত শ্বেত তনু,
অনল-সমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।

বলাবাহুল্য, মধ্য শক্তির কবির শব্দভাণ্ডারের দারিদ্র্যের প্রমাণও এর মধ্যে আছে। উদ্ধৃত এগারোটি পংক্তির মধ্যে গর্জন শব্দটি তিনবার, শূন্য, সংহার, দীপ্ত, বহ্নি প্রভৃতি শব্দ দুবার করে প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য এই ত্রুটি সত্ত্বেও বর্ণনাটি সার্থক।

এ সর্গের ন্যায় অন্যত্রও এ-জাতীয় চিত্রাঙ্কনে হেমচন্দ্র অল্পাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এটি তাঁর কবিপ্রবৃত্তির একটি গৌণ প্রবণতা। মনে হয় এ বাসনাটুকুই তাঁর মহাকাব্যচর্চার ফল এবং মহাকাব্য রচনার ক্ষীণ এবং একমাত্র অন্তর-প্রেরণা ; মধ্যবিত্ত জীবন-সীমা থেকে ঊর্ধ্বায়নের সূত্র। তবে খুবই স্বল্পস্থায়ী। কাজেই কতগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্ররসসাফল্যেই মাত্র তাঁর অধিকার বর্তেছে।

একাদশ সর্গে শচীকে স্বর্গে আনা হয়েছে। ঐন্দ্রিলা পুত্রের মুখে শচীর সৌন্দর্য-মাহাত্ম্যের কথা শুনে আরও ক্রুদ্ধ হয়েছে। শচীকে অবিলম্বে দাস্যে

নিযুক্ত করবার সিদ্ধান্ত করেছে। ঐন্দ্রিলার রূপগর্ব ও ঈর্ষা এই সর্গে যথাযোগ্য ভাবে প্রকাশিত।

সর্গের শেষভাগে শচীর অপমানে 'রুদ্রের ক্রোধাগ্নিচিহ্ন' প্রকাশ পেয়েছে। হেমচন্দ্রের বর্ণনায় তার সার্থক চিত্ররূপ লক্ষ্য করবার মত।

সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ;
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয়,
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়; ইত্যাদি।

ঘটনার গুরুত্ব পাঠকের মনে যে ভীতিজড়িত ভাবাবেগ সঞ্চারিত করেছে তা কতগুলি নৈসর্গিক প্রতিক্রিয়ার চিত্রমালা রচনার মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে। এ-রীতি মধুসূদনের কাব্যে বহু ব্যবহৃত।

দ্বাদশ সর্গ। রুদ্রের ক্রোধাগ্নি শিখা প্রত্যক্ষ করে বৃত্র চিন্তান্বিত হয়েছে। সে চিন্তা অবশ্য খুবই বহিরঙ্গ। শিবের বরে প্রাপ্ত জয় ও রাজ্যসম্পদ পাছে তাঁর ক্রোধে হস্তচ্যুত হয় এই ভয় ছাপিয়ে গোটা অস্তিত্বের আর্তরব বৃত্রের ভাবনায় শ্রুত হয় নি। ঐন্দ্রিলা বৃত্রকে নানাভাবে উত্তেজিত করতে চেয়েছে। কিন্তু বৃত্র শচীর মুক্তির আদেশ দিয়ে শিবের ক্রোধোপশমের ব্যবস্থা করেছে। অবশ্য সর্গের শেষে বৃত্রের চরিত্র প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত আছে। শিবের ক্রোধের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিরুপায় বৃত্র অপমানের অন্তরজ্বালা দেবধ্বংসী যুদ্ধে নিবারণ করতে চেয়েছে।

দন্ত কড়মড়ি দৈত্য, নিশ্বাসে হুঙ্কারি,
ফিরিল আকুল-চিত্ত মন্ত্র সভাতলে!
উচ্ছলিত হৃদিতল অশুভ চিন্তায়,
ক্রোধে, তাপে, প্রজ্জ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি,
ভুলিতে চিত্তের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে
প্রতিজ্ঞা করিলা দৈত্য; সুমিত্রে ডাকিয়া
আজ্ঞা দিলা সেনাবৃন্দে সমরে সাজিতে।

এ-সর্গে বিবৃত ঘটনা মহাকাব্যের আভ্যন্তরীণ কাহিনী-বীজটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে বৃত্রের প্রতিরোধহীন নতিস্বীকার কাহিনী-কেন্দ্রকে দুর্বল করে ফেলেছে।

ত্রয়োদশ সর্গের আরম্ভে অরণ্য প্রদেশে সন্ধ্যাসমাগমের চিত্র আছে। সাধারণভাবে সে বর্ণনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয় এবং কাব্যকাহিনী বা চরিত্রভাবনার দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। দু একটি উপমাচিত্রে রমণীয়ত্ব আছে। যেমন—

সন্ধ্যার তিমির
গাঢ়তর স্নেহে যেন দিয়া আলিঙ্গন,
আদরে ধরেছে সুখে অটবী-সখীরে।

সন্ধ্যার মহারণ্যে কোমল ছায়াবিস্তারে, খদ্যোতদ্যুতিতে, পবন নিস্বনে কবি কমনীয়তা অনুভব করতে চেয়েছেন এবং ঘনীভূত অন্ধকারে, শ্বাপদগর্জনে, মহীরুহের শাখা-জটিলতায়, পেচকের চীৎকারে ভীতিজড়িত ভাব আনতে চেয়েছেন। কিন্তু এ দ্বৈতরূপের অন্তরে কোনো ঐক্য নেই। এক স্বরগ্রাম থেকে অন্য স্বরগ্রামে হঠাৎ যাতায়াতে মনের তার ছিঁড়ে যায়। প্রকৃতি বিষয়ে কোনো নিবিড় ভাবঘনতা সঞ্চারিত হয় না।

(সান্ধ্য বনপথে ইন্দ্র চলেছে দধীচি আশ্রমের দিকে। পথের মধ্যে দেব রমণীদের সঙ্গে তার সাক্ষাতের বর্ণনাটি কৌতূহলোদ্দীপক। অসুরের ভয়ে দেবসুন্দরীরা মর্তধামে বিবিধ বন্য প্রাণীর ছদ্মবেশে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। রাত্রের আবরণে তারা নিজ রূপ ধারণ করে আত্মবন্ধুস্বজনের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এ জাতীয় কল্পনাকে imagination না বলে Fancy বলা যেতে পারে। কিন্তু কল্পনার ভিত্তিতে গহনতা না থাকলেও এর দ্বারা চিত্রাঙ্কনের কিছু রম্য সুযোগ করে নিয়েছেন হেমচন্দ্র।

কেহ বা শিখণ্ডী-মূর্ত্তি ছাড়িয়া সুন্দর
ধরিছে সুন্দরতর, সুর-বিমোহন
অপূর্ব্ব অঙ্গনারূপ লাবণ্যমণ্ডিত।
... ...
কুরঙ্গিণী তনু ত্যজি কোন মনোরমা
কুরঙ্গলাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে,
তাপসের চিত্ত-হর। কোন সীমন্তিনী
ছাড়িয়া শার্দ্দুল-বেশ, দেহে প্রকাশিছে
অনুপম চারুকান্তি রতিকান্তি যিনি,

লক্ষণীয় কবি শিখণ্ডী কুরঙ্গিণীর পাশে শার্দূলকে বসিয়েছেন, কিন্তু যতিভঙ্গ হয় নি। কমনীয় সৌন্দর্য সমানই প্রকাশ পেয়েছে। কবি শার্দূলের চর্মবর্ণের চারুকান্তির সঙ্গে সাহসে ভর করে কোনো সীমন্তিনীর দেহকান্তিকে উপমিত করতে পারেন নি সোজাসুজি। কিন্তু ব্যঞ্জনায় সে সৌন্দর্য আভাসিত। হিংস্রতার সঙ্গে 'শার্দূল' শব্দের নিত্য ভাবানুষঙ্গকে কবি বাক্‌বিন্যাসে অতিক্রম করেছেন ঠিকই।

ত্রয়োদশ সর্গ কাহিনীর অতিপ্রয়োজনীয় অংশ। দধীচির আত্মত্যাগ এখানে বর্ণিত হয়েছে। বিষয় গৌরবে এ অবশ্যই বৃহৎ কথা। বর্ণনায়ও

কবি যে সে-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন দধীচির চরিত্র ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে তার কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের মহাকবিকেও দধীচির আত্ম-বিসর্জনের পরিমণ্ডল রচনা করতে হয়েছিল সযত্নে। আশ্রমের বর্ণনায় কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন লিখেছেন :

> 'নানাবিধ তরুরাজি ও লতাবিতানে যাহার সুষমা সম্পাদন করিতেছে, যাহাতে সামগানসদৃশ ষট্‌পদসমূহের সঙ্গীতধ্বনি জীবঞ্জীবক ও পুংস্কোকিলকুলের কলরব সহকারে উত্থিত হইতেছে, যাহাতে মহিষ, বরাহ, সৃমর ও চমরগণ শার্দ্দূল ভয় পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, যাহাতে মদস্রাবী করিগণ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক করেণুকার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যাহাতে গুহা-কন্দরশায়ী সিংহ ও অন্যান্য বনচরগণ ঘনঘটার ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে, দেবগণ সেই স্বর্গসদৃশ শোভমান আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, প্রভাকরপ্রভ দধীচি ঋষি পিতামহের ন্যায় দীপ্যমান কলেবরে বিরাজ করিতেছে।'

ঐ অহিংস প্রশান্তির পরিবেশেই দধীচির অস্তিত্ব সত্য হয়ে উঠতে পারে। হেমচন্দ্র অবশ্য এ বর্ণনার প্রত্যক্ষ অনুসরণ করেন নি, কিন্তু একটি প্রগাঢ় প্রশান্তির ভাব তিনিও ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। ভারতীয় তপোবনের ধ্যানগম্ভীর মহিমা কবির বর্ণনায় অপ্রকট থাকে নি।

> অজিন-রঞ্জিত
> শোভিছে কুটীর-দ্বার ; শ্রুতি-সুখকর
> স্তুতিধ্বনি চারিদিকে উচ্চে উচ্চারিত ;
> কোথাও ভাস্কর-স্তোত্র-ললিত-লহরী,
> গায়ত্রী-বন্দনা কোথা সন্ধ্যা-আরাধনা,
> বিশদ স্বরেতে বেদ-সঙ্গীত কোথাও,
> কোনখানে 'মহিমনঃ' মহাস্তব পাঠ !

এখানে নিঃসন্দেহে 'প্রাচীনের কণ্ঠস্বর' শোনা যায়।

দধীচির অহিংসামন্ত্রের উপদেশাবলী কিঞ্চিৎ বক্তৃতার মত মনে হতে পারে ; কিন্তু আশ্রম পরিবেশ, দধীচির আত্মদান প্রভৃতি পূর্বাপর প্রসঙ্গের সঙ্গে আশ্চর্য সঙ্গতির ফলে কোথাও শিল্পরূপের স্খলন হয়েছে বলে মনে হয় না। শিষ্যদের সাশ্রুনেত্রে বিদায় দান মানবিক কারুণ্যমিশ্র কোমলতার সঞ্চার করে প্রসঙ্গের মহিমা বাড়িয়েছে।

দধীচির প্রাণদান চাইবার পূর্বে ইন্দ্রের সসঙ্কোচ ভাবনায়ও মাধুর্য ছিল, কিন্তু উপমাগত বিভ্রাটে তা নষ্ট হয়েছে। বলিদানের ছাগের সঙ্গে দধীচির তুলনা অনৌচিত্যে দুষ্ট। ইন্দ্রের বক্তৃতাও কাল ও ভাবোপযোগী নয়। মৌনই ছিল এ স্থানের একমাত্র বিস্ময়বিমূঢ় স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

স্বর্গপুরে শচীর বাস এবং দেবতার পরাভব-দুঃখে কাতরতার চিত্র দিয়ে চতুর্দশ সর্গের আরম্ভ। বৃত্র কর্তৃক প্রেরিত রতি শচীর মুক্তিসংবাদ নিয়ে এসেছে। শচী এই ভিক্ষার দান গ্রহণে অসম্মত হয়ে বলেছে—

শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে?
মোচন করিতে আমা নাহি কি সে কেহ,
অকূল অমরকুল থাকিতে এখানে?
না রতি, কহ গে দৈত্যে, চাহি না উদ্ধার
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা,
পতিহস্তে যতদিন মুক্তি নহে মম!

শচীর যে চরিত্রগৌরব এখানে প্রকাশ পেয়েছে তার কণামাত্র স্বর্গের বড় বড় বীর দেবসেনাপতিদের রণকৌশলে ফুটে ওঠে নি।

শচীকে নিজেদের মধ্যে বহুকাল পরে পেয়ে স্বর্গপ্রকৃতির আনন্দশিহরণ এ সর্গের প্রথম দিকে বর্ণিত। সে বর্ণনা ব্যর্থ নয়। কিন্তু এর ভিত্তিতে নিসর্গ সৌন্দর্যের কোনো নব রোমান্টিক কল্পনা সক্রিয় এরূপ মনে করার কারণ নেই। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের চতুর্থ সর্গে বিশ্বনিখিলের আদর্শ সৌন্দর্য-মূর্তিকে পেয়ে প্রকৃতির আনন্দ উৎসবের রমণীয় চিত্র আছে। হেমচন্দ্র সে আদর্শেরই অনুগমন করেছেন।

বন্দিনী শচীর মনে দেবপরাভবের তীব্র যন্ত্রণা কয়েকটি চিত্রে আশ্চর্য কৌশলে প্রতিফলিত। তরলমতি চপলা স্বর্গের ভাস্কর্য-সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছে। ইন্দ্র কর্তৃক নমুচি, পাকদৈত্য, বলাসুর বধের মূর্তি শচীর চিত্তে তীক্ষ্ণ শেলবিদ্ধ করেছে। ইন্দ্রের পরাভব ও স্বর্গচ্যুতির সঙ্গে এই বীরত্ব-বিজয় ব্যঞ্জনায় যে তুলনার সৃষ্টি করেছে ব্যাখ্যা করে না বললেও তার মর্মঘাতী প্রতিক্রিয়া পাঠকচিত্ত আলোড়িত করে তোলে।

পঞ্চদশ সর্গ যুদ্ধপূর্ণ। সে বর্ণনায় বিশিষ্টতা নেই। শুধু বৃত্রের মধ্যে দানবিক প্রলয়শক্তির উদ্বোধন সার্থক রূপ পেয়েছে।

ত্রিনেত্রে ঘুরিল ঘন বহ্নিচক্রপ্রায়
উজলি বিশাল ভাল; দম্ভে হুহুঙ্কারি
বাড়ায়ে বিপুল বপু করিলা দীঘল—
দীঘল ভূধর মেরু যথা, কিম্বা যথা
ফণীন্দ্র বাসুকি সিন্ধু-মন্থন-প্রলয়ে।
দাঁড়াইলা রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর;
প্রসারি সঘনে বাহু, ঘন লম্ফ ছাড়ি,
প্রচণ্ড চীৎকার-ধ্বনি হুঙ্কারি নাসায়,
দূর শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা,

আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে নিক্ষেপি।

যখনই হেমচন্দ্র বৃত্রের এই বিশেষ রূপটির বর্ণনা দিতে চেয়েছেন, মোটামুটি সাফল্য এসেছে তাঁর ভাষাচিত্রে।

এ দিনের যুদ্ধে দেবতারা বৃত্রের দানবিক বল এবং শিবদত্ত শূলের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়েছে। কিন্তু দেববীর্যে দানববাহিনী ধ্বংসপ্রায় হয়েছে দেখে জয়ী হয়েও বৃত্র বিষণ্ণ চিত্তে স্বর্গে ফিরেছে।

ষোড়শ সর্গে ঐন্দ্রিলা মোহিনী বেশ ধারণ করে বৃত্র সকাশে চলেছে। উদ্দেশ্য শচীকে দাস্যে নিযুক্ত করায় নূতন করে বৃত্রকে স্বীকৃতি করানো। সর্গটির পরিকল্পনা অবান্তর। কারণ ঘটনা এখানে গতিময় নয়। কোনো নূতন সম্ভাবনার দ্বার এখানে উন্মোচিত হয় নি। তাছাড়া এ জাতীয় বেশবিন্যাস ও আদিরসাত্মক ভাবভঙ্গির বর্ণনা হুবহু দ্বিতীয় সর্গের অনুরূপ। ঐন্দ্রিলা চরিত্রের কোনো নূতন রূপ এর মধ্যে প্রকাশ পায় নি।

সপ্তদশ সর্গের আরম্ভে সেনানীদের পতনে এবং দৈত্যকুলের অবক্ষয়ে বৃত্র আক্ষেপ করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের উক্তির প্রতিধ্বনি এর মধ্যে শোনা যায়। অবশ্য ট্র্যাজেডির সে-গভীরতা এখানে প্রত্যাশিত নয়।

দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রুদ্রপীড়ের সৈনাপত্য গ্রহণ, এবং মাতা-পত্নীর কাছ থেকে তার বিদায় আলোচ্য সর্গের বর্ণিত বস্তু। মধুসূদনের আদর্শ অনুসরণ করেছেন কবি। সেনাপতিরূপে রাবণ কর্তৃক মেঘনাদকে বরণ (প্রথম সর্গ), মন্দোদরী-প্রমীলার নিকট থেকে মেঘনাদের শেষ বিদায় দৃশ্য (পঞ্চম সর্গ) পাঠকের মনে পড়বে। পার্থক্য যা আছে তা চরিত্র-পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র্যের আর মধুসূদনের বর্ণনায় ক্লাসিক সংযম থাকার ফল।

হেমচন্দ্র রুদ্রপীড়কে কেন্দ্র করে করুণ রসের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চাইছেন। কিন্তু ঘটনাবিন্যাসে একান্তভাবে পূর্বসূরীর অনুসরণ করায় তাঁর সে প্রচেষ্টা আর গভীরভাবে বিশ্লেষণের যোগ্য থাকে নি।

অষ্টাদশ সর্গে কাব্যকাহিনী বিকশিত হয়েছে। শচী-ইন্দুবালার আলাপে সর্গের আরম্ভ। যুদ্ধের বেশে সেজে সশস্ত্র পরিচারিকাদের নিয়ে ঐন্দ্রিলা প্রবেশ করল এবং শচীকে পদাঘাত করতে উদ্যত হল। এমন সময়ে অগ্নি এবং জয়ন্তের নাটকীয় উপস্থিতি। ভীষণ যুদ্ধে দৈত্যদের পরাভূত করে স্বর্গের একাংশ তারা অধিকার করেছে এবং শচীকে উদ্ধার করতে এসেছে। ঐন্দ্রিলা কিন্তু ভীত হল না, খড়্গ নিয়ে তাদের আক্রমণ করল। জয়ন্ত এবং অগ্নি নারীদেহে অস্ত্রাঘাতে দ্বিধা করতে লাগল। তখন জলন্ত মহাশূল হস্তে

শিবদূত বীরভদ্র এসে শচীকে মুক্ত করে নিয়ে গেল। সুমেরু শিখরে শচীকে রাখা হল ঐন্দ্রিলা-বৃত্রের নাগালের বাইরে। ইন্দুবালা শচীর কাছে আশ্রয় পেল।

শচীকে স্বর্গোদ্ধারের পুর্বেই উদ্ধার করে কবি কাহিনীভিত্তিকে কতকটা শিথিল করে ফেলেছেন। কিন্তু ঐন্দ্রিলার প্রবৃত্তিকে তিনি এরূপ অপ্রতিরোধনীয় করে তুলেছিলেন যে শচীর গৌরব অক্ষত রাখার অন্য কোনো উপায় কবির ছিল না। অবশ্য এরূপ ঘটনাসন্ধি কবির বিন্যাসগত ত্রুটির পরিচয় দেয়। ইন্দ্রের স্বর্গোদ্ধার চেষ্টার পেছনে যে মানবিক কারণভিত্তি তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা পুর্ব থেকেই অপসৃত হওয়ায় গল্পের জোর নিঃসন্দেহে কমেছে।

সর্গের সূচনায় ইন্দুবালার কাছে শচী স্বর্গের পুর্বতন সৌন্দর্য ও মহিমার বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে একমাত্র উল্লেখ্য অংশ হল সৃষ্টি রহস্যের কথা।

কিরূপ উজ্জ্বল
কনক-নির্ম্মিত ব্রহ্মার কমল,
সতত চঞ্চল কারণ-জলে।
কিবা অদভুত সে রেণু-সমুদ্র ;
বীচিমালা তায় কি বিপুল, ক্ষুদ্র,
কত অপরূপ সৃজনের লীলা
প্রকাশ তাহাতে ; কিরূপ চঞ্চলা
পরমাণুময়ী মহী সে জলে॥

কবি হিন্দু পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ভাবনাকে যুক্ত করেছেন।

উনবিংশ সর্গ বৃত্রসংহারের অন্যতম সার্থক অংশ। বিশ্বকর্মার কর্মশালায় ইন্দ্রের উপস্থিতি এবং বজ্র নির্মাণের বর্ণনা এ সর্গে স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র মধুসূদন এবং হোমরের কাছে কতটা ঋণী তার পরিচয় দিয়েছি 'টীকা ও মন্তব্য' অংশে। প্রভাবের কথা মেনে নিয়েও বলতে হবে কবি গম্ভীরের বিপুলের আবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হন নি। কবির অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভাবনায় যে মৌল ত্রুটি ছিল, ঝঙ্কারময় শব্দ চয়নে তা অনেকটা আবৃত হয়েছে। কবির তৎসম শব্দ চয়নের ভূমিকা এ দিক দিয়ে লক্ষ্য করবার মত।

প্রকাণ্ড মুদ্গর-ধ্বনি কোটি কোটি যেন,
পড়িছে আঘাতি শূর্ম্মী, নিনাদি বিকট—
সহস্র বাসুকি-গর্জ্জ ভয়ঙ্কর যথা,
দগ্ধ-ধাতু স্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।

তবে কিছুদূর পড়লেই কবির শব্দ ভাণ্ডার যে যথেষ্ট ধনী ছিল না বোঝা যায়। শব্দের পুনরুক্তির মাত্রা সতর্ক শ্রুতিতে বিঁধবে। কবির উপমা-চিত্রগুলি মাঝে মাঝে বর্ণবস্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য অন্যবর্ণের তুলনায় চোখ ধাঁধানো অগ্নিময় ঔজ্জ্বল্যের প্রাধান্য লক্ষণীয়। আবার স্থিতিশীল ছবির চেয়ে গতিময় ছবি আঁকতেই তাঁর বেশি উৎসাহ। বর্তমান প্রসঙ্গে দু একটি বিস্ময়মথিত চিত্র উপহার দিয়েছেন কবি। যেমন—

> কোনখানে ধূম্রবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি
> পশিছে পৃথিবী-গর্ভে.— শত শত যেন
> মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
> ছুটিছে মহীজঠরে।

কিন্তু একই প্রসঙ্গে বেশ কয়েকবার সাপের উপমা ব্যবহার করায় কবির উদ্ভাবনী শক্তির সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে।

বিংশ সর্গে রুদ্রপীড়ের ভীষণ যুদ্ধ এবং দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পরে ইন্দ্রের যুদ্ধস্থলে আগমন বর্ণিত। যুদ্ধবর্ণনার দৈর্ঘ্য এবং পুনরুক্তিতে বৃত্রসংহার কাব্যটিকে মাঝে মাঝেই ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। ইন্দ্রের আগমনে রুদ্রপীড়ের অবশ্য মৃত্যু-সম্ভাবনায় দেবসৈন্যে আনন্দ কলরব উত্থিত হল। সুমেরু শিখর থেকে শচী সেই আনন্দধ্বনি শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

> সহর্ষ বদন চাহিয়া চপলা
> কহে শচী "সখি, গেল চিত্তমলা
> জুড়াল হৃদয়, নয়ন মন।"
> বলি, অকস্মাৎ চাহি ইন্দুবালা
> মলিন-বদনে, শচী শিহরিলা ;…

এই শেষ কথা কয়টির মধ্যে যে করুণ মাধুর্যের স্পর্শ এনেছেন কবি, তার জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসিত হবেন। গোটা সর্গে উল্লেখ করবার মত আর কিছুই নেই।

একবিংশ সর্গের বিষয়বস্তু বৃত্রের ভাগ্যলিপিখণ্ডন। কালপূর্ণ না হতেই বৃত্রের পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের বদল হয়েছে। সেজন্য দেবলোকের ঊর্ধ্বতম স্তরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যে কর্মতৎপরতা দেখা গিয়েছে তার মধ্যে মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের বহিরঙ্গ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্বয়ং পার্বতী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মিলন ঘটিয়ে এই দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছেন।

হেমচন্দ্রের দেবকল্পনা অবশ্য মধুসূদনের ভাবরাজ্য থেকে বহু দূরবর্তী। মধুসূদনের দেবতারা তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র নন, হিন্দুর জাতীয় সংস্কারের বশীভূত হয়ে তিনি দেবচরিত্র রচনা করেন নি। গ্রীক প্যাগান আদর্শ, নব্যযুগের দৈবী

অবিশ্বাস এবং স্বর্গের বিরুদ্ধে মানবতার বিদ্রোহের সুর তার মধ্যে ধ্বনিত। হেমচন্দ্রের উপরেও হোমরের কিঞ্চিৎ প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে ভাগ্যদেবের ভাগ্যমানচিত্র দর্শনপর মূর্তির কল্পনা জ্যুসের ভাগ্য-মানদণ্ডের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে বসে থাকার সঙ্গে অবশ্যই তুলনীয়। হিন্দু বিশ্বাসানুযায়ী শিবের ধ্যানস্থ রূপই হেমচন্দ্রের কাব্যে প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে হেমচন্দ্রের শিব কোথাও দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বব্যাখ্যাতা অধ্যাপক, কোথাও ভাবুক দর্শক। বিশ্ব-সংহারলীলার একটি প্রতিরূপ বা মডেলের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন, কতকটা গবেষণাগারের বিজ্ঞানকর্মীর মত। অলিম্পুস অথবা ইডা পর্বতশিখরে উপবিষ্ট জ্যুসের মূর্তি হেমচন্দ্রের মনের কোণে জাগ্রত ছিল।

তবে হেমচন্দ্রের দেবতারা খাঁটি হিন্দুর ভক্তি ও বিশ্বাসের স্বর্গে আসীন। এখানে সেখানে আধুনিকতার স্পর্শ কিছু লাগলেও তাদের মূল পৌরাণিক রূপের প্রতি কবির অবিচল আনুগত্য। এই দেবতারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সংগঠন করে থাকেন। তাঁদের ঘিরে কবি আবার অন্তরীক্ষলোক এবং বিশ্বলীলাবর্ণনার সুযোগ করে নিয়েছেন। মহাশূন্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র লোকের বর্ণনায় কবির স্বাভাবিক প্রবণতা এখানেও সক্রিয়। আংশিক সাফল্য থেকে এই সব বর্ণনাংশ ভ্রষ্টও নয়। কিন্তু কবির ভাবনা বহুচারি ছিল না। এবং কল্পনার ডানায় বিশ্বপরিক্রমার শক্তি ছিল না। ফলে একঘেয়েমি এসেছে। অনন্ত অসীমে বিশ্ববিম্বের বুদ্বুদ চাঞ্চল্য অথবা নৈসর্গিক মৃত্যুপ্রলয় রঙ্গ—বারংবার একই জাতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় পাঠকচিত্তের কৌতূহল ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কবির বর্ণনায় ভক্তিরসের কিঞ্চিৎ স্পর্শ আছে। পূর্ণব্রহ্ম এবং ত্রিদেবকল্পনার সমন্বয়চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের যুগে হিন্দু চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। ব্রহ্মলোকের বর্ণনায় কবি কিছুটা নিরাকার-সাকার তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

ভাগ্যদেবের ছবিতে কবির ভাবনাদৈন্য সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। আসলে ভাগ্য বিষয়ে তিনি কোনো অকৃত্রিম চিন্তা বা উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারেন নি। নিয়তির যাত্রাধর্মী চরিত্রাঙ্কনের পরেও তিনি ভাগ্যদেবের একটি স্বতন্ত্র মূর্তি গড়ে এই দুই কল্পনাকে নিঃসম্পর্কিত করে ফেলেছেন। অনেকটা ভারতীয় ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিষীদের আদর্শে চরিত্রটি আঁকা হয়েছে। তার সামনের ভাগ্যমানচিত্রটি আসলে বিশ্ব'কোষ্ঠি'র মত একটা বস্তু। কিন্তু কর্মফল ভাগ্যের নিয়ন্তা। বৃত্রের পাপেই তার পতন। পাপের শাস্তা ভগবান ভাগ্যলিপি খণ্ডন করেন—হেমচন্দ্র এরূপ একটি কথাই বলতে চেয়েছেন।

দ্বাবিংশ সর্গে রুদ্রপীড়ের মৃত্যু বর্ণিত। কাব্যকাহিনী সমাপ্তিমুখি। বিশেষ করে এই সর্গের বিষয়বস্তুর অনুরোধে ছন্দের গাম্ভীর্য প্রত্যাশিত ছিল। স্বর্গের গোড়ায় ঐন্দ্রিলা চরিত্রের প্রগলভতা অকারণে আবার দেখা দেওয়ায়

এর বিষয়গুরুত্বের হানি ঘটেছে এবং সামগ্রিক বেদনারসের উপযুক্ত পটভূমি গড়ে ওঠে নি।

ঐন্দ্রিলা ছলনার আশ্রয়ে শচীপ্রসঙ্গ ব্যক্ত করতে চেয়েছে এবং ইন্দুবালার হরণবার্তা বৃত্রকে জানিয়েছে। শচী কাহিনীর কেন্দ্র থেকে অপসৃত হওয়ায় ঐন্দ্রিলার চরিত্রগুরুত্বও নেপথ্যে সরে গিয়েছে। কারণ এ কাব্যে তাঁর মহিষীপরিচয়, জননীপরিচয় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি। শচীবৃত্তান্ত শেষ হওয়ায় ঐ দুই পরিচয়েই কাহিনীভূমিতে দাঁড়াতে পারত ঐন্দ্রিলা। এই সর্গে ঐন্দ্রিলার ঈর্ষা-ছলনাময় প্রগল্‌ভ চরিত্রভঙ্গি আবার প্রকাশ পাবার কোনরূপ স্বাভাবিক সুযোগই ছিল না।

রুদ্রপীড়ের বীরত্বের বিস্তারিত বর্ণনা বিংশ সর্গে দেওয়া হয়েছে। কবি তাতেও তৃপ্ত হন নি। তার যুদ্ধের বর্ণনা আবার ফেনিয়ে তোলা হয়েছে এই সর্গে। হেমচন্দ্রের মাত্রাবোধের অভাব ছিল। কোথায় থামতে হবে শিল্পসৃষ্টির সেই রহস্যটির সন্ধান তাঁর জানা ছিল না। অবশেষে ইন্দ্রের হাতে রুদ্রপীড়ের মৃত্যু হল। ইন্দ্র এই সুযোগে প্রচুর শিভাল্‌রির পরিচয় দিল। কবি রুদ্রপীড়ের মৃত্যুবর্ণনাকে করুণ রসের আকর করে তুলতে, আকর্ষণীয় রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জীবনে বা মৃত্যুতে রুদ্রপীড় কখনই পাঠকচিত্তের অন্দরমহলে প্রবেশপথ খুঁজে পায় নি।

ইন্দুবালাপ্রসঙ্গে বৃত্তের স্নেহকোমল একটি উক্তি লক্ষ্য করবার মত। বৃত্রের মধ্যে বাঙালি পরিবারের বৎসল শ্বশুরের রূপ এবং ঐন্দ্রিলার মধ্যে নিষ্ঠুরা শাশুড়ির রূপ কল্পনা করতে চেয়েছিলেন হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুরাণাশ্রিত মহাকাব্যের উৎসে বাঙালির পরিবার-ধর্মের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর ছিল না।

রুদ্রপীড়ের মৃত্যুসংবাদ এবং পরিচ্ছদাদি বহন করে বৃত্রসভায় সারথির আগমন ত্রয়োবিংশ সর্গের বর্ণিত বিষয়। পুত্রের মৃত্যুতে বৃত্রের খেদ, ঐন্দ্রিলার ক্রোধশোকমিশ্র উত্তেজনা, স্বর্গবাসী অসুরদের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনায় এ সর্গ পূর্ণ।

এই সর্গের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মধুসূদনের ব্যাপক অনুসরণ। মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের কাছে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ এসেছিল। সপ্তম সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ। এই দুটি ঘটনাসন্ধির অনুরূপ পরিস্থিতি এখানে গড়ে তুলেছেন কবি। ভগ্নদূত মৃত বীরবাহুর বীরত্ব বর্ণনা করে রাবণের শোকসাগর উদ্বেলিত করে তুলেছিল। বহ্নিকও একই সুরে রুদ্রপীড়ের যুদ্ধনৈপুণ্যের কথা বলেছে :

> সূত আমি, কি বর্ণিব, কি জানি বর্ণিতে,
> সে কার্ম্মুক-ক্রীড়াভঙ্গী…। ইত্যাদি।

বীরবাহুর মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গদা এবং মেঘনাদের মৃত্যুতে মন্দোদরী রক্ষোসভায় প্রবেশ করে শোকপ্রকাশ করেছে। এই আদর্শে বৃত্রসমীপে অশ্রুমুখী ক্রুদ্ধ ঐন্দ্রিলাকে এনেছেন হেমচন্দ্র। তাছাড়া ঐন্দ্রিলার প্রতিহিংসা গ্রহণের বাসনা

যে ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রের (বীরাঙ্গনা কাব্য) জনার উক্তি তুলনীয়। রাবণ যে ভাষায় মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দিয়েছিল অনেকটা একই ধরণের ভাষায় বৃত্রাসুর ঐন্দ্রিলাকে শান্ত করতে চেয়েছে।

মধুসূদনের প্রত্যক্ষ অনুগমনের মাত্রা এ সর্গে একটু বেশি। ফলে রসিক পাঠক তুলনার ভাবটিকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারেন না। ত্রয়োবিংশ সর্গে হেমচন্দ্রকে তাই একান্ত জলো বলে মনে হয়।

সর্গশেষে চরমযুদ্ধে দানবদের প্রস্তুতির দৃশ্যটি কবির নিজের ভাবনার পথ ধরেছে। এখানে পারিবারিক রসের স্নেহকোমলতা স্ফরিত। আসন্ন সর্বধ্বংসী পরিণতির পটভূমি হিসেবে এই স্নেহার্দ্র পরিস্থিতিটি তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য বর্ণনাসৌকর্যে কিছু অসাধারণ নয়।

চতুর্বিংশ সর্গের বিষয় বৃত্র-বিনাশ। সর্গারম্ভে ইন্দ্রের নেতৃত্বে দেবসেনাদের সোৎসাহ রণসজ্জার বর্ণনা। বজ্রের শক্তি অনুভব করে দেবতারা উল্লসিত হল। কিন্তু কাল পূর্ণ না হলে বৃত্রনাশ সম্ভব হবে না শুনে তারা বিমর্ষ হল। এমন সময়ে শিবদূত বৃত্রের ভাগ্যলিপি খণ্ডনের সংবাদ নিয়ে এল। অবশেষে দেবদানবের ঘোরতর যুদ্ধে দানবদের পরাজয় ঘটল, বৃত্র বজ্রাঘাতে নিহত হল।

যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী বর্ণনায় কবি নূতনতর শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। শুধুমাত্র বৃত্রের প্রলয়শক্তির ছবি আঁকায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সে কথা আগে বলেছি।

দেবতাদের শিবিরে আভ্যন্তরীণ কলহের কিছু পরিচয় এ সর্গের প্রথম দিকে প্রকাশ পেয়েছে। ইলিয়াড কাব্যের আকিলিস ও আগামেমননের কলহের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসতে পারে। কিন্তু ভারতযুদ্ধে যুধিষ্ঠির-অর্জুনের মধ্যেও তীব্র মতান্তরের ছবি ব্যাসদেব এঁকেছিলেন। এক্ষেত্রে হেমচন্দ্র হোমরের দ্বারাই প্রভাবিত এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ইন্দ্র চরিত্রকে নানা দিক থেকে আলো ফেলে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিলেন হেমচন্দ্র। সূর্যের সঙ্গে বিতর্কের উদ্ভাবনা সে কারণেই।

দেবশিবিরে বিবাদ প্রসঙ্গে কবি বাঙালি পরিবারের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন।

> তাদের (ও) সম্প্রীতি কত সোদরে সোদরে,
> কতই সখ্যতা স্নেহ আত্মীয় স্বজনে,
> সৌভাগ্য সে যতদিন। সৌভাগ্য ফুরালে
> সুখের সংসার ছার—শার্দ্দূল-কলহ
> আত্মীয়-কলহে গৃহে। ভ্রাতৃত্ব উচ্ছেদ।

ভাষা এখানে গদ্যাত্মক। কিন্তু কবির মনের দিগদর্শনের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধ ও মৃত্যুর ঘনঘটায় কবি একটি লঘুতরল কল্পনাবিলাসের অবকাশ করে নিয়েছেন। বজ্র এবং ইন্দ্রসহচরী চপলার প্রথম দর্শন, প্রণয় এবং বিবাহ সঙ্গতভাবেই নবীনচন্দ্র সেনের ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছিল।*

এ সর্গেও কবি একবার মহাকাশের বর্ণনার সুযোগ করে নিয়েছেন। শূন্য-লোকবাসী প্রাণীগণ দেবাসুরের চরম যুদ্ধ দেখতে সমাগত। হেমচন্দ্র অন্তরীক্ষের ছবি আঁকার এই অবকাশটুকুকে ব্যর্থ হতে দেন নি।

সে রণ দেখিতে
খুলিল ব্রহ্মাণ্ডদ্বার অম্বর সাজায়ে;
নানাবর্ণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স,
রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ,
কত দিব্য বাতায়ন খুলে চন্দ্রালোকে,
ছড়ায়ে বিমানপথে চন্দ্রালোক-শোভা।
সূর্য্যলোকে কত কোটি বাতায়ন, আহা;
খুলিল অতুলমূর্ত্তি লোম-হর্ষকর,
অদ্ভুত সৌন্দর্য-রশ্মি প্রকাশি গগনে। ইত্যাদি।

এ ছবিতে রঙ আছে। তবে কবির শব্দভাণ্ডারটি সীমাবদ্ধ হওয়ায় একই শব্দের পুনরুক্তি শ্রুতিরম্যতায় হানি ঘটিয়েছে।

পাঁচ

বৃত্রসংহারের কাব্যপরিচয় নেওয়া হল। এর সাহায্যে কবির কাহিনীগঠন এবং বর্ণন-নৈপুণ্যের সামগ্রিক বিচার করা সহজ হবে।

হেমচন্দ্র দেবদানব সংগ্রামের রাজনৈতিক রণনৈতিক পটভূমির কেন্দ্রে শচীহরণকে স্থাপিত করে একটি মানবিক রসপুষ্ট কাহিনী গ্রন্থনের চেষ্টা করেছিলেন। শচীহরণের সঙ্কল্প ও চেষ্টা থেকে শুরু করে শচীকে বন্দী করে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া; ঐন্দ্রিলার ঈর্ষাদ্বেষ এবং মহাদেবের ক্রোধ; বৃত্রের পাপ এবং ইন্দ্রের আদর্শবাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত, হৃদয়গত, উদ্দেশ্যের (পত্নীকে অপমান থেকে উদ্ধার করা) সংযোগ কাহিনীকে ঘনীভূত করে তুলতে পারত। কিন্তু শচীকে স্বর্গোদ্ধারের পূর্বেই নিরাপদ সুমেরু শৃঙ্গে স্থানান্তরিত করে, গল্পের গ্রন্থি একেবারেই মোচন করা হয়েছে।

গল্পকথনের ভঙ্গিটিতে কারুকার্য নেই। পাত্রপাত্রীকে প্রয়োজনমত উপস্থিত করানো এবং দীর্ঘকাল অনুপস্থিত রেখে কৌতূহলকে তীব্র করে তোলার বহুমুখি নৈপুণ্যের সন্ধান পাই না। প্রতিটি সর্গ নাটকের দৃশ্যের ন্যায় স্থানিক

* 'আমার জীবন': নবীনচন্দ্র সেন।

সীমায় বদ্ধ। কাব্যে দ্রুত স্থান পরিবর্তনের যে সুযোগ আছে, স্বর্গ-মর্ত-রসাতল পরিক্রমার যে অবাধ স্বাধীনতা আছে হেমচন্দ্র তাকে কাজে লাগাবার কথা চিন্তাও করেন নি। ঘটনা এবং বর্ণনার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা তিনি করেছেন। তবে কোনো কোনো সর্গের পরিকল্পনা ঘটনা এবং বর্ণনার দিক থেকে যে অবান্তর ভার বাড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্রের মহাকাব্যের অতিদৈর্ঘ্য শুধুমাত্র কাহিনীর জটিলতা ও বিস্তারের জন্যই নয়, অনেকখানি অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের সংযোজন এবং বর্ণনার পুনরুক্তির ফলে ঘটেছে। কবির ভাষাভঙ্গি অথবা বিষয় উত্থাপন-কৌশলে নাটকীয়তা নেই। নাট্যচেতনা রচনারীতিতে সঞ্চারিত হলে কাব্যের আস্বাদে গুণগত সমুন্নতি ঘটতে পারে। সে বিষয়ে হেমচন্দ্রের কোনো ধারণাই ছিল না।

হেমচন্দ্রের বর্ণনায় প্রণয়রস একান্ত তরল ইন্দ্রিয়াসক্ত স্থূলতায় পর্যবসিত। যুদ্ধের প্রসঙ্গে কবির ঝোঁক অত্যধিক। মহাকাব্যকে খাঁটি 'Heroic Poetry' করে তুলবার বাসনায় কবি বারবারই যুদ্ধের ছবি এঁকেছেন। যুদ্ধ বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণের স্পর্শ নেই। অবশ্য প্রলয়মূর্তির কল্পনায়, রুদ্রতার ছবি আঁকায় তিনি অনেকটা সার্থক। এসব বিষয়ে ভাবগাম্ভীর্য শব্দঘটিত সাহচর্য পেয়েছে। অন্তরীক্ষ প্রদেশের ছবিও তাঁর কল্পনাকে আলোড়িত করেছে। এক্ষেত্রেও তাঁর ভাষা ব্যর্থ নয়।

হেমচন্দ্রের ভাষাচিত্রে উপমাত্মক অলঙ্করণের সহায়তা মধুসূদন প্রমুখের তুলনায় অনেক কম। উপমাদিতে পুরাণঘটিত ব্যাপ্তি সৃষ্টির চেষ্টা বড় নেই। নিসর্গবস্তুর তুলনায়ই কবি তৃপ্ত।

শব্দচয়নের ক্ষেত্রে তিনি মধুসূদনের আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু শব্দনির্মিতির অসামর্থ্য তথা শব্দভাণ্ডারের অতি সঙ্কীর্ণতা তাঁকে বহুক্ষেত্রে পুনরুক্তির মধ্যে নিয়ে ফেলেছে। ইপ্সিত সাফল্য দেয় নি। পৌরাণিক ভাবনাগর্ভ শব্দের ব্যবহার সুপ্রচুর। কিন্তু বাক্‌বিন্যাসের গদ্যপ্রবণতা তাঁকে প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে।

ছয়

বৃত্রসংহার মহাকাব্যের চব্বিশটি সর্গের মধ্যে তেরোটি সর্গে অমিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে, এগারোটি সর্গে পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি প্রচলিত ছন্দ প্রযুক্ত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে যে-সব মন্তব্য করেছিলেন তাতেই বোঝা যায় এ ছন্দের প্রাণ-লক্ষণটি তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি। তিনি যাকে বিরামযতি স্থাপনের দোষ বলে মনে করেছিলেন সেখানেই যে এই ছন্দের নূতন শক্তি তা বুঝবার কান ছিল না হেমচন্দ্রের। তিনি লিখছেন:

"বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে। যথা—

'কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে!—'
'নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক;—'
'হেনকালে হনূ সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে।—'
'রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে
বীরেন্দ্র।—'
'দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জন-রাগে, কুসুম-অঞ্জলি—
আবৃত;—'

এই সকল স্থলে 'গায়ক', 'শিবিরে', 'বীরেন্দ্র', 'আবৃত' শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে।"

[মেঘনাদবধ কাব্যের 'ভূমিকা' (সংশোধিত)]

আসলে যতি-সংস্থাপনের যে স্বাধীনতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের গৌরব তাই-ই হেমচন্দ্র বুঝতে পারেন নি। মেঘনাদ বধের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি লিখেছিলেন,

'এই অভিনব ছন্দ গঠনের নিমিত্ত পুরাতন প্রচলিত, কাল-প্রসিদ্ধ কবিতা বিন্যাসের নিয়ম সংযোজন ব্যতিরেকে, ছন্দাংশে সে সকল নিয়মের অতিক্রমণ করা হয় নাই।'

[মেঘনাদবধ কাব্যের 'মুখবন্ধ']

এই প্রসঙ্গে কতগুলি উদাহরণ তুলে তিনি দেখিয়েছেন, বহুক্ষেত্রে তিনি চার, আট বা চৌদ্দ মাত্রার পরে বিরাম যতি বসিয়েছেন। হেমচন্দ্রের বিশ্বাসমতে অমিত্রাক্ষরের ছন্দ-সাফল্যের মূল এখানে, প্রাচীন রীতি ভঙ্গ করে তিন বা অনুরূপ মাত্রার পরে বিরাম যতি বসানোয় নয়। এ-বিষয়ে মধুসূদনের বক্তব্য তাঁর একটি চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে।

"I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th. Examples—

'জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে,
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী।'—তিলো—৪।

'চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ।'—মেঘ—২।
'কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু।'—তিলো—৪।
'আইলেন রক্ষেশ্বরী, মুরজা-সুন্দরী
কুঞ্জর গামিনী।'—তিলো—২।"

['কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী' : ক্ষেত্র গুপ্ত, পত্রসংখ্যা-৬৩]

হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের রহস্যভেদ করতে পারেন নি। তাই ছন্দের উপরে তিনি পূর্ণ আস্থাও রাখতে পারেন নি। কবির মনে প্রাচীন ছন্দের আদর্শ জাগ্রত ছিল। তিনি লিখেছেন,

"বঙ্গ-কবিগুরু কবিকঙ্কণ ও কবিতাকেশর ভারতচন্দ্র, উভয়েই পয়ারাদি মিলিত ছন্দে লিখিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীতে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দই বিস্তর। এবং অন্নদা-মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর মিলিত ছন্দের আদর্শ। এমত স্থলে কোন ব্যক্তি

'গাঁথিব নূতন মালা—
রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

এই সদর্প উক্তি করিলে সকলেই মনে মনে জিজ্ঞাসা করে, ভারতব্রাহ্মণ নূতন প্রণালীতে কবিতাগ্রন্থন করিবার কি পথ রাখিয়া গিয়াছে ? সত্য বটে, সেই পথ সহজে লক্ষিত হয় না,..."

[মেঘনাদবধকাব্যের 'মুখবন্ধ']

নূতন রীতিতে যেমন তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস আসে নি, তেমনি পুরানো রীতির প্রতি আকর্ষণও বড় কমে নি। ফলে দু ধরনের ছন্দই ব্যবহার করেছেন কবি।

হেমচন্দ্র কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বৈচিত্র্যের কথা বলেছেন। চব্বিশ সর্গে বিস্তৃত কাব্যে আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার একঘেয়ে মনে হতে পারে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে সর্ববিধ ভাব ও 'মুড' প্রকাশ করা সম্ভব মেঘনাদে তা পুরো বোঝা না গেলেও বীরাঙ্গনায় সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হেমচন্দ্রের কানে তা ধরা পড়ে নি। তাই তিনি নানাবিধ ছন্দের মিশ্রণই পছন্দ করেছেন। কিন্তু সত্যকার বড়ো কবিরা বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার প্রয়োজনীয় মনে করেন নি। এ বিষয়ে মিলটনের সমালোচক র‍্যালে লিখেছিলেন,

'In a long peom variety is indispensable, and he preserved the utmost freedom in some respects. He continually varies the stresses in the line, their number, their weight, and their incidence, telling

them fall when it pleases his ear, on the odd as well as on the even syllables of the line.'

বাংলা আখ্যানকাব্যে মধ্যযুগে নানা ছন্দের ব্যবহার দেখা যেত। পয়ার-ত্রিপদীই বেশি। ভারতচন্দ্র কিছু সংস্কৃত ছন্দের আমদানিও করেছিলেন। বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ'-এ মহাকাব্য-লক্ষণ প্রকাশ করতে গিয়ে সর্গে সর্গে ছন্দের বৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে। সে কথা হেমচন্দ্রের মনে থেকে থাকবে।

> একবৃত্তময়ৈ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ
> নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘা সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
> নানাবৃত্তময়ঃ কাপি সর্গকশ্চন দৃশ্যতে…।

সর্গে সর্গে ছন্দের ভিন্নতার নির্দেশ তো আছেই, এমন কি এক সর্গেও নানাজাতীয় ছন্দের মিশ্রণ কখনো কখনো চলতে পারে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। হেমচন্দ্র তাই নিশ্চিত মনেই সর্গে সর্গে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ করেছেন।

প্রধানত যুদ্ধ বর্ণনা, গম্ভীর ও রুদ্র ভাব প্রকাশের জন্য কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন। তরল কোমল ভাব ও রূপ প্রকাশের জন্য সচরাচর অন্য ছন্দ প্রযুক্ত। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। অর্থাৎ কবি একটা স্থূল ধারণার ভিত্তিতে মোটামুটি ছন্দ বিন্যাস করতে চেয়েছেন। [৮]

৮ হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সার্থক হয় নি কেন আগের আলোচনায় তার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছন্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যতিপাতের স্বাধীনতা নেই—ভাষায় প্রবহমানতা এবং ধ্বনিসঙ্গীত নেই। কবি বৃত্রসংহারের ভূমিকায় দুঃখ করেছেন যে বাংলা উচ্চারণে গুরুলঘুর ভেদ নেই বলে সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তিনি সংস্কৃত আদর্শে অত্যন্ত প্রাণহীন চারটি চরণের মিলে এক একটি শ্লোক সম্পূর্ণ করেছেন—বিরাম যতি সেখানেই পড়েছে। ফলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে অপ্রতিহত গতি-সঙ্গীত-ঝঙ্কার তা থেকে কাব্যটি বঞ্চিত হয়েছে। গুরুলঘু উচ্চারণের অভাব পূরণের জন্য কোনো পদ্ধতি তিনি সচেতনভাবে অনুসরণ করেন নি। অথচ চার চরণের শ্লোক-বন্ধন করেছেন। [গোটা বৃত্রসংহারের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা সর্গগুলিতে এই শ্লোক বিভাগ বুঝাবার জন্য চার চরণের স্তবকবিভাগের ন্যায় মুদ্রিত করা হয়েছিল। আমরা অপ্রয়োজনীয় বিধায় মুদ্রণকালে সে দূরত্ব রক্ষা করি নি।] অপরপক্ষে সংস্কৃত শব্দের সচেতন ব্যবহারের ফলে মধুসূদন বাংলা বর্ণবৃত্তে স্বরতরঙ্গলীলার সৃষ্টি করেছিলেন, বাংলা ভাষাকে জাতিচ্যুত করেন নি—কিন্তু নিশ্চিতভাবে মিলটনের আদর্শেই এই নবছন্দ গড়ে তুলেছিলেন।

হেমচন্দ্র স্বাধীন পথে চলতে চেয়েছেন, পূর্বসূরীর সৃষ্টি-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন নি। এবং ক্ষমতার স্বল্পতার জন্য ব্যর্থ হয়েছেন। ১৮

সাত

মহাকাব্য কি বস্তু তা নিয়ে নানা আলোচনা এদেশে এবং বিদেশে হয়ে গেছে। স্বাভাবিক এবং সাহিত্যিক মহাকাব্যের প্রসঙ্গ সাহিত্যের প্রথম শিক্ষানবীশির কাছেও বহুশ্রুত। এখানে শুধু তার প্রাণধর্মের কথাই সংক্ষেপে বিবৃত হল।

রূপ ও ভাবে নানাবিধ বৈচিত্র্য পৃথিবীর বিখ্যাত মহাকাব্যগুলির পাঠক-মাত্রই লক্ষ্য করেছেন। রামায়ণ মহাভারতের আদর্শবোধ এবং সার্বভৌম কল্যাণে বিশ্বাস ইলিয়াড-ওডেসিতে নেই। ইলিয়াডে কাহিনীরসের বৃত্তাকার ঘনপিনদ্ধতা, ওডেসিতে অন্তহীন পথপরিক্রমা। টাসোর কাব্যে ক্রুসেডের সঙ্গে রোমান্টিক কাল্পনিক কাহিনীর মালা গ্রথিত হয়েছে। মিলটন মানুষ এবং তাঁর স্রষ্টার সম্পর্ককে কাব্যধৃত করতে চেয়েছেন। অথচ খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস উভয়ের কাব্যের প্রেরণাস্থল। সমালোচক সি. এম. ইন্‌জ Encyclopaedia of Literature, Vol I গ্রন্থের epic বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন :

> 'Valour and Sagacity are recommended by examples to Homer's hearers. Virgil presents an instructive embodiment of Roman Virtue, Camoes gives the Portuguese a model of their own best characteristics and Milton constructs 'an imitation of an action' that demonstrates man's relation to his just creator.'
>
> [From Virgil to Milton]

যুগে দেশে এবং কবি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের ফলে মহাকাব্যের রূপে বৈচিত্র্য আসে তা যেমন স্বীকার্য, তেমনি এদের আভ্যন্তরীণ ঐক্যসূত্রটিও দৃষ্টি এড়াবার নয়। এই আভ্যন্তরীণ মূল স্বাদটিই মহাকাব্যের প্রাণ। ইন্‌জ-সাহেবের মতে :

> 'Many of the devices mentioned are directed towards establishing large scale in the poem. The epic writer's intention is always to magnify his theme and his men, for in early days he was teaching his countrymen about the greatness of

the ancestors whom they must emulate and in later days he was sometimes deliberately creating human symbols of valour and piety in order to induce noble aspiration and effort in his readers; for he took seriously the poet's function as prophet and teacher.'

এর মধ্যে একটি কথা হল 'large scale', কাহিনী ও চরিত্রকে 'maginfy' করা। অপর কথাটি হল প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ।

স্বয়ং এরিস্টটল বিশাল গাম্ভীর্যের কথা বলেছিলেন ('grandeur of effect')। এরিস্টটল দেখিয়েছেন " 'এপিক'-'প্যাথেটিক' বা 'এথিকাল' যে শ্রেণীরই হোক—'element of the wonderful' থাকা চাই-ই চাই।" ['এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব' : ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য।]

সর্গসংখ্যার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আয়তনগত বিস্তারের প্রতিই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। তাছাড়া বর্ণনা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তিনি বলেন,

সন্ধ্যা-সূর্যেন্দু রজনী-প্রদোষ-ধ্বান্তবাসরাঃ
সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভৌ চ মুনি-স্বর্গ-পুরাধ্বরা
রণপ্রয়ানোপযম-মন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ
বর্ণনীয়া যথাযোগ্যং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ ॥

এরও একটিই উদ্দেশ্য—আয়তনগত বিস্তার। বিশালতা যে মহাকাব্যের মুখ্যলক্ষণ তা অনুধাবন বিশ্বনাথ করেছিলেন। কিন্তু আকারগত ব্যাপ্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিশালতা কি উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব সে বিষয়ে কোনো নির্দেশ দিতে পারেন নি।

এবারকোম্বি তাঁর বিখ্যাত 'The Epic'-গ্রন্থেও এই গাম্ভীর্য ও মহিমার উপরেই সবচেয়ে জোর দিতে চেয়েছেন,

'It will tell its tale both largely and intensely... epic poetry must be an affair of evident largeness.'

রবীন্দ্রনাথও জাত মহাকাব্যের স্বরূপনির্দেশ করতে গিয়ে দেশকালের যে ব্যাপ্তির কথা বলেছেন, গোটা জাতির জীবনসুরের যে অনুরণনের প্রসঙ্গ তুলেছেন তা সাহিত্যিক মহাকাব্যের ক্ষেত্রেও অপ্রযোজ্য নয়। ['প্রাচীন সাহিত্য'-গ্রন্থের 'রামায়ণ' এবং 'সাহিত্য'-গ্রন্থের 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য] প্রথমশ্রেণীর মহাকাব্য দানবাকৃতি বীরদের ব্যক্তিগত কাহিনীর মধ্যেই তাকে সহজভাবে ধরে রাখে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাকাব্য জাতীয় স্বার্থ ও সমস্যাকে সামনে এনে উপস্থিত করে।

সব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত করা যায়, উদাত্ত গাম্ভীর্য ও বিশালতারই সন্ধান করা হয় মহাকাব্যে। স্বভাবতই উপন্যাসের বাস্তবতা এবং প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটি-নাটি বিশ্লেষণ নয়, রোমান্সের বর্ণাঢ্য অতীত-পরিক্রমা নয়, সৌন্দর্যতৃষ্ণার

রোমান্টিক সুদূরাভিসারও নয়। মহাকাব্য কাব্য বলেই এই গাম্ভীর্য ও ব্যাপ্তির সঙ্গে আবেগের ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক। তবে সে আবেগ ঘনীভূত, তরল নয়। চরিত্র-চেতনায়, কাহিনী-বিন্যাসে, বর্ণনা ভঙ্গিতে Sublimity-ই মহাকবির কাম্য।*

কিন্তু অপর একটি দিকের কথাও বিশিষ্ট সমালোচকেরা বলেছেন। জাতীয় জীবনের গৌরব-গাথার প্রচারক হিসেবে মহাকবির ভূমিকার কথা। ভার্জিল প্রসঙ্গে সি. এম. বাওরা লিখেছেন,

> '...he wished to write a poem about something much larger than the destinies of individual heroes, he created a type of epic in which the characters represent something outside themselves, and the events displayed have other interests than their immediate excitement in the context.. ....His first aim is to praise the present,.......'
>
> [From Virgil to Milton]

বাওরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন কামোস, তাসো, মিল্‌টন—এঁরা সবাই স্বকালের বিশাল অভিজ্ঞতা ও যুগসত্যকে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছিলেন। সত্যপ্রচারের মনোভাব এঁদের সকলের মহাকাব্যসৃষ্টির পেছনেই সক্রিয় ছিল। ভার্জিল চেয়েছিলেন রোমের ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা করতে; কামোস, তাসো ইসলামের ধর্মযুদ্ধে সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার ব্রত নিয়েছিলেন। আর মিলটন ভাষাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ভগবৎ অনুগ্রহের চিরন্তনী বাণী।

মহাকাব্যে যুগসত্য জাতীয় জীবনের সামগ্রিক আকৃতিকে যে কত বড় গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছিল হেগেল তা লক্ষ্য করেন—

> '...collective world outlook and objective presence of a national spirit, displayed as an actual event in the form of its self-manifestation, constitutes and nothing short of this does so, the content and form of the true epic poem.'
>
> [The Philosophy of Fine Art.]

হেমচন্দ্রের মহাকাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি জাতির মধ্যে যে স্বাধীনতার নূতন স্বপ্ন দেখা দিয়েছিল, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির যে বাসনা জেগেছিল তার কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। পৌরাণিক ইন্দ্রের মধ্যে নব্য জাতীয় বীরের আদর্শ অনুভব করতে চেয়েছেন কবি। দধীচির

---

*মহাকাব্য প্রসঙ্গে আমার 'মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প'-বইয়ে নানা কথা বলেছি। এ বিষয়ে আলোচনার জন্ম ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের 'মহাকাব্য জিজ্ঞাসা' এবং 'এরিষ্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ত্ব' বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

আত্মত্যাগে শচীর স্বদেশপ্রেমে যে গম্ভীর সুর বাজাতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে তা সেকালের বিশিষ্ট বাণী হয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

কিন্তু তবুও হেমচন্দ্রের কাব্য সামগ্রিকভাবে মহাকাব্যের রসনিবেদন করতে পারে নি। কারণ উপরে যে দ্বিতীয় লক্ষণটির কথা বলা হয়েছে তা প্রথম লক্ষণ 'সাবলাইম'-এ পৌঁছুবার একটি উপায়মাত্র। কাহিনীটি শুধু অতীতাশ্রয়ী রোমান্স রস সম্ভোগ নয়, পুরাতন কল্পকাহিনী ও জীবনের উদ্দীপ্ত ভাবনায় চঞ্চল। এই গহনগভীর জীবন ও সাহিত্য ভাবনারও যৌগপত্য থেকেও অনেকখানি এসেছে সমকালীন যুগচিন্তা প্রকাশের তাগিদ। কিন্তু একে বলা যায় না মহাকাব্যের কেন্দ্রধর্ম। মহাকাব্যের মূল রস সেই বিশাল গম্ভীর মহিমায়। সেকারণেই হেমচন্দ্র মহাকাব্যোচিত বহিরঙ্গ কাহিনীবিস্তারে যথেষ্ট যুগভাবনা প্রকাশ করেও মহাকাব্যের প্রাণধর্ম সামান্যতই মাত্র আয়ত্ত করেছেন।

হেমচন্দ্রের জীবনদৃষ্টিতে মহাকাব্যোচিত 'সাবলাইম'-এর চেতনা ছিল না। না থাকাই স্বাভাবিক। মহাকাব্যরচনার প্রেরণা অনেকখানিই তিনি বাইরে থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এজন্য একে কৃত্রিম বলা হলে আপত্তি করা যাবে না। নানামুখী চেষ্টার মধ্যে মহাকাব্য রচনা তাঁর অন্যতম প্রয়াসমাত্র। তবে চব্বিশ সর্গে বিস্তৃত গ্রন্থটি রচনায় শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন ঘটেছিল। লিখতে লিখতে কোথাও কোথাও মহাকাব্যের রসসৃষ্টি কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। তবে সামগ্রিক রসসিদ্ধি থেকে তা বহুদূরে।

নবম সর্গ পর্যন্ত কবি সুপ্রচুর যুদ্ধবর্ণনার এবং উত্তেজনার ছবি এঁকে মহাকাব্যিক আবহাওয়া গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু দশম সর্গের আগে সত্যকার মহাকাব্যোচিত সুর বাজে নি। দশম সর্গে রুদ্রের ক্রোধের বর্ণনা মহান গম্ভীরকে স্পর্শ করেছে। এই আংশিক সাফল্য এসেছে নবম সর্গের শ্রমসাধ্য সাধনার ফলে। পর্বত-অরণ্যের বর্ণনা—মুহুর্মুহু যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে পাঠকদের নিয়ে গিয়ে তিনি যে রসনিবেদন করতে চেয়েছিলেন এতক্ষণে তা বহিরঙ্গ ছাপিয়ে কাব্যের প্রাণধর্মকে কতকটা স্পর্শ করেছে। সন্দেহ নেই, এখানে বহু পরিশ্রমের চিহ্ন লেগে আছে। পরবর্তী সর্গগুলির মধ্যে ত্রয়োদশ, ঊনবিংশ এবং চতুর্বিংশ সর্গের কল্পনায় ও ভাষারূপে মহাকাব্যোচিত সমুন্নতি অনেকখানি আয়ত্ত। ত্রয়োদশ সর্গে দধীচির আত্মদানের প্রশান্ত গম্ভীর মহিমা হেমচন্দ্র বেশ সাফল্যের সঙ্গেই ভাষাবদ্ধ করেছেন। বিষয় মাহাত্ম্যেই শুধু নয়, ভাষায়ও সে গরিমা যথোচিত প্রকাশ লাভ করেছে। যুদ্ধের বর্ণনা, বীর ও রৌদ্ররসের আয়োজন, পর্বত সমুদ্রের প্রসঙ্গ ছাড়াই—আত্মত্যাগের শান্তরসকে অবলম্বন করে এ-জাতীয় মহাকাব্যিক রসাবেদন বড় সুলভ নয়। ঊনবিংশ সর্গে বিশ্বকর্মার কর্মশালার বর্ণনা—গাম্ভীর্যে ধ্বনি ঝঙ্কারে চিত্তবিস্ফার ঘটায়। বিষয়বস্তুর মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল হেমচন্দ্র তাকে কাব্যরূপে মোটামুটি নিপুণভাবেই বদ্ধ করতে পেরেছেন। চতুর্বিংশ সর্গে বৃত্রের যুদ্ধবর্ণনা

কাব্যের অপরাপর অংশের যুদ্ধবর্ণনার তুলনায় কতকটা জীবন্ত। কিন্তু দানবোচিত নৈসর্গিক প্রলয়শক্তি বৃত্রচরিত্রে ঘনীভূত রূপ ধারণ করেছে যেখানে সেখানেই প্রকৃত মহাকাব্যিক রস প্রকাশ পেয়েছে।

কাব্যের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা-সৌকর্য বিচার প্রসঙ্গে আগেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বর্ণনা ছাড়াও অনেকখানি বৃত্র চরিত্রের কল্পনায়, দধীচির সংক্ষিপ্ত চরিত্ররূপে, শচীর অপ্রগল্‌ভ ব্যক্তিগরিমায় মহাকাব্যিক সিদ্ধি এসেছে। কিন্তু ইন্দুবালার চরিত্রের অতি কোমল এবং মেরুদণ্ডহীন রূপ, ঐন্দ্রিলার তরল প্রবৃত্তিচাঞ্চল্য প্রভৃতি এমন লঘু কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, ভাষা ও ছন্দরূপে এমন চটুলতার সৃষ্টি করেছে যাতে মহাকাব্যিক আবেদন বারবারই ছিন্ন হয়ে যায়।

এক কথায় বলা যায় বৃত্রসংহারের মহাকাব্যিক আবেদন আংশিক, অগভীর এবং বাধাগ্রস্ত। তবুও তিনচারটি সর্গে বিচ্ছিন্নভাবে এর যে স্বাদ মেলে মেঘনাদ-বধকাব্য ছাড়া এদেশের কাব্য-সাহিত্যে তা বড় সুলভ নয়॥

আগেই কাব্যের বর্ণনাসৌকর্য বিচার এবং চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এবিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এখানে আর তার পুনরুক্তি করা হল না।

চতুর্থ অধ্যায়

দশমহাবিদ্যা

এক

'ছায়াময়ী' কাব্যের পরে হেমচন্দ্র 'দশমহাবিদ্যা' লিখলেন। খ্রীষ্টীয় নরক বর্ণনায় তাঁর বর্ণনা-প্রবণতা তৃপ্ত হলেও হিন্দুবিশ্বাস তৃষিত হয়ে উঠল। হয়ত দশমহাবিদ্যায় তৃষিত কবিচিত্ত পৌরাণিক-তান্ত্রিক আশ্বাসের অমৃত আকণ্ঠ পান করে নিল। অবশ্য পুরাণ-তন্ত্রের সঙ্গে নব্য ইতিহাস চেতনাকে কিঞ্চিৎ সমন্বিত করার চেষ্টাও হয়েছে।

দশমহাবিদ্যা এক ধরনের খণ্ডকাব্য। এ জাতীয় খণ্ডকাব্যের রীতিটি য়ুরোপীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে বিশেষ পরিচিত ছিল না। হেমচন্দ্র য়ুরোপীয় রীতির আখ্যান-কাব্য, গীতিকবিতা অন্যান্য নানা জাতের খণ্ড খণ্ড কবিতা, মহাকাব্য লিখলেন। এলিগরির আদর্শে লেখা হল সাঙ্গরূপক। দান্তের অনুবাদ করলেন। এই একটিমাত্র কাব্যে তিনি প্রাচ্য রীতির অনুসারি। বর্ণনাই এ কাব্যের লক্ষ্য। তবে কাহিনীর একটি ক্ষীণ পটভূমি আছে। দুএকটি পাত্রপাত্রীর সমাবেশ ঘটানোও হয়েছে। ভাবে রূপে সম্পূর্ণ বিসদৃশ হলেও বিখ্যাত মেঘদূত কাব্যের রীতিটিও একই।

প্রত্যক্ষত বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য হেমচন্দ্র পুরাণ-তন্ত্রের ঋণ তো গ্রহণ করেছেনই, সরাসরি ভারতব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব মেনে নিয়েছেন। দশমহাবিদ্যা পড়তে গিয়ে পাঠক ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের কথা মনে না করে পারবেন না। 'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ' এই শিরোনামে ভারতচন্দ্র দশমহাবিদ্যার দশ রূপের ছবি এঁকেছেন। তন্ত্রের বর্ণনা থেকেই তিনি এই ছবির আদর্শ নিয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাসটি কবির নিজের। সেখানেই তাঁর নিপুণতা। ভারতচন্দ্র পুরাণ কাহিনীর মধ্যে তন্ত্রোক্ত বর্ণনাকে সুকৌশলে বিন্যস্ত করেছেন।

কাহিনীটি এইরূপ। দক্ষযজ্ঞে শিব-সতী নিমন্ত্রিত হয় নি। সতী তবু পিতৃগৃহে যেতে চাইল। শিব রাজি নয়। তখন সতী অকস্মাৎ কালীমূর্তি পরিগ্রহ করলেন। কালীতে এই রূপান্তর আকস্মিক। অপ্রত্যাশিতের চমকটুকু ব্যর্থ হতে দেন নি কবি। ভাষায় ধরে রেখেছেন ভারতচন্দ্র।

যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্করী বেশ॥

তারপরে কালীরূপের তন্ত্রানুসারী বর্ণাঢ্য বর্ণনা। বর্ণনান্তে মহাদেবের ভীতি-বিহ্বলতার উল্লেখ। বর্ণনা নয়, সংক্ষিপ্ত একচরণের উল্লেখমাত্র। এবং পটপরিবর্তন।

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥

এবং তারার চিত্র। একই রীতি অনুসরণ। মহাদেবের মানসপ্রতিক্রিয়ার বিস্তৃত পরিচয়ের অবতারণা করলে রূপ থেকে রূপান্তরের চলচ্চিত্র গতিহীন হয়ে পড়ত। কবির প্রযুক্ত পদ্ধতিতে তা না-হয়ে মহাদেবের ভীতি বিস্ময়

মিশ্রিত ব্যাকুলতা ও বিহ্বলতার সূত্রে গ্রন্থিত অপস্রিয়মান দশরূপের মালা গাঁথা হয়েছে। তাছাড়া দশমহাবিদ্যাকে সর্বদা নির্বিকার দূরত্বের ফ্রেমে স্থির করে রাখেন নি কবি। কালীর সঙ্গে ক্রোধের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে কিন্তু আরও অন্তত দুবার কবির বর্ণনায় লক্ষণীয় ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। যেমন—

এক। দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥
দুই। দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া॥

সতীর ভৈরবীরূপে হাস্য এবং মাতঙ্গীরূপে পথ আগলানোর পেছনে নিখিলেশ্বরীর অন্তরে মানবীসত্তার অনুভূতি সক্রিয়। মহাদেবের ভীতত্রস্ত অবস্থায় সতীর কৌতুকই যেন এখানে ধরা পড়েছে।

ভারতচন্দ্র নিশ্চিন্তচিত্তে পুরাণ ও তন্ত্রের বিশ্বাসকে কাব্যভাত করেছেন। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত-ভক্তির ক্ষেত্রে নূতন জোয়ার এসেছিল। কবি সেই যুগপ্রভাবের প্রেরণা বিশেষ করে অনুভব করেছিলেন। এবং এই আয়োজন থেকে যতটা সম্ভব কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন।

হেমচন্দ্র দশমহাবিদ্যার রূপের বর্ণনায় তন্ত্র এবং ভারতচন্দ্রকৃত তার ভাবানুবাদ উভয়ের প্রভাবই স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে চিত্রগুলির বিন্যাসে তিনি ভারতচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র পথ ধরে চলেছেন। শিবসতীর পুরাণাশ্রিত কাহিনী প্রসঙ্গেই তিনি চিত্রগুলি বিন্যস্ত করেছেন। কিন্তু দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পরে দশমহাবিদ্যার রূপ অন্তরীক্ষে প্রকটিত করেছেন।

তাছাড়া পুরাণ-তন্ত্রের অনুসরণে অষ্টাদশ শতকের কবি কোনোরূপ সমস্যা অনুভব করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিকে আধুনিক জীবনভাবনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে হয়েছে। এবং দশমহাবিদ্যার রূপ-বৈচিত্র্য চিত্রণের বিশুদ্ধ শিল্পীসুলভ তৃষ্ণাই কবিকে আকর্ষণ করেছে এমন কথাও বলা যায় না। মুখ্যত তন্ত্রভাবনার মধ্যে সমাজেতিহাসের ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলি আবিষ্কারের ব্যাকুলতায় এই কাব্যের সৃষ্টি। সম্ভবত আরও একটি লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্যের দিকে কবি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন কাব্যের আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টিতে:

Where shall I grasp thee, infinite Nature, where?
... ...
How all things live and work, and ever blending
Weave one vast whole from Being's ample range!
—Goethe's *Faust.*

হেমচন্দ্র তাঁর অল্প ক্ষমতা নিয়ে অনন্ত প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন। অবশ্যই পুরাণ-তন্ত্র এবং নব্য ইতিহাস-বিজ্ঞানে আস্থার মূল্যে।

মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ডের ছবি আঁকতে গিয়ে আদ্যা-প্রকৃতির যে ভীষণ রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে এক ভীতিবিহ্বলতার সৃষ্টি হয়। মানুষের

জীবন, তার কমনীয় কামনা অর্থহীন হয়ে পড়ে প্রকৃতির জড় ভয়ঙ্কর মহামৃত্যু-স্রোতে। অবশ্য অনন্ত ভীষণাপ্রকৃতিকে বরদা মূর্তির অনুভাবনায় কবি শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছেন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-ভাবনার একটি অপরিণত স্তরের কথা মনে পড়বে।

সৃষ্টি স্রোত কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার!
আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করিছে বধির।
শতকোটি হাহাকার
কলধ্বনি রচে তার;
পিছু ফিরে চাহিবার কাল নাই, চলেছে অধীর।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে?

[মানসী। নিষ্ঠুর সৃষ্টি।]

রবীন্দ্রনাথ অল্পকালের মধ্যেই প্রকৃতির এই জড় ভীষণ রূপের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। বিশ্বপ্রকৃতিকে মাতৃরূপে অনুভব করেছেন। তার সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সুগভীর সম্বন্ধের কথা ঘোষণা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ন্যায় রোমান্টিক ভাবুকতার দ্বারা স্বভাবভীষণাকে কোমলা শ্যামলায় রূপান্তরিত করতে চান নি। মনে করা যেতে পারে কপালকুণ্ডলার চরিত্র-পরিকল্পনার কথা, চন্দ্রশেখরের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার কথা।

> 'তুমি জড় প্রকৃতি। তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই;—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই; তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।......তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই,—চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।'

বঙ্কিম আশ্বস্ত হন নি। আত্মসমর্পণ করেছেন। হেমচন্দ্র প্রকৃতির একহাতে খড়্গ অন্যহাতে বরাভয় দেখেছেন। এবং কল্যাণ-সমাপ্তিতে আস্থা পোষণ করেছেন। বঙ্কিম রহস্য ভেদের সাধনায় শুধুই বিস্ময়বিমূঢ় হয়েছেন এবং অপরিহার্য বোধে সেই জড় প্রকৃতির কাছে মাথা নীচু করেছেন।

হেমচন্দ্রের সাধ বড় ছিল, সাধ্য তত ছিল না। দশমহাবিদ্যায় সেই সাধের পরিচয় আছে। আর সিদ্ধিহীনতার।

দুই

দশমহাবিদ্যা ক্ষুদ্র কাব্য। কিন্তু ভাবকল্পনায় গাম্ভীর্য আছে। মহিমাকে স্পর্শ করবার চেষ্টা আছে। বৃত্রসংহারে সাবলাইমে পৌঁছবার যে শ্রম-ক্ষত সাধনা কবি করেছিলেন দশমহাবিদ্যার ক্ষুদ্রদেহে সেই রুদ্রের প্রকাশ-সম্ভাবনা ছিল। অন্তত এ খণ্ডকাব্য ভাব-কল্পনায় বৃহৎ ছিল।

কিন্তু রূপসিদ্ধি কবির সহযোগী হলো না সে তীর্থযাত্রায়। ফলশ্রুতিতে ব্যর্থতাই দেখা দিল।

এ কাব্যের আরম্ভে সতীশোকে শিবের ও কৈলাসের বেদনার চিত্র। চিত্রটি যথাসম্ভব বিবর্ণ। শুধু শিবের শোকের মৌন কিঞ্চিৎ ভাবগম্ভীর।

জটালগ্ন মণিমালা, মিলাইয়ে জিহ্বাজালা,
লুকাইল জটার ভিতর।
নিস্পন্দ পবনস্বন্ নিরানন্দ পুষ্পগণ
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণু পর
থামিল গঙ্গার রব, নির্ব্বাক প্রমথ সব,
কৈলাস-জগৎ অচেতন।

পরবর্তী কবিতা 'মহাদেবের বিলাপ'-এ 'রে সতি রে সতি'-রবে যে নাটকীয় প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পেয়েছে বাক্যহীন শোকস্তব্ধতা তার তুলনায় অনেক গভীরভাবে মনকে নাড়া দেবে। মহাদেবের বিলাপের সূত্রে নানা পৌরাণিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন কবি। উল্লেখগুলি শিবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক। মূল বিলাপের সুর এই সব উল্লেখের মধ্য দিয়ে বাজাতে চেয়েছেন। যোগীকে গৃহী করেছিলেন সতী। তাই বিরহে এই গভীর দুঃখপ্রবাহ। কিন্তু বেদনার আন্তরিক গভীরতা প্রকাশ পায় নি। পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলি ভক্ত পাঠকের রসতৃষ্ণা কিছু মেটাতেও পারে।

পরের কবিতা নারদের গান। বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনের বাসনা এই গানে প্রকাশ পেয়েছে :

অনন্ত পরমাণু, বিকট জগদ্‌ভানু—
উদ্ভব কোথা হতে, কি হইবে চরমে?

এইরূপ নানা গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা। জড় চেতনে পার্থক্য কি? জড়ের মধ্যে চেতনা সঞ্চারের রহস্য কি? সুখ দুঃখ নির্বাণের অর্থ কি? কল্যাণময় ভগবানই কি অশুভেরও স্রষ্টা? আদিভূত কি পাঁচটি মাত্র, অথবা অসংখ্য? কিন্তু বিশ্বরহস্যভেদী ভাবনা শুধুই তত্ত্বচিন্তারূপে এখানে প্রকাশ পেয়েছে,

কিছুমাত্র কবিতা হয়ে ওঠেনি। এবং শেষ পর্যন্ত হরিনামের ভক্তিরসস্রোতে সব জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত করতে চেয়েছে নারদ।

পরের কবিতা 'নারদের বীণাবাদন'। হরিনাম গান করতে করতে নারদ আনন্দবিহ্বল হয়ে পড়ল। পরমানন্দে বীণা বাজাতে লাগল। বীণার বৈচিত্র্য শব্দবন্ধে বাঁধতে চেয়েছেন কবি। কবিতাটিতে ভাববস্তু প্রায় কিছু নেই। শুধু শব্দঝঙ্কারে বীণার গুঞ্জনসঙ্গীত—কচিৎ কোমল নিক্বণ, ক্বচিৎ গুরুগর্জন ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা। শব্দের অর্থ অংশকে যথাসম্ভব ন্যূন করে ধ্বনি অংশকে মুখ্য করে তোলার এই চেষ্টা কতকটা সফল হয়েছে। কিন্তু চরণান্তিক মিত্রাক্ষর ব্যবহারে কবি গলদঘর্ম হয়ে পড়েছেন। ক্রিয়াপদে ক্রিয়াপদে মিল সৃষ্টি করায় কোনরূপ সুরই বাজে নি। তা শুনবার কান কবির ছিল না।

নারদের গান ও বীণাবাদন শিবকে দুঃখমুক্ত করল। 'শিবনারদসংবাদ' শীর্ষক পরবর্তী কবিতায় কিছু তত্ত্বকথা প্রকাশ পেয়েছে। শিব সতীকে 'অনাদ্যারূপিণী ভবপ্রসবিনী' বলে অনুভব করতে পেরেছেন। তার জন্য মানবিক রীতির শোকপ্রকাশ যে কত অসঙ্গত তিনি বুঝতে পেরেছেন। চৈতন্যরূপিণী সতীর মৃত্যু নেই। তিনি সর্ব অস্তিত্বের এবং অনস্তিত্বের মূল বীজ।

পরমা প্রকৃতি পরমাণু-মূল।
কারণকলাপমালিনী।
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা
নিখিল অঙ্কুররূপিণী॥

তিনি সতীরূপ পরিহার করে ব্রহ্মাণ্ড বপুতে জড়িয়ে লীলাবিলাস করছেন। হেমচন্দ্রের এই প্রকৃতি ভাবনায় ব্যক্তি উপলব্ধির বর্ণ নেই, হিন্দু তান্ত্রিক বিশ্বাসেই এর ভিত্তি। অবশ্য এ তত্ত্বচিন্তা শিল্পরূপ লাভ করে নি। ভক্তের বিবৃতিতে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে। কবি অবশ্য মর্তমানবের প্রীতিবন্ধনের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগ প্রকাশ করেছেন:

ভালবাসাময় জগত নিখিলে
সমব্যথা কত জীবনে!

কিন্তু কাব্যশিল্প হিসেবে সেখানে কোনোরূপ উন্নতি সূচিত হয়নি। এ কবিতার শেষে মানবদেহহীন হয়ে সতী যে বিশ্বময়ী হয়েছেন তা প্রদর্শন করে নারদকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন মহাদেব।

পরের কবিতার শিরোনাম 'শিবকর্তৃক সৃষ্টি আচ্ছাদন অপসারিত'। মহাদেব সৃষ্টির আবরণ উন্মোচিত করে নারদকে অনাদি প্রবাহের উৎসে নিয়ে চললেন। তত্ত্ববিবৃতি নয়, কবিকল্পনার বিপুলতা এখানে ভাষায় রূপ নিয়েছে। শিবের বিশ্ববিস্তৃত এবং বিশ্বভেদী এই রূপ বৃত্রসংহারে প্রকাশিত তাঁর প্রলয়রূপের সঙ্গে তুলিত হবার যোগ্য। এর আদি আদর্শ গীতার বিশ্বরূপদর্শনে। অবশ্য হেমচন্দ্র সে ছবির অনুকরণ করেন নি। হয়তো

সেখান থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। রসাতল বিদীর্ণ হয়ে পদযুগ ঠেকেছে পাতালে। মাথা পৌঁছেছে মহাকাশে। দীপ্ত তাম্রশলার ন্যায় জটাজাল সূর্যকিরণের ন্যায় আচ্ছন্ন করেছে শূন্য প্রদেশকে। অন্তরীক্ষের বর্ণনায় কবি বৃত্রসংহারেও উল্লেখ্য সাফল্য দেখিয়েছিলেন। কিন্তু গম্ভীর বিশালতা প্রকাশের ছন্দে এরূপ প্রগল্‌ভতা সাজে না। দক্ষযজ্ঞনাশে ভৌতিক কোলাহলের বর্ণনায় ভারতচন্দ্র এ-জাতীয় ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন :

ভূতনাথ ভূতসাথ
দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষরক্ষ লক্ষ লক্ষ
অট্টঅট্ট হাসিছে॥

ভারতচন্দ্রের ন্যায় এখানেও ক্রিয়াপদে মিল—যা আদৌ মিল বলে গণ্য হবার নয়। রায়গুণাকর প্রথম দ্বিতীয় পদে অতিরিক্ত মিল দিয়ে সে ক্ষতি পুরণ করেছেন। হেমচন্দ্রে তারও অভাব। অবশ্যই 'ভূতনাথ' 'ভূতসাথ'-এর মধ্যে যে অন্ত্যানুপ্রাস 'মহাদেব' 'মহাবেশ'-এ সেরূপ কিছু নেই। আলোচ্য কবিতায় ছন্দ তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

পরবর্তী কবিতা 'নারদের মহাকাশ দর্শন'। অন্তরীক্ষের বর্ণনা। প্রধানত কোমলতা ও সৌন্দর্য মিশ্রিত। মাঝে মাঝে বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল'-এর অংশ বিশেষের কথা মনে পড়ে। ব্রহ্মার মানসসরে ভাসমান সারদার বিশ্ব-ভরা বিচিত্র অজস্র প্রতিবিম্বনের ছবি।

'মহাশূন্যে দশ ব্রহ্মাণ্ডের স্থান নির্দেশে' ভিন্নভিন্ন রাশিচক্রে দশমহাবিদ্যাকে স্থাপন করা হয়েছে। তালিকা ছাড়া এ কবিতায় উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। সম্ভবত মহাকাশের অখণ্ড অনন্তের ধারণাটি পাঠকচিত্তে কতকটা স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন কবি। রাশিচক্রের ন্যায় পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডলীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই।

পরবর্তী অংশ 'শিবনারদ বার্তা'য় মানব সংসারের চিত্র :

মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা।
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ে বেদনা॥
আধ ভাঙ্গা সাধ কত পরাণে জড়ায়।
অসুখে কতই দুখে জীবন খেয়ায়॥
দেবতুল্য বাসনায় ঊর্ধ্বদিকে গতি।
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দগ্ধমতি॥

কবির মানবপ্রীতি, মানবদেহধারণের গৌরব ও যন্ত্রণার ঐকতান এ অংশে বেজেছে।

পরের কবিতার শিরোনাম 'নারদের মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ডদর্শন'। জীবদুঃখে নারদের কাতরতা প্রকাশ পেয়েছে। দয়াহীন নিখিলের রুধিরাক্ত পটভূমিতে দেবর্ষির মানবপ্রীতির করুণসুর বেজেছে।

না কাঁদে পরাণী ত্রিলোক ভিতরে
নাহি কি এমন ঠাঁই ?

হেমচন্দ্রের মনে এ ভাবনাটি 'বৃত্রসংহার' রচনার কাল থেকেই দেখা দিয়েছিল। দশম সর্গে পার্বতী শিবকে অনুরূপ প্রশ্নই করেছিলেন :

সুখ হৈতে মানবের দুঃখ পরিমাণ
গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে !

দশমহাবিদ্যায় এই প্রশ্নটির উত্তর একাগ্রভাবে খুঁজবার কিছু সুযোগ নিয়েছেন কবি।

এর পরে একে একে মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মহালক্ষ্মী—দশমহাবিদ্যার রূপবর্ণনা। অশান্তি ও হিংসাময় দুঃখের জগতে শান্তি ও প্রীতি ধীরে ধীরে একাধিপত্য বিস্তার করবে দশমহাবিদ্যার মূর্তিপরম্পরার মধ্য দিয়ে এই সত্যে প্রত্যয় হল নারদের।

জগৎ অশুভ নয়, কালেতে হইবে লয়
জীবদুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।

নারদের মুখ দিয়ে মানুষকে আশ্বাসের বাণী শোনালেন কবি। এবং আশ্বাসের সঙ্গে ভক্তির সুরটি মিশিয়ে দিলেন নির্দ্বিধায়।

জড় জীব দেহ মন যাঁ হইতে প্রকটন,
অনুক্ষণ সেই রূপ হৃদিমাঝে জাগারে।

শেষ কবিতাটি ক্ষুদ্র। শিব নিজ দেহে বিশ্বরূপ সংহরণ করেছিলেন। আবার চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা বিশ্বে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল। আদ্যাপ্রকৃতি সতী দশরূপ সঙ্কুচিত করে পার্বতী রূপ নিলেন। কৈলাসে হরপার্বতীর রূপ শোভা পেল। আধুনিক কবি ভক্তিপ্রফুল্ল চিত্তে কাব্য শেষ করলেন।

তিন

দশমহাবিদ্যার একটি প্রধান অংশ শক্তির দশরূপের বর্ণনা। কাব্যটির প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়েই এই রূপাঙ্কন। শব্দচিত্র নির্মাণে কবির সাফল্যের পরিমাণ বিচার্য। এবং নূতন যুগের ভাবনা দ্বারা প্রাচীন বিষয়বস্তুতে নূতন জীবনসঞ্চার-চেষ্টা কতটা সত্য হয়ে উঠেছে তার সন্ধান নেওয়াও প্রয়োজন।

চিত্ররচনায় হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব বেশি নয়। বলা যেতে পারে মূর্তিগুলি একান্ত বিবর্ণ নয়। তবে তন্ত্রের কল্পনাগাম্ভীর্য এবং ঘনীভূত চিত্র-রূপের কাছে পৌঁছতে পারেন নি কবি। ভারতচন্দ্রের আঁকা ছবিগুলিতে মৌলিকতা নেই, আছে তন্ত্রের অনুসরণ। কিন্তু সেগুলি রূপহীন নয়। রামপ্রসাদের কবিতাগুলিতে কল্পনায় এবং রূপনির্মাণে মৌলিকতা আছে। তন্ত্রোক্ত ভীষণ কালিকা স্নেহময়ী বরদা মাতৃ ভাবনার সঙ্গে সহজ সমন্বয়ে বদ্ধ হয়েছে তাঁর কবিতায়। যেমন :

শঙ্কর শতদলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনুরুচি বিজিত তরুণতমাল ॥
যোগিনী সকল, ভৈরবীসমরে, করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস উর্ধ্বে শোণিত পিবতি নয়ন বিশাল ॥

কবির বিগলিত ভক্তিধারায় কঠিন দ্রবীভূত হয়েছে। অনুকরণাত্মক অথবা মৌলিক উভয়ধারার কালীচিত্র রচনায় অষ্টাদশ শতকের বাঙালি কবিরা যে সাফল্যের নজির রেখে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে তুলনায় হেমচন্দ্র কোনো নূতনত্ব দেখাতে পারেন নি—অন্তত শুধুমাত্র চিত্ররচনার দিক থেকে। এখানে সেখানে সামান্য যে সব বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত মেলে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি।

প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণমান মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনাটি কবির নিজের। করাল-বদনা কালীর নৃত্যবেগে আবর্তিত বিশ্বনিখিল। এই গতিপ্রবাহ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যুরূপা মহাকালীই আদি প্রকৃতি—সৃষ্টির উৎস।

হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তার তুলনা ॥
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী ॥
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে ॥
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপা মহাকালা গ্রাসে মুখব্যাদানে ॥
অঙ্গ হতে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করাল বদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে ॥

ছন্দে নৃত্যের বহিরঙ্গ তালটি ধরে রাখবার চেষ্টায় ভাবকল্পনার সামগ্রিক গাম্ভীর্যে অনেকটা হানি ঘটেছে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা নিরর্থক হয়ে যায় নি। সন্দেহ নেই গতিময় নৃত্যের তাল বাইরে ছন্দদেহে এত প্রত্যক্ষ করে না তুলে অন্তরের গভীরে সত্য করে তোলা গেলে উচ্চতর শিল্পকৃতি পাওয়া যেত।

কবি সর্বদা চিত্ররচনার প্রতি মোহ অনুভব করেন নি। ষোড়শী এবং বগলার প্রসঙ্গ উল্লেখে মাত্র পর্যবসিত। এবং ছিন্নমস্তার তন্ত্রোক্ত বিস্তৃত বর্ণনা কয়েকটি চরণে সঙ্কুচিত।

হেমচন্দ্র সভ্যতার বিভিন্ন স্তর এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন এ কাব্যে। ইঙ্গিতগুলি স্পষ্ট, এবং প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রায়ই সম্বন্ধ-বদ্ধ। ব্যতিক্রম অল্প।

জীবধর্মের আদি সত্য হিংসা। আত্মরক্ষায় ঘোরতর সংগ্রাম এবং সংহার। চারদিকে রক্ত ধ্বংস এবং মৃত্যুর বিভীষিকা। কালিকার মহাভয়ঙ্করী মূর্তির সঙ্গে এই ভাবনার সংঘর্ষ কোথাও নেই। কবির সে-বর্ণনা ('শোণিত-

অর্ণব কলকল ডাকিছে' প্রভৃতি) ছন্দের অসম্ভব পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা আহত না হলে অনেক ফলপ্রদ হত।

তারপরে প্রথম জ্ঞানের অঙ্কুর সঞ্চার হল জীব হৃদয়ে। কবি তারার মধ্যে সভ্যতার সেই প্রথম সোপানের চিহ্ন দেখেছেন। উলঙ্গিনী আদ্যা-প্রকৃতি এবারে ব্যাঘ্র চর্ম পরেছেন। খড়্গ-খর্পরের পাশে এক হাতে নীল-পদ্মও শোভা পাচ্ছে। তা ছাড়া—

জ্বলন্ত চিতামাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে।

বিশ্বব্যাপী হিংসা বহ্নি ও মৃত্যুর মধ্যে মনুষ্যত্ব পদ্মের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। এখনও চিতায় লেলিহান শিখা। কিন্তু ভরসা এই, সে-আগুন থেকেই জন্ম হয়েছে শোভা ও শুচিতা সূচক পদ্মের। কবির ভাবনা ব্যর্থ হয় নি—রূপের সঙ্গে তার স্বাভাবিক সম্বন্ধ ঘটেছে আলোচ্য কবিতায়।

সভ্যতার বিকাশ-সম্ভাবনা তারায়। পরের স্তর জীবহৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার। কবি তন্ত্র থেকে সরে এসেছেন। জবাকুসুম সদৃশা রক্তবর্ণা দেবীকে 'শ্বেতবরণ বামা পূর্ণকলা কামিনী'-রূপে বর্ণনা করেছেন। তন্ত্রবর্ণিত বিস্তৃত চিত্রের স্থানে একটি মাত্র চরণ। সেখানে অবশ্য ষোড়শীকে 'সর্বশৃঙ্গার বেশাঢ্যা' 'সর্বাভরণভূষিতা', 'জগদাহ্লাদের কারণ' এবং 'বিশ্বরঞ্জনকারিণী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হেমচন্দ্র অনায়াসে এই রূপের সহায়তায় আপনার বিশিষ্ট ভাবটি দ্যোতিত করতে পারতেন।

ভুবনেশ্বরী দেখা দিয়েছেন জীবদুঃখবিনাশিনী সর্বমঙ্গলারূপে। হেমচন্দ্র দেবীকে 'সদা সুহাস্যযুতা' বলে বর্ণনা করেছেন। কবি তাঁর ত্রিনয়নে দেখেছেন প্রফুল্লতা এবং 'প্রভাত-আভা দেহে'। রক্তিমাভ না বলে 'প্রভাত-আভা' শব্দটি ব্যবহার করায় বর্ণের সৌকুমার্য প্রকাশ পেয়েছে। এবং তা কবির ভাবনার যোগ্য বাহন হয়েছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে পরবর্তী স্তরে দেখা দিয়েছে জ্ঞান ও ভক্তি। ভৈরবীর শাস্ত্র-কথিত স্তবে তাঁকে 'বিদ্যামভীতিং' বরদাত্রী বলা হয়েছে। কবি তার সঙ্গে ভক্তির প্রসঙ্গ যুক্ত করেছেন মাত্র। নূতনত্ব বিশেষ নেই। রূপে ও ভাবে অভিনব কোনো ভাবাসঙ্গ তাঁকে গড়ে তুলতে হয় নি।

মাতঙ্গীমূর্তির বর্ণনায় সৌন্দর্যের একটি কোমলকান্তরূপ প্রকাশ পেয়েছে। 'দলমলকুন্তল', 'কলহংস শোভাসম শ্বেতমালা নিরুপম' এবং 'শ্যামাঙ্গী' দেবীর দুই করে শঙ্খের বালা। এই রূপের আধারে সর্বজীবে প্রীতি-ভাবটির সহজ সুন্দর মিলন ঘটেছে।

ধূমাবতীর শ্রমক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসাতুর, বিবর্ণা, বিধবাবেশে কবি জীবের শ্রম-ক্লান্তির অপনোদন লক্ষ্য করেছেন। এ দেবীকে বরং দারিদ্র্য ও শ্রমের প্রতীক বলা যেত। এঁর রূপে শ্রম বিনাশের ইঙ্গিত কোথায়?

বগলাকে তিনি দারিদ্র্যদলনী বলে কল্পনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু কবির

ভাবনা বিবৃতি ছাপিয়ে রূপধৃত কাব্যসত্য হয়ে ওঠে নি। কারণ বগলার কোনো রূপই এখানে প্রকাশ পায় নি।

ছিন্নমস্তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও মদনোন্মত্ততা এবং বিপরীত রতিমূর্তিতে জগতের সর্বপাপের দ্যোতনা এসেছে। ভয়ঙ্করী তিনি। আপনি ছিন্ন করেছেন আপনার মস্তক। আপনি শোষণ করছেন আপনার রক্ত। নিঃসন্দেহে এই চিত্রে বীভৎস বিকৃত সভ্যতার আত্মঘাতী রূপ ধরা পড়েছে।

মহালক্ষ্মীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সভ্যতার সর্বোত্তম আশা-উজ্জ্বল রূপ। তিনি রোগ শোক তাপ হরণ করেন। 'লীলারসে নিমগন' সুমোহন-বেশ মহালক্ষ্মী সহজেই মূর্তিমতী দয়া, জীবের 'সর্বসুখসদ্মে' পরিণত হয়েছেন।

চার

হেমচন্দ্রের এই কবিতায় সভ্যতার ক্রমবিকাশের কোনো পারম্পর্যপূর্ণ ছবি, কোনো ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিশ্লেষণ না পেলে ক্ষুব্ধ হবার কারণ নেই। মানব সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য নিশ্চয়ই কেউ দশমহাবিদ্যা পড়বেন না।

হেমচন্দ্র প্রাচীন হিন্দুবিশ্বাস ও ভক্তিকে আধুনিক শিক্ষিত মানুষের জীবন-ভাবনার কাছে এনে ফেলতে চেয়েছেন। এই চেষ্টা নবজাগরণের একটি মুখ্য প্রবণতা। বৃত্রসংহারের আলোচনায় সে কথা বলেছি।

হেমচন্দ্র এর মধ্য দিয়ে মানুষকে একটি সহজ আশার বাণী শুনিয়েছেন। মানবজীবনের দুঃখ নিয়ে তিনি মাঝে মাঝেই ভাবুকতা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এ দুঃখবোধের পেছনে কোনো গভীর দার্শনিকতা নেই। নেহাৎই সাধারণ মানবের বিচিত্র বাস্তব দুঃখবেদনা, অভাব-অভিযোগ, কামনার অপূর্ণতাই কবিকে চিন্তান্বিত করেছে। 'কবিতাবলী'তেও সে দুঃখের কথা আছে। 'জীবন-মরীচিকা' প্রভৃতির কথা মনে করা যেতে পারে। বৃত্রসংহারে পার্বতীর মুখে সে কথাই একবার শুনিয়েছেন কবি।

> পাপ-পুণ্য কিসে হয় ; দুষ্কৃতি, সুকৃতি,
> অদৃষ্ট অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে ;
> সুখ হৈতে মানবের দুঃখ পরিমাণ
> গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে !

দশমহাবিদ্যা সম্পূর্ণত সেই দুঃখবোধ এবং দুঃখমোচনের কাব্য। মানব দুঃখে ব্যথিতচিত্ত কবি যে প্রশ্ন তুলেছেন তা কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মানবপ্রীতিরসে পূর্ণ নব্যপ্রত্যয়ের ফল। হিংসাই জীবজগতের আদি সত্য। কঠিন সংগ্রাম এবং অপরের ধ্বংসসাধনের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিগত প্রণয়ের মধ্য দিয়ে সেই আদিম হিংস্রতা ছাপিয়ে ওঠে মানুষ। জ্ঞানচর্চা মানুষকে ক্ষুদ্রতা মুক্ত করে। তবুও থাকে দারিদ্র্য-দুঃখ। আর আধুনিক সভ্যতা তো বিকারগ্রস্ত, আপনার

হননে আপনি উদ্যত। সর্বব্যাপিনী প্রীতিই মানব সভ্যতার উচ্চতম ফলশ্রুতি। দুঃখজয়মন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর মননও ঐ একই সিদ্ধান্তে পৌছেছিল।

> 'প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।'
>
> [কমলাকান্ত। প্রথম সংখ্যা]

কবি বিশ্ববিধানের দিকে তাকিয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর মানবভাবনার বশবর্তী হয়ে। কিন্তু প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতি বিরূপতা দেখান নি। তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। পৌরাণিক-তান্ত্রিক বিশ্বাসে অবিচল কবিমন নারদের কণ্ঠে আন্তস্ত ভক্তির সুরটি বাজিয়েছেন। শাস্ত্রীয় ভাবনার সঙ্গে কোথাও স্বাতন্ত্র্য দেখা দিলেও তা একান্তই বহিরঙ্গ।

পাঁচ

দশমহাবিদ্যার পাঠক প্রথমেই চমকে যাবেন শব্দের উপরের রেখাঙ্কন দেখে। কবির নির্দেশ 'চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং পদের অন্তেস্থিত 'অ' স্পষ্ট উচ্চারিত হইবে।' বাংলা ছন্দের প্রধান দুর্বলতা এ ভাষার উচ্চারণে গুরুলঘুর ভেদ নেই। অনেকেই তা লক্ষ্য করেছিলেন। মধুসূদনের একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে।

> '…our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an 'apostate', that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our family-priest.'
>
> [কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী : ক্ষেত্র গুপ্ত। পত্রসংখ্যা—৫৮]

কিন্তু মহাকবি নূতন ছন্দ সৃষ্টি করতে গিয়ে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির ব্যত্যয় ঘটান নি। হেমচন্দ্রের এ ধারণা ছিল না যে কোনো ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গিকে ইচ্ছামত বিপর্যস্ত করে নূতন ছন্দের প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। সে-জাতীয় পরীক্ষা হাস্যকর হয়ে পড়তে বাধ্য।

তা ছাড়া কি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি এই ছন্দঘটিত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন? ভাবকল্পনার মধ্যে, কবির জীবনবোধের মধ্যে এমন কিছু বিশিষ্টতা ছিল কি যার জন্য অনুরূপ নূতন ছন্দ ব্যবহার ছিল অপরিহার্য? কবি মাঝে মাঝে অনুরূপরীতির প্রয়োগ করেছেন। তাদের সাহায্যে বুঝবার উপায় নেই, সেরূপ কোনো আভ্যন্তরীণ তথা শৈল্পিক কারণ আছে কি না।

কবির এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে—কারণ অস্বাভাবিক উচ্চারণের কৃত্রিমতা ফলশ্রুতিতে ব্যর্থতা ডেকে আনতে বাধ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

কবিতাবলী

এক

হেমচন্দ্র স্বল্পদীর্ঘ কবিতারচনায় উৎসাহী ছিলেন। দুই খণ্ড 'কবিতাবলী' (১৮৭০,৮০) এবং 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮) গ্রন্থ এরূপ কবিতার সঙ্কলন। পুস্তিকার আকারেও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়ও কিছু কবিতা ছড়িয়ে ছিল। 'এডুকেশন গেজেট'-এ ১৮৬৮ সালে এই জাতীয় কবিতা প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন হেমচন্দ্র। বাংলার গীতিকবিতার ক্রমবিকাশে এই সব কবিতার গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা আছে।

আধুনিক কালে ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম নানা বিষয়ে স্বতন্ত্র কবিতা লিখতে শুরু করেন। আখ্যানকাব্য থেকে এরা রূপেগুণে একেবারে আলাদা। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের অনুসরণে এদের অনেকে খণ্ডকাব্য বিশেষণে ভূষিত করে থাকেন। এরা পুরাতন বাংলা সাহিত্যের গেয় 'পদ' নয়। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে তুলনা করলেই এই পার্থক্য বোঝা যাবে। আবার নব্য গীতিকবিতার সঙ্গে এর আকার ঘটিত সাদৃশ্য থাকলেও প্রকৃতিগত দূরত্ব কম নয়। তবুও এই 'খণ্ড' কবিতা থেকেই গীতিকবিতার জন্ম, যেমন খণ্ড কবিতার ভিত্তিতে পুরাতন 'পদ'-এর রূপও রীতির বৈশিষ্ট্য। অবশ্য খণ্ড কবিতার সঙ্গে গীতিকবিতার পার্থক্যের রেখাটি যে সর্বদা স্পষ্ট করে আঁকা যায় এমন নয়। খণ্ড কবিতায় যেখানে কবির আত্মকথন প্রধান সেখানে রচনা হয়ে ওঠে গীতিধর্মী। এই আত্মোদ্‌ঘাটনে কখনও ব্যক্তিগত ভাবানুভূতির স্পষ্ট তরঙ্গস্পন্দন শোনা যায়, কখনও তা অস্পষ্ট অনির্বচনীয় রহস্যঘন হয়ে ওঠে। কখনও তা স্বদেশচেতনায় উচ্চকণ্ঠ এবং উত্তেজিত, কোথাও একান্ত ব্যক্তি-ভাবনায় অনুচ্চার। কোথাও বস্তুর চারপাশে কল্পনার স্বল্পরেখ আলিম্পন, আবার বস্তুকে আত্মসাৎ করে সুদূরাভিসার কল্পনার কামস্বর্গে। কিন্তু যেখানে রচনা বস্তুনিষ্ঠ বা ব্যঙ্গবিদ্ধ, অথবা ব্যক্তিগত জীবনোপলব্ধির চেয়ে বস্তুমুখি জীবন-ভাবনা মুখ্য তাদের গীতিকবিতার সীমায় টানা শক্ত। এদের খণ্ড কবিতা নামেই পরিচিত করা যাক।

ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা এদিক দিয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। সামাজিক বিষয়, প্রাকৃতিক শোভা, রাজনৈতিক ভাবনা, ধর্মচেতনা, মানবিক অনুভূতি—কোনো বিশেষ ঘটনা বা দৃশ্য—এমনি নানা প্রসঙ্গে ছোট ছোট কবিতা লেখার সূত্রপাত ঈশ্বর গুপ্তের হাতে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র গুপ্তকবির শিষ্যত্ব মেনে নিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে তাঁদের বেশ কিছু কবিতা 'রূপক' শিরোনামে প্রভাকরে

বেরিয়েছে। ১৮৬৫-৬৭ সালে 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায়ও এ জাতীয় কবিতা রঙ্গলাল লিখেছেন। দীনবন্ধুর খণ্ডকবিতার সঙ্কলন 'দ্বাদশ কবিতা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭২ সালে। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' (১৮৬১), 'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬২) খণ্ড কবিতার রূপরীতিতে নিয়ে এল গীতিকবিতার সুর। এদের মধ্যে রোমাণ্টিক সুদূরাভিসার নেই, তবু এরা খাঁটি গীতিকবিতা—কবির আত্মোদ্ঘাটনে, স্বাদেশিকতা ও ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর মিশ্রণে, চিত্তদীর্ণ যন্ত্রণায়। কবির 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে (১৮৬৬) লিরিকেরই একটা ঘনীভূত রূপ সনেটের সংহত আকার নিয়ে দেখা দিল। সেখানে কবির আত্মানুসন্ধান। বিহারীলালের 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২) অনেকটা গানের রাজ্যের। পাঠ্য কবিতায় স্থিত হল 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন' 'প্রেম প্রবাহিনী'। ১৮৭০ সালে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হলেও দুতিন বছর আগে এদের কোনো কোনো অংশ সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। রোমাণ্টিক গীতিকবিতায় কল্পনা আকাশচারি হয়ে উঠল। 'সারদামঙ্গল'-এ (১৮৭৯) তা অনির্বচনীয় রহস্যমণ্ডিত দিগন্তরেখার মত বিলীয়মান এক মায়াময় বিস্ময়কর রূপ নিল। নবীনচন্দ্র সেনের দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১,৭৮) তে বস্তুমুখি, আত্মমুখি দুজাতের কবিতারই দেখা মেলে। এর প্রথম খণ্ডের কিছু কবিতা চার-পাঁচ বছর আগে 'এডুকেশন গেজেটে'-এ বেরিয়েছিল।

১৮৭০ সাল নাগাদ বাংলা গীতিকবিতার প্রতিষ্ঠা। এবং তার পর থেকে এ ধারার ক্রম-প্রাধান্য বিস্তার। প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর ধরে সমকালীন বিশিষ্ট কবিরা খণ্ডকবিতা-গীতিকবিতার বিবিধ রূপ ও বিচিত্র স্বাদ নিয়ে সাধনা করেছেন। (এককভাবে বিহারীলালকে বাংলা গীতিকবিতার জনক বলে বিশেষিত করা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নয়।) এই বিলম্বিত প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল। মহাকাব্য আখ্যানকাব্যের প্রচলন। ক্ষুদ্রাকার খণ্ড কবিতার তুলনায় এদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বে সমকালীন সাহিত্যপ্রধানদের বিশ্বাস। ফলে বিহারীলালের আগে কেউই একাগ্রচিত্তে নব্যধারার অনুশীলনে আগ্রহ দেখান নি। তাছাড়া গীতিকবিতার আঙ্গিক ও রসাবেদন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা ধীরে ধীরে বিচিত্রমুখি চেষ্টার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর মূল্য বিচার্য।

দুই

বিস্রম্ভালাপের উদ্দেশ্যে মহাকাব্যিক বিপুল আয়োজনের ফাঁকে ফাঁকে হেমচন্দ্র মুষ্টিমেয় খণ্ডকবিতা লেখেন নি। তাঁর কাব্যসাধনার একটি মুখ্য

প্রচেষ্টা এই ধারায় বয়ে চলেছে কাব্য জীবনের প্রায় আদ্যন্ত জুড়ে। ১৮৬৮ সালে খণ্ড কবিতা লিখতে শুরু করেন তিনি। আমৃত্যু লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য শেষ রচনা 'চিত্তবিকাশ' গীতিকবিতার সঙ্কলন।

খণ্ডকবিতা-গীতিকবিতায়ই হেমচন্দ্র বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—সাহিত্যজগতে এদেরই স্থায়িত্বের সম্ভাবনা আছে, এমন সমালোচনাও শোনা যায়। অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হবার প্রশ্ন আসে না। হেমচন্দ্রের কোনো রচনায়ই প্রতিভার সেই সর্বোচ্চ স্তরের পরিচয় নেই যাতে যুগান্তরের রসিক পাঠক কাব্যাস্বাদের অঞ্জলি ভরে নিতে পারে। আলোচ্য কাব্যভাণ্ডারে সন্ধানী মন কিছু মাঝারি ধরনের কবিতার খোঁজ পাবেন। কবি বৃত্রসংহার-দশমহাবিদ্যায় যে স্তরের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন কবিতাবলীর মান তার চেয়ে কোনো দিকেই উঁচু নয়। হেমচন্দ্র বিশেষ করে খণ্ডকবিতা-গীতিকবিতা রচনার উপযোগী প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন—মহাকাব্যিক কৃত্রিম প্রচেষ্টায় তাঁর কবিপ্রাণের সত্য পরিচয় নেই, এমন সিদ্ধান্তে আস্থা রাখা চলে না। য়ুরোপীয় কাব্যরীতির নানা মহল থেকে রূপ ও আঙ্গিক আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রেও তাঁর গুরু মধুসূদন। কিন্তু গুরুর মত উচ্চ প্রতিভা বা শিল্পবোধের সুনির্দিষ্ট ভারকেন্দ্র না থাকায় তাঁর সে সাধনার বৈচিত্র্যের মধ্যে বৃহত্তর কোনো ঐক্যের সন্ধান মেলে না।

হেমচন্দ্রের কবিতা ভাণ্ডারে বস্তুনিষ্ঠ এবং আত্মনিষ্ঠ দুধরনের লেখাই আছে। কিছু আছে খাঁটি লিরিকও। অনেকগুলি কবিতা ব্যঙ্গমুখ্য। কোথাও মানবজীবন ও ভাগ্য সম্বন্ধে ভাবনা যেমন আছে তেমনি একান্ত ব্যক্তিগত বেদনার উপলব্ধিকেও প্রকাশ করতে চেয়েছেন কবি মাঝে মাঝে।

তিন

স্বাধীনতার চেতনা, স্বদেশপ্রেম নবজাগৃতির মন্ত্র—আধুনিক কালের ভাবনা। মধ্যযুগে রাজকীয় আনুগত্য ছিল, ছিল আত্মরক্ষার জৈব প্রয়োজনও। রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে এক জাতের স্বাদেশিকতার উন্মেষও ঘটেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মকুলগৌরব প্রভৃতি প্রশ্নগুলির সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। বিশুদ্ধ জাতীয় ভাবনা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সংস্পর্শের ফল। প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থাদির উদ্ধারে এবং ঐতিহ্যচর্চায়ও এই জাতীয় মনোভঙ্গি কতকটা সক্রিয় ছিল। আবার এর ফলে এই মনোভাবই পুষ্ট হয়েছিল। হেমচন্দ্রের সমকালে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনা সচেতন আন্দোলন এবং সংগঠনের অভিমুখি হয়েছিল। সে-পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্তে দেশাত্মবোধক কবিতার শুরু। মধুসূদনের সনেটে স্বদেশ প্রীতির গভীরতর ভাববাঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে। নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীতে জাতীয়

ভাবোদ্দীপক কবিতা আছে। হেমচন্দ্রের এ জাতীয় কবিতার সংখ্যাও অনেক। সমকালে এদের মূল্যেই কবি আকাশ-ছোঁয়া জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।

রঙ্গলাল মধুসূদন নবীনচন্দ্রের কাহিনী-কাব্য (এবং মহাকাব্য) গুলিতেও নানা সূত্রে স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। হেমচন্দ্রের বীরবাহু বৃত্রসংহারের কথা আগেই মোটামুটি বিস্তারিতভাবে বলেছি। বঙ্কিমের অনেকগুলি উপন্যাসের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়বে। পরোক্ষত হলেও বাঙালির স্বদেশি ভাবনার বিকাশে নীলদর্পণের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তবে খণ্ড কবিতায় কাহিনীর আবরণটি অপসৃত হওয়ায় এই বিশেষ ভাবটি অনেক প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে।

ভারতীয় চিন্তানায়কদের স্বদেশি চিন্তার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে তো বটেই, বিশের কোঠায়ও দীর্ঘকাল ধরে দ্বিধা ছিল প্রবল। য়ুরোপীয় গণতন্ত্রের কথা এঁরা ভাবছেন কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার দাবিটি তুলে ধরতে পারছেন না উচ্চকণ্ঠে।

একালের ভারতবাসীর কাছে হেমচন্দ্রের কবিপ্রাণের এই দৃপ্ত আহ্বান স্পষ্ট এবং উত্তেজক।

> আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষুমেলি,
> দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
> কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতুহলী,
>   বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।
> ...   .
> বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
> শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
> সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
> সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
>   ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?
>
> [ভারত-সঙ্গীত]

কবিকে এই তীব্রতার চারপাশে একটি আবরণ টানতে হয়েছে শিবাজীর সমকালীন চারণ মাধবাচার্যের প্রসঙ্গ নিয়ে এসে। কবিতার ভূমিকাটি অবশ্য আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি। তা যে সরকারী বিরূপতা প্রতিরোধ করবার একটি একান্ত বহিরঙ্গ চেষ্টা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু বাইরেই ছিল না এই প্রতিবন্ধক। কবির অন্তরেও ছিল। সে বিষয়ে হেমচন্দ্র একক নন।

মধুসূদন জাতীয় পরাধীনতা ও দীনতায়, সর্বব্যাপী দুর্দশায় বেদনার্ত হয়ে লিখেছিলেন,

> 'The Hindu, as he stands before you, is a fallen being—once—a green, a beautiful, a tall, a

majestical, a flowering tree ; now blasted by lighting !'

[The Anglo Saxon and the Hindu]

এবং এই পরাভূত অবদমিত জাতির উন্নয়ন যে ইংরেজ সংস্কৃতির হাতে সেকথা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন উক্ত রচনার সমাপ্তিতে।

'It is the glorious mission, I repeat, of the Anglo Saxon to renovate, to regenerate, or in one word to Christianize the Hindu.'

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির কথাই কবি বলতে চেয়েছেন। হিন্দুকে খ্রীষ্টান করার প্রস্তাবটি নেহাৎই বহিরঙ্গ।

ইংরেজদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা থেকে তাদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক দমননীতিকে পৃথক করে দেখতে পারেন নি সেকালের চিন্তানায়কেরা। তাছাড়া মধ্যযুগীয় নবাবী ব্যবস্থায় ফিরে যাবার ভয় ছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য এবং মূল অর্থনৈতিক সমুন্নয়নের ভাবনা তাই স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারে নি অধিকাংশের ভাবনায়। কেউ ইংরেজকে 'বড়' আর 'ছোট' বলে পৃথক করে দেখে নিশ্চিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এর সমাপ্তি অংশের কথা মনে পড়বে।

'সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না। আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!'

চিকিৎসক বলিলেন, 'সত্যানন্দ, কাতর হইও না।...ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।...ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, 'শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।'

উদ্ধৃতাংশে সত্যানন্দ ও মহাপুরুষের মধ্যে চিন্তার যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে তাতে মোটামুটিভাবে সমকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশ চিন্তার দ্বিধা প্রতিফলিত।

হেমচন্দ্রও তাই 'ভারত-সঙ্গীত'-এর মত কবিতার পাশে পাশে 'ভারত ভিক্ষা', 'ভারতবিলাপ'-এর গ্লানিজর্জর স্তুতিবাদে আত্মসমর্পণ করেছেন।

যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়,
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—
সেই ব্রিটনের রাজকুলচূড়া
কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আঁখি
ভারতবাসীরা দাঁড়ায় পথে।

'নেভার নেভার' কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে হলেও কবি বিদ্ধ করেছিলেন বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী শোষক মনোভাবের প্রকৃত স্বরূপ। তাঁর সে ধিক্কারের ভাষা ছিল অত্যন্ত তীব্র।

চিরশিক্ষা ব্রিটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাব—টুট টুট টুট॥…
স্পষ্ট কথা বলা ভাল বিঘ্ন বড় ভারি,
'মিলচ কাউ' ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি॥

এই কবি যখন এসিয়বাসীর উপরে ইংরেজের বিজয় দেখে বিগলিত হন, অথবা দুর্ভিক্ষকালীন সরকারী দাক্ষিণ্যে অত্যুৎসাহী হয়ে 'ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার' লিখে ফেলেন তখন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মনের দ্বিধা কত ব্যাপক ছিল অনুভব করা যায়।

'স্বদেশ' শীর্ষক কবিতায় জন্মভূমির দিকে বাঙালিকে মুখ ফেরাতে আহ্বান জানিয়েছেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত। বাংলা ভাষায় এই আমন্ত্রণ নূতন। কবি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধতার কথা বলেন নি। কিন্তু বাঙালির মন স্বজাতি এবং স্বদেশের দিকে ফেরাতে চেয়েছেন। তাদের পরজাতি-পরদেশের প্রতি আসক্তিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-বিদ্ধ করেছেন। কবির ভাষায় আন্তরিকতার উত্তাপ আছে। যদিও তা প্রবল ও গভীর হয়ে আবেগে রূপান্তরিত হয় নি। অনেকটা বিবৃতিধর্মী এই কবিতার শিল্পগুণ বেশি নয়, যতটা মনে রাখবার মত এর সামাজিক-ঐতিহাসিক মূল্য।

মধুসূদনের 'বঙ্গভূমির প্রতি'তে স্বদেশপ্রেম ব্যক্তিক উপলব্ধিতে ঘনীভূত হয়ে রূপ ধারণ করেছে। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রাণ কবিতাগুলির চেয়ে এদের দূরত্ব অনেক। তাঁর সনেটেও দেশপ্রেম একটি মুখ্য সুর। কিন্তু তা হেমচন্দ্রের ন্যায় ততখানি সংগ্রামক্ষুব্ধ নয়। পরাধীনতার বেদনা-বোধ সেখানেও কম নয়, কিন্তু বিদেশি শাসনের অবসান কর্তব্য কিনা এ জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কবি কোনোদিনই ভাবিত হন নি। দেশের পরাধীনতার কথা বলতে

গিয়েও মধুসূদন বর্ণাঢ্য রূপসৃষ্টির কবিজনোচিত দায়িত্বই পালন করেছেন। যেমন দেশের স্বাধীনতা চ্যুতির কারণ যে তার অতুল ঐশ্বর্য একথা বিবৃতি-বক্তৃতার আকারে নয় বেদনাদ্রব রূপধ্যানের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

কেনা লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে ব'লে ?
হায় লো ভারত-ভূমি। বৃথা স্বর্ণজলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি।

মধুসূদনের এই স্বদেশভক্তির পেছনে কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চেতনা ক্রীড়াশীল নয়। এখানে হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বড় রকমের পার্থক্য। দেশকে মধুসূদন ভালোবেসেছেন দেশের ভাষাকে ভালোবেসে। এ প্রেম কবিপ্রাণের উৎসেই জন্মেছে। স্বদেশ-প্রকৃতির রূপসম্ভোগে তা স্পষ্ট ও বাস্তব হয়ে উঠেছে। কবির আত্মপরিচিতি তাই দেশের সৌন্দর্য-বর্ণনায় মুখর।

যে-দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ মণ্ডলে
(তুষারে বাপিত বাস উর্ধ্ব কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ-দরপণ !) হেরি ভীষণ মূরতি ,—
যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত কাননে,
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-স্বপনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী।

হেমচন্দ্র স্বদেশের সেখানে পরিচয় দিতে গিয়ে বীরত্বোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের তথ্যমন্থন করেছেন।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারত ভূমি যবনের দাস,
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা !

আর্য্যাবর্ত্ত জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।"

বঙ্কিমের স্বদেশমন্ত্র জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর সর্ব প্রধান ধর্মোৎসবকে একাত্ম করে জন্মভূমির একটি মাতৃমূর্তি গড়ে তুলেছে।

'...সুবর্ণ মণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা! হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্ন-মণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য-সিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।'

[কমলাকান্ত]

বঙ্কিমের কল্পনায় ধৃত স্বদেশের জননীমূর্তি বাঙালির ধর্ম-ভাবনা, ঐতিহ্য চেতনাকে তৃপ্ত করে জাতীয় উপলব্ধিতে চিরস্থায়ী সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হেমচন্দ্রের কবিতায়ও স্বদেশের একটি রমণীমূর্তি বার বার উঁকি দিয়েছে।

আগে ছিল রাণী ধরা রাজধানী
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা।

বঙ্কিমের কমলাকান্ত প্রকাশের আগেই এক ভাগ্যাহতা রমণীরূপে কবি স্বদেশকে কল্পনা করেছেন। কিন্তু সে ভাবনায় ব্যাপ্তি বা গভীরতার অভাব। তুলনায় নবীনচন্দ্র যখন অশোকবনে বন্দিনী সীতার মধ্যে দেশজননীর খোঁজ পান, 'তুমিই অশোকবনে সীতাবিষাদিনী' তখন কবির সাদৃশ্য আবিষ্কারের অভিনবত্বে চমক লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাৎপর্যও অনুভব করা যায়।

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা কাব্যবিচারে প্রায়ই উত্তীর্ণ নয়। বক্তৃতার উদ্দীপনা আছে, তাই আছে জনচিত্তজয়ের সুযোগ। কিন্তু নেই

ভাবাবেগের চিত্ররূপসিদ্ধি। নবীনচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা যেমন রূপবদ্ধ হয়েছে,

না পার,—বসিয়া এ মহাশ্মশানে
বিংশতি কোটিক শবের উপর,
উগ্র উদ্দীপনা—মহাসুরা-পানে,
সাধ মহামন্ত্র অভয় অন্তর।
[শব-সাধন]

হেমচন্দ্রে প্রায়ই তেমন ঘটেনি। তিনি বরং ইতিহাস পুরাণ মন্থন করে নামের মালা চয়ন করেছেন। তথ্যপুঞ্জে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা :

লুটাইল 'আসমান' রুসিয়ার চরণে।
লুটাইল 'জুলুরাজ' পশুরাজ-বিক্রমে···
ঘুচাইয়া বন্যজাতি 'আফ্রিকে'র বিভ্রমে !
লুটে 'ওলন্দাজ' পায় এখনও 'জাভা'য়।
[ইউরোপ এবং আসিয়া]

ম্যারাথন, থার্ম্মপলি হয়েছে শ্মশানস্থলী,
গিরীস আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি,
[পদ্মের মৃণাল]

জ্ঞানচর্চাও স্বাদু হয়ে উঠতে পারে—সেজন্য চাই তথ্যের রসরূপে রূপান্তর। অথবা ভাষায় মননের ঔজ্জ্বল্য সঞ্চার। হেমচন্দ্রে তা নেই। তথ্য তাই কাব্যসাফল্যে সাহায্য করে নি।

চার

হেমচন্দ্রের কবিতায় স্বদেশপ্রেমের দুই ভাব। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং সমাজ ভাবনা। প্রকাশের দুই স্বতন্ত্র রীতি—দুই ভিন্ন সুর। গম্ভীর, উত্তেজক এবং লঘু হাস্যোদ্দীপক। অর্থাৎ কবির শিল্প-চেতনার যে উৎসে স্বদেশ ও সমাজ বিষয়ক কবিতাগুলির জন্ম, ব্যঙ্গ কবিতার উদ্ভবও সেখান থেকেই। বিষয় এক, দৃষ্টি কোণ ভিন্ন, রস ভিন্ন।

ব্যঙ্গদৃষ্টিতে হেমচন্দ্রের অধিকার ছিল। তার প্রমাণ এই কবিতাগুলির সাফল্যে। কবির লেখায় খাঁটি আবেগ—খাঁটি সৌন্দর্যমূলক কল্পনার অভাব লক্ষ্য করা যায়। আবেগের স্রোতে যে চিত্ত ভাসমান নয়, কৌতুকের সত্য তাঁরই আয়ত্তে। সৌন্দর্যের বর্ণসজ্জা যাঁকে আচ্ছন্ন করে নি তাঁর ব্যঙ্গদৃষ্টিতেই বিদ্ধ বস্তুর ভগ্নজীর্ণ বাস্তবর্ত।

হেমচন্দ্রের অন্যান্য রচনায় যে অভাব সাফল্যের পরিপন্থী এ-জাতের কবিতায় তা-ই রসসিদ্ধির কারণ।

আধুনিক বাংলা ব্যঙ্গকবিতার গুরু ঈশ্বর গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ সর্বত্র প্রসারিত। তপসে মাছ, আনারস, পাঁঠা, পৌষপার্বণ প্রসঙ্গে যে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন কবি তার ভিত্তিতে আছে বাংলার গ্রাম্য রঙ্গরস—চণ্ডীমণ্ডপ-বটতলা -পুকুরের বাঁধানো ঘাটের আসরে প্রচলিত প্রবাদ-মন্তব্য, গালগল্প, রসিকতা। কবি ভাষায় শ্লেষযমকের চমক লাগিয়ে তাকে আধুনিক রুচির উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের অন্য এক শ্রেণীর কবিতায় অবশ্য ইংরেজ সভ্যতার সংস্পর্শজাত ভারসাম্যচ্যুতিই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে আহত হয়েছে।

যত দুধের শিশু, ভোজে ঈশু,
ডুবে মোলো ডবের টবে।
আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ীগুলো, তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন 'এ', 'বি', শিখে বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে॥

কোম্পানীর হাত থেকে ভিক্টোরিয়ার রাজ্যভার গ্রহণ প্রসঙ্গে কবির রাজনৈতিক ব্যঙ্গের ('তুমি মা কল্পতরু, আমরা তোমার পোষা গরু') কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

ব্যঙ্গকবি হেমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের সচেতন শিষ্য। অবশ্য পুরাতন গ্রাম্য রসিকতার সঙ্গে গুরুর যে সম্পর্ক ছিল, শিষ্যে তা সম্পূর্ণই লুপ্ত হয়েছে। হেমচন্দ্র সম্পূর্ণই নাগরিক। সমাজভাবনার নানাদিক, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, মিউনিসিপাল ভোট, দেশলাইয়ের প্রচলন, যুবরাজের বঙ্গজেনানা দর্শন প্রভৃতি সাময়িক নানা বিষয় তাঁর আক্রমণের ও কৌতুকের অবলম্বন রূপে গৃহীত।

হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ মাঝে মাঝে আক্রমণে শাণিত। ইংরেজ শাসকদের হিন্দু প্রীতি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

লাথি কিল পটাপট, জুতো চড় চটাচট্,
'লিভর' পীলে ফটাফট আপনি যেতো ফেটে।
আমরাই করুণায় মলম মাখায়ে গায়
রাখিতাম কোলে করে হিন্দুর সন্তানে।
সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের বাগানে!

এদেশি রাজনীতিবিদদের আস্ফালনে কবির মন্তব্য:

পরের অধীন দাসের জাতি 'নেসন্' আবার তারা?
তাদের আবার 'এজিটেসন্'—নরুন উঁচু করা!

কোথাও ব্যক্তিগত কটাক্ষ প্রত্যক্ষ ও তীব্র হয়ে উঠেছে ভাগ্য-তৈরীর নেশামত্ত জনৈক মুখুজ্জেকে* লক্ষ্য করে :

বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন।
বিষ্ণুপুরে মিন্সের দেখ বড়ে টেপার গুণ ॥
ছি! রাজেন্দ্র! কাল কাটালে পুঁথি ঘেটে ঘেটে।
শেষে আইনপেসার পেন্নারিতে মান্‌টা গেল ঘেটে ॥
ধন্য হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপ্টা দরে মাৎ করিলে খেতাব 'সি. এস. আই' ॥

এ কবিতায় ব্যক্তিগত আঘাত বড় কম ছিল না। কিন্তু সতর্ক পাঠক অনুভব করবেন এ কবিতার অঙ্গুলি সঙ্কেত সর্বকালের সুবিধাবাদী, শক্তিমানের পদলেহী, আত্মমর্যাদাহীন মানুষদের দিকে প্রসারিত।

হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গকবিতা চিত্রময়। চিত্রময় বাণীর অভাবে স্বদেশ বিষয়ে লেখা গম্ভীর কবিতাগুলি কবিতা হিসেবে হয়েছিল অনেকটা ব্যর্থ। এখানে ব্যঙ্গবক্র চিত্ররচনার নৈপুণ্যে কবিতা হয়েছে উপভোগ্য। এ প্রসঙ্গে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র কথা মনে পড়বে। ব্যঙ্গের তুলিতে আঁকা ছবির সে-এক মিছিল। ভাষার গুণে এবং গ্রন্থন কৌশলে চিত্র হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্র। এর সুপ্রচুর নিদর্শন আছে 'সাবাস হুজুক আজব সহর' এবং 'বাজিমাৎ' কবিতায়।

মিউনিসিপাল ভোটরঙ্গ জমে উঠেছে প্রথম কবিতায়। ভোটের ব্যাপার ব্যঙ্গরসিকদের সমভাবে আকর্ষণ করেছে সেকালেও। কারণ এখানে খ্যাতির নেশায় মত্ত হয়ে মনের ভারসাম্য হারাবার উদাহরণ মেলে ভূরি ভূরি। বিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে আদর্শ ও নীতির বালাই থাকে না একেবারেই। জনমনরঞ্জনের স্থূল চেষ্টা হাস্যকর হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গরসিক এর সুযোগ গ্রহণ করেন। আলোচ্য কবিতায় ভোরবেলা ভোটারদের নানা শ্রেণীর সাজসজ্জা এবং প্রস্তুতির কয়েকটি স্বতন্ত্র এবং সূত্রবদ্ধ দ্রুত চলমান ছবি। সময়মত ভোট দিতে না গেলে সাহেব শাসকেরা 'চাবুকে করিবে লাল সদা প্রাণে ভয়', তাই 'পরিবার পুত্রকন্যা হাহাকার করে'।

ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের মধ্যে তুমুল কোলাহল আর বিশৃঙ্খলা চলছে :

কেঁদে বলে হুঁসিয়র ভোটর সে কোনো।
ছেড়ে দেও 'দণ্ডবিধি' কাণ্ড কি তা শোনো ॥
ঘরে আছে পাঁচটি ছেলে, একা রোজগারী।
আমার ওপর বিনি দোষে 'পত্তর' কেন জারি ?

তারপরে পোষাক, টুপি, ঘড়ির চেন দেখে মেম্বর বাছাই। ভোটশেষে কবির ব্যঙ্গদৃষ্টি অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে। ভোটার্থীদের পত্নীকুলে চলছে প্রচণ্ড কলহ।

*'বাজিমাৎ' কবিতা রচনার ইতিহাস বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে।

মধ্যযুগ থেকে বাঙালি কবিরা নারীকোন্দলের কৌতুক-চিত্র রচনায় নৈপুণ্যে প্রতিষ্ঠিত। নূতন প্রসঙ্গে নূতন ভাষায় হেমচন্দ্র সেই পুরাতন ধারায় অভিনবত্ব এনেছেন। দুই রমণীর সংলাপ উদ্ধৃত হল। সদস্য নির্বাচন প্রসঙ্গে তাদের যুক্তিক্রম এবং যোগ্যতা বিচার উপহাসের উচ্চহাস্যের বিষয় হয়েছে। ছাতবিহারিণী জনৈকার উক্তি :

মেগের হাতে র্যাঁড়া কুলি, পেগের বড়াই খালি।
বাগীচা, বাগান, বোট, নাই একটি মালী ॥
সে আবার হইতে চায় ভোটের মেম্বার।
পোড়া কপাল, কালামুখ, ধিক্ ধিক্ ছার ॥

উলেনধারিণী অপরার প্রত্যুক্তি :

কড়িতে কি যোটে মান, বড়িতে খিচুড়ি।
গুড়েতে কি খাজা হয়, এক আঙ্গুলে তুড়ি ॥
আঙ্গটি, ঘড়ির চেন, বানরে কি সাজে।
আমার ভাতার হলে, আমি পালাতেম লাজে ॥
হরপের এক অক্ষর যার ঘটে নাই।
সে হবে মেম্বার তার মেগের মুখে ছাই ॥

'বাজিমাৎ' কবিতার শেষাংশেও রমণীকুলে প্রবেশ করে কবি আরও সার্থক হয়েছেন। কবিতার পূর্বার্ধে তীক্ষ্ণ আক্রমণ উত্তরার্ধে ব্যঙ্গকে স্পর্শ করে রঙ্গরস প্রগল্ভ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও কবি মধ্যযুগীয় একটি বিশেষ রূপরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এ নারীদের পতিনিন্দার মাধ্যমে সমাজব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতচন্দ্র-ভক্ত হেমচন্দ্র পুরাতন ভঙ্গিকে যুগোপযোগী করে ব্যবহার করেছেন।

রাজপুত্রকে অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ জানিয়ে উকিল মুখুজ্জে ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত পাকা করেছে। মুখুজ্জে-গিন্নি দেশজোড়া আলোচনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। নগরবাসী গৃহিনীকুল ঈর্ষার জ্বালায় পতিদের গঞ্জনা দিচ্ছে। এই গঞ্জনায় সমাজ প্রধানদের ইংরেজসেবা এবং বিলাস-ব্যসনের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে। নারীসমাজের প্রতিও কবির উপহাস জ্বলে উঠেছে। জজিয়াতিটা খাস বিলায়েতি পদ হলেও শুধু নামেই অনারেবল, জজগিন্নি আজ তা বুঝে নিয়েছে। না হলে 'তোমার কোর্টের উকিল তোমাকে হারায়।' জমিদারপত্নীর মন্তব্য, সাটিনের সাজে, ফেটিন হাঁকিয়ে, লবিতে ঘুরে ঘুরে 'ক্লাইব লাটের আমল থেকে পেসা খোসামুদি' সত্ত্বেও যে পুরুষ কাজ গুছাতে পারে না, 'এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি।' শিক্ষিতা রমণীর অভিমান, মূর্খ মুখুজ্জেগিন্নির হলুদ মাখা হাতের কাছে 'সাতপুরুষে সভ্য মোরা হলাম গুদামজাৎ।'

পড়তে পারি, বলতে পারি,—ইংরাজী ভাষায়।
পিয়ানো বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায় ॥

'এনলাইটেন' সবার আগে কর্ত্তা বিলেত যান।
তোমার গুণে গুণমণি হারালে সে মান॥
পায়ে বুট, জোব্বা গায়ে গলায় সোনার চেন।
তকমাওয়ালা আরদালিতে হয়না শুধু 'ফেম'॥
বাপ পিতামোর নামে খালি হয় নাকো রাজভেট।
'টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট্ চাই ষ্ট্রেট্'॥

হেমচন্দ্র মধ্যযুগীয় রীতিকে আপন প্রয়োজনে সুব্যবহার করেছেন। ব্যঙ্গ চিত্ররচনায় তথা গ্রন্থন-নৈপুণ্যে উল্লেখ্য সাফল্য দেখিয়েছেন।

অবশ্য গ্রন্থনে 'ভারত উদ্ধার'-এর (১৮৭৭) কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈপুণ্য বোধ হয় আরও বেশি। নব্যরীতির মহাকাব্যের আঙ্গিকে তিনি চার সর্গে একটি গোটা ব্যঙ্গকাব্য লিখেছিলেন। নকল বীররস এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্যারোডিতে সেখানে জমে উঠেছে কৌতুক রস। হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আঙ্গিক সাধনায় এবং রসাবেদনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে।

আঙ্গিকে হেমচন্দ্র বৈচিত্র্যমুখি। নকসাধর্মী চলচ্চিত্রের পাশে তাই বসেছে রণদামামাসহ মার্চ-সঙ্গীতের ঢঙে লেখা 'নেভার নেভার', অথবা দেবস্তোত্র রচনার ছলনা ('দেশলাই-এর স্তব')।

দেশলাইয়ের স্তবে বিষয় এবং ভঙ্গির বিরুদ্ধতা-জনিত সংঘর্ষে আছে কৌতুকের চমক। ইংরেজ স্তোত্র, গর্দভস্তব প্রভৃতি প্রসঙ্গে বঙ্কিম এ-জাতীয় আঙ্গিকের চর্চা করেছিলেন 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) বইয়ে। সংস্কৃত দেবস্তোত্রের প্রশংসাত্মক ভঙ্গিতে তীব্র নিন্দাই লেখকের লক্ষ্য ছিল। সেখানে তীক্ষ্ণ আক্রমণের রস কিঞ্চিৎ বক্রভাবে প্রকাশ পেয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের কবিতায় অবশ্য বিশুদ্ধ কৌতুকই লক্ষ্য। বিষয় আধুনিক এবং একান্ত বাস্তব, ভঙ্গি প্রাচীন এবং আধ্যাত্মিক। রূপ ও ভাবের বৈপরীত্যে হাস্যরস এখানে ঘনীভূত।

ব্যঙ্গকবিতার ভাষা হেমচন্দ্রের সচেতন সাধনার বস্তু। তাঁর ভাবগম্ভীর কবিতায় ভাষা প্রায়ই তরল এবং শিথিল। কিন্তু ব্যঙ্গকবিতার ভাষা ধনুকের ছিলার মত টান করে বাঁধা, কখনও শাণিত তীরসন্ধানে অব্যর্থ, কখনও শুধু টঙ্কার শব্দে চমকে দিতে উদ্যত।

তাঁর ভাষায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার সুপ্রচুর। ঈশ্বর গুপ্তের কিছু কবিতায় এই পদ্ধতি প্রথম প্রযুক্ত হলেও, হেমচন্দ্রে এ-জাতীয় শব্দ বহুল প্রযুক্ত। এদের সাহায্যে একটি লঘু পরিবেশ বজায় রাখতে চেয়েছেন কবি। ইংরেজি-বাংলা শব্দের মিশ্রণ ব্যাপারটিই পাঠকের কাছে কৌতুকবহ। মাঝে মাঝে এর দ্বারা ব্যঙ্গের আঘাত তীক্ষ্ণতর করা হয়েছে। অনেক ফার্সি শব্দও এদের

সঙ্গে এসে মিলেছে। ভিন্নজাতের শব্দ মিলিয়ে ধ্বনিসাম্য বাজিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন—

"মিষ্টি কথা—'মিষ্টিরি' তলায়।"
"রাষ্ট্র জুড়ে 'ফাষ্ট' খ্যাতি।"
"এক বাহাদুর 'হুক্কে' ভারী 'বক্ষ' ফাঁপা পেট।"
"দানাদার দাতা।"
"অম্বল থেকে 'অনারেবল'।"

কোথাও শব্দের নির্বাচনে ও বয়নে ব্যঙ্গের আঘাত। যেমন—

"নবাব নমুদ আলী, খানসামা গোলাম।"
"ঘড়েল সাবুই বাগ্।"
"ডিপুটি নফর বক্স।"

কখনও আবার দেশি বা বিদেশি শব্দকে সংস্কৃতরীতিতে সমাসবদ্ধ করে তোলা। যেমন—

"নমামি ফরফরশব্দ 'ফস্ফর'-বেষ্টন।"
"র‍্যাফেল'-বধা ছবিগুলি ঘরে দোরে সাঁটা!"
"ডাকিল 'বৃটিশ'-বৃষ গাঁক্-গাঁক্ ডাক।"

উপমাদি প্রয়োগেও কবির ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। আপাত অসম্ভব প্রসঙ্গকে তুলনার সূত্রে বেঁধেছেন কবি। বাঙালির পোলিটিকল এজিটেসনকে বলেছেন নরুন-উঁচানো, দেশলাইকে বলেছেন মাথায় শালের বিড়ে খাটি একহারা চেহারার ডেপুটি। বৃটিশকে বৃষ, ভারতকে মিল্চ কাউ। শব্দের সার্থক বক্র প্রয়োগে উপমাসৃষ্টি হাস্যের কারণ হয়ে উঠেছে।

মোট কথা ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় হেমচন্দ্রের সাফল্য উচ্চস্তরের। মামুলির গণ্ডিতে তাকে ফেলা যায় না।

পাঁচ

বাংলা ভাষার আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার বহুল প্রচলন হবার আগে এক ধরনের চিন্তামুখ্য কবিতা দেখা যেত। নীতিকবিতার সঙ্গে এদের কিছুটা মিল আছে। অনেকটা অমিলও। নীতিকবিতায় উপদেশটি প্রত্যক্ষ, বিষয়টি সর্বপরিচিত, অন্তত সর্বগ্রাহ্য। রচনারীতি প্রচারমুখি। ছন্দের আশ্রয় গ্রহণই এদের কবিতা বলে পরিচিত হবার একমাত্র দাবি। চিন্তাপ্রধান কবিতায় কোনো প্রত্যক্ষ উপদেশদানের চেষ্টা নেই। এদের মধ্যে প্রকাশিত ভাবনাটি অনেকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফল। তাছাড়া বহিরঙ্গ যে-প্রসঙ্গ অবলম্বন ক'রে ভাবনাটি দেখা দেয় তা একান্ত মূল্যহীন নয়।

হেমচন্দ্রের কবিতাগুচ্ছে এ-জাতীয় রচনার সংখ্যা বড় কম নয়। তাদের বৈশিষ্ট্য এবং সাফল্যের পরিমাণ নিরূপণের আগে বলা দরকার কাব্যজগতে প্রথম স্তরের উৎকর্ষের দাবি এদের নেই।

এ ধারার কবিতার মধ্যে 'পদ্মের মৃণাল' সেকালে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল। কবিতাটি কিন্তু শিল্পসফল নয়। সরোবরে পদ্মের মৃণাল হাওয়ার বেগে ডুবছে এবং ভাসছে। দেখে কবির মনে শোকের বেগ কল্লোলিত হল। কবি বিশ্বইতিহাস মন্থন করে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের তালিকাপ্রণয়ন করলেন। রাজনৈতিক কবিতায় যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, ঐতিহাসিক তথ্যচয়নে যে আগ্রহ দেখা গিয়েছে, পদ্মের মৃণাল অনেকটা তার সমগোত্রের। মানবসভ্যতায় কোনো গৌরবই চিরস্থায়ি নয়। কবিতার এই বাণী বইয়ে পড়া পুরানো কথা; ব্যক্তিপ্রজ্ঞায় কবি একে আবিষ্কার করেন নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উত্তাপ লাগে নি এ ভাবনায়। তাছাড়া বহিরঙ্গ প্রসঙ্গ, পদ্মের মৃণালটি নেহাৎই উপলক্ষ্য। তার রূপ কবির মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। এর বস্তুরূপের বর্ণনা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি কবিতার মূলভাবনার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত।

'লজ্জাবতী লতা'র দিকে কবির চোখ পড়েছিল। কিন্তু তাও এর কমনীয় সৌন্দর্যের জন্ম নয়। কবি শেষ পর্যন্ত নীতি কথা শোনাতে চেয়েছেন। লজ্জাবতী লতার মত 'সদা সঙ্কুচিত প্রাণ রমণী পুরুষগণে কে করে যতন?' কবির এই প্রশ্ন কোনরূপ ন্যায্য ও স্বাভাবিক অধিকার ছাড়াই সহজ নিসর্গবর্ণনার দেহলগ্ন হয়ে বিরাজ করছে। পদ্মের মৃণালের তুলনায় লজ্জাবতী লতাটি কিছু গুরুত্ব পেয়েছে কবিতায়। কিন্তু প্রধান হয়ে ওঠে নি। একটি জীবন-ভাবনার বা ঐতিহাসিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে নিসর্গবর্ণনার যেন কিছু মূল্য নেই।

মানবজীবন, সুখদুঃখ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা হেমচন্দ্রের অন্যান্য কাব্যেও মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে। 'জীবন মরীচিকা', 'জীবনসঙ্গীত', 'পরশমণি' এই শ্রেণীর রচনা। যৌবনের দৃষ্টিতে যে পৃথিবী রঙিন মনে হয়, তা যে মনের রচনা, কঠিনতর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ তা বুঝতে পারে। বার্ধক্যে আশার অবসানে জীবন একটা মরীচিকা বলেই মনে হয়। এ কবিতাগুলি জীবনপ্রবাহের তীরে দাঁড়িয়ে ভাবুক দর্শকের উক্তি। ব্যক্তিগত উপলব্ধির আর্তনাদ এর মধ্য দিয়ে শোনা যায় নি বলেই এ কবিতা গীতিকবিতা হয়ে ওঠে নি। এই হতাশার অন্ধকার থেকে মানবকে আশা-উজ্জ্বল কর্মের মধ্যে জাগ্রত করবার আহ্বানও ('বলো না কাতর স্বরে') একান্তই বহির্মুখি। কবিতার আত্মকথন নয়। চন্দ্ররূপ 'পরশমণির' গুণকীর্তনও চিন্তাশীল ব্যক্তির নিরুত্তাপ জীবনচিন্তা মাত্র।

রচনাগুলি কবিতা হিসেবে অকিঞ্চিৎকর। শুষ্ক বিবৃতি মাঝে মাঝে উপমাদির আশ্রয়ে রূপে ধরা দিতে চেয়েছে। কিন্তু রূপে-ভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়ে উঠে নি। উঠবার সম্ভাবনাও ছিল না। এসব কবিতার উৎসে তাঁর চিন্তাবিদ্ বস্তুমুখি মন যতটা সক্রিয় ছিল, ভাবগুম্ভিত রূপচেতন কবিচিত্তের স্পন্দন ততটা অনুভূত হয় নি।

কিন্তু প্রকৃতি-প্রসঙ্গে এবং জীবন-আশ্রয়ে লেখা এই সব কবিতার মূল্য আছে হেমচন্দ্রের লিরিকপ্রাণতার ক্রমবিকাশের স্তর নির্দেশক হিসেবে। এই বস্তুকেন্দ্রিক ভাবনা ক্রমে আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে। সর্বব্যাপী চিন্তা আত্মগত হয়ে উঠেছে। নিরুত্তাপ তটস্থ দর্শক স্রোতে ভেসেছেন। অলোড়িত হয়েছেন। যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছেন।

ছয়

গীতিকবিতা লেখায় হেমচন্দ্র ক্রমে আগ্রহ অনুভব করলেন। বস্তুমুখি রচনা আত্মমুখি হয়ে উঠল। ভাবনার স্থানে ব্যক্তিগত ভাবব্যাকুলতা দেখা দিল। অবশ্য বিহারীলালের যুগে এদের গীতিকবিতা হিসেবে অনেকেই মেনে নিতে সঙ্কোচ বোধ করবেন। হেমচন্দ্রের এইসব কবিতার মধ্যে আত্মকথন আছে। কিন্তু আপন কবি-আত্মার কল্পমূর্তির দ্বারা বিশ্বগ্রাসের সাধনা নেই। বিহারীলালের সারদা হৃদয়পদ্মে স্থিতা এবং বিশ্বময়ী। বিহারীলালের মাহাত্ম্য এই সাধনায় হলেও তা ব্যর্থ সাধন। হেমচন্দ্রের গীতিভাবনায় এমন নিগূঢ় উপলব্ধি নেই। আপনার ব্যক্তিত্বকে এবং নিখিলকে একই কান্তিতে বিদ্ধ করার চেষ্টা নেই। বিহারীলাল গীতিচেতনার সাহায্যে বিশ্বরহস্য বুঝতে চেয়েছেন, ভাব-রূপ, জীবন-মৃত্যু, প্রকৃতি-মানুষ সব কিছু মিলিয়ে সামগ্রিক ব্যক্তিবোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। হেমচন্দ্রের গীতিবোধে এই সমগ্রতা নেই। তার কোনো বিশিষ্ট গীতিদর্শন (lyric philosophy) নেই। কারণ তিনি শুধু গীতিকবি নন। কাব্যসাহিত্যে তাঁর নানামুখি পরীক্ষার একটি ধারাই মাত্র গীতিধর্মী হয়ে উঠেছে।

হেমচন্দ্রে আত্মগত উপলব্ধি বস্তুর সঙ্গে সন্ধি করেছে। বিহারীলাল বস্তুকে জয় করতে চেয়েছেন। বিহারীলাল অনির্বচনীয় রহস্যলোকে তাঁর দূরযানী কল্পনাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কেন তার বেদনা, কি তাঁর কামনা কবি কি তা নিজেই জানেন? না-জানার ব্যাকুলতাই এ-কবিতার মুখ্য সুর। হেমচন্দ্রের বেদনা-কামনা সবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। বরং মধুসূদনের 'আশার ছলনে ভুলি' এবং 'রেখো মা দাসেরে মনে'—কবিতাদুটির সঙ্গে গীতিধর্মের দিক থেকে হেমচন্দ্রের এ-জাতীয় কবিতার সাদৃশ্য আছে, যদিও ভাষারূপে নেই সদৃশ সফলতা।

'পদ্মফুল', 'যমুনাতটে', 'অশোকতরু', 'কোন একটি পাখীর প্রতি' প্রভৃতি প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা 'পদ্মের মৃণাল', 'লজ্জাবতী লতা' থেকে মূলে পৃথক। হেমচন্দ্র প্রথমোক্ত কবিতাগুলিতে নিসর্গ প্রসঙ্গে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। শেষোক্ত দুটি কবিতায় অবলম্বিত বিষয়টি বহিরঙ্গ। কবি এদের রূপে বশীভূত হন নি। এদের আশ্রয় করে ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। কবিতা হিসেবে এরা দুই স্বতন্ত্র রাজ্যের।

প্রকৃতি-বিষয়ে কবির কোনো ঘনীভূত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় নি। তবে যুগপ্রভাবে তাঁর মনেও প্রশ্ন জেগেছে:

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায়?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায়?
কেন বা উৎসবে মাতি
থাকি কভু দিবারাতি
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায়?
[যমুনা তটে]

কিন্তু কোথাও তা গভীর ও একাগ্র হয়ে ওঠে নি।

কবির মন মাঝে মাঝে সৌন্দর্যস্বপ্নে মগ্ন হয়েছে। শব্দচিত্রে তার প্রমাণ আছে। যেমন—

এক। কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে
পত্রদলে শতদল।
[পদ্মফুল]

'থরে' শব্দ এবং 'ল' ধ্বনির পুনরুক্তিতে কোমলতা ব্যঞ্জিত হয়েছে।

দুই। —আমিই পাগল
আমিই একা কি মত্ত পিয়ে ও গরল
ওরে উন্মাদক পদ্ম?
[পদ্মফুল]

কবিচিত্তের রূপমত্ততা 'পাগল', 'গরল' প্রভৃতি শব্দে দ্যোতিত হয়েছে।

তিন। তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী
শান্ত নিশানাথ জ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশান্ত নদীর তট, পর্ব্বত-উপরি…
[যমুনা তটে]

চিত্রকল্পনায় শান্ত বিষাদ ঘেরা নির্জনতা প্রকাশ পেয়েছে।

চার।　　　　　　পুষ্পগুচ্ছ থরে থরে

　　　　　… … …

　　　　　সিন্দুরের ঝারা যেন বিটপী উপরে।

　　　　　　　　　　[অশোকতরু]

উপমা প্রয়োগে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে শব্দচিত্র।

পাঁচ।　তলদেশে মখমল,　তৃণ করে ঢল ঢল।

　　　　　　　　　　[অশোকতরু]

ভাষাবন্ধে রূপায়িত হয়েছে স্পর্শ সুখ।

অবশ্য একান্ত প্রথানুগ মধ্যযুগসুলভ প্রকৃতি বর্ণনারও অভাব নেই।

প্রকৃতিতে প্রেমে সহজে মেশামেশি কয়েকটি কবিতায়। নিগূঢ় কল্পনার ছায়াপাত নেই সেখানে, তবে কৃত্রিম বলে তাদের মনে হয় না। হেমচন্দ্রের প্রণয়-কবিতার প্রধান ত্রুটি, কবির হৃদয়ভাব প্রায়ই চিত্ররূপ হয়ে ওঠে নি। অনেকখানি ভাবতারল্য ঘনীভূত হয়ে একটুখানি রূপ হয়ে ওঠায়ই কবিতার সাফল্য *। প্রায়ই প্রেমকবিতা ভাবের আবেগে কম্পিত, উচ্ছ্বাসে তরল, ভাষা ব্যবহারে শিথিল।

হেমচন্দ্রের প্রেমের কবিতায় একটি বিষাদের সুর আছে। ক্বচিৎ তা উচ্চগ্রামে উঠেছে। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'তে অনেকগুলি প্রেমের কবিতা আছে। সেখানে 'প্যাসন'-এর প্রগল্‌ভ লীলা :

শর্ব্বরি! তোমার অঙ্কে চাপিয়া হৃদয়,
হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি,
মরিয়াছি, বাঁচিয়াছি,
দহিয়াছি, সহিয়াছি তীব্র জ্বালারাশি;
শর্ব্বরি! কহ না তুমি কেন ভালবাসি?

　　　　　　　　　　[কেন ভালবাসি]

অনুরূপ তীব্রতা ও জ্বালা নেই হেমচন্দ্রের প্রেমকবিতায়। তাঁর কবিতা অধিকাংশই বিরহমূলক। কোথাও কিন্তু ইন্দ্রিয়ভাবনার অসংযম দেখা যায় নি। অনুত্তেজিত মৃদু সুর, একান্ত সাংসারিক প্রসঙ্গের স্থূল উল্লেখ (যেমন, বিবাহ-পূর্ব প্রণয়ীর নিকট নায়িকার খেদোক্তি : 'বিধবা হয়েছি নাথ') এবং শব্দে ব্যঞ্জনাময়তার অভাব এদের বিশিষ্ট হয়ে উঠতে দেয় নি। প্রেম-বিরহের কবিতায়ও হেমচন্দ্রের মধ্যবিত্ত মন একেবারে দাঁড়ের পাখি। কামনার অসংযমে অথবা আকাশচারি কল্পনাপ্রাধান্যে শিকল কাটার চেষ্টাও তার নেই।

* বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ : প্রমথ চৌধুরী।

হেমচন্দ্রের শেষকাব্য 'চিত্তবিকাশ'-এ সঙ্কলিত হয়েছে কবির শেষ জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য-অন্ধত্ব-পীড়িত কয়েকটি কবিতা।

পূর্বে কবি 'পরশমণি' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তাতে সাধারণভাবে মানবজীবনে চোখের মূল্য সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞানগর্ভ কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য কাব্যে 'বিভু, কি দশা হবে আমার' প্রভৃতি বেশ কয়েকটি কবিতায় ঐ একই কথা বলেছেন। কিন্তু এবার কবি আর তটস্থ ভাবুক নন। অন্ধত্বের আঘাতে ক্ষতচিত্ত। তার আর্তনাদ চিত্তবিকাশে স্থান পেয়েছে। 'জীবন মরীচিকা' প্রভৃতি কবিতায় হেমচন্দ্র এককালে যৌবনাবসানে নৈরাশ্যের প্রসঙ্গ নিয়ে চিন্তামূলক মন্তব্য করেছিলেন। সর্বজনীন সত্যদর্শনের চেষ্টা করেছিলেন। বর্তমানে চিত্তবিকাশের বহু কবিতায় হেমচন্দ্র ব্যক্তিগত উপলব্ধির বীণায় বিলুপ্ত আশা, ভগ্নসুখ, অপগত যৌবন-বেদনার সুর বাজাতে চেয়েছেন। অবশ্য কবির ব্যথা প্রকাশ পেলেও প্রায়ই তা গান হয়ে ওঠে নি, শিল্পরসসিদ্ধি ঘটে নি।

চিত্তবিকাশের কবিতায় অন্ধকবি দর্শনযোগ্য সৌন্দর্যের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। বিশেষত চোখ হারিয়েছেন বলেই প্রজাপতির ডানায় খেয়ালি বিধাতার রঙের খেলার মানস স্বাদ পেতে চেয়েছেন। খদ্যোতের 'দৃষ্টি মনোলোভা' ক্ষুদ্ররূপের কথা ভেবেছেন।

কবির অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা স্মৃতিসুখে মগ্ন হতে চাইছে। কিন্তু ব্যথায় তীব্রতা নেই। বৃদ্ধ কবি ব্যথাতুর অতৃপ্ত হৃদয় নিয়ে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

বৃত্রসংহার

প্রথম খণ্ড : প্রথম সর্গ

বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,—
নিস্তব্ধ, বিমর্ষভাব, চিন্তিত, আকুল,
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘডম্বরে যথা অমানিশি।
যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে রসাতল, বিধ্বনিত সদা ;
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।
বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত,
মলিন নির্ব্বাণ-প্রায় কলেবর-জ্যোতিঃ
মলিন নির্ব্বাণ যথা সূর্য্য ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে ;
কিংবা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে
কুজ্ঝটি-মণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনু ,—
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে।
ব্যাকুল, বিমর্ষভাব, ব্যথিত অন্তর
অদিতি-নন্দনগণ রসাতল-পুরে,
স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্ব্বক্ষণ—
কিরূপে করিবে ধ্বংস দুর্জ্জয় অসুরে।
চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব,
ক্রমে দেববৃন্দ-মুখে বহে গাঢ় শ্বাস,—
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন বায়ুর উচ্ছ্বাস
বহে যুড়ি চারিদিক্ আলোড়ি সাগর।
সে অস্ফুট ধ্বনি ক্রমে পূরে রসাতল
ঢাকিয়া সিন্ধুর নাদ গভীর নিনাদে ;
দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস,
আন্দোলি পাতালপুরী, তীব্র
ঝড়বেগে।
দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়া তখন
কহিলা গম্ভীর স্বরে—শূন্যপথে যেন

একত্রে জীমূতবৃন্দ মন্দ্রিল শতেক—
মহাতেজে সুরবৃন্দে সম্ভাষি কহিলা :—
"জাগ্রত কি দানবারি সুরবৃন্দ আজ ?
জাগ্রত কি অস্বপন দৈত্যাহারী দেব ?
দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে ?
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন ?
হা ধিক ! হা ধিক্ দেব ! অদিতি-প্রসূত !
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দনুজের বাস !
নির্ব্বাসিত সুরগণ রসাতল-ধামে,
অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস।
দুর্ব্বিনীত, দেবদ্বেষী দনুজ-প্রবেশে
পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ,
অজর অমর শূর স্বর্গ-অধিকারী,
দেববৃন্দ স্বরভ্রষ্ট পড়িয়া পাতালে !
ভ্রান্ত কি হইলা সবে ? কি ঘোর প্রমাদ !
চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুর-মর্দ্দন' আখ্যা—কি হেতু হে তবে
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে ?
চিরযোদ্ধা—চিরকাল যুঝি দৈত্য সহ
জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র পূজিত ;
আজি কি না দৈত্যভয়ে ত্রাসিত সকলে
আছ এ পাতালপুরে অমরা বিস্মরি !
কি প্রতাপ দনুজের, কি বিক্রম হেন,
শঙ্কিত সকলে যাহে স্ববীর্য্য পাশরি ?
কোথা সে শূরত্ব আজ বিজয়ী দেবের
শতবার রণে যায় দনুজে জিনিলা ?
ধিক্ দেব ! ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ-হৃদয়
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্বলি।
ধিক্ হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি

অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদাঙ্কিত পৃষ্ঠ, চির-নির্ব্বাসন!
বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা?
চির-অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে,
দমুজের পদ-চিহ্ন ললাটে আঁকিয়া?"
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি।
দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমে সক্রোধ-মূরতি,
নাসারন্ধ্রে বহে শ্বাস বিকট উচ্ছ্বাসে।
যথা দগ্ধগিরি স্রাব উদ্গিরণ আগে,
অগ্নির ভূধরে ধূম সতত নির্গমে,
ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী;
পার্ব্বতী-নন্দন বাক্যে সেইরূপ দেবে।
তুলিয়া স্বপৃষ্ঠে তূণ, পাশ, শক্তি ধরি,
উঠিলা অমরবৃন্দ চাহি শূন্যপানে,
পুনঃ পুনঃ খরদৃষ্টি নিক্ষেপি তিমিরে,
ছাড়িতে লাগিলা ঘন ঘন হুহুঙ্কার।
সর্ব্বাগ্রে অনলমূর্ত্তি—দেব বৈশ্বানর,
প্রদীপ্ত কৃপাণ করে উন্মত্ত স্বভাব,
কহিতে লাগিল, দ্রুত কর্কশ-বচনে,
স্ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্নিতে।
কহিলা, "হে সেনাপতি! এ মণ্ডলী-মাঝে
কোন্ ভীরু আছে হেন ইচ্ছা নহে যার
অমর-নিবাস স্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ
পুনঃ প্রবেশিতে, তায় স্ববেশ ধরিয়া?
দানবে যুঝিতে, আর কি ভয় এখন?
ভীরুতার হেতু আর আছে কি হে কিছু?
অমরের তিরস্কার সম্ভব যতেক
ঘটেছে দেবের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বন।
স্বর্গ-অধোদেশে মর্ত্ত, অধোদেশে তার,
অতল গভীর সিন্ধু—তাহার অধোতে,
অন্ধতম পুরী এই বিষম পাতাল,
তাহে এবে দৈত্য-ভয়ে লুক্কায়িত সবে।
দুঃখে বাস—ধূমময় গাঢ়তর তমঃ
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, ঘন ঘন প্রকম্পন,
সিন্ধুনাদ শিরোপরি সদা নিনাদিত
শরীর-কম্পন হিমস্তূপ চারিদিকে।
এ কষ্ট অনন্তকাল যুগ যুগান্তরে
ভুঞ্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এখানে,
যত দিন প্রলয়ে না সংহার-অনলে
অমর-আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার।
অথবা কপটি হ'য়ে ছদ্মবেশ ধরি
দেবের ঘৃণিত ছল ধূর্ত্ততা প্রকাশি,
ত্রৈলোক্য-ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে,
মিথ্যুক-বঞ্চকবেশে নিত্য পরবাসী।
নিরন্তর মনে ভয় কাপট্য প্রকাশ
হয় পাছে কার(ও) কাছে, চিত্ত জাগরিত
বিষম দুঃসহ চিন্তা ঘৃণা লজ্জাকর
সতত কতই আরো হৃদয়ে যন্ত্রণা।
সে কাপট্য ধরি প্রাণে জীবন যাপনা
শরীর-বহন আর, দুর্গতির শেষ;
বরঞ্চ নিরয়-গর্ভে নিয়ত নিবাস
শ্রেয়স্কর শতগুণ জিনি সে শঠতা।
অথবা প্রকাশ্যভাবে হইবে ভ্রমিতে
চতুর্দ্দশ-লোক-নিন্দা সহি অবিরত,
শত্রু-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার করি,
কপালে দাসত্ব-চিহ্ন করিয়া লাঞ্ছিত!
যখনি ভ্রূকুটি করি চাহিবে দানব,
কিম্বা সে অঙ্গুলি তুলি ব্যঙ্গ-উপহাসে
দেখাইবে এই দেব স্বর্গের নায়ক,
শত নরকের বহ্নি অন্তর দহিবে!
অথবা বর্জ্জিত হয়ে দেবত্ব আপন
থাকিতে হইবে স্বর্গে মার আছে যথা
অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট-কলেবর,
অসুর-পদাঙ্ক-রজঃ ভূষণ মস্তকে।
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে;

প্রকাশি অমর-বীর্য্য, সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্তকাল দনুজ-সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হইবে শেষ।
অমর করিয়া সৃষ্টি করিলা যে দেবে
পিতামহ পদ্মাসন—সুমনস্ খ্যাতি—
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে যারা সর্ব্বগরীয়ান্
অদৃষ্টের বশতায় তাদের এ গতি!
দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,
তবে সে দেবত্ব কোথা হে অমর্ত্ত্যগণ?
দেব-অস্ত্রাঘাতে নহে দানব-বিনাশ.
সে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয়?
নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে?
দেব কি দানব কিংবা মানব সন্তানে?
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল,
নিয়তি কিঙ্কর তার শুন দেবগণ!
ধর শক্তি, শক্তিধর, হও অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ সুরতেজে কর বরিষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে।"
কহিলা সে হুতাশন—সর্ব্ব অঙ্গে শিখা
প্রজ্বলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া,
অগ্নির বচনে মত্ত আদিত্য-সকলে
ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পূরি রসাতল।
একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে,
কোটি বিজলীর জ্যোতি খেলিতে লাগিল;
পাতালের অন্ধকার ঘুচায়ে নিমেষে
দেখা দিল চারিদিকে জ্যোতির্ম্ময় দেহ।
তখন প্রচেতা মর্ত্তে বরুণ বিখ্যাত—
উঠিলা গম্ভীরভাব, ধীর মূর্ত্তি ধরি,
পাশ-অস্ত্র শূন্য 'পরে হেলাইয়া যেন,
উন্মত্ত জলধিজল প্রশান্ত করিল।
দেখিয়া প্রশান্ত-মূর্ত্তি দেব প্রচেতার
নিস্তব্ধ অমরগণ, নিস্তব্ধ যেমন
স্নিগ্ধ বসুন্ধরা, যবে ঝটিকা নিবাড়ে
ত্রিরাত্রি ত্রিদিবা ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়ি।
কহিলা প্রচেতা ধীর গম্ভীর বচন—
"তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শান্তভাবে,
হেন প্রগল্ভতা নহে মহতে উচিত,
এ ঔদ্ধত্য অল্পমতি প্রাণীরে সম্ভবে।
যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়া স্বর্গ উদ্ধারিতে
অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে?
কে আছে নারকী হেন দেব-নামধারী
দ্বিরুক্তি করিবে এই পবিত্র প্রস্তাবে?
তথাপি প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ আগে
উচিত ভাবিয়া দেখা ফলাফল তার;
সামান্যের(ও) উপদেশ শুভপ্রদ কভু,
জ্ঞানীর মন্ত্রণা কভু না হয় নিষ্ফল।
কি ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যদ্যপি?
সর্ব্বজন-হাস্যাস্পদ হ'য়ে কিবা ফল?
অসিদ্ধ-প্রতিজ্ঞ লোক অনর্থ প্রলাপি,
নমস্য জগতে, কার্য্যে সুসিদ্ধ যে জন।
অনেক মহাত্মা বাক্য কহিলা অনেক,
কার্য্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য আড়ম্বরে;
কোদণ্ড-নির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশের আগে,
শরলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শরাঘাতে।
দেব-তেজ, দেব-অস্ত্র, দেবের বিক্রম,
বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এত দিন কোথা ছিল, অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ?
কোথা ছিল সে সকল যবে দৈত্য-শূল
নিক্ষেপিল সুরবৃন্দে এ পুরী পাতালে?
সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিস্তেজ
দুর্জ্জয় বৃত্রের হস্ত দেব অস্ত্রাঘাতে?
অস্ত্র সেই, বীর্য্য সেই, সেই দেবগণ,
অক্ষুণ্ণ অসুর(ও) সেই, সুপ্রসন্ন বিধি
এখনো রক্ষিছে তারে অনিবার্য্য তেজে,
কি বিশ্বাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে?
ভাগ্য নাই! ভাগধেয় মূঢ়ের প্রলাপ!!

সাহস যাহার সদা সেই ভাগ্যধর!
তবে কেন ইন্দ্রবাণ-তেজঃ দুর্নিবার
অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিলা বক্ষেতে?
কেন ইন্দ্র সুরপতি সর্ব্বরণজয়ী
দনুজমর্দ্দন নিত্য, শূলের প্রহারে
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি,
চেতন-বিরতি যার নহে ক্ষণকাল?
কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,
সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে,
কুমেরু-শিখরে একা কাটাইছে কাল,—
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যানে নিরত?
দেবগণ, মম বাক্য—অকর্ত্তব্য রণ
যত দিন ইন্দ্র আসি না হন সহায়;
অগ্রে কোন(ও) দেব তাঁর করুন উদ্দেশ,
পশ্চাৎ যুদ্ধ-কল্পনা হবে সমাপিত।"
বরুণের বাক্যে সূর্য্যদেব ত্বিষাম্পতি
উঠিলা প্রখরতেজঃ—কহিলা সবেগে—
"বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্ব্বজন,
ভাবিও সে বৈধাবৈধ বাঞ্ছনীয় শেষ।
ত্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ নির্জ্জর অমর,
অদিতি-নন্দনগণ চির-আয়ুষ্মান্
অনশ্বর দেববীর্য্য, শরীর অক্ষয়,
সর্ব্বকালে, সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ এ বাদ।
অসুর অচিরস্থায়ী, অদৃষ্ট অস্থির;
চঞ্চল দানবচিত্ত রিপু-পরবশ;
মন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির-আজ্ঞাবহ;
জয়োৎসাহ প্রভুভক্তি অনিত্য সকলি,
সর্ব্বকালে সর্ব্বজনে জান তথ্য এই,
দুরন্ত দানব তবে কত দিন সবে
দুর্ব্বার সমরক্ষেত্রে সুরবীর্য্যানল,
কত কাল রবে দৈত্য সে রণে তিষ্ঠিয়া?
মম ইচ্ছা সুরবৃন্দ দুরন্ত আহবে,
দহ হে দানবকুল ভীম উগ্রতেজে,
যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর
জলুক গগন ব্যাপী অনন্ত সমর!
জলুক দেবের তেজ অমরা ঘেরিয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রখর শিখায়;
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে,
পুত্রপরম্পরা ঘোর চিরশোকানলে।
চিরযুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,
না জানিবে কোন কালে বিশ্রামের সুখ,
নারিবে তিষ্ঠিতে স্বর্গে দেব-সন্নিধানে,
হইবে অমর-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত।
অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে,
কোন যুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত,
ভুগুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে
চিরযুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি।
ধিক্ লজ্জা! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে,
নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর!
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেবে উপেক্ষিয়া—
স্বর্গ-বিরহিত দেব চিন্তায় ব্যাকুল!
নাহিক বাসব হেথা সত্য বটে তাহা,
কিন্তু যদি পুরন্দর আরো বহুযুগ
প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে
এইভাবে রবে সবে চির-অন্ধকারে?
চল হে আদিত্যগণ প্রবেশি শূন্যেতে,
দৈত্যের কণ্টক হ'য়ে অমরা বেষ্টিয়া
দগ্ধ করি দৈত্যকুল, যুগ-যুগকাল,
যুদ্ধের অনন্তবহ্নি জ্বালায়ে অম্বরে।
স্বর্গের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহে
শিখরে শিখরে জাগি শস্ত্রধারিবেশে
সুশাণিত দেব-অস্ত্র নিত্য বরিষণে
দনুজের চিত্তশান্তি ঘুচাই আহবে।"
কহিলা এতেক সূর্য্য। ঝটিকার বেগে
চারিদিক্ হৈতে দেব ছুটিতে লাগিল,
উত্থিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।
কিংবা যথা যবে ঘোর প্রলয়ে ভীষণ,

সংহার-অনলে বিশ্ব হ'য়ে ভস্মাকার
উড়ে অন্তরীক্ষপথে দিগন্ত আচ্ছাদি,
তেমতি অমরবৃন্দ ঘেরিলা ভাস্করে।
সকলে সম্মত শীঘ্র উঠি ব্যোমপথে,
বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদিবা,
চিরসমরের স্রোতে ঢালিয়া শরীর,
দেবনিন্দাকারী দুষ্ট অসুরে ব্যথিতে।

দ্বিতীয় সর্গ

হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন-ভিতর
পতিসহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,
দানব-রমণী করিছে ক্রীড়া।
রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদন-মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া॥
মদন-সজ্জিত কুসুম-আসন,
চারিদিকে শোভা করেছে ধারণ,
বিচিত্র সৌন্দর্য্য সুরভিময়।
হাসিছে কানন ফুলশয্যা ধরি,
স্থানে স্থানে যেন মৃত্তিকা-উপরি
কতই কুসুম-পালঙ্ক রয়॥
কত ফুল-ক্ষেত্র চারিদিকে শোভে,
মুনি ভ্রান্ত হয় কান্তি হেরি লোভে,
রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা।
বসন্ত আপনি সুমোহন বেশ,
ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ,
হয়েছে অপূর্ব্ব শোভার মেলা॥
দানব-রমণী ঐন্দ্রিলা সেখানে,
শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে,
ফুলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি।
করিছে শয়ন কভু পারিজাতে,
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে,
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি॥
বসিছে কখন অনুরাগভরে,
ইন্দিরা-কমল-পর্য্যঙ্ক উপরে,
দৈত্যপতি হাসে পারশে বসি।
হাসে মনোসুখে ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
রতিদত্ত মালা করতলে ধরি,
বসনবন্ধন পড়িছে খসি॥
মূর্ত্তিমান্ ছয় রাগ করে গান,
রাগিণী ছত্রিশ মিলাইছে তান,
সঙ্গীত-তরঙ্গে পীযূষ ঢালি।
স্বরে উদ্দীপন করে নব রস,
পরশ, আঘ্রাণ, সকলি অবশ,
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় ব্যাপৃত খালি॥
ভ্রমে রতিপতি সাজাইয়া বাণ,
কুসুম-ধনুতে সু-ঈষৎ টান,
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি।
নাচে মনোরমা স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
কন্দর্প-মোহন বেশ-ভূষা পরি,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ভাসি॥
এইরূপে ক্রীড়া করে দৈত্য সনে,
দৈত্যজায়া সুখে নন্দন কাননে,
বৃত্রাসুর সুখে বিহ্বল-প্রায়।
ধরি অনুরাগে পতি-করতল,
কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল,
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায়:—
"শুন দৈত্যেশ্বর, শুন শুন বলি,
বৃথা এ বিলাস, বৃথা এ সকলি,
এখনও আমরা বিজিত নয়।
বিজিত যে জন, বিজয়ী-চরণ,
নাহি যদি সেবা করিল কখন,
সে হেন বিজয়ে কি ফলোদয়॥

তুমি স্বর্গপতি আজি দৈত্যেশ্বর,
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর,
ধিক্ লজ্জা তবু সাধ না পুরে !

কটাক্ষে তোমার আশুপ্রাপ্য যাহা,
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা,
তবে সে কি লাভ থাকি এ পুরে ?

স্বয়ম্বরা হ'য়ে করেছি বরণ,
হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্রলক্ষণ,
ইচ্ছাময়ী হব হৃদয়ে আশ।

যে ইচ্ছা যখন ধরিবে হৃদয়,
তখনি সফল হবে সমুদয়,
জানিব না কারে বলে নিরাশ॥

ত্যজি নিজকুল গন্ধর্ব্ব ছাড়িয়া,
বরিলাম তোমা যে আশা করিয়া,
এবে সে বিফল হইল তাহা !

নিষ্ফলা বাসনা হৃদয়ে যাহার,
কিবা স্বর্গপুরী, কিবা মর্ত্ত আর,
যেখানে সেখানে নিয়ত হাহা॥

কিবা সে ভূপতি কিবা সে ভিখারী,
কাঙ্গালী সে জন যেখানে বিহারী,
প্রাণের শূন্যতা ঘুচে না কভু।

পতিত্বে বরণ করিয়া তোমায়,
তবু সে বাসনা পুরিল না হায়,
আমার (ও) এ দশা ঘটিল তবু॥

ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল,
সে বাসনা পূর্ণ হৈত কত কাল,
সহিতে হ'ত না লালসা-জালা।

ভালবাসা এবে কিসে বা জাগাই,
দিয়াছি যা ছিল, সে যৌবন নাই,
ভালবেসে বেসে হয়েছি আলা॥

ইন্দ্রাণী যদি সে করিত বাসনা,
না পুরিতে পল পুরিত কামনা,
মরি সে ইন্দ্রের লৈয়ে বালাই।

প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই,
না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই,
সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই॥"

বলিয়া নেহালে পতির বদন,
আধ ছল্-ছল্ ঢলে দু-নয়ন,
অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয়।

শুনি দৈত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে,
"কি বলিলে প্রিয়ে বল শুনি ফিরে,
প্রেয়সী নারীর এ দশা নয় ?

কি দোষে ভর্ৎসনা করিছ আমায়,
না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়,
অদেয় কিবা এ জগতী মাঝ ?

দিয়াছি জগৎ চরণের তলে,
কৌস্তুভ যেমত মাণিক মণ্ডলে,
তুমি সে তেমতি নারীতে আজ॥

কে আছে রমণী তুলনা ধরিতে,
ঐশ্বর্য্য বিভব গৌরব খ্যাতিতে,
তোমার উপমা কাহাতে হয় ?

আর কি লালসা বল তা এখন,
আছে কিবা বাকি দিতে কোন্ ধন,
কি বাসনা পুনঃ হৃদে উদয় ?"

কহিল ঐন্দ্রিলা—"দিয়াছ সে সব,
জানি হে সে সব বিভব, গৌরব,
তবু সর্ব্বজন-পূজিতা নই।

মণিকুলে যথা কৌস্তুভ মহৎ,
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ,
বল, দৈত্যপতি, হয়েছি কই ?

এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে,
গৌরবে তেমতি সুখেতে বিরাজে,
এখনও আয়ত্ত হলো না সেহ।

স্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে,
কিবা এ স্বরগ কিবা সে মহীতে,
শচীর মহত্ত্ব ভুলে না কেহ !

রাতিমুখে আমি শুনিনু সেদিন,
সুমেরু এখন হয়েছে শ্রীহীন,
শচীর সৌন্দর্য্য দেহে না ধরি।
ইন্দ্রাণী যখন আছিল এখানে,
অমর-সুন্দরী সকলে সেখানে,
থাকিত হেমাদ্রি উজ্জ্বল করি ॥
শুনেছি না কি সে পরমা রূপসী,
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।
গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরষে,
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে ॥
শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ,
ঘুচাইব চক্ষু-কর্ণের বিবাদ,
আমার চিত্তের বাসনা এই।
থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস,
ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ,
ভুলাতে তোমারে শিখাবে সেই ॥
আসিবে যতেক অমর-সুন্দরী,
শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য শোভা ধরি,
অমর-কৌতুক শিখাবে ভালো।
এই বাঞ্ছা চিতে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি,
হয় কি না পুনঃ সুমেরু আলো ॥"
শুনে বৃত্রাসুর ঈষৎ হাসিয়া,
কহিল ঐন্দ্রিলা-নয়নে চাহিয়া,
"এই ইচ্ছা প্রিয়ে হৃদে তোমার ?"
বলিয়া এতেক দানব-ঈশ্বর,
কন্দর্পে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে সত্বর,
"কোথা শচী এবে করে বিহার ?"
কহিল কন্দর্প মুখে চিরহাসি,
"অমরা বিহনে এবে মর্ত্তবাসী,
নৈমিষ-অরণ্যে শচী বেড়ায়।
সঙ্গে প্রিয়তমা সখী অনুগত,
ভ্রমে সে অরণ্যে দুঃখেতে সতত,
না পেয়ে দেখিতে সুমেরু-কায় ॥
কষ্টে করে বাস শচী নরলোকে,
ইন্দ্র, ইন্দ্রালয়, ইন্দ্রত্বের শোকে,
অন্তরে দারুণ দুঃখহুতাশ।"
শুনি দৈত্যপতি কহিলা, "সুন্দরী,
পাবে শচীসহ শচী-সহচরী,
অচিরে তোমার পুরিবে আশ ॥"
ঐন্দ্রিলা শুনিয়া সহর্ষ হইলা,
অধরে মধুর হাসি প্রকাশিলা,
পতি-কর সুখে ধরে অমনি।
হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার,
ধনুকে ঈষৎ করিল টঙ্কার,
শিহরে দানব দৈত্যরমণী ॥
পুনঃ ছয় রাগ রাগিণী ছত্রিশ,
গীত-বৃষ্টি করে ভুলে আশীবিষ,
নব নব রস বিভাস করি।
পুনঃ সে ইন্দ্রিয় অবশ সঙ্গীতে,
অসুর-অসুরী শুনিতে শুনিতে,
চমকে চমকে উঠে শিহরি ॥
কভু বীর-রসে ধরিছে সুতার,
দানব উঠিছে করি মার মার,
আবার সমরে পশিছে যেন।
অমর নাশিতে ধরিছে ত্রিশূল,
আবার যেন সে অমরের কুল,
বিনাশে সংগ্রামে ভাবিছে হেন ॥
কখন করুণা-সরিতে ভাসিয়া
চলেছে ঐন্দ্রিলা নয়ন মুছিয়া,
কখন অপত্য স্নেহেতে ভোর।
যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার,
স্তনযুগে স্বতঃ বহে ক্ষীরধার,
এমনি ত্রিদিব-সঙ্গীত-ঘোর ॥

কভু হাস্যরস করে উদ্দীপন,
কোথায় বসন, কোথায় ভূষণ,
ঐন্দ্রিলা উল্লাসে অধীর হয়!
ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে,
ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল-অঙ্গে,
উৎফুল্ল বদন লোচনদ্বয় ॥
অমনি অপ্সরা হইয়া বিহ্বল,
চলে ধীরে ধীরে তনু ঢল ঢল,
নেত্র করতল অলকা কাঁপে

ঈষৎ হাসিতে অধর অধীর,
অঙ্গুলি-অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির,
টানিয়া অধরে ঈষৎ চাপে ॥
চারি দিকে ছুটে মধুর সুবাস,
চারি দিকে উঠে হরষ উচ্ছ্বাস,
চারি দিকে চারু কুসুম হাসে
খেলে রে দানবী দানবে মোহিয়া,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ডুবিয়া,
প্রমোদ প্লাবনে নন্দন ভাসে ॥

তৃতীয় সর্গ

উঠিছে দানবরাজ নিদ্রা পরিহরি
ইন্দ্রালয়ে শশব্যস্ত নানাদ্রব্য ধরি
দান[illegible] গন্ধর্ব, যক্ষ [illegible] বেড়ায়,
গৃহ পথ রথ অশ্ব সত্বরে সাজায়;
সাজায় সুন্দর করি পুষ্পমাল্য দিয়া,
গবাক্ষ গৃহের দ্বার শোভা বিন্যাসিয়া;
উড়ায় প্রাসাদ-চূড়ে দানবপতাকা—
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন শিবনাম আঁকা।
ঘন করে শঙ্খধ্বনি; ঘন ভেরীনাদ;
চারিদিকে স্তবশব্দ ঘন ঘোর হ্রাদ।
শিখরে শিখরে বাজে দুন্দুভি গভীর;
ঘন ঘন ধনুর্ঘোষে গগন অস্থির।
ইন্দ্রালয় বিলোড়িত দানবের দাপে;
জয়শব্দে চরাচর মেরু-শীর্ষ কাঁপে।
বাসবের বাসগৃহ গগন যুড়িয়া,
হিমাদ্রিভূধর তুল্য, আছে বিস্তারিয়া।
স্ফটিকের আভা তায় ফুটিয়া পড়িছে,
হিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাসিছে।
দ্বারদেশে ঐরাবত হস্তী সুসজ্জিত;
সুসজ্জিত পুষ্পরথ দ্বারে উপস্থিত।

ইন্দ্রপুরীশোভাকর সভার ভবন,
কুবের সাজায় আনি বিবিধ ভূষণ;
সারি সারি মণিস্তম্ভ সাজাইছে তায়,
সাজাইছে পুষ্পদাম চন্দ্রাতপ-গায়।
হায় রে সে ইন্দ্রাসন বসিত যাহাতে
বাসব অমরপতি রাখিছে তাহাতে
মন্দার-পুষ্পের গুচ্ছ করিয়া যতন,
দানব আসিয়া ঘ্রাণ করিবে গ্রহণ।
ইন্দ্রের মুকুট দণ্ড আনি দ্রুতগতি
রাখিছে আসন-পার্শ্বে ভয়ে যক্ষপতি।
সভাতলে বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া
তটস্থ কিন্নরগণ, দেখিছে চাহিয়া।
আতঙ্কে প্রবেশদ্বারে;– বিদ্যাধরী যত;–
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী বিনত—
বসন ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত,
কেবল নর্ত্তন বাকী বাদনসংযুত।
সমবেত সভাতলে, করি যোড়কর,
অপ্সরা, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর।
সমবেত দৈত্যবর্গ সুদীর্ঘ শরীর—
হেনকালে শঙ্খধ্বনি হইল গম্ভীর;

অমনি স্বযন্ত্রে বাদ্য বাজিল মধুর ;
অমনি অপ্সরা-পায়ে বাজিল নূপুর ;
পূরিল সুধার ঘ্রাণে সভার ভবন ;
বহিল অমরপ্রিয় সুরভি পবন ।
প্রবেশিল সভাতলে অসুর দুর্জ্জয় ;
চারিদিকে স্তুতিপাঠ জয় শব্দ হয় ।
ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায় ।
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ ।
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায় ;
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায় ।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন 'পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে ।
মন্ত্রীরে সম্ভাষি দৈত্য কহিলা তখন—
"সুমিত্র হে, ভীষণেরে করহ প্রেরণ
সত্বরে অবনীতলে, নৈমিষ কাননে ;
ভ্রমে শচী সে অরণ্যে সুররামা সনে ;
আনুক স্বরগপুরে অমরী সকলে ;
যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশলে ;
কৌশলে না সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল ;
ঐন্দ্রিলার অভিলাষ করিব সফল ।
বড় লজ্জা দিলা কাল ঐন্দ্রিলা আমারে—
শচীভ্রমে স্বতন্তরা না সেবি তাহারে !
সুমিত্র, সত্বরে কার্য্য কর সম্পাদন,
ভীষণে নৈমিষারণ্যে করহ প্রেরণ ।"
দৈত্যেন্দ্রবচনে মন্ত্রী কহিলা সুমিত্র,—
"মহিষী-বাঞ্ছিত যাহা কিবা সে বিচিত্র !
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, দনুজের নাথ,
নৈমিষ-অরণ্যে দৈত্য যাবে অচিরাৎ ।
নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল,
আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল ।"
দৈত্যেশ কহিলা, "মন্ত্রি, কহ কি কহিবে,
অবিদিত বৃত্রাসুরে কিছু না থাকিবে ।"

কহিলা সুমিত্র তবে "শুন দৈত্যনাথ,
অমর আসিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত ।
কহিলা প্রহরী যারা ছিলা গত নিশি
দেখেছে দেবের জ্যোতিঃ প্রকাশিছে দিশি
অতি শীঘ্র, বোধ হয়, দেবতা সকল,
রণ-আশে প্রবেশ করিবে স্বর্গস্থল ;
এ সময় ভীষণেরে প্রেরণ উচিত
হয় কি না, দৈত্যপতি, ভাবিতে বিহিত ।
সামান্য বিপক্ষ নহে জান, দৈত্যপতি,
কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি !
দিবারাত্রি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম,
দুর্দ্দম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম ।
যত যোদ্ধা দানবের হৈবে প্রয়োজন—
এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ ?"
শুনিয়া, হাসিলা বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর
কহিলা, "প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রিবর ?
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার !
এ অযথা কথা মন্ত্রি রচিত কাহার ?
দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া,
লুক্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া !
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গমুখ,
যাক্ কত কাল আরো ঘুচুক সে দুখ !
দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ,
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন ।
বৃত্রাসুর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবে না আর ।
বোধ হয়, প্রতীহার, রক্ষক যাহারা,
অন্য কিছু শূন্যপথে দেখেছে তাহারা—
হয় কোন উল্কা, কিম্বা নক্ষত্র পতন,
নিদ্রাঘোরে শূন্য 'পরে করেছে দর্শন ।"
কহিলা সুমিত্র, "দৈত্যপতি, অনুরূপ
বলিলা প্রহরিগণ, কহিয়া স্বরূপ ।
গগনমার্গেতে দেব-জ্যোতির আভাস
দেখিয়াছে স্থানে স্থানে জ্যোতির
প্রকাশ ।

রক্ষক-প্রধানে ডাকি জিজ্ঞাসা করিলে,
বিদিত হইবে সর্ব্ব স্বকর্ণে শুনিলে।"
দৈত্যেশ আদেশে আ(ই)সে রক্ষক প্রধান
দাঁড়াইলা সভাতলে পর্ব্বত-প্রমাণ।
কহিলা দানবপতি, "কহ, হে ঋক্ষভ,
কি দেখিলা গত নিশি কিবা অনুভব?"
কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য, "শুন দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ!
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতিঃ নহে সে আকার;
জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতিঃ যে প্রকার:
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায়
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশ দিশে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে;
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশ-প্রান্তে ঘেরি চারিধার;
বহু দূরে এখন (ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"
বৃত্রাসুর জিজ্ঞাসিলা ঘুচাতে সন্দেহ,
"ইন্দ্রের কোদণ্ডনাদ শুনিলা কি কেহ?
ইন্দ্র যদি সঙ্গে থাকে অবশ্য সে ধ্বনি
শুনিতে পাইত স্বর্গে সকলে তখনি!"
কহিলা ঋক্ষভ, "অন্য দানব যতেক,
ইন্দ্রের কোদণ্ডধ্বনি না শুনিলা এক।"
তখন দানব-ইন্দ্র বৃত্রাসুর কয়—
"দেবতা আসিছে সত্য কিবা তাহে ভয়?
একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল,
এইবার একেবারে ঘুচাব জঞ্জাল।
ইন্দ্র সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবতা;
বাতুল হয়েছে তারা, কি ঘোর মূর্খতা!
সঙ্কল্প করিনু অদ্য, শুন, দৈত্যকুল,
সঙ্কল্প করিনু হের পরশি ত্রিশূল—
সূর্য্যেরে রাখিব করি রথের সারথি;
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি;
পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জ্জনী ধরি,
অমরার পথে পথে রজঃ স্নিগ্ধ করি;
বরুণ রজক-বেশে অম্বরে সেবিবে,
দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে।
নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও,
সুমিত্র, নৈমিষারণ্যে ভীষণে পাঠাও।"
কহিয়া এতেক, বৃত্রাসুর দৈত্যপতি,
সভা ভাঙ্গি সুমেরুর দিকে কৈলা গতি।
এখানে ত্রিদিব যুড়ে ছুটিল সংবাদ,
স্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংহনাদ।
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি শিখরে শিখরে;
কোদণ্ড-টঙ্কারে ঘন গগন শিহরে।
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা—
শিবের ত্রিশূলচিহ্ন শিবনাম আঁকা।
মহাকোলাহলে পূর্ণ হৈল সর্ব্বস্থল,
সাজিল সমরসাজে দানব সকল।
বৃত্রাসুরপুত্র, বীর রুদ্রপীড় নাম,
সুধন্য দানব-কুলে, বিচিত্র ললাম।
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,
বাল্যকাল হৈতে যার অসীম সাহস,
সজ্জিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট শীরষে,
দেবতা আসিছে যুদ্ধে শুনিয়া হরষে,
সুমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস,
উৎসাহ-হিল্লোলে ভাসি করিল প্রকাশ।
মহাযোদ্ধা বৃত্রপুত্র, পূর্ব্বের সমরে,
লভিলা বিপুল যশ যুঝিয়া অমরে।
আবার আসিছে যুদ্ধে দেবতা সকল,
শুনি মহোৎসাহে মত্ত হৈলা মহাবল।
চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলয়ে,
আন্দোলিয়া নানা কথা যুদ্ধের বিষয়ে।
স্বর্গদ্বারে দ্বারে চলে দৈত্য মহারথী,
হর্য্যক্ষ বিপুলবক্ষ পূর্ব্বে কৈলা গতি।

ঐরাবণী—বল যার ঐরাবত প্রায়,
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধায়।
শঙ্খধ্বজ দৈত্য—যার শঙ্খের নিনাদে
অমর কম্পিত হয়—উত্তর আচ্ছাদে।

দক্ষিণেতে সিংহজটা—সিংহের প্রতাপ
চলিলা দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য, ভয়ঙ্কর দাপ।
স্বর্গের প্রাচীরে ভ্রমে দৈত্য কোটি জন—
ভীষণ নৈমিষারণ্যে করিলা গমন।

চতুর্থ সর্গ

সায়াহ্নে সখীর সনে,
বসিয়া নৈমিষবনে,
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
"বল আর কত দিন,
এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো মরতে পড়িয়া!
না হেরে অমরাবতী,
চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভুবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা,
জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে॥
স্বপনে যদ্যপি ছাই,
সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবেরে স্বপন নাহি আসে!
জাগ্রতে সে দেখি যাহা,
চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে
নয়নের কাছে কাছে,
সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব,
দৃষ্টিপথে আবির্ভাব
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া

ভ্রান্তি যদি হৈত কভু,
কিছুক্ষণ সুখে তবু,
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।
পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই,
দেবের কপালে ছাই,
বিধি সৃজে অস্বপ্ন করিয়া!
অমৃত করিলে পান,
তবে বা জুড়াত প্রাণ,
সে উপায় নাহিক এখন।
কিরূপে, চপলা, বল,
নিবসি এ ভূমণ্ডল,
চিরদুঃখে করিব যাপন॥
মানবের এ আগারে,
থাকি যেন কারাগারে,
পুরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে!
অতি গাঢ়তর বায়ু,
আই-ঢাই করে আয়ু,
বুক যেন নিবদ্ধ নিগড়ে!
নয়ন ফিরাতে ঠাঁই,
কোথাও নাহিক পাই,
শূন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে!
সুখে নাহি দৃষ্টি হয়,
চারিদিক্ বহ্নিময়,
আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে!

হায় ! এ মাটির ক্ষিতি,
পায়ে বাজে নিতি নিতি,
শিলা যেন কঠোর কর্কশ !
শুনিতে না পাই ভাল,
শব্দ যেন সর্ব্বকাল,
কর্ণমূলে ঝটিকাপরশ !
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি,
কেমনে শরীর রাখি,
সখী রে সকলি হেথা স্থূল !
নিত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান,
আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল !
অমর—মরণ নাই,
কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখনি ভাবি লো সই,
তখনি তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সহিব ॥
অনন্ত যৌবন লৈয়ে,
ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাসসুখ ;
কিরূপে থাকিব হেথা,
হইয়া অনন্ত-চেতা,
নরলোকে সহিয়া এ দুখ !
নরজন্ম ভাল সখী,
মৃত্যু হয় বিষ ভখি,
মরিলে দুঃখের অবসান।
অনুদিন অনুক্ষণ,
নিদ্রাহীন অস্বপন,
জ্বলে না লো তাদের পরাণ !
বরং সে ছিল ভাল,
নাহি যদি কোন কাল,
দেখিতাম স্বরগ নয়নে।

আগে সুখ পরে পীড়া,
আগে যশঃ পরে ব্রীড়া,
জীবিতের অসহ্য সহনে !
জানি সখী গুল্ম ছাড়ি,
তৃণদলে না উপাড়ি,
মহা ঝড় তরুতেই বহে।
জানি সর্ব্বসহা ভিন্ন,
উত্তাপে না হয়ে খিন্ন,
অগ্নিদাহ অন্যে নাহি সহে ॥
তথাপি অন্তর দহে,
এ ঘৃণা না প্রাণে সহ,
পূর্ব্বকথা সদা পড়ে মনে।
যে গৌরব ছিল আগে,
বাসবের অনুরাগে,
কার হেন ছিল ত্রিভুবনে !
কেমনে ভুলিব বল,
মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে ;
তুই সে মেঘের অঙ্গে,
খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে !
কি শোভা হইত তবে,
বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ-আসনে !
হইত কি ঘন ঘন,
মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘ যবে দুলাত পবনে !
ইন্দ্রের সে মুখকান্তি,
ঘুচায়ে নয়নভ্রান্তি,
কত দিন সখী রে না হেরি !
কত দিন বৈসে নাই,
ঘুচায়ে চক্ষু বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি !

সুমেরু-শিখরে যবে,
সুখে খেলিতাম সবে,
অমর সঙ্গিনীগণ সহ,
উপরে অনন্ত শূন্য,
অনন্ত নক্ষত্র-পুর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ।
ভ্রমিত নির্ম্মল বায়,
ফুটিয়া ফুটিয়া তায়,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত,
নির্ম্মল কিরণশোভা,
সখী রে কি মনোলোভা,
মেরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত!
সখী সেই মন্দাকিনী,
চিরানন্দ-প্রদায়িনী,
দেবের পরশ সুখকর।
চলেছে নন্দনতলে,
উছলি মধুর জলে,
ভাবিতে রে হৃদয় কাতর!
কার ভোগ্যা এবে তাহা,
কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দনবিপিন!
কে ভ্রমিছে এবে তায়,
কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাতে কে করে মলিন!
জগতের নিরুপম,
সখী পারিজাত মম,
দৈত্যজায়া পরিছে গলায়!
যে পুষ্প শচীর হৃদি,
স্নিগ্ধ করিবারে বিধি,
নিরমিলা অতুল শোভায়!
সখী রে, দানবজায়া,
ধরি কলুষিত কায়া,
বসিছে সে আসন-উপরে;
যেখানে অমরীগণ,
ক্রীড়াসুখে নিমগন,
বিরাজিত প্রফুল্ল অন্তরে!
হায় লজ্জা! চপলা রে,
আমার শয়নাগারে,
অমর পরশে নাহি যাহা,
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন,
না ছুঁইলা কোন জন,
বৃত্রাসুর পরশিল তাহা!
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক,
কি আর কব অধিক,
এ পীড়ন সহি লো এ প্রাণে!
এত দিনে দৈত্যবালা,
এ মুখ করিয়া কালা,
শচীরে বিন্ধিল বিষবাণে!
সাজে লো আমার সাজে,
আমার সপ্তকী বাজে,
ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়!
আমার মুকুট-রত্ন,
অমরে করিত যত্ন,
কুবের আনিয়া দেয় তায়!
শচী বলি কেবা আর,
গৌরব করিবে তার,
কে আর আসিবে শচী-স্থান!
আর না আসিবে লক্ষ্মী,
বাহুতে বাঁধিতে রক্ষী,
লইতে ইন্দিরা-পুষ্পঘ্রাণ!
ইন্দিরার প্রিয় পদ্ম,
সুধাজাত সুধাসদ্ম,
কত সুখে লইত কমলা;
এবে সে ছোঁবে না আর,
হাতে তুলে দিলে তাঁর—
শচীর পরশ এবে মলা!

উমা নাহি ফিরে চাবে,
ব্রহ্মাণী সরিয়া যাবে,
কাছে যদি কখন দাঁড়াই।
সুররামা অন্য যত,
লজ্জা দিবে অবিরত,
চূর্ণ করি শচীর বড়াই !
কোথায় পলাব বল ?
কোথা আছে হেন স্থল ?
এ মুখ না দেখাব কাহারে ;
বরঞ্চ মানবদেহে,
পশিয়া মানবগেহে,
জন্মিব, মরিব, বারে বারে !
ভুলে রব যত কাল,
জীয়ে রব তত কাল,
ভাবিলে সে আবার মরণ।
তবে বা ঘুচিবে তাপ,
ভাবনার অপলাপ,
তবে যাবে চিত্তের পীড়ন ॥"
হেন কালে পুষ্পধনু,
নিত্য মনোহর তনু,
চিরহাসি অধরে প্রকাশ।
আসি শচী সন্নিধান,
বাড়ায়ে শচীর মান,
ইন্দ্রাণীরে করিলা সম্ভাষ ॥
চপলা হেরি সত্বর,
কহিলা, "হে পঞ্চশর,
হেথা গতি কোথা হৈতে বল
আছ ত, আছ ত ভাল,
গোরা ছিলে হৈলে কাল,
তুমি আর রতির কুশল ?
শুনি না কি মাল্যকার
হৈয়ে এবে আছ, মার !
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও ?
নিজ করে গাঁথ মালা,
সাজাতে দানব-বালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও ?
এত গুণপনা তব,
জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে সে অন্যমনে,
ত্যজি পুষ্পশরাসনে,
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার ॥
বড় আগে হেলি হেলি,
পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি,
বেড়াইতে সুমোহন বেশ।
ত্যক্ত করি বারে বারে,
সর্ব্বলোকে সবাকারে,
শুন, কাম, এই তার শেষ ॥
ছি ছি মরি, নাহি লাজ,
ধরি মালাকার-সাজ,
এখন (ও) সে আছ স্বর্গপুরে।
রতির কি লজ্জা নাই,
মুখেতে মাখিয়া ছাই,
ঐন্দ্রিলারে সাজায় নূপুরে !"
শচী কহে, "চপলা রে,
গঞ্জনা দিও না মারে,
সুখে আছে সুখে থাক কাম।
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি,
স্বর্গপুরী পরিহরি,
পুরাইত কিবা মনস্কাম ?
ভাবনা যাতনা নাই,
সদা সুখী সর্ব্বঠাঁই,
চিরজীবী হ(উ)ক সেই জনা।
রতির কপাল ভাল,
সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতনা

প্রত্যয়, কৌশল কিবা,
আমারে শিখায়ে দিবা,
 সদা সুখ চিত্তে কিসে হয় ;
কিরূপে ভুলিব সব,
তুমি যথা মনোভব,
 নিত্যসুখী নিত্য হাস্যময় !"
কন্দর্প অপাঙ্গ ঠারে,
শাসাইয়া চপলারে,
 সসম্ভ্রমে শচী প্রতি কয়—
"সুখ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া,
সকলি বাসনা নিয়া,
 যুক্তির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন-বনে,
কোথায় বা ত্রিভুবনে,
 জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ ;
কামের বাঞ্ছিত যাহা,
নন্দন-ভিতরে তাহা,
 না পাইব গিয়া অন্য স্থান !
সেবি বা অসুর নর,
কি দানবী কি অমর,
 তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে
যার যেথা ভালবাসা,
তার সেথা চির-আশা.
 সুখ দুঃখ মনের খনিতে !
সে কথা বৃথা এখন,
আসিয়াছি যে কারণ,
 শুন আগে বাসবরমণী।
আসন্ন বিপদ জানি,
আপনি কর্ত্তব্য মানি,
 জানাইতে এসেছি অবনি ॥
নির্দ্দয় অদৃষ্ট অতি,
এখন (ও) তোমার প্রতি,
 শুনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ।
কর্ত্তব্য যা হয় কর,
না থাক অবনী'পর.
 নিকটে আসিছে আশীবিষ ॥"
"শচীর অদৃষ্ট মন্দ,
আছে কি শচীর ধন্দ,
 সে কথা শুনাতে আ(ই)লে মার !
স্বর্গ ত্যজি ধরাবাস,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নাশ,
 ইহা হৈতে অভাগ্য কি আর ?"
শুনিয়া কন্দর্প কয়,
"এই যদি কষ্ট হয়,
 না জানি সে কি বলিবে তায়।
ঐন্দ্রিলা সেবিতে যবে,
রতি-সহচরী হবে.
 অর্ঘ্য দিবে বৃত্রাসুর-পায় !
ক্ষমা কর, সুরেশ্বরী,
এ কথা বদনে ধরি,
 চেতাইতে বলিতে সে হয়।
স্বকর্ণে শুনেছি যত,
ঐন্দ্রিলার মনোরথ,
 তাই মনে পাই এত ভয় !
বসিয়া নন্দনবনে,
ঐন্দ্রিলা দৈত্যের সনে,
 আমার সে সাক্ষাতে কহিলা,
'শচীরে স্বরগে আন,
থাকুক আমার মান,
 শচী সেবা মোরে না করিলা—
বৃথা এ ইন্দ্রত্ব তব,
বৃথা এ ঐশ্বর্য্য সব,
 বৃথা নাম, ঐন্দ্রিলা আমার !
শুনি শচী গরবিণী,
চিরসুখী বিলাসিনী,
 সে গৌরব ঘুচাব তাহার।

থাকিবে স্বরগে আসি.
হইয়া আমার দাসী,
তাব-ভাব শিখাবে আমায়।
শিখাবে চলন-ভঙ্গি,
কর পদ দিবে রঙ্গি,
তবে মম চিত্তক্ষোভ যায়!'
লজ্জা পায় বৃত্রাসুর,
আসিতে অবনিপুর,
আজ্ঞা দিলা ভীষণ দৈত্যেরে।
মহাবল দৈত্য সেই,
তোমার রক্ষক নেই,
ইন্দ্রপ্রিয়া পড়িলা সে ফেরে॥"
কন্দর্প-বাক্যেতে শচী,
কুন্তলে ফণিনী রচি,
এক-দৃষ্টে দৃষ্টি করে তায়,
শুদ্ধ ভাব নিরুত্তর,
গণ্ড রাখে হস্ত'পর,
ছায়া যেন পড়ে সর্ব্ব গায়।
নিস্পন্দ শরীর মন,
সচেতনে অচেতন,
নিঃশ্বাস না সরে নাসিকায়।
অজানিত অচিন্তিত,
চিন্তা যেন উপস্থিত,
হৃদয়েতে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
কুন্তলরচিত ফণী,
নিরখি মেঘবাহনী,
কহে শচী চপলা চাহিয়া,
"এ নরক মম ভাগে,
সখী, নাহি জানি আগে,
দেখি নাহি কখন ভাবিয়া॥
দুর্গতির শেষে যাহা,
শচীর হয়েছে তাহা,
ভাবিতাম সদা মনে মনে।
আরো যে শত ধিক্কার
কপালে আছে আমার
সে কথা না উদিলা চেতনে।
কেমনে চপলা বল,
পরশিবে করতল,
দানবীর চরণ-নূপুর?
কেমনে গো স্তনহার
স্তন শোভিবারে তার,
ভুজে দিব কেমনে কেয়ূর?
কেমনে সুকাঞ্চী ধরি'
দিব কটিতট 'পরি,
কেমনে বা কবরী বান্ধিব?
বিনাব কুন্তলে বেণী,
কিরূপে মুকুতা শ্রেণী
ভালে তার সাজাইয়া দিব?
সখি রে যে জানি নাই.
কিরূপে সে ভাবি তাই
সাজাইব দানব-মহিলা,
যার কাছে যাব এবে,
কেবা সে শিখায়ে দেবে
দাসীপনা তুষিতে ঐন্দ্রিলা!
যার অঙ্গে যত্ন ক'রে
দক্ষ-কন্যা সমাদরে
পরাইত বসন ভূষণ।
সে আজি লো দাসী হৈয়ে,
বস্ত্র আভরণ লৈয়ে,
ঐন্দ্রিলার করিবে সেবন!
হায় লজ্জা! হায় ধিক্!
শ্রবণেরে শত ধিক্!
এ কথা কুহরে স্থান দিল।
দাসীপনা বাকি কিবা,
সিংহী ছিনু হৈনু শিবা,
যখন এ শুনিতে হইল!

কেন হে কন্দর্প তুমি,
আইলা মরত-ভূমি,
কেন কহ শুনালে আমায় ?
হৃদি'পরে গুরু শিলা,
কেন বল চাপাইলা,
অনঙ্গ হে কি দোষ তোমায় ?
ঘটিত কপালে যদি,
ঘটিত হে সে অবধি,
দাসত্বে যাইত যবে শচী।
আগে কৈয়ে কেন মার,
অন্তরে দাসত্ব-ভার,
শচীরে হে করিলে অশচী।
চপলা সত্যই কি না,
সেবিতে হবে ঐন্দ্রিলা,
শচীর কি কেহই রে নাই !
অপাঙ্গ পড়িলে যার,
ভয় হৈত দেবতার,
দেব যক্ষ তুষিত সবাই ;
তাহার এ দুর্ব্বিপাকে,
কেহ নাই তারে রাখে,
দানবেরে করিয়া দমন,
ইন্দ্র যেন তপে নিষ্ঠ,
কোথা দেব অবশিষ্ট,
সূর্য্য চন্দ্র বরুণ পবন ?
কোথা স্কন্দ হুতাশন,
কোথা গণদেবগণ,
বৃথা নাম লই সে সবার ;
ইন্দ্রত্ব গিয়াছে যবে,
আর কে শুনিবে সবে,
শচীরে ভাবিবে কেবা আর ॥

তবুও ত নিরাশ্রয়
ইন্দ্রাণী এখন (ও) নয়,
ইন্দ্রাণী ত পুত্রের জননী।
সখী রে বাসব সম,
আছে ত জয়ন্ত মম,
ইন্দ্রাণী ত বীরপ্রসবিনী ॥
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত,
জননীর দুঃখ অন্ত,
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়।
তোমার প্রসূতি, হায় !
দৈত্যের দাসত্বে যায় !
রক্ষ আসি পুত্র তব মায় ॥"
এত কহি ইন্দ্রপ্রিয়া,
ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ।—
জননী ভাবেন যদি,
সে ভাবনা, গিরি, নদী,
ভেদি, সুতে করে আকর্ষণ ॥
জয়ন্ত পাতালদেশে,
শুনিলা ক্ষণ-নিমেষে,
মায়ের সে মানসের ধ্বনি !
ব্যথিত কাতর মনে,
কটি বান্ধি সারসনে,
অবনীতে চলিলা তখনি ॥
কন্দর্প শচীর স্থান,
বিদায় পাইয়া যান,
পুনঃ সেই নন্দন-কানন।
শচীর সান্ত্বনা আশে,
চপলা দাঁড়ায়ে পাশে,
কহে স্নিগ্ধ বিনীত বচন ॥

পঞ্চম সর্গ

চপলা শচীরে কহে, "শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া,
অদ্যাপি জয়ন্ত না আইসে কি লাগিয়া ?
বুঝি বা বিভ্রাটে কোন পড়িলা আপনি !
তাই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনি।
কন্দর্পের কথায় অন্তরে ভাবি ভয়,
মর্ত্ত ছাড়ি, চল দেবি, বৈকুণ্ঠ-আলয় ;
কিম্বা সে কৈলাসে চল উমার নিকটে ;
বিশ্বাস কর্ত্তব্য কভু না হয় কপটে।
কমলা, অথবা গৌরী, অথবা ব্রহ্মাণী,
নিশ্চয় আশ্রয় দান দিবে, ইন্দ্ররাণি।"
ইন্দ্রাণী চপলাবাক্যে কহে, "কিবা কহ,
অন্যের আশ্রয়ে বাস শচীর দুঃসহ।
পরবাসে পরবশ, সদা চিত্তে মলা ;
আশ্রয়দাতার মতি-গতি বুঝে চলা ;
চিন্তিত সতত, ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই ;
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই !
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা স্বাধীন উল্লাস ;
সসর্প গৃহেতে বাস, পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার !
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ,
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ !
শুন, প্রিয়তমা সখি, সে আশা বিফলা,
মর্ত্ত ছাড়ি পরাশ্রয়ে যাব না, চপলা।"
চপলা শুনিয়া দুঃখে কহিলা তখনি,
"ছদ্মবেশে থাক তবে বাসব-ঘরণি।"
কহে ইন্দ্রপ্রিয়া, "সখি, শুন লো চপলা,
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা।
ঘৃণিত আমার, সখি, গোপন-নিবাস ;
ছদ্মবেশ কদাচ না করিব প্রকাশ।
চিরদিন যেই রূপ জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, যেই রূপ শচীর(ও) এখন।
আসিছে দংশিতে ফণি করুক দংশন—
নিজরূপ, সখী, নাহি ত্যজিব কখন।"
বলিতে বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ
অপূর্ব্ব গরিমা-ছটা কিরণ-আভাস।
নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্য্যোদয় !
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মাদ(ও) যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেহ, সে নেত্র বদন।
নিরখি চপলা-চিত্তে অসীম আহ্লাদ ;
চিন্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ।
ভাবিতে লাগিল শেষে বিপুল হরিষে—
"নন্দন-সদৃশ বন সৃজিব নৈমিষে।
মহেন্দ্রাণী-যোগ্য তবে হইবে এ বন ;
এ মূর্ত্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ।
কপটী দানব মুগ্ধ হইবে মায়ায়,
না পারিবে পরশিতে শচীর কায়ায়।
প্রকাশিব ক্ষিতির ঐশ্বর্য্য যত আজি ;
শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজি।"
চপলা এতেক ভাবি বিচিত্র কানন,
শচীর অজ্ঞাতসারে, কৈলা প্রকটন।—
মানস-মোহকর নবদ্রুমরাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয়-সুগন্ধি,
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল থরথর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মরমর নাদে।
হাসিল ফুলফুল মঞ্জুলমঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন-ফুল্ল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ।
নাচিল চিত-সুখে ময়ূর কুরঙ্গ ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।

সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
সুরষ অরধ ; অরধ শশিশোভা ;
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে—
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।
হেনকালে ইন্দ্রসুত আসিয়া সেথায়,
দাঁড়াইলা প্রণমিয়া জননীর পায়।
জননী পুত্রের মুখ বহু দিন পরে
দেখে যদি, হৃদয়ের সর্ব্বচিন্তা হরে ;
অন্য আশা, অভিলাষ ক্ষোভ যত আর,
অন্তরে বিলীন হয় বাষ্পের আকার,—
প্রভাতে যেমন সূর্য্য-তরুণ কিরণ
ধরণী পরশি করে কুজ্‌ঝটি হরণ!
পুত্র পেয়ে, শচী যেন পাইলা আবার
স্বর্গের বৈভব যত, ঐশ্বর্য্য তাহার।
বারংবার শিরঘ্রাণ, চিবুক আঘ্রাণ,
লইলা, ধরিলা কোলে, পুলকিত প্রাণ।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ,
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ ;
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে,
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ-সলিলে ;
তরু যথা নবোদ্‌গত কিসলয়রাজি,
বসন্ত-প্রারম্ভে ধরে নীল পীতে সাজি ;
নিদ্রা যথা ভুজদ্বয় প্রসারণ করি,
ক্লান্তপরাণীরে রাখে বক্ষস্থলে ধরি ;
শুক্রতারা ধরে যথা নিশান্তে যামিনী ;
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।
অঞ্চলে মুখের ধূলি ঝাড়ি সুখে চায়,
মৃদু পরশনে কর সর্ব্বাঙ্গে বুলায়।
কাতর অন্তরে কহে চপলা-চাহিয়া—
"দেখ, সখি, সে শরীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ;
পল্বলের শুষ্ক পদ্ম পঙ্কেতে যেমন,
সখি রে, বৎসের আস্য তেমতি এখন!
খোল, বৎস, খোল তব কবচ অঙ্গের,
এ ভূষণ নহে যোগ্য এ শুষ্ক দেহের।
সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে,
স্নিগ্ধ হও কিছু কাল মহীর সমীরে ;
স্বর্গের অনিলতুল্য নহে এ সমীর,
তথাপি জুড়াবে, বৎস, হইবে সুস্থির ;
পাতালবাসের ক্লেশ হৈবে অবসান
সেবিলে এ সমীরণ—খোল অঙ্গত্রাণ।"
বলিতে বলিতে বর্ম্ম খুলিলা আপনি ;
উরসে অস্ত্রের চিহ্ন দেখিলা তখনি।
আশ্চর্য্য ভাবিয়া শচী জিজ্ঞাসে, "তনয়,
এ কি দেখি বক্ষ কেন ক্ষতচিহ্নময় ?
কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার
হেন চিহ্ন—এ কি সব অস্ত্রের প্রহার ?"
জয়ন্ত কহিল, "মাতা, আমার উরসে
ছিল না কলঙ্ক কভু অস্ত্রের পরশে ;
কেবল সে শিবদত্ত অসুর-ত্রিশূল
এবার ধরেছি বক্ষে - হৈও না ব্যাকুল—
অন্য অস্ত্রে দেব-অঙ্গ ভেদ নাহি হয়,
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়।"
শুনিয়া পুত্রের বাণী কহিলা ইন্দ্রাণী,
"বৎস রে, কতই কষ্ট ভুগিলা না জানি ;
জান নাই কভু আগে অস্ত্রের যাতনা—
না জানি সহিলা কত বিষম বেদনা!
হায় শিব! হে শঙ্কর! হে দেব শূলিন্‌!
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন?
হায় উমা! শচীরে কি কিছু স্নেহ নাই ?
কি দোষ করেছি কবে, কহ তব ঠাঁই ?
তোমার নন্দনে, গৌরি, কতই যতনে
রেখেছি অমরালয়ে, বিদিত ভুবনে ;
পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ, দেব-সেনাপতি—
শচীর নন্দনে উমা কৈলা এ দুর্গতি!
শিবের ত্রিশূল বৃত্র করিলা প্রহার।
সেই বৃত্র মাহেশ্বরি, আশ্রিত তোমার!"
কহি দুঃখে কহে শচী, "আমায় উদ্ধারি
কাজ নাই, বৎস, আর হৈয়ে অস্ত্রধারী।

জানিলে অগ্রে কি আমি মানসে স্মরণ
করিতাম তোরে হেথা করিতে গমন ?
শতবার ঐন্দ্রিলার চরণ সেবিব,
অকাতরে স্বর্গের আসন তারে দিব ;
তোমার কমল অঙ্গে ত্রিশূল-প্রহার,
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।"
শুনিয়া মাতার বাক্য ইন্দ্রসুত কয়—
"জননি, ছাড়িব তোমা ? যাতনার ভয় ?
চিন্তা দূর কর, স্থির হও গো জননি,
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসবঘরণি,
পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষ বার
তব আশীর্ব্বাদে শিবত্রিশূল-প্রহার।
কহ, মাতঃ, কি কারণে স্মরিলা আমায় ;
কি বিপদ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায় ?"
চপলা, শুনিয়া শচী-নন্দন-বচন,
বিস্তারি কহিলা তারে সর্ব্ব-বিবরণ।
কন্দর্প নৈমিষে আসি ভীষণ-বারতা
প্রকাশিলা যেইরূপ, প্রকাশিলা তথা।
শুনিয়া জয়ন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলিতে লাগিলা ক্রোধে, বিস্তৃত নয়ন।
দেখি শচী কহে, "বৎস, হও রে শীতল,
ভ্রম কিছুক্ষণ এই নৈমিষ-মণ্ডল ;
হের, বৎস, সুধাকর উঠিছে গগনে,
স্নিগ্ধ হও কিছুক্ষণ শশীর কিরণে।
মহীতে মাধুরীময় সুধার সঙ্কাশ,
একমাত্র আছে অই চন্দ্রমা-প্রকাশ !
উহারি কিরণে তব তনু সুকুমার,
জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার।"
শুনিয়া জননী-বাক্য, জয়ন্ত তখন
অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন ;
চিন্তিয়া চলিলা ধীরে কানন-ভিতরে,
শীতল সমীর সেবি হেরি শশধরে।
চপলা, কানন রচি, আনন্দে বিহ্বলা,
বেড়ায় চৌদিকে সুখে হইয়া চঞ্চলা।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ দুজন
কাননিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন।
জিজ্ঞাসিছে এক জন চাহি অন্য প্রতি,
"কোথায় আনিলা দূত,আ(ই)লা কোন্ পথি?
নৈমিষ-অরণ্য কোথা ? দেখি যে উদ্যান,
স্বর্গের নন্দনতুল্য পূর্ণ পুষ্পঘ্রাণ ;
চারু মনোহর লতা ; পল্লব মধুর,
পক্ষিকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর ;
মোহকর মনোহর সুস্নিগ্ধ বাতাস,
কিরণ জিনিয়া চন্দ্র পুরণপ্রকাশ ;
কোথায় নৈমিষবন ? অমরাবতীতে
এখন(ও) ভ্রমিছ ভ্রমে, না আ(ই)স মহীতে।"
দূত কহে, "জানিতাম এখানে নৈমিষ,
না জানি কি হৈল্য তবে হারায়েছি দিশ!
হইল সে বহুদিন মর্ত্তে নাহি আসি—
হবে বা নৈমিষ এই—এবে কুঞ্জরাশি।"
হেনকালে চপলারে দেখিতে পাইয়া,
জিজ্ঞাসা করিলা তায় নিকটে আসিয়া।
চপলা কহিলা, "কেন, কিসের কারণ,
নৈমিষ-অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ ?
এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে ;
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে ?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন-আকার।
বল আগে, কার দূত, পুরুষ কি নারী ?
পার কি চিনিতে? বুঝি আমি যেন পারি।
হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মানব—
হায় রে সে স্বর্গ, যথা অমর-বৈভব !"
ভাবিলা ভীষণ, তবে এই হবে শচী,
মায়ায় নন্দনবন মর্ত্তে আছি রচি।
প্রফুল্ল পরাণে কহে "ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল ;
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।

যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার ;
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার,
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ, তাই সুরপতি
পাঠাইলা লৈতে তোমা আপন বসতি।”
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা,
“আমায়, সন্দেশবহ, চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল !
শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী, জানিহ নিশ্চয়।
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত ?
নূতনে নূতন জ্বালা, বুঝে না সঙ্কেত !”
‘শিব !’ বলি, দূতবেশী কহে দৈত্যচর,
“চিনেছি চিনেছি—ভ্রান্তি নাহি অতঃপর।
শচী-সহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা”—
“আবার ভুলিলা দূত,” চপলা কহিলা—
“থাক মেনে, আর কেনে দেও পরিচয়—
মূর্খের অশেষ দোষ, কহিনু নিশ্চয় ;
অহে দূত, বুঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা, মণি চুনা দুর্ঘট ঘটনা।
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা ;
শুন দূত, শচী-দূতী আমি সে চপলা।
আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে,
না হবে নৈরাশ, ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।”
বলিয়া চপলা চলে ; পশ্চাতে তাহার
চলিলা পুরুষ, পারিজাত হস্তে যার।
দেখিয়া কানন-শোভা মোহিত ভীষণ ;
শত শত উপবন অমরমোহন,
নিরখিলা চারিদিকে—নিরখিলা তায়
কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায় ;
পলাশ, বল্লরী, পুষ্প, তরুণ লতায়
সুশোভিত, নন্দনের সদৃশ শোভায় !
লতায় লতায় ফুল, লতায় লতায়
শিখিনী নাচায় পুচ্ছে চন্দ্রক-মালায় ;

ঝাঁকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রততী উপরে
মধুলিহ পড়ে ঢলি সুখে মধুভরে ;
তরুণ অরুণ, কিবা মৃদু শশধর,
জিনিয়া মৃদুল রশ্মি কাননভিতর !
শ্রবণ-সুস্নিগ্ধকর মধুর নিঃস্বন
কাননে ঝরিছে নিত্য করিয়া প্লাবন।
মধ্যস্থলে ইন্দ্রপ্রিয়া বৈসে ধীরবেশ ;
জলদবরণ পৃষ্ঠে সুনিবিড় কেশ।
মুখে আভা ভানু যেন উথলিয়া পড়ে !
গাম্ভীর্য্য-প্রতিমা বিধি দেহে যেন গড়ে !
দেখিয়া স্তিমিতনেত্র হইলা ভীষণ,
বাক্‌শূন্য, শ্রুতিশূন্য করে দরশন।
বিশ্বসৃষ্টি করি, যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ
করিলা মানব-চিত্তে চৈতন্য প্রভাত,
আদিসৃষ্ট সেই প্রাণী নবসূর্য্যোদয়
যে ভাবে দেখিলা, দৈত্য সেই ভাব হয়,
সংজ্ঞা নাই, চিন্তা নাই, নাহি আত্মজ্ঞান,
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য, পরাণ !
প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া ;
চপলারে জিজ্ঞাসিলা ভাবিয়া চিন্তিয়া—
“পুরন্দর-ভার্য্যা শচী এই কি ইন্দ্রাণী ?”
চপলা কহিলা, “এই ত্রিদিবের রাণী।”
ভাবিতে লাগিলা মনে ভীষণ তখন,
“সত্যই স্বর্গের রাণী ইন্দ্রাণী এ জন !
কোথায় ঐন্দ্রিলা—বুঝি, দাসীর সে দাসী
তুলনায় নহে এর, চিতে হেন বাসি।
ধন্য সুরপতি ইন্দ্র ! এ অরুণ যার
চিরোদিত গৃহমাঝে ঘুচায় আঁধার।”
নানা চিন্তা এইরূপ করে মনে মনে,
না বুঝে স্বরগে শচী লইবে কেমনে ;
অচল নিরখি যার বদনপ্রভায়,
পরশে কেমনে তায় ভাবিয়া না পায় ;
বিষম বিপদ ভাবে, উভয় সঙ্কট,
ভাবিলা সে কার্য্যসিদ্ধি অসাধ্য, দুর্ঘট ;

অনেক চিন্তিলা, স্থির নারিলা করিতে।
কিরূপে লইবে শচী অমরাবতীতে।
হেনকালে ইতস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
জয়ন্ত, ভীষণে দূরে পাইলা দেখিতে।
"অরে রে কপট দৈত্য" বলিয়া তখন,
ধাইলা তুলিয়া খড়্গ, যেন হুতাশন।
কহিলা ভীষণে চাহি কুটদৃষ্টি ধরি,
ক্ষণকাল খড়্গ শূন্যে সম্বরণ করি—
"চল্, এ কানন-বহির্ভাগে শীঘ্র চল্,
জননীর বাসভূমি নহে যুদ্ধস্থল ;
নহে বৈধ স্ত্রীজাতির সম্মুখে সমর,
চল্ এ উদ্যান ছাড়ি, পাষণ্ড বর্ব্বর !"
জয়ন্তে দেখিবা মাত্র চিন্তা গেল দূর,
ধরিল বিকট মূর্ত্তি ভীষণ অসুর।
গর্জ্জিল সিংহের নাদে শেল ধরি করে,
ঘুরায় শূন্যেতে ঘন মেঘের ঘর্ঘরে।
না ছাড়িতে শেল শীঘ্র বাসব-নন্দন
"জননী, অন্তর হও" বলিয়া, তখন
বেগে হেলাইয়া খড়্গ ভীষণ গর্জ্জিয়া,
পড়িল বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া ;
শূন্যে খেলাইয়া অসি বিজুলি আকার,
চকিতে কন্ধরমূলে করিল প্রহার।
বিচ্ছিন্ন হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তরে,
ঘোর শব্দে পড়ে গাত্র ভূতল উপরে।
শালবৃক্ষ পড়ে যেন হইয়া ছেদিত,
অথবা আগ্নেয়শৃঙ্গ অগ্নি-বিদারিত।
শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন
প্রবেশিল দ্রুতগতি, ভেদিয়া কানন।
দেখিয়া তাহারে, কহে জয়ন্ত কর্কশ—
"তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ।
যা রে দাস, যা রে ফিরে দৈত্যের নিকট,
সমাচার দিস্— 'তার ভীষণ বিকট
জয়ন্তের খড়্গাঘাতে লুটে ধরাতল' ;
অন্য আর যারে ইচ্ছা পাঠাইতে বল্।
ভেট দিস্ দৈত্যরাজে—ধর্ মুণ্ড ধর্ !"
বলিয়া নিক্ষেপি মুণ্ড ফেলিল অন্তর।
ত্রাসিত, অস্থির দূত বিস্মিত ভাবিয়া
বৃত্রাসুরে বার্ত্তা দিতে চলিল ফিরিয়া।
জয়ন্ত, আনন্দচিত্ত, জননী-নিকটে—
উপস্থিত হৈলা আসি এড়ায়ে সঙ্কটে।

ষষ্ঠ সর্গ

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।
দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল ;
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।
প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণ-দর্শন—
পাষাণ-সদৃশ-বপু, দীর্ঘ উন্নবান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীমদর্পে ভীম-তেজে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।
জাগ্রত, সুসজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ত্মে বর্ত্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।
অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে ;
রাত্রি-দিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ,
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিকে দিকে ব্যাপি।

ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে,
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা-দনুজে।
অর্ণবের উর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি, অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম,
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু-অভিমুখে;
অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল;
কিম্বা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে;
সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে,
জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।
সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জ্জন ক'রি বচন কর্কশ—
"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন(ও) দেবতা!
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে!
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয়-হৃদয়ে?
মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন?
ধিক্ আজ দৈত্য নামে! হে সৈনিকগণ!
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে!
কোথা সে সাহস, বীর্য্য, শৌর্য্য, পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির-রণজয়ী?
সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিলা কতবার অতুল বিক্রম;
নাহি স্থান বসুধার কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে!—
পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনি,
বিস্মিত করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে,
জিনিলা স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে লাঞ্ছিয়া;
খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশকবৃন্দের মত—দৈত্য-অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে!
সেই পরাজিত; তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিলা সংগ্রামে;
না পার জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া
রে ভীরু দানবগণ! নামে কলঙ্কিলা!
স্বয়ং যাইব অদ্য, পশিব সমরে;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ।
আন্ রে সে শিবশূল—আন্ রে আমার
বিজয়ী ত্রিশূল যাহা অর্পিলা শঙ্কর।"
বলিয়া গর্জ্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রমে।
দেখিয়া ত্রাসিত যত দানব-সৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য হেরে নিস্তব্ধ সকলে।
নিরখে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শঙ্খের নাদে বৃংহিত করিয়া!
তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়—
শোভিত-মাণিকগুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত,
কহিলা পিতারে চাহি হ'য়ে কৃতাঞ্জলি;
কহিলা—"হে তাত! জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
কর অবধান, পিতঃ, পূরাহ বাসনা,
দেহ আজ্ঞা আমি অদ্য যাই এ সংগ্রামে।
যশস্বিন্! যশঃ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায় তবে,
আত্মজ আমরা তব হৈব যশোভাগী?
কোন্ কালে আর তবে লভিব সুখ্যাতি?
কীর্ত্তি যাহা—বীরলব্ধ বীরের আরাধ্য—
বীরের বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা,
সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জ্জন,
কি রাখিলা রণকীর্ত্তি মণ্ডিতে তনয়ে?

ভাবিতে ত হয়, তাত, ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে ?
জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে ?
জন্ম বৃথা ! কর্ম্ম বৃথা ! বৃথা বংশখ্যাতি !
কীর্ত্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা !
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জী'নে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয় !
বিভব, ঐশ্বর্য্য, পদ, সকলি সে বৃথা !
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের ;
পুজ্য সেহ কোন কালে নহে কোন লোকে,
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায় !
বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী ;
গৌরব, সম্পদ, তেজঃ, নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত !
সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট,
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত ।
যশোলিপ্সা কদাপিহ ভীরুর অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্য্যবান্ !—
বীরের স্বর্গই যশঃ, যশ(ই) সে জীবন ;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে ।
কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতি-পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে সুখে অই পদরেণু ।
জানিবে অসুর সুরে—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার ।"
চাহিয়া সহর্ষচিত্ত পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি ;—
"রুদ্রপীড় ! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে ;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা, পুত্র যশোধর !
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরও ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানব-তিলক !
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রোজ্জ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া !
অনন্ত তরঙ্গময় সাগরগর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর ;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে সে সুখ—
কিংবা সে গঙ্গোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত !
তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত,
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত ।
সেই সুখ সে উৎসাহ হায় কত কাল
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্ব্বার ।
নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ;
দেখ্ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন, কলঙ্ক গভীর !
যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক
সেনাপতি পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে,
যাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে ।"

রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃ-পদধূলি
সাদরে লইয়া শিরে শুনিয়া ভারতী,
এ হেন সময়ে দূত, নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাতলে হৈলা উপনীত।
দূতে দেখি দৈত্যপতি, উৎসুক-হৃদয়,
কহিলা, "সন্দেশবহ, কি বারতা কহ?
কিরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশ বা তুমি?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী, কোথা বা ভীষণ?"
আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন,
কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায়,
বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার!
কহিলা, "প্রথম যবে আইনু এ স্থানে,
স্বর্গ হৈতে বহুদূর হিমাচল পথে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গে, প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনী সহ।
নানা ছল নানা বেশ বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পথে হৈনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ; অতঃপর শেষে
পুরী-প্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।
প্রাচীর-নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে, জাগরিত যথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।
আসন্ন বিপদে চিত্তে হইল উদয়,
জটিল কৌশল এক, গূঢ় প্রতারণা—
'ঐন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয়-পারে,
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব্ব-দানবে,
সেই সমাচার লয়ে ত্বরিত-গমনে
ঐন্দ্রিলা-নিকটে যাই, পিত্রাদেশে তাঁর,
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান্
সমরে সহায় হ'ন এ তার প্রার্থনা।'—
এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিলা মোরে পুরী প্রবেশিতে।
আদেশ পাইবামাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।"
শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর;—
"এ বারতা, দূত, তোর অলীক কল্পনা,
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া ভীষণ সংহতি—
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত?"
দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ কম্পবিরহিত—
যথা নব কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।
সুমিত্র, দানব-মন্ত্রী কহিলা তখন,—
"দৈত্যেশ্বর! দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচী সহ
মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"
নতমুখ, নিম্নদৃষ্টি, দূত, ক্ষুণ্নমতি,
কহিলা—"না মন্ত্রি ব্যর্থ আশ্বাস তোমার;
নৈমিষ-অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।"
"ভীষণ নিহত!"—গর্জ্জিলা দানবপতি।
"হা রে রে বালক—জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী!—
দম্ভ তোর এত?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস;
"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি, গাঢ় নিরীক্ষণ—
"যশোলিপ্সা চিত্তে তব অতি বলবতী
কর তৃপ্ত জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি;
শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন, যাও ধরাধামে;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে, অচিরাৎ পালহ আদেশ।"
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা,—"দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হইবে নির্গত?

যুদ্ধে পরাজয়ি যদি দেব-অনীকিনী,
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সত্বরে কিরূপে
হইবে কুমার-কল্প, তব অভিপ্রেত।
অসংখ্য এ দেবসেনা দুর্দ্দম সংগ্রামে,
অমর তাহাতে সবে, সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অন্য অস্ত্রাঘাতে,
মূর্চ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিহনে।
তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি ?
কুমার সংহতি অন্য, দানব ঈশ্বর ?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ ?"
দৈত্যেশ কহিলা—"মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্রে, না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"
নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শূল,—
"পুরী-রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।"
ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট-প্রদেশে,
স্থাপিয়া অঙ্গুলীদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া
কহিলা দানবপতি,—"সুমিত্র হে, এই—
এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে বৃত্রের,
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিম্বা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তায়—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড় !"
রুদ্রপীড় কহে "মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ?
জান না কি অভেদ্য এ আমার শরীর ?
বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে।
ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,
যাইব অমর-ব্যূহ ভেদিয়া সত্বর,
আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।
হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ;
বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ
বিব্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।"
এরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে,
শত সুসৈনিক দৈত্য-সংহতি লইয়া
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত-বেশ।
অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্য কেহ সমর উচিত—
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয় সঙ্কটে।
নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ ;
যুদ্ধই তাহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
ছল কি কৌশল তার নহে অভিপ্রেত।
নিরুপায়, কোনমতে সমরে সম্মত
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে,
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে
অন্য কোন সদুপায় করিতে সুস্থির।
স্থির হৈল অবশেষে কাহার(ও) বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
পশিলা নগরী মধ্যে, অবলম্বি তাহা,
নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিষে।
কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন
আসি উপনীত দ্রুত—আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর-শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন শূল-বিরহিত।
উড়িলা কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত,
প্রকাণ্ড অর্ণবপোতে ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে,
সমরকেতন অন্য হৈল সঙ্কুচিত।

বাজিল সন্তাষ-শঙ্খ, দূত কোন জন
বার্ত্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চসম্বোধনে,—
বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা।
"ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয় পারে,
গন্ধর্ব্ব-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক ;
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে।
দেবকুল, তাহে যদি থাকহ সম্মত,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছুকাল,
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান।"
বার্ত্তা শুনি, দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ—
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার—
মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা,
কি কর্ত্তব্য দানবের এবিধ প্রস্তাবে।
নিষেধ করিলা পাশী—প্রচেতা সুধীর,—
"উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে,
কপট, বঞ্চক, ক্রূর, দিতিসুত অতি,
নহেক উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের।
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে ?
সেখানে থাকিলে পাশী না ছাড়িত তায়।"
সূর্য্য অভিপ্রায়,—"দৈত্যযোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যাক অবিরোধে,
দেব-যোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে।"
অগ্নি কহে—"তুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ নাহিক তায়, নাহি অনিষেধ,
সমর দৈত্যের সনে যেইখানে থাক্‌,
সম্মুখে পশ্চাতে শক্র কি তাহে প্রভেদ ?
সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে,
অভিমতি দিলা তার— সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিলে তাহার (ই) সহিত।
মহাসেন, সেনাপতি, সকলের শেষে
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্ব্বল
করাই কর্ত্তব্য কার্য্য যুদ্ধের বিধানে ;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।
স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি, দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হৈবে পুরী রক্ষক বিহনে,
শ্রেয়ঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর।"
সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে,
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত ;
বার্ত্তা লৈয়ে বার্ত্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড়-সন্নিধানে নিবেদিলা দ্রুত।
মহাহর্ষ হৈল সবে ; দৈত্য যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা,
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী-উদ্দেশে,
নৈমিষ-অরণ্যে যথা শচী-নিবসতি।

সপ্তম সর্গ

হেথা সুরপতি ইন্দ্র কুমেরু-শিখরে
নিয়তির পূজা সাঙ্গ করিয়া চাহিলা,-
চাহিলা বিস্ময়ে যেন, নিরখি নূতন
গগন ভূতল মূর্ত্তি বিশ্ব অবয়ব।
কহিলা বাসব—"হায়, গত এত কাল!
যুগান্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস!
ভাবি যেন পরিচিত পুর্ব্বের জগৎ
ধরিছে নূতন ভাব ছাড়ি পুরাতন!

যেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল,
কুমেরু-শরীরে, এবে নিরখি সেখানে
প্রকাণ্ড প্রসারি শূন্যে উন্নত-শিখর
নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীরুহ কত!
পূর্ব্বে হেরিয়াছি যেথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিমণ্ডিত,
লতাগুল্মসমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজ গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া।
গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেইখানে,
বিস্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্থল,
তরু-বারি বিরহিত তাপদগ্ধ সদা,
নিরন্তর সমাকীর্ণ বালুকারাশিতে!
নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্তমাঝে হয়েছে প্রকাশ ;
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষ-পথে!
এত কাল হৈল গত পূজায় নিয়তি,
নিয়তি এখন ও) তুষ্ট না হইলা মোরে।
আদিষ্ট না হই, কিম্বা না পাই সাক্ষাৎ,
না বুঝি কেন বা দৈব এত প্রতিকূল!
আবার পূজিব তাঁরে কল্পান্ত পুরিয়া,
দেখি প্রতিকূল তিনি হন কত কাল!
অন্য চিন্তা, আশা, ইচ্ছা, সব পরিহরি,
বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত।"
এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর,—
বসিতে পূজায়, পুনঃ নিয়তি তখন
আবির্ভাব হৈলা আসি সম্মুখে তাঁহার
পাষাণমূরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয়।
মাধুর্য্য কি সহৃদ্যতা কিম্বা দয়ালেশ,
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিত্য নিরীক্ষণ
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য পটে।
অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া
বাসবে ;—

"কেন ইন্দ্র! নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিবা রুষ্ট কভু ;
অজ্ঞাত নহ ত তুমি সৃষ্টি হৈলা যবে,
তদবধি এ আলেখ্য অর্পিলা আমায়
বিরিঞ্চি কমলাসন, নাহি সাধ্য মম
ব্যর্থ করি অণুমাত্র ইহার লিখন।
অন্যথা সূচ্যগ্রে যদি হয় লিপি এর,
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণতিলেক না রবে,
খণ্ড খণ্ড হবে ধরা, শূন্য, জলনিধি,
বিশাল শৈলেন্দ্র চূর্ণ হবে অচিরাৎ।
বিকলাঙ্গ হবে বিশ্ব—মনুষ্য, দেবতা,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কাল, পরমাণু—
বিশৃঙ্খল হৈবে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল,
ভাগ্যের এ লিপি যদি তিলার্দ্ধ খণ্ডিত।
বাসব, আমার পূজা কি হেতু বৃথায়?
বিবেক হয়েছ হারা পড়িয়া বিপদে,
নির্ম্মল দেবের চিত্ত আচ্ছন্ন বিপাকে।
তাই ভ্রান্ত হয়ে চাও অসাধ্য সাধিতে।
নাহি চাহি, ভাগ্য তব ভবিতব্য-লিপি
খণ্ডন করিতে বিন্দু-বিসর্গ প্রমাণ।"
কহিলা বাসব দুঃখে—"না চাহি কদাচ
অসাধ্য তোমার যাহা আমায় তা দিতে ;
কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্য-কুলপতি বৃত্র ; কত দিনে পুনঃ
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে,
কত দিনে পূর্ণ হবে দেবের দুর্গতি?"
নিয়তি কহিলা ;—"ইন্দ্র, কি উপায়ে হত
হইবে দানবরাজ, কহিতে সে পারি,
কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার ;
তুমি না হলেও অন্যে জানিত না কিছু।
তুমি সুরপতি ইন্দ্র—তোমায় কিঞ্চিৎ
ভবিতব্য গূঢ় লিপি করি প্রকটন ;
'ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্রের বিনাশ,'—
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিব-পাশে।"
এত কহি অন্তর্হিতা হইলা নিয়তি।

বাসব সহর্ষচিত্ত চিন্তি ক্ষণকাল,
ভাগ্যের ভারতী চিত্তে
আন্দোলিয়া সুখে,
অচিরাৎ স্বপ্নদেবে করিলা স্মরণ।
কহিলা,—"হে দেবদূত সুসন্দেশবহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন যেখানে,
কহ গে তাদের দূত, এ সুবারতা.
কুমেরু-পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র-বিনাশ যেরূপে।
'কৈলাসে ধূর্জ্জটি-পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য-লিপি যথা, বৃত্রের বিনাশ.
ব্রহ্মার দিবার শেষে, ভাগ্যের ভারতী।'
নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে
জানিতে বিশেষ তথ্য, পিনাকী-নিকটে
গতি মম ; পুনর্ব্বার লভি শিবাদেশ,
অচিরাৎ সুরবৃন্দ-সংহতি মিলিব।"
বলিয়া চলিলা ইন্দ্র শিবের আলয়ে।
স্বপন, বাসব-বাক্যে স্বর্গ-অভিমুখে
দেবগণ সমুদ্দেশে করিলা গমন,
বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণা।
সেখানে আদিত্যগণ বসি নানা স্থানে
বিতণ্ডা করিছে নানা উৎসুক অন্তর,
কি উদ্দেশে বৃত্রাসুর নন্দনে আপন,
সৈনিক-সংহতি শত মর্ত্তে পাঠাইলা।
শত্রুপক্ষে, প্রত্যাশারে যাইতে আদেশ,
কেহ বা উচিত কহে, কেহ অনুচিত,
অলীক কথনে দৈত্য ছলিলা অমরে,
কেহ বা সংশয়যুক্ত কেহ দ্বৈধহীন।
প্রচেতা চিন্তায় মগ্ন, ভাবি কিছুকাল,
অনুভব কৈলা শেষে দৈত্য-অভিপ্রেত,—
শচীর প্রবাস মর্ত্তে ইন্দ্র কুমেরুতে,
তথ্য পেয়ে গেলা কোন(ও) সাধিতে অনর্থ
এরূপ সংশয় ভাবি প্রচেতা তখন,
প্রকাশিলা দেবগণে দ্বিধা আপনার,
কেহ কৈলা গ্রাহ্য তায় কেহ না শুনিলা,
মতামত নানামত প্রচেতা-বচনে।
দেব সেনাপতি স্কন্দ পার্ব্বতী-নন্দন,
কহিলা তখন—"বৃথা তর্ক কেন এত ?
যাক্ মর্ত্তে দূত কোন(ও) আসুক জানিয়া
সমর যথার্থ কি না গন্ধর্ব্ব দানবে।
সমাচার পেয়ে পরে কর্ত্তব্য বিধান
যা হয় হইবে শেষ, দূত কেহ যাক।"
কহিলা প্রচেতা—"কিন্তু অবসর পেয়ে
ঘটায় উৎপাত যদি, কি উপায় তবে ?"
উগ্রমূর্ত্তি অগ্নি ক্রোধে উদ্যত তখনি
যাইতে বসুধা মাঝে শত্রু সংহারিতে,
মন্ত্রণায় কালক্ষয়, সর্ব্বকর্ম্মে ক্ষতি,
একাকী যাইবে মর্ত্তে সদর্পে কহিলা।
তখন কহিলা সূর্য্য—"বিপদ্ যদ্যপি
ঘটে কোন(ও) দেবে মর্ত্তে, তখনি স্মরণ
করিবে সে অন্য দেবে মানসে ডাকিয়া,
দূত মাত্র এক জন প্রেরণ উচিত।"
হেন আন্দোলন হয় দেবগণ-মাঝে,
হেনকালে ইন্দ্র-দূত শুভবার্ত্তাবহ
স্বপন আইলা সেথা ; শীঘ্রতর অতি
একত্র হইলা তথা আদিতেয়গণ।
সহর্ষবদনে দূত অমরবৃন্দেরে
সম্ভাষি, কহিলা আজ্ঞা বাসবের যথা,
কহিলা—"আমারে ইন্দ্র শীঘ্র পাঠাইলা
শুনাইতে দেবগণে এ শুভ বারতা,—
কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র-বিনাশ-উপায়

'কৈলাসে ধূর্জ্জটি-পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য গূঢ়-লিপি বৃত্রের নিধন
ব্রহ্মার দিবার অন্তে—ভাগ্যের ভারতী।'
নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে,
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকীর পাশে

গতি তাঁর; পুনর্ব্বার জানি সমুদয়
অচিরাৎ সুরবৃন্দে দিবেন সাক্ষাৎ।"
দূতের বচনে মহানন্দ দেবগণে
মহাদম্ভে পুনরায় সংগ্রামে সাজিল;
পুনরায় দৈত্যকুল প্রাচীর-শিখরে
তুলিল পতাকা শিব-ত্রিশূল-অঙ্কিত।

অষ্টম সর্গ

বৈজয়ন্ত-ধাম এবে দৈত্যালয়,
প্রকোষ্ঠ-অন্তরে তায়,
ইন্দুবালা নাম, রুদ্রপীড়-রামা
নিমগ্ন গাঢ় চিন্তায়।
পূর্ণ মধুমাসে পূর্ণ কলেবর
পূর্ণকান্তি সুশোভন,
যেন কিসলয় চারু মনোহর
তেমনি দেহ গঠন!
মধুর সুষমা অতি মৃদুতর
সরস শিরীষ ছলে,
মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন
উছলি উছলি চলে;
কাছে বসি রতি করেতে ধারণ
গ্রন্থনরজ্জুর মূল;
অসম্পূর্ণ মালা উরুদেশ 'পরে
চারিদিকে আলা ফুল।
অবদ্ধ কুন্তল পড়েছে বদনে
গ্রীবাতে, উরস-পরে,
যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল
অর্দ্ধাবৃত শশধরে।
অর্দ্ধভঙ্গ স্বর ঘর্ম্ম বিন্দু ভালে
রতিরে চাহি সুধায়,
"পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী
কত দিনে আসা যায়।

নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ?
বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ,
যশস্বী কি রণে তেঁহ?"
বলিতে বলিতে মণিবন্ধ'পরে
আন্‌-মনে রাখে কর;
পরখি আয়তি, চেতিয়া অমনি
স্মরে "শিব শিব হর।"
কন্দর্প-কামিনী কহে—"ইন্দুবালা,
চিন্তা কেন কর এত?
পতি সে তোমার সমরে পণ্ডিত
সাধিবেন অভিপ্রেত।
সত্বরে ফিরিয়া আসিয়া আবার
মিলিবেন তব সনে,
বীর-পত্নী হৈয়ে দানব-নন্দিনি,
এত ভয় কেন রণে?"
কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস,
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায়! সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে!
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে ক'জন, ভাবে সে ক'জন
বীরপত্নী কিসে হয়!

কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ ;
যশঃ-তৃষা হায় মিটে না কি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন ?
পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি ।
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে
সমরের দাহ সহি ?"
কহিয়া এতেক, উঠি অন্যমনে,
অস্থির-চরণে গতি ;
ভ্রমে গৃহ-মাঝে গৃহ-সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি ।
"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে ।
"এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ"
বলি তাহে বৈসে ভুলে ।
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার
তুলি এই সারসন,
কহিলা, 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ ।'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কত দিন,
শিরে এই শিরস্ত্রাণ ।
কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ ।
অতি প্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি,
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি এক দিন,
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি ।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময় !
মনমথ দিলা তাঁয় !
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিলা আমার গায় !
এবে শুকায়েছে হয়েছে নির্গন্ধ
প্রিয়কর কত দিন,
না পরশে ইহা ; সমর-তরঙ্গে
রত তিনি অনুদিন ।
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার
সমরে শুধু নিদয় ;
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয় !
আমিও রমণী, রমণীও শচী
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই
মহাবীর পতি মম,
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম ।
ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে,
আমার (ই) হৃদয় কাঁপে !
না জানি একাকী গহন-কাননে
শচী ভাবে কত তাপে ।
ঐন্দ্রিল-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী দানব-মহিষী
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ !
আমারে না কেন কহিলা মহিষী
আমি সেবিতাম তাঁয়,
পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায় ?
কেন আ(ই)লা দৈত্য এ অমরালয়ে,
আছিল আপন দেশ ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশঃ
কি আশা মিটিবে শেষ ?
যায় দিয়া তারে ফিরি যদি দেশে
যায় পুনঃ দৈত্যপতি,
এ পোড়া আশঙ্কা, এ যন্ত্রণা যত,
তবে সে থাকে না, রতি !"

রতি কহে "আহা !—তুমি ইন্দুবালা
দানব-কুলের মণি।
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি !
দেখিলে তাহারে না জানি বা কিবা
করিত তোমার চিতে ;
বুঝি শোকভরে ক্ষণমাত্র কাল
এই স্থানে না থাকিতে।
সে অঙ্গ-গঠন, মুখের সে জ্যোতি,
সে চারু গ্রীবার ভান,
মহিমাজড়িত, সে গুরু চলনি
সে উরু, উরস-স্থান।
যে দেখেছে কভু চিরদিন তার
হৃদয়ে থাকয়ে পশি !
দেখিলা সে রতি এ পোড়া নয়নে
পূর্ণিমার সেই শশী।
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী সে শচী,
তাহারে কিঙ্করী বেশে,
রাখিবে এখানে ; রতির অভাগ্যে
দেখিতে হইল শেষে !"
সুকুমার-মতি কহে ইন্দুবালা
"হায়, রতি, কি কহিলা !
এ হেন রামারে করিতে কিঙ্করী
দৈত্যেন্দ্রাণী আকাঙ্ক্ষিলা !
আমারে লইয়া, কন্দর্প-কামিনি,
চল সে পৃথিবী'পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন
ধরিব পতির কর ;
আমার বিনয় নারিবে ঠেলিতে,
রাখিবে আমার কথা ;
নারীর বিনয় পতির নিকটে
কখন নহে অন্যথা।
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ,
সে সাধ মিটাব আমি ;
শচী-বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী।
কি পৌরুষ তাঁর বাড়িবে না জানি
রমণীর প্রতি বল !
চল, রতি, চল লইয়া আমারে,
যাব সে অবনীতল।"
কহে কামপ্রিয়া, "দৈত্যকুল-বধূ,
তাও কি কখন হয় ?
ভ্রমে চারিদিকে সদা দেব-সেনা
পুরীতে দানবচয়।"
"তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি ?"
কহে ইন্দুবালা সতী ;
"যাইতে অবশ্য আছে কোন(ও) পথ
সেই পথে চল, রতি।"
ইন্দুবালা-বাক্যে মীনকেতু-জায়া
কহে "শুন, দৈত্যাঙ্গনা !
যাবে ব্যূহ ভেদি বীর পতি তব
তুমি ত যুদ্ধ জান না।"
না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি,
ইন্দুবালা দ্রুতগতি,
গবাক্ষ-সমীপে আসিয়া আতঙ্কে
কহে, "অই শুন রতি !
অই বুঝি রণ হয় তাঁর সনে,
শুন অই কোলাহল ;
তুমুল সংগ্রাম, স্মর-সহচরি,
করে দেবাসুর-দল !
নামিতে ধরায় অই কি সে পথ,
অই দিকে, স্মর-সখি ?
অই বুঝি হায় রুদ্রপীড়-ধ্বজ
উড়িছে শূন্যে নিরখি !
শূল-অঙ্কময় বিশাল কেতন
বুঝি বা সে হবে অই ;
এতক্ষণে, রতি, না জানি কি হ'ল
কেমনে সুস্থির হই !

শুন ভয়ঙ্কর কিবা সিংহনাদ !
অগ্নিময় যেন শিলা,
তাল তাল তাল কত অস্ত্ররাশি
নভোদেশ আচ্ছাদিলা !
হায়, রতি, মোরে কে দিবে সম্বাদ,
কার সনে এই রণ !
অইখানে পতি আছে কি আমার ?
অনলে দহে যে মন !"
কহে কামপ্রিয়া, "অয়ি ইন্দুবালা,
কই কোথা রণ কই ?
স্বপনে দেখিছ সমর এ সব,
অন্তরে আকুল হই।
আইনু শুনিয়া গিয়াছে ধরায়
তোমার হৃদয়নেতা ;
নাহি কোন ভয় মিছা এ ভাবনা,
রুদ্রপীড় নাহি সেথা।"
শুনি চিন্তাবেগ উপশম কিছু,
কহে খেদে ইন্দুবালা ;
"পারি না সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি,
নিতি নিতি এই জ্বালা !
দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশি,
পড়ে কত মহাবীর ;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হৈবে বুঝি শেষ স্থির !
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী,
কত পিতা পুত্রহীন !
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ !
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে ?
দানবের কুলে জন্ম হয় মম,
বুঝি অদৃষ্টের ছলে।
কাম-সহচরি, সত্য তোমা বলি,
সতত অন্তর জ্বলে !"
"হায় ইন্দুবালা, তুমি সুকোমল
পারিজাতপুষ্প যেন !
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন ?"
"বলো না ও কথা, মন্মথ-প্রেয়সি,
তুমি সে জান না তাঁয় ;
দেখ না কি কভু শৈল-অঙ্গে কত
স্বাদু নীর-ধারা ধায় !
শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে,
বীর তিনি রণ-প্রিয় !
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়।
যাব শচী-পাশে, করিব শুশ্রূষা,
যাতে সাধ দিব আনি !
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না,
কহিনু নিশ্চিত বাণী।
মন্মথ-রমণি ! নাহি কর খেদ,
যাহ ফিরে নিজ বাস,
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস।
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল,
থাকিবে অমনি ঢালা ;
এবে গুটাইয়া, আরো সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা।
যবে শচী ল'য়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে।
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে,
কে ঢাকিবে তবে আর,"
বলিয়া, লইয়া কুসুমের রাশি,
বসিলা গাঁথিতে হার।

"কি মালা গাঁথিবে ইন্দুবালা তুমি,
কি মালা গাঁথিতে জান ?
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাঁথি দিত,
তবু না জুড়াত প্রাণ।
দেবকন্যা যারে সেবিত নিয়ত,
সুমেরু উজ্জ্বল করি,
সে আজ এখানে ঐন্দ্রিলা সেবিয়া
রবে দাসী-বেশ ধরি !
এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন,
দিয়া তারে পুষ্পহার ?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার ?
আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে ;
দানব-নন্দিনি, জান না সে তুমি,
দুঃখীরে পূজিলে লাগে !
মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বাঁন্ধিয়া পায় !

রতির কপালে এও সে ঘটিল
দেখিতে হইল হায় !"
বলি বাষ্পাকুল নয়নে তখনি
মন্মথ-রমণী চলে।
রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল
ইন্দুবালা চক্ষু-জলে।
পড়ে বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে,
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল ;
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়,
চিন্তাতে হৈয়ে আকুল।
কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূর রব,
চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব ;
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুলমালা হাতে ইন্দুবালা রামা
রুদ্রপীড়-ভাবনায়।

নবম সর্গ

হেথা দৈত্য শত যোধ
চলে শূন্যে বিনা রোধ,
উদয়-অচল আদি হিমাচল-পথে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে পদক্ষেপ,
ক্রমশঃ পথ-সংক্ষেপ,
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উরয়ে মরতে
নৈমিষে জয়ন্ত লৈয়ে,
শচী অতি ব্যগ্র হৈয়ে,
জিজ্ঞাসে তনয়ে যত অমরের কথা,
"কোথায় দেবতাগণ ?
বাসব মেঘ-বাহন ?
পাতালের সমাচার স্বর্গের বারতা।

অমর-অঙ্গনাগণ,
কোথায় সবে এখন ?
কত কালে পুনঃ সবে হইবে মিলিত ?
আখণ্ডল পুনর্ব্বার,
ধরিলা কি অস্ত্র তাঁর,
অথবা কুমেরু-চূড়ে ধ্যানে নিমন্ত্রিত ?"
হেনকালে রণশঙ্খ,
মৃগেন্দ্র-শ্রুতি-আতঙ্ক,
অসুরের সিংহনাদ পূরিল গগন ;
বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া অচলচয়,
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন।

জয়ন্ত শুনে সে রব,
শুনয়ে যথা বৃষভ
ধাবমান অন্য কোন বৃষের গর্জ্জন ;
অথবা ঝটিকারম্ভে,
পক্ষ প্রসারিয়া দম্ভে,
শ্যেনপক্ষী শুনে যথা বায়ুর স্বনন ;
অথবা বিদ্যুতাচ্ছন্ন
উচ্চৈঃশ্রবা সুপ্রসন্ন,
শুনি যথা মেঘমন্দ্র গ্রীবা বক্র করে ;
কিম্বা ফণীন্দ্রের নাদে,
শুনিয়া যথা আহ্লাদে,
গরুড় বিশাল পক্ষ বিস্তারে অম্বরে ;
শুনিয়া দৈত্য-সংরাব,
জয়ন্ত তেমতি ভাব,
অরণ্য ছাড়িলা বেগে হৈলা অগ্রসর।
কালাগ্নি-সদৃশ অঙ্গে,
কিরণ শত তরঙ্গে,
আস্য, গ্রীবা, অসি, বর্ম্ম করিল ভাস্বর।
রুদ্রপীড়ে কিছুক্ষণ,
করি দৃঢ় নিরীক্ষণ,
কহে, "হে দানবপুত্র, বহুদিন পরে,
আবার সমর-রঙ্গে,
ভেট হৈল তব সঙ্গে,
নৈমিষ-কাননে আজ ধরণী-উপরে।
ছিল যে দুঃখিত মন
না পরশি প্রহরণ,
দানব-সংহতি রণে ক্রীড়ন অভাবে ;
তোমার সহিত ভেটে,
আজি সেই দুঃখ মেটে,
চিরক্ষোভ জয়ন্তের আজি সে জুড়াবে।
যুঝিতে না লয় চিতে,
কে আর জানে যুঝিতে,
পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পুরে আশ ;
হস্তী যদি দন্ত-বলে
গিরি-অঙ্গ নাহি দলে,
অনর্থ তবে সে তার সামর্থ্য-প্রকাশ !
সুরবৃন্দে বড় লাজ,
গত যুদ্ধে দিলা, আজ
সে আক্ষেপে মনসাধে পূর্ণাহুতি দিব ;
বাসব-নন্দন-বল,
সুরের রণ-কৌশল,
ভুলিলা, দানব-সুত, পুনঃ চেতাইব।
রুদ্রপীড় তব সনে,
সুখ বটে যুঝি রণে,
বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তস্কর ;
মনে তাই ঘৃণা বাসি,
সমরে তোমারে নাশি,
সে সুখ এখন আর পাবে না অন্তর।
এ সব মশকবৃন্দে,
কি আর হইবে নিন্দে,
শালতরু পেলে ছিন্ন কে করে কদলী ?
তোমার সমর-সাধ,
আমার চিত্তের সাধ,
ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পুরাব সকলি।"
রুদ্রপীড় ক্রোধে দহে,
বাসব-নন্দনে কহে,
"তুই কি জানিবি বল্ সমরের প্রথা ?
বীরের উচিত ধর্ম্ম,
বীরের উচিত কর্ম্ম,
বৃত্রের নন্দনে কভু না হবে অন্যথা।
সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ,
সমূহ অমরবর্গ,
এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাস ;
ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভুপত্নী-পাশ।

কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি, তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ ;
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে প'ড়ে হারায়ে সম্বিৎ।
লজ্জা নাহি চিতে আসে,
নিন্দা কর হেন ভাষে,
যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বৃত্রের কুমার ?
হারায়েছি শতবার,
হারাইব আর বার,
তুই সে নির্লজ্জ বড় ছুঁইবি আবার
সেই দীপ্ত হুতাশন ?
ভয়ে যার অদর্শন,
হয়েছিলি এত কাল, হতাশে কোথায় !
ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ,
বল্ যুদ্ধে সম্ভাষণ,
সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায় ?"
"বৃথা বাক্যে কাল যায়,
সকলে একত্রে আয়,"
কহিলা জয়ন্ত, "যুদ্ধ দেখরে দানব !
ধর অস্ত্র শত যোধ,
এখনি পাইবে বোধ,
বাসব-নন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব ॥"
বলি কৈলা সিংহনাদ,
দৈত্যের শঙ্খের হ্রাদ,
অরণ্য আলোড়ি, শূন্য করিল বিদার।
শতযোদ্ধা একিবার,
কোদণ্ডে দিল টঙ্কার,
মেঘের নিনাদে ঘোর ছাড়িল হুঙ্কার ॥
অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেব দৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি, বাণের গর্জ্জন।

আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ ॥
দ্রুঘণ, মুষল, শল্য,
প্রক্ষেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।
জয়ন্তের শররাশি
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা ॥
কেশরি-শার্দ্দূলদল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর।
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী-উপর ॥
ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদ্গিরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল।
অসুর জয়ন্ত ক্ষিপ্ত,
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত-প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল ॥
ধরাতল টলটল,
নদীকুল কল-কল,
ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ করিল প্লাবন।
ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ণ,
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে দিগ্ দিগন্তে পতন ॥
হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্দ্ধ-দিন পুরে,
তখন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ,
কিম্বা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি।

যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার,
যবে যাদঃপতি জলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-প্রায় দেহের প্রসার ;
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি
দূর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস ;
নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস।
কিম্বা গিরি-শৃঙ্গরাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব ;
বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব।
জয়ন্ত তেমনি বলে,
দানব-যোদ্ধায় দলে,
রুদ্রপীড়সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে।
পূর্ণ দেব-দিনমান,
অস্তাচলে সূর্য্য যান,
বিস্মিত দানবগণ জয়ন্ত-প্রতাপে ॥
তখন বৃত্র-তনয়,
জয়ন্তে সম্ভাষি কয়,
"ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পরিহরি।
সূর্য্য হের অস্তগত,
যুদ্ধ কৈলা অবিরত,
বিশ্রাম করহ এবে, আইল শর্ব্বরী ॥
প্রভাতে আবার শুন,
সমরে পশিব পুনঃ,
না ধরিব প্রহরণ থাকিতে রজনী।
বীরবাক্য সুনিশ্চয়,
যুদ্ধে তব পরাজয়,
নহে, যে অবধি শচী থাকিবে অবনী ॥"
জয়ন্ত কহিলা ভাষ,
"যথা তব অভিলাষ,
আমার না হইল শ্রান্তি, শ্রান্তি যদি তব,
কর সে বিশ্রাম লাভ,
আমার সমান ভাব,
দিবস রজনী মম তুল্য অনুভব ॥
ধর অস্ত্র নাহি ধর,
এ রজনী, দৈত্যবর,
আমার সমর-বেশ থাকিবে এমনি,
যখন বাসনা হয়,
শুন হে বৃত্র-তনয়,
সমরে ডাকিও, থাকে না থাকে রজনী ॥"
বলিয়া নৈমিষ মাঝে,
আবরিত যুদ্ধ-সাজে,
বসিলা আসিয়া কোন তরুর তলায়।
মনে মনে আন্দোলন,
করে সুখে অনুক্ষণ,
দিবার যুদ্ধের কথা প্রগাঢ় চিন্তায় ॥
প্রভাতে আবার রণ,
চিন্তা মনে সর্ব্বক্ষণ,
কত আশা হৃদয়েতে তরঙ্গ খেলায়—
রুদ্রপীড়-বিনাশন,
দৈত্যের দর্প-দমন,
জননী-বিপদ্-শান্তি, খ্যাতি অমরায়,

হিল্লোলে হিল্লোলে আসে ;
কখন বা চিত্তে ভাসে,
সমর-আশঙ্কা—পাছে দানব হারায় ;
বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ দিয়া,
হস্ত পদ প্রসারিয়া,
চিন্তা করে কতক্ষণে রজনী পোহায় ॥
গাঢ় ভাবনায় মগ্ন,
যেন বা সে নিদ্রাচ্ছন্ন,
বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় মুদিত অলসে।
পত্রের বিচ্ছেদ দিয়া,
চন্দ্ররশ্মি প্রবেশিয়া
মৃদু মৃদু সুশোভিত ললাট পরশে ;
শচী চপলার সনে,
আসিয়া অনন্যমনে
হেরে তনয়ের মুখে কৌমুদী-প্রপাত।
কত চিন্তা ধরে প্রাণে,
কত আশা মনে মানে,
ভাবে যেন সে রজনী না হয় প্রভাত ॥
চপলার কানে কানে,
মৃদু পবনের স্বানে,
কহে "সখি, দেখ কিবা হয়েছে শোভন
মৃদু রশ্মি ক্লান্ত দেহে,
যেন পড়িয়াছে স্নেহে,
মন্দার-কুসুমে যেন চন্দ্রমা-কিরণ ॥
এই সুষমার খেলা,
চাঁদেতে চাঁদের মেলা,
আহা, আজি না দেখিল, সখি, পুরন্দর !
দেখা সে হইবে যবে,
কহিব তাঁহারে তবে,
দেখিলে সে কত তাঁর জুড়াত অন্তর ॥
শুনে এ রণ-সম্বাদ,
করিতেন কি আহ্লাদ,
দিতেন কতই সুখে পুত্রে আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ করি কত,
স্নিগ্ধ হৈয়ে অবিরত,
করিতেন স্নেহে অই বদন চুম্বন ॥
যদি থাকিতাম আজ,
অমর-বৃন্দের মাঝ,
অমরাবতীতে, সখি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
আজি কত মহোৎসবে,
তুষিতাম দেব সবে,
কতই আনন্দে আজি ভাসিত পরাণী।
জয়ন্তে করিয়া সঙ্গে,
ভাসিয়া সুখ-তরঙ্গে,
ভ্রমিতাম কতই আনন্দে ত্রিভুবন।
বিষ্ণুপ্রিয়া কমলারে,
ঈশান-প্রিয়া উমারে,
দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন !
একা যে করিলা রণ
সহ দৈত্য শত জন !
সমরে করিলা ক্লান্ত রুদ্রপীড় শূরে !
সে আনন্দে বিসর্জ্জন—
ধরাতে নৈমিষবন—
অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্ত্তপুরে !
আবার অন্তরে ভয়,
না জানি যে কিবা হয়
কালযুদ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত ;
রুদ্রপীড় মহাবীর,
জয়ন্ত ক্লান্ত-শরীর,
অসুরের অস্ত্রবৃষ্টি যেন উল্কাপাত !"
কহিয়া বিমর্ষ দুখে,
চাহি চপলার মুখে,
ফেলিয়া সুদীর্ঘশ্বাস কহে ইন্দ্রজায়া,
"তনয়ে স্মরি এখানে,
শৃঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে,
সখি রে, দুরন্ত বড় সন্তানের মায়া।

পুত্র-মুখ যতক্ষণ,
না করিনু নিরীক্ষণ,
দানব-আশঙ্কা চিত্তে ছিল না তিলেক।
আগে না ভাবিয়া, সখি,
ও চারু-মুখ নিরখি,
বিবশা হয়েছি এবে হারায়ে বিবেক॥
অন্তরে আশঙ্কা হেন,
বিপদ্ নিকট যেন,
সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল ভার?
সখি, অন্য কোন্ দেবে,
স্মরণ করিব এবে,
সহায় হইতে যুদ্ধে জয়ন্তে আমার?"
নিশি-শেষে নিদ্রা-ভঙ্গে,
অর্দ্ধ-চেতনের সঙ্গে,
অদূরে মুরলী-ধ্বনি বাজিলে যেমন;
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া,
পরাণেতে জড়াইয়া,
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।
জয়ন্ত-শ্রুতি-কুহরে,
তেমতি প্রবেশ করে,
শচীর সে সুমধুর কোমল বচন।
উন্মীলিত-নেত্রে বসি,
হেরি অস্তপ্রায় শশী,
কহিলা, জননী-পদ করিয়া বন্দন,
"প্রভাত হইল নিশি,
প্রকাশিছে পূর্ব্বদিশি,
দেখ, মাতঃ, চারু কান্তি অরুণের রাগে;
পুত্রে আশীর্ব্বাদ কর,
না উঠিতে প্রভাকর,
প্রবেশি সংগ্রামস্থলে দানবের আগে॥"
শুনি শচী শতবার
শিরস্ত্রাণ লৈলা তার,
যতনে অঙ্কেতে পুত্রে করিলা ধারণ।

কহিলা "বাছা জয়ন্ত,
আশিস্ করি অনন্ত,
চিরজয়ী হও রণে শচীর জীবন॥
কিন্তু প্রাণে এত ভয়,
কেন রে উদয় হয়,
আতঙ্কে কি হেতু এত শরীর অস্থির!
যত চাই পূর্ব্বপানে,
ততই যেন পরাণে,
অরুণ-কিরণ বিন্ধে সুপ্রখর-তীর!
না পারি সাহস ধরি,
নয়ন প্রসার করি,
যা হেরিতে যাই তাহে আতঙ্ক উদয়;
বিবর্ণ যেন মিহির,
গগন—মহী-শরীর,
সকলি বিবর্ণ হেরি, যেন মসীময়!
নিমেষে নিমেষে চিতে,
ইচ্ছা হয় নিরখিতে,
তোমার বদন আজি ভ্রান্তিতে যেমন!
কাছে আছ ভাবি এই,
ভাবি পুনঃ কাছে নেই,
কোল শূন্য হৈল যেন ভাবি বা কখন!
কখন(ও) সে শুনি ভুলে,
তুমি যেন শ্রুতিমূলে,
'জননি, জননি' বলি করিছ নিনাদ;
কেন হেন হয় বল,
নেত্র-কোণে আসে জল,
কভু ত ছিল না হেন শচীর প্রমাদ!
একাকী যাইবে রণে,
ছাড়িতে না লয় মনে,
অন্য কোন্ দেবে এবে করিব স্মরণ।"
বলিয়া অধিক স্নেহ,
ভুজেতে বান্ধিয়া দেহ,
হৃদয়ের কাছে আনি করিল ধারণ॥

জয়ন্ত কহিল "মাতঃ,
হবে না বিপদ্‌পাত,
স্নেহেতে ভাবিছ এত আশঙ্কা বৃথায়।
একাকী এ যুদ্ধে যাব,
নহে বড় লজ্জা পাব,
দেব-দৈত্যে উপহাস করিবে আমায়॥
বৃত্রসুতে কি ভাবনা,
আমিও জানি আপনা,
কালি সে বুঝেছি যত দৈত্যের বিক্রম
স্মরি অন্য কোন দেবে,
জননি, না কর এবে
বৃথা, কৈনু গত কল্য যত পরিশ্রম॥
দেখ মাতঃ সূর্য্যোদয়,
বিলম্ব উচিত নয়",
বলিয়া বন্দিয়া শচী-যুগল-চরণ;
যুদ্ধস্থানে কৈলা গতি,
ইন্দ্রাণী দিলা সম্মতি,
অপাঙ্গে অশ্রুর বিন্দু, আকুল বচন।
নিদ্রাভঙ্গে চিন্তান্বিত,
রুদ্রপীড় উৎকণ্ঠিত,
ভাবিছে কি হৈবে পুনঃ সমরে সে দিন
ছিল সঙ্গে যোদ্ধা শত,
নবতি হইলা হত,
জীবিত যে কয় জন, শ্রান্তিতে মলিন॥
কখন(ও) বা ভাবে ভ্রমে,
জয়ন্তের পরাক্রমে,
রুদ্রপীড় নাম বুঝি হয় বা নিষ্ফল;
ইন্দ্র-হস্তে হৈবে নাশ,
মিথ্যা বুঝি সে বিশ্বাস,
জেতৃ বুঝি নহে তার বাসব কেবল॥
এইরূপ চিন্তান্বিত,
যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত,
প্রতিজ্ঞা করিছে দৃঢ় স্মরিয়া শঙ্কর;
হয় মৃত্যু নয় জয়,
নহিলে কভু নিশ্চয়
ত্রিদিবে না যাবে আর বিদারি অম্বর
ভাবিতে ভাবিতে চায়,
জয়ন্তে দেখিতে পায়,
সত্বরে লইয়া সঙ্গে দশ দৈত্যবীর,
অগ্রসর হৈলা রণে,
রণ-শঙ্খ ঘনে ঘনে,
আবার নিনাদি শূন্য করিল অস্থির॥
দ্বিগুণ বিক্রমে এবে,
দানব আক্রমে দেবে,
ছাড়িয়া বিকট দর্পে গর্জ্জন ভীষণ।
দেব দৈত্যে যুদ্ধারম্ভ,
আবার ভুবন স্তব্ধ,
শূন্যমার্গে অবিরত অস্ত্র-সংঘর্ষণ।
আবার কাঁপিল ধরা,
মূর্ত্তি ধরি ভয়ঙ্করা,
তুমুল যুদ্ধ-সঙ্কুল, ক্ষুব্ধ জলস্থল;
দগ্ধ হৈল তরুকুল,
বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমূল,
ভীষণ কর্কশ বেশে সাজে রণস্থল॥
জয়ন্ত দানব-মাঝে,
যুঝিছে তেমতি সাজে,
যুঝিলা যেমন পূর্ব্বে বিনতা-তনয়
গরুত্মান্ মহাবীর,
ফণীন্দ্রে করি অস্থির,
প্রবেশি পাতালপুরে ভুজঙ্গময়।
চারিদিকে আশীবিষ
ফণা ধরি অহর্নিশ,
গাঢ় অন্ধকারে করে বিকট গর্জ্জন,
গরুড় দুর্জ্জয় দর্পে,
ঝাপটে ঝাপটে সর্পে,
প্রসারি বিশাল পক্ষ করায় ঘূর্ণন।

এরূপে পূর্ব্বাহ্ণ গত,
জয়ন্ত-শরে নিহত,
আবার দানব পঞ্চ পড়িল ভূতলে—
পড়ে যথা ধরাধর,
শৃঙ্গ ভাঙ্গি ভূমি 'পর
ভূকম্পনে চলে জল উছলে উছলে।
তখন আক্রুদ্ধ-বেশ,
আকুঞ্চিত ভুরু-কেশ,
রুদ্রপীড় মুহূর্ত্তেক জয়ন্তে নিরখি,
ভীষণ হুঙ্কার-রবে,
শূন্যেতে তুলিলা তবে,
প্রকাণ্ড দ্রুঘণ এক মুষ্টিতে থমকি,
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে,
ঘোর শব্দ যেন মেঘে,
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার।
না করিতে সম্বরণ,
জয়ন্ত-অঙ্গে পতন,
হইল প্রকাণ্ড মূর্ত্তি শৈলের আকার॥
না সহি দুর্ব্বহ ভার,
অচল বিকুলি-হার,
বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন!
কিম্বা যেন রাশীকৃত,
চন্দ্ররশ্মি আভা-হৃত,
খসিয়া পৃথিবী অঙ্গে হইল পতন!
শিরীষকুসুমস্তর,
যেন বা অবনী'পর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন।
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি,
নিমেষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অঙ্গার দীপ্তি মিশায় যেমন!
মৃত্যুহীন দেবকায়া,
মূর্চ্ছাই মৃত্যুর ছায়া,
জয়ন্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল।

নিদ্রিত মানব যথা,
নিশ্চল হইল তথা,
রেণু-ধূসরিত তনু পড়িয়া রহিল॥
উল্লাসে দানবদল,
জয়শব্দ-কোলাহল,
নিনাদে, অবনি শূন্য কৈল বিদারণ।
শিহরে যেমন প্রাণী,
শববাহী-হরিধ্বনি,
গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ,
তেমতি সে ভয়ঙ্কর,
দানবের জয়-স্বর,
শুনিয়া শিহরে শচী অন্তরে পীড়িয়া,
চঞ্চল দামিনী যথা,
ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা,
হেরে আসি পুত্রতনু ধরাতে পড়িয়া।
"হা বৎস জয়ন্ত" বলি,
স্খলিত চরণে চলি,
ধাইয়া আসিয়া পার্শ্বে ধরিল তনয়;
কোলেতে করিল তনু,
ছিলাশূন্য যেন ধনু,
বদনে স্থাপিয়া দৃষ্টি স্পন্দহীন হয়।
না বহে শ্বাস প্রশ্বাস,
কণ্ঠে রুদ্ধ গাঢ় ভাষ,
কঠোর অশ্রুর বিন্দু নেত্রে নাহি খসে,
নয়নে নিবদ্ধ হেন,
শিশিরের বিন্দু যেন
কমল-পলাশে বদ্ধ হিমের পরশে।
অন্তরে প্রবাহ ধায়,
হৃদয় ভাঙ্গিতে চায়,
নির্গত হইতে নারে সে শোক-নির্ঝর;
যেন কল কল করি,
গহ্বর সলিলে ভরি,
পর্ব্বত নির্ঝর ভ্রমে বেষ্টিত প্রস্তর।

না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তর-মূর্ত্তি অর্দ্ধ-অচেতন !
পুত্রতনু কোলে ধরি,
নিরখে নয়ন ভরি,
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু হয় বিলোড়ন !
যত দেখে পুত্রমুখ,
তত বিস্ফারিত বুক,
ক্রমে তেজোরাশি তত প্রকাশে বদন ;
বারিভারাক্রান্ত মেঘ,
ভেদিলে কিরণ-বেগ,
প্রকাশয়ে সূর্য্য যথা, দেখিতে তেমন ।
নিকটে চপলা সখী,
শচীর মুখ নিরখি,
রুদ্ধভাব উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে না পায় ;
নয়নে অশ্রুর ধার,
গলিত যেন তুষার,
বদন উরস বহি দর-দর ধায় ।
ভাবে দৈত্যসুত মনে,
চাহিয়া শচী-বদনে,
পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে ;
ধরিতে না উঠে কর,
চরণ হয় অচর,
এর চেয়ে নাহি কেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ?
বুঝি বা নিষ্ফলে যায়,
জনকের অভিপ্রায়,
সমরের এত ক্লেশ, এত যে আয়াস !
জয়ন্ত সমরে হত,
শুধু সে সুখ্যাতি কত ?
বুঝি পূর্ণ না হইল চিত্ত-অভিলাষ ॥
চিন্তা করি ক্ষণকাল,
নিকটে ডাকে করাল,
অনুচর দৈত্যে এক নিকন্ধর নাম ;
চিত্তে নাহি দয়ালেশ,
খল পামরের শেষ,
তারে আজ্ঞা দিলা পুরাইতে মনস্কাম
উল্লাসে দানব ক্রূর,
সর্প যেন ছাড়ি দূর,
শচীর পশ্চাতে দ্রুত করিয়া গমন ;
ভুজঙ্গ জড়ায় যেন,
করেতে কুন্তল হেন
জড়ায়ে, তুলিলা কেশে করি আকর্ষণ ।
হায় মতঙ্গজ যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল থর ;
দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল-লতা,
তুলিতে লাগিল শূন্যে শচী-কলেবর !
করিয়া উল্লাসধ্বনি,
মুহূর্ত্তে ছাড়ি অবনী,
উঠিল অচল-পথে দানবের দল,
শিখরে শিখরে পদ,
এড়ায়ে কন্দর নদ,
শূন্যমার্গে চলে দৈত্য কাঁপায়ে অচল ।
সংহতি চলে চপলা,
আকাশ করি উজলা,
ক্রন্দন-নিনাদে পূরি অন্তরীক্ষদেশ ;
ছাড়িয়া উদয়গিরি,
নানা শৈলশিরে ফিরি,
স্বর্গের নিকটে আসি উত্তরিল শেষ ।
রুদ্রপীড় অগ্রসর,
শঙ্খে ঘন ঘোর স্বর,
অমরা কম্পিত করি বাজায় তখন ;
শুনিয়া দনুজ যত,
প্রাচীরে প্রাচীরে শত,
শত কম্বুনাদ করে নিস্বন ভীষণ ।

সে নাদ পশিল কাণে,
বাজিল শচীর প্রাণে,
সহসা ঘুচিল স্তম্ভ, চেতনা জাগিল,
স্মৃতি-পথে আচম্বিতে,
উত্থিত হইয়া চিতে,
চিন্তা-সরিতের স্রোত উথলি চলিল।
"কোথায় জয়ন্ত হায়!"
বলি চারিদিকে চায়,
"কে করিল শূন্য কোল, কে হরিল তোরে!
বিপদে রাখিতে মায়,
আসিয়া, ফেলিলি তায়,
অকূল আঁধারময় শোকসিন্ধু-ঘোরে!
কি দেখিতে আসি হেথা,
হে ইন্দ্র, সূর্য্য, প্রচেতা,
কই কোথা আমার সে জিনি পারিজাত?
জয়ন্ত কুমার কই,
শচীর নন্দন কই,
দেবরাজ-পুত্র কই? হায় রে বিধাতঃ!
হা শঙ্কর উমাপতি!
হা বিষ্ণু কমলাপতি!
হায় গৌরী, হায় রমা, হায় বাগ্‌বাণী—
শুষ্ক আজি অকস্মাৎ,
শচী-হৃদি-পারিজাত,
কি আর দেখাবে স্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!
এসো সে দেখিবে এবে,
দানবের পদ সেবে,
দুঃখিনী সহায়হীনা শচী ইন্দ্রজায়া!
কোথায় ত্রিদশকুল!
কোথা আদ্যাশক্তি মূল!
দনুজ-পরশে শচী—কলুষিত-কায়া!"
বলি কান্দে ইন্দ্রপ্রিয়া,
ঘৃণাতাপে দগ্ধ হিয়া,
প্রজ্বলিত শোকানল-শিখায় অস্থির,
"হা জয়ন্ত" বলি চায়,
নাসাপথে বেগে ধায়,
উত্তপ্ত ভীষণ শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর।
বহে চক্ষে জলধারা—
যথা সে ত্রিলোক-তারা,
ত্রিপথগা গঙ্গা যবে বিষ্ণুর চরণে,
বহিলা অনন্ত স্বেদি,
ব্যোমকেশ-জটা ভেদি,
বিপুল তরঙ্গে ভাসাইয়া ঐরাবণে।
শচীর ক্রন্দন নাদে,
ত্রিলোকের জীব কাঁদে
ব্যাকুলিত কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মপুরী।
ব্যাকুলিত রসাতল,
ব্যাকুল অবনীতল,
শচীর আক্ষেপ ধায় ত্রিজগৎ পুরি।
যথা মহাবাত্যা যবে,
ধ্বনি করে ঘোর রবে,
ঘন বেগে ঘন ধারা, মারুত-গর্জ্জন,
কখন বা হয় শান্ত,
কখন দাপে দুর্দ্দান্ত,
ভীষণ প্রচণ্ড বায়ু, প্রচণ্ড বর্ষণ!
শচী কান্দে সেই বেশ,
শূন্যে আকর্ষিত কেশ,
বৃত্রাসুর-দূত আসি রুদ্রপীড়ে কয়;
"প্রবেশ অমরাবতী,
দেখ সে দেব-দুর্গতি,
সমরে অমর সহ দানবের জয়।"
রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারিদিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি;
দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ-বায়ু-চঞ্চল
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি।

দেখিতে দেখিতে চলে,
বৃত্রাসুর-সভাতলে,
নিকন্ধর শচীদেহ সেখানে রাখিল ;
শচীমূর্ত্তি দৈত্যপতি,
নেহারি অনন্যগতি,
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল

দশম সর্গ

হেথায় কুমেরুশৈল ছাড়িয়া বাসব,
ইন্দ্রায়ুধ অস্ত্রাদিতে হৈয়ে সুসজ্জিত—
চলিলা কৈলাসধামে নিয়তি-আদেশে,
নিত্য বিরাজিত যেথা উমা, উমাপতি।
উঠিতে লাগিলা শূন্যে, নিম্নে ধরাতল
জলধি পর্ব্বত-মালা, তরুতে সজ্জিত—
দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন
বিভূষিত বেশভূষা চারু অবয়ব।
নীলবর্ণ শোভাপূর্ণ বিশাল শরীর
কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিধি ;
অরণ্যানী শত শত কত শোভাময়
কোন খানে বিরাজিত বিটপমণ্ডলী।
কত বেগবতী নদী শাখা প্রসারিয়া
চলিছে ধরণী-অঙ্গে তরঙ্গ বিমল,
ঘেরিয়া কানন, গিরি, নগরী, সুন্দর—
সহস্র প্রবাহমালা দীপ্ত প্রভাকরে।
স্তরে স্তরে মেঘাকারে শোভে কোনখানে
সজ্জিত শৈলের শ্রেণী কুজ্ঝটি-আবৃত,
সুদৃশ্য ধরণী-অঙ্গে কিবা সুললিত,
মণ্ডিত শিখর চারু ভানুর ছটায় !
হিমাদ্রির উচ্চ শৃঙ্গ দূর অন্তরীক্ষে
দেখিলা কাঞ্চনতুল্য কিরণ-মণ্ডিত,
দেবগণ লীলাচ্ছলে শিখরে যাহার
প্রকাশিলা কোন(ও) কালে পবিত্র ভারতে
দেখিলা শৃঙ্গেতে তার গোমুখী-গহ্বরে
ধায় ভাগীরথী-ধারা, দেখিলা নিকটে
কালিন্দী-সরিৎ-স্রোত বহিছে কল্লোলে,
সাজাইতে পুণ্যভূমি আর্য্য-প্রিয় দেশ।
ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ মাঝে
জ্যোতির্বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয়।
দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরাসঙ্গে ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্তি সূর্য্য চারিধারে
শীতল কিরণে পূর্ণ করি নভঃস্থল।
ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো দূর শূন্য-পথে অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমাবেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু ঘেরিয়া ভাস্করে।
সে সকলে দূরে রাখি গ্রহ শনৈশ্চর,
ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া ভাস্করে ;
অষ্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা সুন্দর !
দেখিলা সে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন,
অন্তরীক্ষে ভ্রমে সদা নিজ নিজ পথে
বিবিধ বরণছটা অঙ্গে প্রকাশিয়া,
আনন্দিত করি শূন্য অপূর্ব্ব ধ্বনিতে।
দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
উর্দ্ধ উর্দ্ধ বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অতি,
সুদূর নক্ষত্র তুল্য লাগিল ভাতিতে।

ক্রমে ক্ষীণ—লীনপ্রায় মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী-অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর ছাড়ি নিম্নদেশে।
অদৃশ্য ধরণী শেষ—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌরজগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে।
শব্দশূন্য, বর্ণশূন্য, প্রশান্ত, গভীর,
ব্যাপৃত সে ব্যোমদেশ, ব্যাসঅন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে ছায়ার আকার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তি কোটি কোটি কত!
বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি
বিরাজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে, অনন্ত শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।
বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অষ্ট, সংযত মূরতি,
প্রকাশিত বক্ত্র, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা;
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি।
গাঙ্গেয় সলিল-কণা কণা পরিমাণে
ঝরিতেছে জটাজুটে—ঝরিছে তেমনি,
হিমাদ্রি-অচল-অঙ্গে উত্তুঙ্গ শিখর,
ধবলগিরিতে যথা হিমবরিষণ।
বসিয়া নিমগ্ন-চিত্ত গভীর কথনে;
গভীর কথনে মগ্ন উমা বাম দেশে,
একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিম্ব যত
দেখায়ে গৌরীরে তত্ত্ব কহেন বুঝায়ে,—
কি হেতু হইলা সৃষ্টি, সৃষ্টি কি প্রকারে,
পঞ্চভূত, আত্মা, মনঃ, প্রকৃতি প্রথমা,
পরমাণু, পরমায়ু, উৎপত্তি, বিনাশ,
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি-সংস্থাপনা।
পুরুষ-প্রকৃতিভেদ হৈলা কিবা হেতু,
হইলা বা কত কাল, কিরূপ সে ভেদ,
ছিল কিম্বা নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে,
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ!
কত কাল কোন্ বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে,
সৃষ্টির প্রারম্ভে মূর্ত্তি স্থিতি কি প্রকার,
কেন বা জগৎ-গর্ভে সকলি অস্থায়ী,
সদা পরিবর্ত্তশীল জড় কি চেতন।
কিরূপে অণুর সৃষ্টি, জীবের অঙ্কুর,
হইল আদি মুহূর্ত্তে, বিনাশন যবে
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল;
জীবাত্মা অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন।
এই বিশ্ব সুপ্রত্যক্ষ—এ সৌর জগৎ—
বর্ত্তমান কত কাল থাকিবে এ আর;
নরদেহধারী প্রাণী মনুজ আখ্যাত
ধরিবে কি মূর্ত্তি পুনঃ কল্পান্তর পরে।
পাপ পুণ্য কিসে হয়; দুষ্কৃতি, সুকৃতি,
অদৃষ্ট অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে;
সুখ হৈতে মানবের দুঃখ-পরিমাণ
গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে!
অন্য জীব-আত্মা আর, নরের আত্মায়,
কি ভেদ, কি ভেদ দেব-মানবসন্তানে,
দুঃখ-সুখ ভোগাভোগ মুক্তি বা নির্ব্বাণ,
দেবতা, মানব, দৈত্য ভিতরে কি ভেদ।
এইরূপ দেব নর-চিন্তার অতীত
নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণীত করি ব্যোমকেশ
কহিছেন ভবানীর ব্রহ্মাণ্ড দেখায়ে;
শুনিছেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রফুল্লিত।
এরূপে ব্যাপৃত হৈমবতী মহেশ্বর,
মহাঘোর শূন্য-গর্ভ কৈলাস-ভিতরে;
হেনকালে সুরপতি আসিয়া সেথায়
সম্ভ্রমে বন্দিলা উমা, উমাপতি হরে।
বাসবে দেখিয়া দুর্গা মধুর বচনে
কুশল জিজ্ঞাসি তায় কৈলা সম্ভাষণ,
জিজ্ঞাসিলা—"কি কারণে গত এতকাল,
না আইলা পুরন্দর কৈলাসপুরীতে?

কি হেতু মলিন দেহ, বদন বিরস ?
সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ শুষ্ক সমাধিতে যেন,
কিম্বা যেন রণস্থলে ছিলা কত কাল—
কি বিপদ্ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে ?”
কহিলা মেঘবাহন—“হে আদ্যা প্রকৃতি,
ভুলিলা কি সর্ব্বকথা—দেবের দুর্দ্দশা
কি করিলা বৃত্রাসুর মহেশ্বর-বরে,
সমরে অমরাবতী জিনিয়া প্রতাপে ?
দেবগণ স্বর্গচ্যুত, জ্যোতিঃশূন্য দেহ,
শিবদত্ত মহাশূল-আঘাতে তাড়িত,
রক্ষা পাইল কোনমতে পাতালে পশিয়া ;
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস।
শচী বৈজয়ন্তহারা ভ্রমিছে ধরায়,
অরণ্যে নিবাস নিত্য অহর্নিশিকাল ;
অন্য দেবীগণ যত স্বর্গচ্যুত সবে,
না জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়া।
ত্রিদিব বিজয়াবধি নিয়তি পূজায়
নিমগ্ন ছিলাম আমি কুমেরু-জঠরে,
পরাজিত, পরাশ্রিত, শক্র-তিরস্কৃত—
বিপদ ইহার হৈতে কি আর ভবানি ?
ভুলিলা কি মহেশ্বরি, মহেশের মত,
সুরবৃন্দে একেবারে ? ভুলিলা বাসবে ?
ভুলিলা কি ইন্দ্রাণীরে পর্ব্বতনন্দিনি,
পার্ব্বতি, ভুলিলা কি গো পুত্র ষড়াননে ?
জানি নাই, ভাবি নাই, বিপদ নূতন
হৈল কিনা উপস্থিত অন্য কিছু আর—
নিয়তি-আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষপথে
চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস উদ্দেশে।”
ভবানী কহিলা—“সত্য ওহে ভগবন্,
ভ্রান্ত হৈয়ে এত দিন তত্ত্ব-আলাপনে
ছিলাম ঈশান সঙ্গে রত এইরূপে।—
জান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব শ্রবণে।
কি কব সে মৃত্যুঞ্জয়ে ; সদা আশুতোষ,
যে যাহা বাসনা করে না ভাবি পশ্চাৎ
দেন তারে অচিরাৎ বর আকাঙ্ক্ষিত,
আপনি নিমগ্ন সদা এই চিন্তাসুখে।
এতক্ষণ, ইন্দ্র, তুমি উপস্থিত হেথা,
কথোপকথন এত তোমায় আমায়,
হের সে নিবিষ্টচিত্ত তথাপি তেমতি,
উমাপতি সমভাব—সংজ্ঞা-বিরহিত।
অমরে যন্ত্রণা এত দিলা বৃত্রাসুর ;
আহা, ইন্দ্র, এত কষ্ট ভুঞ্জিলা হে তুমি !
শচীর ধরায় বাস অরণ্য-ভিতরে !
কার্ত্তিকেয় মহামূর্চ্ছা-যাতনা-পীড়িত !
ইন্দ্র, আমি এইক্ষণে কহিব শঙ্করে,
তাঁর আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট দৈত্য দুরাচার
উচ্ছিন্ন করিল স্বর্গ দেবে তিরস্কারি,
করেন এখনি দৈত্যনিধন উপায়।”
এত কহি কাত্যায়নী চাহি মহাদেবে
কহিলা—“শঙ্কর, হের আইলা বাসব
কৈলাসভুবনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে,
তব বরপুষ্ট বৃত্র দৈত্যের পীড়নে।
হে শূলিন্, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট
ঘটাও অমর-বৃন্দে দৈত্য আশ্বাসিয়া,
দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারখার—
দানব-দৌরাত্ম্যে,দেব না পারে তিষ্ঠিতে।
মায়া নাই, দয়া নাই, স্নেহ-বিরহিত,
দেব-দেবীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে,
ভুলিয়া আপন পুত্র পার্ব্বতী-তনয়ে,
আছ নিত্য এই ধ্যান-সুখে নিমীলিত।
রক্ষিতে না পার যদি সৃষ্টির নিয়ম,
আশু তুষ্ট হৈয়ে তবে কেন দুষ্ট জনে
বর দিয়া, পাড় এত বিষম উৎপাত ?
উমাপতি, কর বৃত্র-নিধন উপায়।”
ত্রিপুর-অন্তক শম্ভু শিবানীরে চাহি
কহিলা—“হে হৈমবতি, বৃত্রের সংহার
এখন (ও) কি না হইল ? পাপিষ্ঠ দনুজ
এখন (ও) কি সুরবৃন্দে করে নিষ্পীড়ন ?

রহ গৌরী, ক্ষণকাল” বলি চিন্তা করি,
কহিলেন শূলপাণি—“শুন হে বাসব,
দুঃখ-অবসান তব হইবে সত্বর,
বৃত্রের নিধন ব্রহ্মদিবা অবসানে!”
ইন্দ্র কহে—“দেবদেব, জানি সে সম্বাদ,
অদৃষ্ট পূজিয়া বহু কষ্টে বহুকাল;
আদেশে তাঁহার এবে এসেছি কৈলাসে,
বৃত্র-বিনাশের প্রথা জানিতে বিশেষ।
ইন্দ্রের যাতনা, দেব, পারিবে বুঝিতে,
বৃত্রভুজদর্পে রণে হৈয়ে পরাজিত,
বাসবের বলবীর্য্য নহে অবিদিত,
ত্র্যম্বক, তোমার আর উমার নিকটে।
আপন মহিমা ব্যক্ত করিতে আপনি,
নাহি পারি—না সম্ভবে আখণ্ডলে কভু
ত্রিপুরারি, তবু চিত্ত-বেদনার বেগ
দমন করিতে নারি চেতনা থাকিতে।
ছিলাম স্বর্গের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত,
অসুরের রণে কভু নহে পরাভব,
আজি সে ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রাসুরে দিয়া,
ভ্রমি হের নানা স্থানে ভিক্ষুক সদৃশ।
এ কোদণ্ডতেজে দৈত্য না বধেছি কারে,
বৃত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আমার?
কি কব, করিলা যুদ্ধে অজেয় তাহারে,
আপন ত্রিশূল দৈত্যে দিয়া শূলপাণি!”
কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ
ভীমতেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মুক,
ইন্দ্রের পরশে গাঢ়, চমকে চমকে,
জ্বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতিঃ অপরূপ।
সামান্য মানবকুলে বীর যেবা হয়,
অরাতির দম্ভ তার চিত্তের গরল;
পতঙ্গকীটের তুল্য নহে সে পরাণী,
শত্রু-নির্যাতনে মৃত্যু সেও চাহে কভু।
মহাবীর্য্যবান্ ইন্দ্র দেবের প্রধান—
দনুজ-বিজিত হৈয়ে, হৃতি-প্রজ্বলিত
বহ্নিতুল্য চিত্ততাপে দগ্ধ নিরন্তর,
হৃদয়ের দীপ্ত জ্বালা বাক্যেতে প্রকাশে।
শুনে উমা, উমাপতি আকৃষ্ট হইয়া,
ইন্দ্রের কাতর-উক্তি, চিত্তে তীব্র বেগ;
হেনকালে অকস্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা
ঈষৎ কাঁপিল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে।
খসিয়া পড়িল ধনু আখণ্ডল করে,
উমার অশ্রুর বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল,
সহসা উদ্বেগ চিত্তে হইল সবার,
বিপদে স্মরিছে যেন অনুগত কেহ।
জিজ্ঞাসিলা মহেশ্বর চাহিয়া উমারে—
“কেন হৈমবতি, হেন হয় অকস্মাৎ?
বিপদে স্মরণ শিবে করিছে কেহ বা?
সহসা নতুবা জটা কাঁপিছে কি হেতু?”
না ফুরাতে শিববাক্য, কহিলা পার্ব্বতী
“হে উমেশ, শচী আজ করিছে স্মরণ,
বিপদে পড়িয়া ঘোর দৈত্যের পীড়নে;
নৈমিষ হইতে দৈত্য করিছে হরণ।”
ভবানীর বাক্যারম্ভে দেবেন্দ্র বাসব
জানিতে পারিয়া সর্ব্ব, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
তুলিয়া কার্ম্মুক শূন্যে—দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
স্বর্গ-অভিমুখে শীঘ্র হইলা ধাবিত।
“তিষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল” বলিয়া মহেশ
হস্ত প্রসারিয়া তারে কৈলা নিবারণ।
শিব-করে আকর্ষিত হ’য়ে আখণ্ডল,
গর্জ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ণব,
যবে বাত্যা-উত্তেজিত, মেদিনী গ্রাসিয়া,
ধায় ক্রোধে যাদঃপতি, অবরোধে যদি
সে বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল,
বেষ্টি চতুর্দ্দিক দৃঢ় পাষাণ-ভিত্তিতে।
গর্জ্জি হেন ক্ষণকাল শান্তভাবে কিছু,
কহিলা—“ধূর্জ্জটি, তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি?
যা ছিল ইন্দ্রের শেষে তাহাও দনুজে
সমর্পিলা এত দিনে, মৃত্যুঞ্জয়ী দেব?

পুত্র মূর্চ্ছাগত, পত্নী দৈত্য-অপহৃত,
রক্ষা হেতু যাই তাহে করহ নিষেধ?
বাসনা কি, শিব, তব ইন্দ্রের লাঞ্ছনা
না থাকিবে বাকি কিছু বৃত্রাসুর কাছে?
কেন তবে সৃষ্টিমাঝে রেখেছ অমর?
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি-বিরচিত
নাহি চূর্ণ কর তবে?—কেন, হে বিধাতঃ,
করিলে দেবের সৃষ্টি যন্ত্রণা ভুগিতে?
শিবের শিবত্ব শুধু এই কি কারণে?
অমরে অপ্রীতি সদা, সম্প্রীতি অসুরে?
এই কি সে সর্ব্বজন-পূজিত শঙ্কর?
স্বজনের শত্রু যাঁর মিত্র-আচরিত?
নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে
বৃত্রবধ কি উপায়ে, ছাড়হ আমায়,
দেখ পশুপতি, এবে কোদণ্ড-সহায়
একা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে।"
ইন্দ্রের ভর্ৎসনা শুনি ত্রিপুর-অন্তক
কহিলা আনিতে শূল বীরভদ্রে চাহি,
কহিলা বাসবে,—"শান্ত হও সুরপতি,
শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।
এত দর্প দনুজের অমরা হরিয়া,
অমরাবতীর শোভা—শচী পুলোমজা—
পরশে শরীর তার?—হারে বৃত্রাসুর?
শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি?"
বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিম্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজূট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে।
গর্জ্জিলা তেমতি, যথা হিমাদ্রি বিদারি
ভাগীরথী ধায় মর্ত্তে গোমুখী-গহ্বরে;
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত-শিখায়—
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ।
ধরিলা সংহার মূর্ত্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জ্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ,
তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে—দীপ্ত শ্বেত তনু,
অনল-সমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।
ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানী-পশ্চাতে আসি কৈলা অধিষ্ঠান;
বীরভদ্র সন্ত্রাসিত দাঁড়াইলা দূরে,
পার্ব্বতী ঈশানে উচ্চে করিলা সম্ভাষ—
"সম্বর সম্বর দেব, সংহার-ত্রিশূল,
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,
অকালে হইবে সর্ব্বসৃষ্টি বিনাশন,
সম্বরণ কর শীঘ্র সংহার-মূরতি।
কি দোষ করিলা কহ বিশ্ববাসিগণ?
কি দোস করিলা অন্য প্রাণী যে সকল?
কোন্ দোষে দোষী, দেব, দেবতা মানব?
একা বৃত্রে বিনাশিতে বিশ্ব ধ্বংস কর?
কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি,
নিক্ষেপে সংহারশূল সৃষ্টিনাশ হবে;—
ভবিতব্য-লিপি, দেব, না কর খণ্ডন,
সম্বর সংহার-মূর্ত্তি ঈশ, উমাপতি।"
পার্ব্বতী বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উগ্রবেশ,
ধরিলা আবার পূর্ব্ব-প্রশান্ত মূরতি—
রজত-গিরি-সন্নিভ ধবল অচল
ভূষিয়া বরষে যথা হিমানীর কণা।
সহাস্য-বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা—
"আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম,
পার্ব্বতী কহিলা সত্য, এ শূল-নিক্ষেপে
সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হৈবে অকস্মাৎ।
পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে,
যাও শীঘ্র দধীচি মুনির সন্নিধান,
মহাতেজঃপুঞ্জ ঋষি, দেব-উপকারে
ত্যজিবে আপন দেহ, পবিত্র-হৃদয়।
দধীচির পূত অস্থি বিশ্বকর্ম্মা-করে
হইবে অদ্ভুত অস্ত্র—অমোঘ সন্ধান;
সংহার-ত্রিশূল তুল্য তেজঃ সে আয়ুধে,
প্রলয়-বিষাণ-শব্দে নিনাদিবে সদা;

অব্যর্থ হবে সে অস্ত্র তীব্র বহ্নিময়
সর্ব্বত্র সকল কালে সর্ব্বসংহারক ;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হৈবে অভিহিত।
ব্রহ্মার দিবার অন্তে সায়াহ্নে যখন
সূর্য্যরথ অস্তাচল চূড়া পরশিবে,
নিক্ষেপ করিবে তাহা বৃত্র-বক্ষস্থলে,
যাও শচী-উদ্ধারিতে, সত্বরে বাসব !

বদরী-আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে, বিষ্ণু-আরাধনা ধরি,
সেইখানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।"
শুনিয়া শঙ্কর-বাক্য সহর্ষ বাসব,
বিশ্বমাতা উমারে বন্দিয়া ভক্তিভাবে,
বন্দি গাঢ় ভক্তিসহ দেব উমাপতি,
চলিলা দধীচি-পার্শ্বে শূন্যেতে মিশায়ে।

একাদশ সর্গ

সমরে অমর পুনঃ হৈলা পরাভব,
অমরাবতীতে দৈত্য করে মহোৎসব।
জয়ধ্বনি, কোলাহল, পথে পথে পথে ;
ভ্রমিছে দানববৃন্দ পূর্ণ মনোরথে।
রথব্রজ সুসজ্জিত, সুসজ্জিত হয়,
সজ্জনাশোভিত শান্ত কুঞ্জর-নিচয়।
আরূঢ় সৈনিকবৃন্দ উৎসবে নিরত ;
সমূহ অমরা ব্যাপি ভ্রমে অবিরত।
পুষ্পমাল্যে পরিপূর্ণ গৃহহর্ম্ম্যরাজি,
বর্ত্ম-পাশে শোভে দিব্য পতাকায় সাজি
সিঞ্চিত-সুগন্ধি-বারি স্নিগ্ধ পথিকুল,
চতুষ্পথ-পথ-ঊর্দ্ধে বিন্যাসিত ফুল।
বাজিছে প্রাচীরে, শৈল-শিখরে-শিখরে
বিজয়দুন্দুভি, মৃদু জলদের স্বরে ;
ভাসিছে আনন্দে দৈত্যরমণীমণ্ডলী,
সংগ্রামনিবৃত্ত পুত্র, পতি, বক্ষে দলি ;
মার্জ্জিত পুষ্পের হার গ্রথিত যতনে
পরাইছে পতিপুত্রে প্রফুল্লিত মনে।
মঙ্গল-সূচনা নানা, মঙ্গল-বাদন,
আলয়ে আলয়ে সদা সঙ্গীত নর্ত্তন।
পদব্রজে গীতিজীবী চিত্ত-উৎসাহিত,
গাইয়া ভ্রমিছে সুখে বিজয়সঙ্গীত।

অসীম আনন্দ মনে, দিতিসুতগণে
সুখে নিরখিছে আস্য আশার দর্পণে ;—
সমরে অমরজয়—স্বর্গপুরে শচী—
জড়াইছে চিত্তে নানা বাসনা বিরচি।
ছুটিছে দেখিতে শচী দৈত্যবালাগণ,
বিচলিত কেশ-বেশ স্খলিত বসন ;
অঞ্চল লুটায় ভূমে, কঞ্চুলিকা খসে,
রসনা ত্যজিয়া শ্রোণি নিতম্ব পরশে ;
বক্ষ ছাড়ি ভুজশিরে উঠে একাবলী,
কুণ্ডল চঞ্চল ভয়ে ধরে কেশাবলী ;
মঞ্জীর ছাড়িয়া পদ পড়ে ক্ষিতিতলে,
চরণ-অলক্ত লুপ্ত, পৃক্ত রেণুদলে।
ছুটিছে আনন্দস্রোত ত্রিদিব পূরিয়া,
ভ্রমিছে দানববৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়া ;
রুদ্রপীড়-যশোগীত সর্ব্বজনমুখে,
বৃত্রের বিক্রম সর্ব্বজন ভাবে সুখে।
বৈজয়ন্ত-মাঝে ঐন্দ্রিলার নৃত্যাগারে,
দৈত্যপতি পুত্রমুখ আনন্দে নেহারে।
ঐন্দ্রিলা বসিয়া বামপার্শ্বে হাস্যমুখ,
শচীর হরণবার্ত্তা শুনিতে উৎসুক।
রুদ্রপীড়ে সম্বোধন করি দৈত্যরাজ,
কহিলা "তনয়, দীপ্ত দৈত্যের সমাজ

তোমার যশঃপ্রভায়, তোমার বিক্রমে ;
কিরূপে আনিলা শচী কহ অনুক্রমে।"
রুদ্রপীড়—বৃত্রপুত্র—বাক্য সুবিনীত,
কহিলা পিতারে চাহি "সামান্য সে পিতঃ,
সামান্য বারতা তুচ্ছ কহিব কি আর,
দেখিলাম স্বর্গে আসি যেবা চমৎকার;
সে কথা অগ্রেতে, তাত, শুনাও তনয়ে—
নির্জীব নিরখি কেন অমর-নিচয়ে ?
কবে হৈল, কিবা যুদ্ধ, কে যুদ্ধ করিল ?
কোন্ বীর বাহুবলে বিপক্ষে মথিল ?"
বড়ই রহিল ক্ষোভ—আমি সে সমরে
না লভিনু কোন যশঃ যুঝিয়া অমরে !
না জানি যে ভাগ্যধর কত সুসৈনিক,
আমার পূর্ব্বের যশঃ করিল অলীক।
কি সামান্য খ্যাতি লভি জয়স্তে জিনিয়া ?
কিবা কীর্ত্তি করি লাভ শচীরে আনিয়া ?
অন্ত না থাকিত, কীর্ত্তি হইত অক্ষয়,
এ যুদ্ধে অমরবৃন্দে কৈলে পরাজয় !
বৃথা সে জল্পনা, তাত, কহিয়া সম্বাদ,
প্রীতি দান কর পুত্রে—শুনিতে আহ্লাদ।"
রুদ্রপীড়বাক্যে তবে দনুজের পতি
কহিলা—"তনয়, নাহি হও ক্ষুণ্নমতি।
যশোভাগ্য বড় তব জানিহ নিশ্চয়,
ছিলে না এ দেবাসুর-যুদ্ধে সে সময় ;
থাকিলে সুখ্যাতিভাগ বৃদ্ধি না পাইত,
অথবা পূর্ব্বের যশে মালিন্য ধরিত।
মহাপরাক্রান্ত যত সেনাপতি মম,
সর্ব্বজনে এ সমরে হৈলা অসম্ভ্রম।
শুন তবে, চিত্তে যদি এতই আক্ষেপ,
সংগ্রামের সমাচার কহি সে সংক্ষেপ।
নৈমিষ-কাননে গতি করিলা যখন,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে তায় যত সুরগণ,
চারিধারে একেবারে বিষম সাহসে
আক্রমণ কৈলা পুরী সহসা হরষে ;
পাইল কি না পাইল ইন্দ্র-সমাচার,
কহিতে না পারি, কিন্তু বিক্রমে দুর্ব্বার
পশিতে লাগিল দ্বার করিয়া উচ্ছেদ,
লঙ্ঘিয়া প্রাচীর-চূড়া, ভিত্তি করি ভেদ ;
তিন অহোরাত্রি দৃষ্টি-শ্রুতিপথ রোধে
অম্বরে অস্ত্রের বৃষ্টি উভপক্ষ যোধে।
দেবতা দৈত্যের জান সমরের প্রথা,
জান ত কি দুর্নিবার সংক্রুদ্ধ দেবতা ;
বৈশ্বানর অরুণের জান ত প্রতাপ,
একে একে যুঝে যদি ধরিয়া উত্তাপ,
বরুণের তীব্রবেগ, প্রভঞ্জন-বল,
পার্ব্বতী-পুত্রের বীর্য্য, সমর-কৌশল,
অবগত আছ সর্ব্ব ; একত্রে সে সবে,
একেবারে প্রজ্বলিত করিল আহবে।—
অগ্নি প্রবেশিলা তেজে পশ্চিম তোরণে,
সূর্য্য দেখা দিলা পূর্ব্বে সহস্র কিরণে,
উত্তর তোরণে দোঁহে বরুণ পবন,
পুরদ্বার লৈলা নিজে পার্ব্বতী-নন্দন।
অসংখ্য অমর সৈন্য সংহতি সবার,
একেবারে ভেদ কৈলা পুরী চারিদ্বার।
পরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ, বীরবর্গ যত,
রণক্ষেত্র আচ্ছাদিয়া পড়ে অবিরত ;
তুমুলরণসংকুল উভয় সেনায়,
পরাজয় দৈত্যদলে, জয় দেবতায়।
অসহ্য দুর্দ্ধর বেগে একান্ত অস্থির,
ভঙ্গ দিলা যুদ্ধ ত্যজি দৈত্যপক্ষ-বীর।
পুরীমধ্যে প্রবেশিলা আদিত্য সকল ;
বিত্রস্ত অসুর-সৈন্য আতঙ্কে বিহ্বল।
তখন একাকী যুদ্ধে হইয়া নিরত
আদিত্যেয়গণে করি পুরী-বহির্গত।
পূর্ব্ব-রণে ত্রিদশ পলায় রসাতলে,
এবার রহিল সবে সংগ্রামের স্থলে ;
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ অদ্ভুত বিক্রম ;
সম্প্রহারে আমারও হৈল বহু শ্রম ;

তখন সে শিবদত্ত ত্রিশূল-প্রহারে,
একেবারে বিলুণ্ঠিত কৈনু সবাকারে।
দেবের যে মৃত্যু, সবে এবে সে মূর্চ্ছায়—
কত কাল না ভুগিব আর সে জ্বালায় ॥"
শুনিতে শুনিতে, রুদ্রপীড়-সর্ব্বকায়
লোমহর্ষ দেখা দিল উৎসাহ-ছটায় ;
বিস্ফারিত নেত্র, উরঃস্থল বিস্ফারিত—
গুণ-ছিন্ন হৈলে যথা ধনু প্রসারিত,
অথবা ক্রোধিত ফণী যথা ফণা ধরে,
ব্যালগ্রাহী-কোলাহল শুনিলে অন্তরে—
সেই ভাবে রুদ্রপীড় চাহিয়া জনকে
ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ, হুলকে হুলকে।
কহিল—"হা পিতঃ, মম না ঘটিল ভাগে,
যুঝিতে সে দেবাসুর-যুদ্ধে অনুরাগে ;
সুযোগ তাদৃশ আর ঘটন দুষ্কর—
চির-আশা এত দিনে হইল অন্তর !"
বৃত্রাসুর কহে "পুত্র, না ভাব বিষাদ,
কহ এবে শুনি তব নৈমিষ-সম্বাদ।
বহু খ্যাতি কৈলা লাভ সে কার্য্য-সাধনে,
পুরিছে অমরা তব যশের কীর্ত্তনে।"
পিতার আদেশে রুদ্রপীড় আদি-অন্ত
প্রকাশ করিলা জিনে যেরূপে জয়ন্ত ;
কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস,
আনিলা যেরূপে শচী করিলা প্রকাশ।
শুনিয়া ঐন্দ্রিলা মহা-আনন্দে মগন,
মুখঘ্রাণ লৈয়ে, শীর্ষ করিলা চুম্বন ;—
কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন ;
কিরূপ বসন, ভূষা, চলন কিরূপ,
কত বয়ঃ, কার মত, কিবা তার রূপ ;
হাব-ভাব, হাসি-ভঙ্গি, নাসা, ওষ্ঠাধর,
বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলি, নখর,
দেখিতে কিরূপ—জিজ্ঞাসয়ে শতবার,
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ, ভুরু কি প্রকার ;
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন,
শতবার শত ছলে করিলা শ্রবণ।
রুদ্রপীড় কহে "শচী অতি রূপবতী,
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভারতী ;
রূপ হৈতে গাম্ভীর্য্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার (ই) চিত্তে সম্ভ্রম উদয় ;
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্ত্তি চিত্ত উঠিল শিহরি ;
দেবী বটে, বটে শচী শক্রের বনিতা,
তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে প্রভান্বিতা।"
শুনিয়া উথলে ঐন্দ্রিলার চিত্তবেগ ;
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ।
বহুদিন হৈতে শচীরূপের গরিমা,
বহুদিন হৈতে তার গর্ব্বের মহিমা,
শুনিত ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বে—কখন কদাচ,
আঁচে শুনা, আঁচে জানা, কটুতার আঁচ
পরাণে আছিল অগ্রে, শুনিত ভুলিত ;
শচীও না ছিল কাছে, ধরাতে থাকিত।
এবে নিত্য নিত্য তার শুনি রূপগুণ,
হৃদয়ে জ্বলিল যেন জ্বলন্ত আগুন।
হিংসার ভাজন যদি থাকে বহুদূরে,,
হিংসকের চিত্ত তবু কালকূটে পুরে ;
নিকটে আইলে বিষ উথলে তখন,
অসহ্য, হৃদয়ে জ্বলে, চিতার দহন।
আছিল বিশ্বাস অগ্রে, গরবে কেবল,
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল ;
সৌরভ যে এত তার, মাধুর্য্য নির্ম্মল,
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল ;
তাহে পুত্র মুখে তার রূপের বাখানি—
জ্বলন্ত গরলে যেন পুরিল পরাণী।
লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর,
বৃত্রাসুরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার—
"যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,
রতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন ;

সত্যই কি শচী তবে এতই রূপসী ?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী ?
আমার এ কেশ, তার কুন্তল তুলায়,
চারুতায়, মৃদুতায় শুনি লজ্জা পায়।
এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা ?
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা ?
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী ?
সিংহীর চলনি তার, আমি সে শৃগালী ?
শুন, হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,
আর সে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না সহি,
এখনি আনহ শচী, কিঙ্করীর বেশে,
দাঁড়াক আসিয়া পার্শ্বে,
রূপব্যাখ্যা শেষে ;
রূপ আছে, আছে তার, রূপ কেবা চায় ?
দেখি আগে কেমন সে চামর ঢুলায় ;
দেখি আগে হাতে দিয়া তাম্বুল-আধার,
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গ-সংস্কার ;
কেমন পরায় বাস, সাজায় ভূষণ ;
জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন :
জানে যদি ভালমত হাব-ভাব হাস,
রাখিব নিকটে তারে শিখাবে বিলাস ;
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ ধারে ;
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,
পাবে সুখ, রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে।
আন তারে, দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর,
চল আজ মহোৎসবে সুমেরু-শিখর ;
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিনী,
হইয়া বসন-ভুষা-তাম্বুলবাহিনী ;
দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার—
পুলোম-দুহিতা কিম্বা দৈত্য-মহিলার !"
শুনিয়া জননী-বাক্য, বিনীত-বচনে,
রুদ্রপীড় কহে, 'মাতঃ, কষ্ট
কি কারণে ?
দাসী হৈতে আসিয়াছে হইবে সে দাসী ;
মহত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি ?"

পুত্রের বচনে, চাহি ব্যাঘ্রীর সদৃশ,
কটাক্ষ করিয়া কুট, নেত্র অনিমিষ
ঐন্দ্রিলা কহিলা, "পুত্র, তুমি শিশু অতি,
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ?
বামন কি পারে কভু শিখর পরশে ?
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?
নারীমাঝে আমা হৈতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ—
হৃদে জ্বলে হলাহল—সে যদি না মম
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম ;
শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন—
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।"
কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ;
শচীরে ভাবিয়া হৈল আকুল পরাণী॥
কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল ;
বাজিল প্রলয়শৃঙ্গ শ্রুতি-বিদারণ ;
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন ;
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ ;
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত ;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত ;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয়,
সদ্যজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয় ;
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে ;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে ;
টলমল্ টলমল্ ত্রিদশ-আলয়,
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয় ;
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরু-শিখর ;
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর !
ঐন্দ্রিলার হস্ত হৈতে খসিল কঙ্কণ,
রুদ্রপীড়-অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ ;
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" বলিয়া উঠিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড : দ্বাদশ সর্গ

কহ, মাতঃ শ্বেতভুজে, স্বয়ম্ভুনন্দিনি,
কি হইলা অতঃপর বৈজয়ন্তধামে?
শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা, ব্যাপি ব্যোমদেশ,
ত্রাসিত করিলা যবে ত্রৈলোক্য-মণ্ডল।
কি করিলা বৃত্রাসুর, কি ভাবিলা চিতে,
শুনিয়া সে ভয়ঙ্কর প্রলয়-বিষাণ?
দাম্ভিকা গন্ধর্ব্ব-বালা দৈত্যেন্দ্র-মহিষী
সে দৈব উৎপাতে, কহ, চিত্তে কি ভাবিলা
ইন্দ্রপুরী প্রবেশিয়া পুলোমানন্দিনী
যাপিলা কিরূপে কাল রিপুদলমাঝে?
কি করিলা দেবগণ দানবে দণ্ডিতে?
কিরূপে যুঝিলা স্বর্গ, শচী উদ্ধারিতে?
কেমনে দেবেন্দ্র ইন্দ্র, অভীষ্ট সাধিতে,
লভিল দধীচি-অস্থি? বিশ্বকর্ম্মা তায়
কিরূপে গঠিলা বজ্র—ভীম প্রহরণ?
বধিলা কিরূপে ইন্দ্র বৃত্র মহাসুরে?
কহ, মাতঃ, অমরার কোন্ স্থানে এবে
শিব-শক্তিধর বৃত্র? কি চিন্তা-পীড়িত?
শূন্য কেন বৈজয়ন্ত সভাগৃহ আজি?
হে দেবি, করিয়া দয়া, কহ সে ভারতী।
উত্তুঙ্গ সুমেরু-শৃঙ্গ উঠেছে যেখানে
অনন্ত গগনমার্গে—স্বর্গ শোভা করি,
মস্তকে বিশাল শূন্য ধরি যেন সুখে,
হর্ষে হাসিতেছে নিজ সামর্থ্য নিরখি,
শূল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে
দাঁড়ায়ে ভূধর-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া,
একদৃষ্টি শূন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে—
যেখানে শিবের ক্রোধ-বহ্নি দেখা দিল।
অপূর্ব্ব দেখিতে চিত্র!—সুমেরু-অচলে
বৃত্রের বিশাল বপুঃ, গিরি যেন কোন(ও)
অন্য কোন(ও) গিরি-অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া,
পরীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত!
ভীমদৃষ্টি ভয়ানক, কুঞ্চিত ভ্রূভাগ,
তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জ্বলে,
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গম্ভীর
বিদ্যুতের ছটা ধরি! ভাবে বৃত্রাসুর—
"শিবের ক্রোধাগ্নি কি এ? শিবের বিষাণ
গর্জ্জিল কি অইখানে ত্রৈলোক্য কাঁপায়ে?
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—জানাতে তাহারে
তাহার দিবস-অন্ত! কৃতান্ত-শর্ব্বরী
আসিছে তমসা-জালে ঢাকিতে দানবে?
দর্পে যার প্রকম্পিত, পল্লবের প্রায়,
ভূলোক, দ্যুলোক, শূন্য! ভুজবলে যার
স্বর্গে, মর্ত্তে দৈত্যনাম নিত্যপূজনীয়!
মুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল,
গঙ্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিনু!
সিদ্ধ হৈনু শিব-বরে খ্যাতি ত্রিভুবনে—
সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হবে কি নির্ব্বাণ?
পণ্ড শিব-আরাধনা? সামর্থ্য নিস্ফল?
অবিশ্রান্ত রণ-ক্লেশ অশেষ যাতন,
দুর্ব্বার সংহার-শূল শঙ্কর-অর্পিত,
সব ব্যর্থ? দৈব-বহ্নি ঘোষিল কি ইহা?
অথবা উন্মাদ আমি অলীক আতঙ্কে
ভ্রান্ত হয়ে ভাবি মনে—তবে কি কারণ
সহসা ত্রিনেত্রে মম পলক পড়িল?
শিব-ক্রোধানল ভিন্ন বৃত্র ভীত কিসে?
হবে বা দয়ার্দ্রচিত্ত দেব আশুতোষ
ক্রুদ্ধ হৈলা ইন্দ্রজায়া শচী-কারাবাসে?
জানাইলা রোষ তাঁর—ভক্তপ্রিয় দেব
জ্বালাইয়া ক্রোধানল গগনমণ্ডলে!"

এত ভাবি, দৈত্যপতি নিশ্বাসি গভীর
কটাক্ষ হানিলা তীব্র শূন্যেতে আবার ;
নমিলা উদ্দেশে রুদ্রে, শিবদত্ত শূলে
সম্ভ্রমে পূজিয়া যত্নে ফিরিলা আলয়ে।
ইন্দ্রপুরী-দ্বারে দৈত্যা, ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
দ্রুত কৈলা আলিঙ্গন দানবে দেখিয়া,
সাদর-সম্ভাষ মুখে, নেত্রে প্রেমশিখা,
যতনে ধরিলা হস্ত অপাঙ্গ হেলায়ে।
দৈত্যনাথ চিন্তামগ্ন, না কৈল উত্তর।
চতুরা ঐন্দ্রিলা ভাব বুঝিলা ভঙ্গিতে,
ধরিলা গম্ভীর মূর্ত্তি ; ধীর পাদক্ষেপে,
হস্ত ধরি, ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা।
বসাইল রত্নাসনে—হায়, যে আসনে
ইন্দ্র, ইন্দ্রজায়া, পুর্ব্বে লভিত বিশ্রাম,
ত্রিদিবে যখন দেব মাতিত উৎসবে,
দৈত্য-রণে জয়ী হয়ে যত্নে আজি তায়
বসাইলা বৃত্রাসুরে, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
বসিলা নিকটে, বার্ত্তা সুধাইলা কত ;
করিল কতই যত্ন দানবে তুষিতে !
কুঞ্জরপালক যথা মত্ত করিরাজে
তোষে নানা স্তোক-বাক্যে, যবে করিরাজ
পাদক্ষেপে পরাঙ্মুখ উর্দ্ধে শুণ্ড তুলি !
তখন দনুজেশ্বর বৃত্র বলবান্
চাহিয়া ঐন্দ্রিলা-মুখ কটাক্ষ হানিলা,
কহিলা গম্ভীর স্বরে—নগেন্দ্র-গহ্বরে
গর্জ্জিল পবন যেন ভীষণ নিস্বনে—
"ঐন্দ্রিলে—ঐন্দ্রিলে, জান না কি হেমকুম্ভ
ভাঙ্গিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ-আঘাতে ?
বিশাল সাম্রাজ্য এই ;—ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া,
বৃত্রের দোর্দ্দণ্ড দাপ, হেথা এই সুখ,
এই স্বর্গে, ইন্দ্রধামে, অমর-বাঞ্ছিত
ঐশ্বর্য্য অপরিসীম খ্যাতি চরাচরে ;
বৃত্রের সম্বল—চন্দ্রশেখরের দয়া ;
চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তনবিভাস,
সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হৈতে বামা—
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হতে !
ক্রোধান্বিত বিশ্বনাথ শচী অপমানে,
জানাইলা রুদ্র-রোষ বিষাণে নিনাদি,
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—দণ্ডিতে,ঐন্দ্রিলে,
গন্ধর্ব্ব কন্যার দর্প দনুজে আঘাতি।
চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
এখন (ও) ভাতিছে মৃদু সুমেরু-উপরে
দীপ্ত অন্ধকার যথা !" বলিয়া নীরব
দনুজ-ঈশ্বর, শিবভক্ত মহাসুর।
ঐন্দ্রিলা তখন—"দেব ! দৈত্যকুলনাথ,
ঐন্দ্রিলা-বল্লভ, দম্ভী, শম্ভুশূলধারী,
হেন অসম্ভব দ্বিধা অন্তরে তোমার ?
অম্বুনিধি আন্দোলিত শুশুক-ফুৎকারে ?
নগেন্দ্র-ভূধর-কম্প পতঙ্গ-নিশ্বাসে !
খগেন্দ্রে ভুজঙ্গ-ভয় ? কি প্রমাদ হায় !
কি দেখিলা—কোথা রুদ্রক্রোধ হুতাশন ?
কোথা বা বিষাণ-শব্দ ? উন্মাদ কল্পনা !
কে কহিলা তোমারে এ হে দনুজেশ্বর,
হাস্যকর উপন্যাস—রোগীর প্রলাপ ?
জান না কি শূর—স্বর্গে নিসর্গের খেলা
অনন্ত-মাঝারে হয় নিত্য কতরূপ ?
কিবা জ্বালা চক্ষু ধাঁধি জ্বলে শূন্যদেশে,
যখন প্রকাণ্ড কোন(ও) গ্রহের মণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে ব্রহ্মাণ্ড ঝলসি !
কিবা ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ বিদারি
ভ্রমণ করয়ে শূন্যে, নক্ষত্রে যখন
নক্ষত্র আঘাতি ধায় গম্ভীর অম্বরে,
দৈব আকর্ষণ-বলে ? হে দনুজনাথ,
দেখেছ শুনেছ পূর্ব্বে কত দৈব হেন।

অথবা মায়াবী দেব দনুজে ছলিতে,
সবে একত্রিত এবে যুদ্ধ-আড়ম্বরে,
ইন্দ্রজাল ইন্দ্রপুরে দেখায় অদ্ভুত,
দুর্ব্বল করিতে ছলে দৈত্যভুজবল।
শিবভক্ত শিবপ্রিয়, তুমি দৈত্যরাজ,
তোমাকে বিমুখ শম্ভু? চিত্তে দেহ স্থান
হেন কাল্পনিক চিন্তা? কলঙ্ক তোমার,
কলঙ্ক, হে শিবভক্ত, ধূর্জ্জটির নামে!
আমি যদি, দৈত্যপতি, তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ!
ভয়, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার হৃদয়ে
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে!
প্রতিজ্ঞা করিলে—দানবের পণ, প্রভু,
মনে যেন থাকে—দেব-সেনাপতিবৃন্দে
জিনিয়া সমরে, বান্ধি আনি অমরায়
ইন্দ্রের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে।
সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ! হাসে দেবগণ,
আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে!
বৃথা নিন্দ ঐন্দ্রিলারে, দনুজ-ঈশ্বর,
অলীক স্বপনে মুগ্ধ তুমি সে আপনি!"
"বামা তুমি" বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন;
হেরিয়া ঐন্দ্রিলা-মুখ গর্ব্বিত, গম্ভীর,
দম্ভে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চারু-বিম্বাধর
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন!
সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব।
লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড—দম্ভের ছটায়
চিত্ত-প্রতিবিম্ব যেন প্রজ্বলিত এবে
সর্ব্ব-অঙ্গে, অবয়বে, ললাটে, গ্রীবায়
যেন বা কি দৈববাণী, অন্যের অশ্রুত,
গোপনে শুনেছে বামা, তাই সে প্রত্যয়
দৃঢ়তর এত মনে,—তাই উপহাস
করিছে দনুজবাক্যে দনুজ-মহিষী।
দেখিয়া দৈত্যেরও মনে দর্প উপজিল;
ঐন্দ্রিলার গর্ব্বে যেন চিত্তে ক্ষণকাল

জন্মিল প্রত্যয় হেন—তাহারি সে ভ্রম!
ঐন্দ্রিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হাসিয়া—
"বামা আমি"—বলি দম্ভে সম্ভাষি গম্ভীর
দাঁড়াইল মহাদর্পে শির উচ্চ করি,
ভুজঙ্গী ঘাতকে লক্ষ্যি দংশিবার আগে
সঘন গর্জ্জিয়া যেন প্রসারয়ে ফণা।
কিম্বা যেন রাজহংসী পদ্মবন লুটি.
মৃণাল আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে,
চঞ্চুতে পঙ্কজ-শোভা পক্ষ সাপটিয়া
মধ্যহ্রদে স্থির হ'য়ে গ্রীবা উচ্চ করে!
"বামা আমি, দনুজেন্দ্র, রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।
শুন, ওহে দৈত্যনাথ, 'বামা' সত্য আমি
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোকখ্যাত গন্ধর্ব্ব দুহিতা;
সামান্যা অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা;
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা, শুন হে দানব।
সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে ত্র্যম্বক
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে,
সত্যই যদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাদ
প্রলয়-বিষাণ-শব্দ—শুদ্ধ কেন তায়?
খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা;
ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্ব্বাণ
হবে না, জানিহ পুনঃ,—ভাবনা কি তবে?
ভাবনা কার্য্যের আগে, সাধন এখন।
স্খলিত হিমানীস্তূপ কম্পিত ভূধরে
ঘর্ঘর নিনাদি, চূর্ণ করি শৃঙ্গমালা,
ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি,
কে নিবারে গতি তার—কার সাধ্য হেন?
তেমতি জানিও ইহা; নতুবা দৈত্যেশ
দানবেন্দ্র নামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে
বাসনা যদ্যপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম
ঘুচাইতে চাও যদি—শচী ফিরে দাও,

ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে,
নিজে ভেটবাসী হয়ে, নিঃশঙ্ক দানব!
নহে কহ, আমি তার দাসী হয়ে যাই,
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্র করে!"
দেখিলা দানবরাজ গরিমার ছটা
ঐন্দ্রিলার মুখপদ্মে—যথা সে পঙ্কজে
সূর্য্যের কিরণমালা, অরুণ যখন
অরুণ স্যন্দনে চাপি, নীলাম্বর পথে
আনন্দে চালায় রথ; মৃদুকলস্বরে
জাগায় মানবে সুখে বিহঙ্গমব্রজ।
নিরখি পূর্ণেন্দুমুখ, দৈত্যরাজ-মুখে
ভাতিল অতুল জ্যোতি—শশাঙ্ক-কিরণ
চূর্ণ মেঘস্তরে যথা। ঢাকিল আবার
(ঢাকে যথা মেঘচূর্ণ পূর্ণশশধরে)
দনুজেন্দ্র মুখকান্তি চিন্তার ছায়াতে।
কহিলা মহাদানব চিন্তি ক্ষণকাল,
"বামা তুমি, ইন্দুমুখি, গন্ধর্ব্বনন্দিনি,
এ নহে নিসর্গখেলা—তা হ'লে কি কভু
আতঙ্কে আমার নেত্রে পলক পড়িত?
নিসর্গ ক্রীড়ার রঙ্গ দেখেছি সে কত।"
কহিলা—"এ মহেশের ক্রোধ(ই) যদি
কি চিন্তা এমন তাহে? জান না ঐন্দ্রিলে,
মৃত্যুঞ্জয় আশুতোষ—ক্রোধ নাহি রয়!
শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশ।"
এত কহি রতিরে কহিলা দৈত্যপতি,
"শীঘ্র যাও, মদনমোহিনি, শচী-পাশে,
কহ তারে আসিতে হেথায়; কায়ক্লেশ
ঘুচাব তাহার অচিরাৎ।" দ্রুতগতি
দৈত্যপতি হইলা বাহির; মহাবেগে
উঠিল প্রাচীরে, চাহি দেখিলা চৌদিকে,
দৈত্যদৃষ্টি যত দূর—দূরপ্রান্তে তার,
অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি
জ্বলিছে দেবের তনু গভীর নিশীথে!
স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল
কোথা অবিরল শ্রেণী—দু'একটি কোথা
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা! দেখিতে তেমতি
হে কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবী-সলিলে
ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া
কার্ত্তিকের অমানিশা-অন্ধকার হরি,
মত্ত যবে কাশীবাসী দেওয়ালী-উৎসবে!
অথবা দেখিতে, আহা, নক্ষত্র যেমন—
নক্ষত্র নিশীথ-পুষ্প—নীলাম্বর মাঝে
শোভে যবে অন্ধকারে গগন আবরি।
দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ম্ম, প্রহরণ,
খড়্গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ, পরশু,
কোদণ্ড বিশাল মূর্ত্তি, গদা ভয়ঙ্কর,
জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত-তনু তূণীর, ফলক,
তোমর, মার্গণ, টাঙ্গী, ভীম খরশান,
কোনখানে স্তূপাকার জ্বলিছে তিমিরে
বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে
রথের ঘর্ঘর শব্দ, নেমি দীপ্তিময়;
কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মণ্ডলে।
তুরঙ্গের হ্রেষারব, করীর বৃংহতি,
মহিষের ঘোরশব্দ উঠিছে কোথাও,
গাঢ়তর রজনীর নিঃশব্দতা হরি,—
কোথাও মাধুর্য্যপূর্ণ অমরের বাণী।
কোন বা শিবির'পরে শিখিপুচ্ছ শোভে;
কোন শিবিরের চূড়ে মৃগাঙ্ক অঙ্কিত;
হেমকুম্ভ কার(ও) ধ্বজে, কার(ও) ধ্বজে তারা,
কোন বা শিবির-ধ্বজে জ্বলন্ত পাবক।
কত স্থানে স্তূপাকার মেঘের বরণ
বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভুজদণ্ড, উরু,
রুধিরাক্ত দৈত্যবপু, দেখিতে ভীষণ,
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেব-রণস্থল।
দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল,
স্বর্গের দিবার জ্যোতি উদিল পূর্ব্বেতে,
দন্ত কড়মড়ি দৈত্য, নিশ্বাসে হুঙ্কারি,
ফিরিল আকুল-চিত্ত মন্ত্র-সভাতলে

উচ্ছলিত হৃদিতল অশুভ চিন্তায়,
ক্রোধে, তাপে, প্রজ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি,
ভুলিতে চিত্তের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে
প্রতিজ্ঞা করিলা দৈত্য; সুমিত্রে ডাকিয়া
আজ্ঞা দিলা সেনাবৃন্দে সমরে সাজিতে।
অমরা-উত্তর-দ্বারে—যেথা মহারথ
অমর-সেনানীগণ কার্ত্তিকেয় আদি—
সাজিতে লাগিল সৈন্য ভীমকোলাহলে!

ত্রয়োদশ সর্গ

নগেন্দ্র-অঞ্চলে—যেথা নগেন্দ্র-সম্ভবা
তটিনী অলকনন্দা কলকল স্বরে
কহিছে, অটবী-অঙ্গ ধীরে প্রক্ষালিয়া,
"দিনমণি অস্তগত", উরিলা সুরেশ,
ছাড়িয়া অম্বরপথ বিশাল বিস্তৃত
রম্য সে অরণ্য-দেশ! সন্ধ্যার তিমির
গাঢ়তর স্নেহে যেন দিয়া আলিঙ্গন,
আদরে ধরেছে সুখে অটবী-সখীরে।
অরণ্য ভিতরে কত মহীরুহরাজি—
পলাশ, শিরীষ, বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী,
জটে জটে, স্কন্ধে স্কন্ধে, জড়ায়ে জড়ায়ে
নিঃশব্দে ভাবিছে যেন ভীম বাত্যাতেজ!
বিরাজিছে অরণ্যানী দেখিতে তেমতি,
হাসি, কান্না, ক্রোধ যেন একত্রে
মিশ্রিত!
কোথা শান্ত স্থির ভাব, কোথা ভয়ঙ্কর,
কোথা বা তমসা-পূর্ণ বিবর্ণ মলিন!
ধীরপদে, শর্ব্বরীর ঘোর অন্ধকারে
চলিলা বাসব বক্র অরণ্য-বর্ত্মেতে,
শুনিতে শুনিতে কত—ফেরু-ঝিল্লী-রব,
বিকট-তক্ষকনাদ ভল্লুক-চীৎকার,
পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশরি-গর্জ্জন,
ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষের নিস্বন,
শাখাচ্যুত পল্লবের শব্দ মৃদুতর,
পবনের স্বন্ স্বন্ সুঘোর নিশ্বাস।
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন পল্লব-রাজিতে
দেখিলা খদ্যোত-দ্যুতি শোভিছে কোথাও
সাজাইয়া তরুরাজি অপরূপ রূপে,—
কোটি মণিখণ্ড যেন অটবী-মস্তকে!
কোথাও আবার শাখা-জটা ভয়ঙ্কর—
নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে
প্রসারণ করে কর!—দেখিতে দেখিতে
চলিলা অমরনাথ কৌতুকে মগন।
নিরখিলা এক স্থানে আসি কিছু দূরে,
রমণীমণ্ডলী-শোভা বন-অন্ধকারে—
রজনী-সীমন্তে যথা তারকার দাম,
শোভে, শূন্য শোভা করি, মৃদুল রশ্মিতে!
আলিঙ্গন পরস্পরে, মধুর সম্ভাষ
জিনি কলকণ্ঠ-ধ্বনি—সুখের মিলনে
প্রবাসী ভাসয়ে যথা স্বদেশী লভিয়া!
নির্ব্বাসিত কিম্বা যথা ফিরে নিজালয়ে!
দেখিতে লাগিলা ইন্দ্র পৌলোমীবল্লভ
সে সুদৃশ্য মনোহর অদৃশ্য ভাবেতে,
মহাকুতূহল-মগ্ন; দেখিলা বিস্ময়ে,
কেহ বা শিখণ্ডী-মূর্ত্তি ছাড়িয়া সুন্দর
ধরিছে সুন্দরতর, সুর-বিমোহন
অপূর্ব্ব অঙ্গনারূপ লাবণ্যমণ্ডিত।
কেহ সুখে কুহু-কণ্ঠ-রূপ পরিহরি
নিন্দিছে শশাঙ্ক-জ্যোতি রূপের ছটায়।
কুরঙ্গিনী-তনু ত্যজি কোন মনোরমা
কুরঙ্গলাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে,
তাপসের চিত্ত-হর! কোন সীমন্তিনী
ছাড়িয়া শার্দ্দূল-বেশ, দেহে প্রকাশিছে
অনুপম চারু কান্তি রতিকান্তি জিনি,

কহিছে কোন ললনা,—সুচামর কেশ
লুটিছে চরণ-পার্শ্বে,—ভ্রমিছে যেমন
মধুকর-কুল রক্ত-কমল উপরে !
কহিছে, "হা, কত কাল, অদৃষ্ট রে আর
সুরাঙ্গনা এ দুর্গতি ভুঞ্জিবে ধরায় !
ধিক্ দেবগণে দৈত্য-রণে পরাজিত।
ধিক্ ইন্দ্রে—জিষ্ণু নামে কলঙ্ক তাঁহার।"
হেন কালে অগ্রসরি সুরেন্দ্র বাসব
রমণীমণ্ডলী-পার্শ্বে দিলা দরশন,
পৃষ্ঠেতে কার্ম্মুক দীপ্ত, রত্ন-বিভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল করি অরণ্য বিশাল।
হরষিত হংসীকুল নিরখিলে যথা
মরালে মণ্ডল-মাঝে, হরষিত তথা
দেবাঙ্গনাগণ ইন্দ্রে ঘেরিলা চৌদিকে,
দ্রুত সুধাইলা স্বর্গ উদ্ধার কি রূপে ?
কহিলা, "হে শচীনাথ, দারুণ যন্ত্রণা
এত দিনে অবসান ; আর না হইবে
সহিতে প্রবাস-ক্লেশ, হৃদয়ের দাহ,
পশুপক্ষী-রূপে ছদ্মবেশে ধরাবাসে।
ত্রিদিবে অসুরদল-প্রবেশ অবধি
পলাইনু মোরা সবে—দাবাগ্নি যেমন
প্রবেশিলে বনে, ধায় কুরঙ্গিনীদল—
তদবধি অনন্ত যাতনা, হে সুরেশ ;
কেহ বিহঙ্গিনী-রূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে,
কেহ বা কুরঙ্গী, কেহ ক্রৌঞ্চীবেশ ধরি,
মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী কেহ, কেহ বা মহিষী,
হা অদৃষ্ট—কেহ রূপে বরাহী জম্বুকী !
সে দুর্দৈব অবসান এত দিনে দেব,
অমরী-উদ্দেশে আ(ই)লা স্বর্গ উদ্ধারিয়া
হে সুরেন্দ্র, শচীপতি, আ(ই)স এইখানে
অভিষেক করি তোমা অমর-উৎসবে।"
বলি ধা(ই)লা নানা জনে পুষ্প অন্বেষণে,
গাঁথি মালা সাজাইতে মহেন্দ্র-শীর্ষক,
ঝুলাইতে পুষ্পহার সুরেশ-গলায়—
অমর-সঙ্গীতে বন পুলকিত করি।
ক্ষুব্ধচিত্ত পুরন্দর—যথা বলহীন
কেশরী পিঞ্জর-মাঝে—ছাড়িলা নিশ্বাস
গভীর প্রবল বেগে ! হায়রে ভূতলে
দেবেন্দ্র ভিক্ষুক আজি দৈত্য-ভুজদাপে ;
আশ্বাসে করিলা শান্ত সুরকন্যাদলে,
সুমন্দ গভীর স্বরে কহিলা প্রকাশি
কি হেতু ধরায় গতি ; কহিলা যে হেতু
গতি তাঁর দধীচি-আশ্রমে শিবাদেশে ;
যে বারতা দিলা তাঁরে সুমেরু-শিখরে
ইন্দ্রবাক্যে হরষ-বিষাদে ভাগ্যদেব।
কহিলা অঙ্গনাদল, "হে পৌলোমী-নাথ,
কিছু অগ্রে দধীচির পবিত্র আশ্রম।
দয়ার সাগর ঋষি ঋষিকুলচূড়া
অদ্বিতীয় সুরলোকে ! জেনেছি আমরা
যে অবধি ভূমণ্ডলে বাস, হে সুরেশ,—
জীব-উপকারে ঋষি জগতে অতুল।
ব্রত—পর-উপকার, স্বার্থ-পরিহার,
কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের মঙ্গল;
কিবা কীটে, কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল
মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—জীব-চূড়ামণি।
জীবন দিবেন তিনি দেবের কল্যাণে
না চিন্ত, অমরপতি !" দেখাইলা পথ ;
চলিলা সুরেশ ধীরগতি। কতক্ষণে
দেখিলা গগনপ্রান্তে তরুণ কিরণ,
চারুমূর্ত্তি প্রভাকর শূন্যে সাম্যভাব !
খেলিছে কুরঙ্গরাজি ; অজিন-রঞ্জিত
শোভিছে কুটীর-দ্বার ; শ্রুতি-সুখকর
স্তুতিধ্বনি চারিদিকে উচ্চে উচ্চারিত ;
কোথাও ভাস্কর-স্তোত্র-ললিত-লহরী,
গায়ত্রী-বন্দনা কোথা, সন্ধ্যা আরাধনা,
বিশদ সুরেতে বেদ-সঙ্গীত কোথাও,
কোনখানে 'মহিমনঃ' মহাস্তবপাঠ !

শিষ্যবৃন্দ, আনন্দে ঘেরিয়া তপোধনে,
শুনিছে মহর্ষিবাক্য—অনন্যমানস ;
হায়রে যেমতি বাগীশ্বরী-বীণাধ্বনি
শুনিতে উৎসুক-চিত্ত অমরমণ্ডলী
সৃষ্টির উৎসব দিনে—পদ্মাসনা যবে
দেব-চিত্ত-মোহকর শুনান ভারতী।
কহিছেন মহা-ঋষি কিরূপে কলহ,
সর্ব্ব-জীব-দুঃখমূল, আইল ধরায় !
"এক দিন—হায় কেন উদিল সে দিন
জলধি-সম্ভবা বিষ্ণু-জায়া স্বর্গধামে
চাহিলা বিরিঞ্চি-পাশে, সৃষ্টিতে অতুল,
অপরূপ রত্ন কোন(ও) সৃজি দিতে তাঁরে !
বিধাতা সৃজিলা ফল অতুল ভুবনে—
কান্তি, চন্দ্র-শোভা জিনি,—ভ্রান্তিনিরখিলে
সৌরভ জিনিয়া চারু সুরভি পীযূষ,
অমর-দনুজে ঘোর দ্বন্দ্ব যার লাগি,
ফিরে যবে দেবাসুর অম্বুনিধি মথি
শ্রান্তদেহে অমরায়—দগ্ধ হলাহলে !
অনন্ত যৌবন ফলে পরশিলে বামা,
পুরুষের করস্পর্শে অক্ষয় প্রতাপ।
ব্রহ্মাণী মোহিলা হেরি, চাহিলা সে ফল,
ক্রোধান্ধ কেশবজায়া ; দেবীবৃন্দ মাঝে,
উপজিল ঘোরদ্বন্দ্ব ; না চিন্তি বিধাতা
নিক্ষেপিলা বিষময় ফল ধরাতলে।
তদবধি ঈর্ষা, দ্বেষ, হত্যা এ জগতে !
নররক্তে নিমজ্জিত এ ধরণীতল ;
রণস্রোত প্রবাহিত সে অবধি ভবে—
মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারি !
কত দিনে বুঝিবে রে মনুজ-সন্তান
কি কুটিল ব্যাধি লোভ! কি কূট গরল
নরকুল-দেহে দ্বন্দ্ব ! কবে সে বুঝিবে
আত্মার পশুত্বলাভ সমর-প্রাঙ্গণে।
কুটিল, কূট-কটাক্ষী, হত্যা ভয়ঙ্করী
সাধিতে যা পারে ভবে, নারে কিরে তাহা
অমর-নন্দিনী দয়া সরলা সুন্দরী ?
কবে নরকুল—অবনী-সীমন্ত-রত্ন—
মিলি সখ্যভাবে সুখে নিত্য ছড়াইবে
ভ্রাতৃত্বের সুখ-ধারা ; যথা সে সুখদা
বিমল-তরঙ্গ গঙ্গা পুণ্যভূমি মাঝে
ছড়ান সলিলধারা মানবে রক্ষিতে !
হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বম্ভর !
হর বিশ্বভার শীঘ্র এ ভ্রান্তি ঘুচায়ে—
ভ্রান্ত নরকুলে, দেব, কর চিরসুখী !
হৃষীকেশ, হও, প্রভো, মানবে সদয় !"
পৌলোমী-ভরসা ইন্দ্র, মুগ্ধ ঋষিভাষে,
অলক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে ছিলা এতক্ষণ,
পূর্ণজ্যোতি দেবকান্তি এবে প্রকাশিলা।
নীরদ-লাঞ্ছন কেশ প্লাবিত কিরণে,
বক্ষেতে বিশাল বর্ম্ম—ভাস্কর যেমন
প্রভাতে অরুণোদয়ে কুহেলি আবৃত।
শোভিছে অতুল তূণ, সুন্দর কার্ম্মুক—
কাদম্বিনী কোলে যাহা চির-শোভাময় !
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি, যথা তারাদল
নিশীথে শর্ব্বরী-কোলে উঠি তপোধন
সশিষ্যে সম্ভ্রমে সুখে অতিথি সম্ভাষি,
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন।
জিজ্ঞাসিলা সুশীতল গম্ভীর বচনে
"আশ্রমে কি হেতু গতি? কিবা অভিলাষ ?"
ভগ্নচিত্ত আখণ্ডল নেহারি নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ,—ভগ্নচিত্ত যথা
দয়ালু দর্শকবৃন্দ নবমীর দিনে,
যূপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দ্দয় কামার,
মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা-মূর্ত্তি আগে,
অসহায় ছাগ, মেষ পূজায় অর্পিতে !—
কে পারে আনিতে মুখে সে নিষ্ঠুর বাণী—
কে পারে চাহিতে অন্যে প্রাণ ভিক্ষাদান,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা ? কে হেন দারুণ
প্রাণীমাঝে ? নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর !

হেরি ঋষি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ; গদ-গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"পুরন্দর, শচীকান্ত? কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম।
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হ'য়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি!
দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের(ও) অতীত"
এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড়, সুশীতল, পল্লব-শোভিত,
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা
সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ, আকুল-হৃদয়,
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।
জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস; সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।
তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতিঃ সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে।
সুললাটে আভা নিরুপম! বিলম্বিত
চারুশ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মাল্য বক্ষঃস্থলে!
বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে!
চাহি শিষ্যকুল-মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে;—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভব-মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন?
হিতব্রত-সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা?
হায় রে অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে?
অনুক্ষণ জীবনের স্রোতধারা-ক্ষয়,
হয় সে কতই রূপে! কেন তবে হেন,
ঘটে যদি কার(ও) ভাগ্যে সে দুর্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত-সাধনে?
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"
ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি,
আশীষিলা শিষ্যগণে; কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি, দেহ মম বারেক পরশি।"
অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন,
তপোধনশিরঃ স্পর্শি স্বকর কমলে,
কহিলা আকুল স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—
"সাধু-শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক!
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন!
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির-মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর!
জীবময় নররূপী—অকূল জলধি,
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্বপ্রায়
জীবদেহ অনুদিন! এ ভব-মণ্ডলে
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ।
ক্ষুদ্র প্রাণী-দেহ-ক্ষয়ে এ সিন্ধু-সলিল
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি জানে—নিয়ত গভীর
স্রোতময়! অহিত জগতে নহে তায়,
অহিত—নিষ্ফলে প্রাণী-দেহের নিধনে!
প্রাণীমাত্রে—কি মহৎ, কিবা ক্ষুদ্রতম—
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,
আপন আপন কার্য্যে জীবন-ধারণে।

বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু-পরিমাণে
বাড়ে দিবা, বিভাবরী, সাগর-গর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশঃ বিস্তৃত
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু-গিরিময়,
তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই,
সাধু কার্য্যে মানবের প্রতি অহরহঃ।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল কল্যাণ-সাধন অনুদিন!
পরহিত ব্রত, ঋষি, ধর্ম্ম যে পরম;
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।
মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ, ঋষিকুলচূড়া
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।
কি বর অর্পিব আর নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে!
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগতখ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমিমাঝে!”

বলিয়া রোমাঞ্চতনু হইলা বাসব,
নিরখি মুনীন্দ্র-মুখে শোভা নিরমল!
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান,
উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,
সমুহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বনলতা-তরুকুল শোকে অবনত!
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি!
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

চতুর্দ্দশ সর্গ

অমরার প্রান্তভাগে মন্দাকিনী-তীরে
মন্দির পাষাণময়, নিভৃত আলয়,
অনুতপ্ত অমরের চির চিন্তাধাম,—
বন্দী এবে ইন্দ্রজায়া সে তপোমন্দিরে!
চতুর্দ্দিকে সেই সব নিকুঞ্জকানন,
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভপুরিত,
সেই পারিজাতপুষ্প, শোভা—ঘ্রাণে যার
উন্মাদিত দেবচিত্ত। শোভিছে আলোকে
দূরে বৈজয়ন্তপুরী—ইন্দ্র-অট্টালিকা—
চারু কারুকার্য্যে যায় সৃষ্টিতে অতুল
করিলা অমরশিল্পী—শিল্পীকুলরাজ
বিশ্বকৃৎ; সুখিত অমর-বাসগৃহ।

দূরে সে নন্দনবন শোভিছে তেমতি
প্রমোদ বিশ্রাম-সুখ চিরদিন যায়,
লভিলা বাসব-জায়া; শোভিছে তেমতি
চির পরিচিত যত অমর-বিভব।
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি। নব কুসুমিত
নন্দনে কুসুমদল সুগন্ধ ছড়ায়ে
ভাসিছে অপূর্ব্ব সুখে; উন্মাদিত প্রাণে
পারিজাত পরিমল করি বিতরণ
খুলিছে হৃদয়দ্বার! নির্ম্মল মলয়
গন্ধে মুগ্ধ করি স্বর্গ আনন্দে ছুটিছে,

হরিতে শচীর শ্রান্তি ! হরষে অধীর
ছুটেছে তরঙ্গময়ী মন্দাকিনী-ধারা
প্রক্ষালি পবিত্র জলে শৈল নিকেতন—
শচী-নিকেতন আজি ! মনঃশিলাতল
আরো মনোরম মূর্ত্তি শচী-সমাগমে !
কে আছে ত্রিলোকমাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া,
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
সে জনমভূমি তার) নিরখি পূর্ব্বের
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণিকুল,
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হ'য়ে
"এই জন্মভূমি মম !"
কে আছে রে, হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ !
বিজেতা-চরণতলে নিত্য বিদলিত,
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে !
বিজন অরণ্যভূমি বনের (ও) কুসুম
ভুঞ্জিতে পরাণে ভয় ! শত্রুর অর্চ্চনা
দেব-অর্চ্চনার আগে ত্রিসন্ধ্যা যেখানে !
কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে ?
চিত্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পীড়া-দহন আজি। গভীর উচ্ছ্বাসে
বহিছে হৃদয়তলে চিন্তার হিল্লোল !
নয়ন ফিরাতে চিত্তে বিন্ধে তীক্ষ্ণশলা !
চপলা তরলমতি সে শোভা হেরিয়া
ধরিতে নারিলা ধৈর্য্য সুরেশ-জায়ারে
সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা,
দেখাইয়া অমরার শোভা চারিদিকে ;
"হের, সুরেশ্বরি, হের, চারিধারে কত
অমরের কীর্ত্তিস্তম্ভ ! আহা, কি সুন্দর,
জম্ভভেদি প্রতিমূর্ত্তি বিরাজে ওখানে !
ভগ্ন ভানি ভুজ এবে—তবু কি সুন্দর,
নমুচি-সূদন নাম যা হ'তে ইন্দ্রের,
হের, ইন্দ্ররমা, সেই নমুচিনিধন
হতেছে বাসব-হস্তে !—পাষাণে রচিত
কি সুচারু মূর্ত্তি, আহা, দেব বাসবের !
অই পাকদৈত্য পড়ে সুরেন্দ্রের শরে !
অই বলাসুর বীর রুধির উদ্গারি
ত্যজিছে বিশাল বপু ! বিশ্বকর্ম্মা-করে
রচিত বিচিত্র আরো দেবকীর্ত্তি কত !
অই হের মনোহর সে শোভামণ্ডপ,
রত্নাগার নাম যার ; পদ্মযোনি যায়
করিতেন অধিষ্ঠান ইন্দ্রপুরে আসি !
তেমতি উজ্জ্বল শোভা এখন(ও) তাহাতে
অই সেই কমলার কমল-আসন
মণিময় পদ্মে গাঁথা ! দৈত্য দুরাচার
হরেছে কতই দেখ মণিখণ্ড তার !
বিষ্ণু-রত্নাসন-শোভা দেখ তার পাশে।
কি বিচিত্র, আহা মরি, বেদী নিরুপম
ত্রিভুবন-মোহকর—ত্রিদিবে অতুল,
বসিতেন আসি যায় জগতজননী
কাত্যায়নী ত্রিনয়না—শূলপাণি সহ !
অই বিরাজিছে সেই বাণীর মন্দির,
শ্বেতভুজা আনন্দে বিহ্বলা যার মাঝে
সপ্ততার বীণা ধরি গায়িতেন সুখে
অমর-সৃজন-বার্ত্তা !—পড়ে কি স্মরণে,
হে দেবেন্দ্র-মনোরমা, কি আনন্দ-স্রোত
ভাসিত অমরামাঝে ! মহর্ষি নারদ
উন্মত্ত সে গীত শুনি নাচিত হরষে !
পঞ্চতালে তাল সুখে দিতেন মহেশ !
হে সুরেশ-প্রণয়িনি, কি চিন্তা মধুর
হেরে পুনঃ এই সব ! কত যে স্মরণ
হয় পুরাগত কথা। অনন্ত হিল্লোল
উথলিত চিত্তমাঝে যেন অকস্মাৎ !
আহা, প্রবাসের পরে, কিবা মনোহর
স্মৃতি-রশ্মি চিন্তা-পথে খেলে মৃদুতর—

অস্তসূর্য্যরেখা যথা কাদম্বিনী-কোলে
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন !
বিষাদ-হরষ-মাখা মধুর বচনে
কহিলা সুরেশকান্তা—"হে চারুহাসিনি,
কোথা বল অমরার সে শোভা এখন !
কোথা সে অতুল স্বর্গ ইন্দ্র-রমণীর !
কেন আর চিত্ত-দাহ করিস্, চপলে,
শুনায়ে ও সব কথা ! শিখিব যখন
সেবিতে ঐন্দ্রিলাপদ, শুনিব আহ্লাদে !
স্বর্গ নহে, চপলা, এ—ইন্দ্রাণীর কারা।"
"কি কহিলা, ইন্দ্রজায়া, কারা এ তোমার"
কহিলা চপলা দুঃখে অন্তরে আকুল
"চারিধারে এই সব অমর বিভব
হাসিছে না আজ (ও) কি সে তেমতি
গৌরবে !
বলিছে না অই শোভা-মণ্ডিত সুমেরু,
শিখর উঠেছে যার অনন্ত বিদারি,
তোমার(ই) চরণ তার সেবিতে বাসনা ?
বলিছে না এ দেবদেউল উচ্চশিরে
'বৈজয়ন্ত শচীধাম' ? এই মন্দাকিনী
কার পদ প্রক্ষালিতে মহা গর্ব্বে হেন
চলেছে তরঙ্গ তুলি ? ভ্রমিছে হরষে,
আবর্ত্ত পুষ্কর আদি অই যে অম্বরে,
কারে পৃষ্ঠাসন দিতে ? অই যে বিজুলি
কার রথচক্রনেমি ভাতিতে ছুটিছে ?
শচী ঐন্দ্রিলার দাসী বলে কি উহারা ?
কিম্বা বলে সুরেশ্বরী মহিষী তাদের ?"
উৎসুক উৎফুল্ল মুখ হেরি চপলার;
সৃক্কনে হাসির রেখা, সুরেন্দ্র-রমণী
আলিঙ্গন দিল তায় ; কহিলা "চপলে,
কহ শুনি সুখকর সে শুভ সম্বাদ,
রতি শুনাইলা যাহা সে দিন আমায়—
জয়ন্ত-চেতনপ্রাপ্তি বারতা মধুর !
না মিটে পিপাসা মম সে কথা শুনিয়া !

সখি রে, ধরার মাঝে নৈমিষ-বিপিনে
থাকিতাম মনসুখে পুত্র কোলে করি,
পেতাম যদ্যপি নিত্য তায় ! কি আহ্লাদ,
আহা সখি , ভুঞ্জিনু সে দিন মর্ত্তধামে
পুত্র কোলে বসিনু যখন সে নৈমিষে !
কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লো চপলে !
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম না হ'তে অধিক
সুখ এ অমরালয়ে ! পুত্র পেলে কোলে
জননীর স্বর্গসুখ—সর্ব্বত্র সমান !
কত দিনে চপলা রে, সে সুখ আবার
ভুঞ্জিতে পাইব চিত্তে ? কত দিনে বল্
জয়ন্তে করিয়া কোলে ভুলি এ দুর্দ্দশা—
দৈত্য-করে আমার এ কেশ আকর্ষণ !"
হেনকালে কামপ্রিয়া আসিয়া নিকটে
বন্দিলা শচীর পদ। আশীষি ইন্দ্রাণী
কহিলা—"মন্মথপ্রিয়ে, সদা সুখী আমি
হেরি তোরে—ভুলিব না মমতা তোমার !
কি সুখী করিলা হায় শুনায়ে সে দিন
জয়ন্ত চেতনা-বার্ত্তা মধুর সম্বাদ !
কহিতেছিলাম এই চপলারে পুনঃ
শুনাতে সে সুসম্বাদ !—হও চিরসুখী
কি বারতা কহ আজি ? কহ ইন্দুবালা
চারুমতি দৈত্যবধূ—কি কহিলা শুনি
সে উত্তর ? ভাবিলা নিদয়া বুঝি মোরে—
নিদয়া যেমন দৈত্যমহিষী ঐন্দ্রিলা ?
কত সাধ, কামবধূ, শুনি তোর মুখে
ইন্দুবালা-বিবরণ দেখিতে তাহারে !
কিন্তু ভাবি পাছে তার বাসনা পুরালে,
পাপীয়সী ঐন্দ্রিলা পীড়য়ে সে বালায়।"
উত্তরিলা মন্মথরমণী—হাস্যছটা
বিম্বাধরে সদা মনোহর !—"হে বাসব-
মনোরমে, বাসনা পুরিল এত দিনে।
মনোবাঞ্ছা পুরাইলা বিধি ! দিলা মোরে,
সুরেশ্বরি, শুনাতে তোমায় এ সম্বাদ !

মৃত্যুঞ্জয় এত দিনে সদয় তোমায়!
এত দিনে হৈমবতী হেরম্ব-জননী
চাহিলা তোমার মুখ! শিব-ক্রোধানলে
(জ্বলিল যে ক্রোধানল সে দিন অম্বরে)
ত্রাসিত ত্রিদিবজয়ী দনুজ-ঈশ্বর,
ভাবিলা ছাড়িবে তোমা মহেশে তুষিতে।
হে সুরেশ-রমা, দৈত্যনাথ কহিলা আমায়
'শীঘ্র যাও, মদনমোহিনি, শচীপাশে,
কহ তারে আসিতে হেথায়' ; অচিরাৎ
কারাবাস শেষ তব, সতি!" নীরবিলা
কামকান্তা মধুরহাসিনী প্রিয়ম্বদা।
ঝটিকার আগে যথা গম্ভীর আকাশ,
পুলোম-ঋষির কন্যা—পুরন্দর-জায়া
তেমতি গম্ভীর ভাব! ভাবিতে লাগিলা
অনঙ্গমহিলা-বাক্যে চিন্তিত অন্তর!
কতক্ষণ পরে—"না রতি," কহিলা ধীরে
"মায়াবী অসুর ছলে ছলিল তোমায়।
না বুঝিলে, কামবধূ, কালভুজঙ্গিনী
ঐন্দ্রিলার কূটখেলা। ছাড়িবে আমায়?
হে অনঙ্গ-সহচরি, এ কথা কিরূপে
হৃদয়ে আশ্রয় দিলে? যার তরে চর
ধরামাঝে পাঠাইয়া কেশে ধরাইয়া
আমায় আনিল হেথা, তার বাক্য হেলি,
দৈত্যপতি ছাড়িবে শচীরে! কহ শুনি
কি ছলনে ভুলিলে এ ছলে? সত্য যদি
ভাবিলে তা, বল বা কিরূপে—সুসম্বাদ
ভাবিলে ইহায়? রতি, শুভ সমাচার
শুনাতে আমায়, যদি শুনাইতে আজ,
তাপিতশরীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায়—স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ। কিম্বা পুত্র মম
জয়ন্ত জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে! হে অনঙ্গরমে,
শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে?
মোচন করিতে আমা নাহি কি সে কেহ,
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে?
না রতি, কহ গে দৈত্যে, চাহি না উদ্ধার
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা,
পতিহস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম।"
এত কহি স্থির-নেত্রে শূন্যদেশে চাহি
উচ্ছ্বাসিলা চিত্তবেগ—"হে শিবে শৈলজে,
জীবদুঃখবিনাশিনি, শচী নিজালয়ে
সেবিবে ঐন্দ্রিলা-পদ দেখিবে তা তুমি?"
নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি, উৎফুল্ল বদনে
শোভা দিল অপরূপ! প্রভাতিল যেন
তাড়িত কিরণ স্থির তুষার-রাশিতে
আভাময়,—আভাময় করি দশ দিক্!
শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা,
ভাবি মনে অসুরের ক্রোধন-মুরতি,
কাঁদিয়া চলিলা ধীরে ঐন্দ্রিলা-আগারে!

পঞ্চদশ সর্গ

গেলা যবে দৈত্যপতি উত্তরতোরণে
দণ্ডিতে অমরদর্প—দণ্ডিতে সমরে
মহাবল বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জনে,
দণ্ডিতে দুর্জ্জয় পাশী জলকুলেশ্বরে,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবে, শাসিতে সংগ্রামে
ভীম শিখিধ্বজ শিবসুতে—গেলা বরি
রুদ্রপীড়ে সেনাপতি-পদে। দম্ভ ছাড়ি
দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলা দৈত্যসুত।

পূর্ব্বদ্বারে ঘোর-রণ দেবতা-অসুরে—
ভীমরঙ্গে যুঝিছে অনল, যুঝে সঙ্গে
ইন্দ্রসুত জয়ন্ত কুমার ধনুর্দ্ধর।
বাজিছে অমরবাদ্য সমর-উল্লাসে ;
দৈত্যরণবাদ্য বাজে অম্বুনিধি-নাদে,
ভয়ঙ্কর কোলাহল বিদারে অম্বর !
অগ্রসরি চমূমুখে কোদণ্ড টঙ্কারি
দাঁড়াইল রুদ্রপীড়—বাজে ঘোর রণ !
ছুটিল অমরঠাট ত্রিদিব আকুলি ;
ছুটিল দানব গর্জ্জি জলদ-গর্জ্জনে ;
ঘন ঘন টলে স্বর্গ বীরপদভরে।
কভু ক্ষণকাল, দেবসৈন্য অগ্রসর
বিঘূর্ণি দনুজে—কভু নিন্দি দৈত্যসেনা
অমরবৃন্দেরে, ধায় ঘোর কোলাহলে।
ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল
খেলে রঙ্গে বেলা সঙ্গে সাগরের কূলে—
কভু জলরাশি দম্ভে ছুটে উঠে তীরে,
আবার পালটি ধায় সিন্ধুর গর্ভেতে—
তেমতি সমর-রঙ্গ অমর-দানবে !
লঙ্ঘিয়া প্রাচীর ক্রমে উঠিতে লাগিলা
অমর-বাহিনী ; অগ্নি অগ্নিময়-তনু,
জয়ন্ত ভীষণ, দেব-সেনাদল আগে
ছুটিছে উৎসাহে, সিংহনাদে সুরকুল
করি উৎসাহিত ! পড়ে দেব-অস্ত্রাঘাতে
দৈত্য-অনীকিনী, পড়ে শিলাখণ্ড যথা
আছাড়ি আছাড়ি, ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ,
কিম্বা যথা দ্রুমরাজি ঝড়ে মড়মড়ি।
ঘোর উচ্চস্বরে বহ্নি—"হে অমরচমূ,
আর (ও) ক্ষণকাল বীর্য্য দেখাও এমনি,
দেবহস্তগত তবে হয় এ নগরী।
অই স্থান, হে বীরেন্দ্র বাসব-তনয়,
লঙ্ঘিলে, দানবশূন্য নিমেষে এ দ্বার !
দেখিবে অচিরে সে চির-আনন্দধাম,
দেখ নাই দেবচক্ষে বহু কল্প যাহা,
অমরার চির-রত্ন নন্দন উদ্যান।"

বলি অগ্নি, স্ফুলিঙ্গ-মণ্ডিত কলেবর,
লম্ফে লম্ফে সর্ব্ব-অগ্রে উঠিলা প্রাচীরে,
ছুটিলা জয়ন্ত দ্রুত সসৈন্য পশ্চাতে।
নারে রুদ্রপীড়সেনা সে বেগ ধরিতে ;
বৃত্রসুত যুঝিলা অদ্ভুত পরাক্রমে,
নারিলা ফিরাতে নিজদলে ; ভঙ্গ দিলা
সেনা সঙ্গে, সর্ব্ব-অঙ্গে শোণিতের ধারা !
এথায় উত্তরদ্বারে অমর সুরথী
যুঝিছে দানব সঙ্গে ; সমরে মাতিয়া
দেখাইছে সুরবৃন্দ অমর-বিক্রম,
নিবারি দৈত্যেন্দ্র-ভুজবল ভয়ঙ্কর।
সুরক্ষিপ্ত শররাশি, ঝলসি গগন
ছুটিছে আকুলি দিক—বিদারি যেমন
বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধায় অনন্ত শরীরে—
উগারি অনলরাশি বিভীষণ-শিখা।
পড়ে ভীম জটাসুর (সঙ্গে ফিরে যার
দ্বিকোটি দানব নিত্য) দৈত্য
মহাকায়,
দন্ত কড়মড়ি, ভীম গদার প্রহারে ;
ঘুরাই ঘর্ঘরে যাহা বায়ুকুলপতি,
হানিছে চৌদিকে, নাশি দনুজের দল,
একা লণ্ডভণ্ড করি দ্বিকোটি দানবে।
কালাগ্নি জলিছে অঙ্গে, ধাইছে মার্ত্তণ্ড
উজলি সমর-সিন্ধু—উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শতক্রোশ—
ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অসুরে নাশিছে।
পলাইছে দন্তবক্র দানব দুর্ম্মতি,
(অমর জর্জ্জর-তনু দন্তাঘাতে যার,
ভয়ে যার লবণ-সমুদ্র প্রকম্পিত)
পলাইছে স্বদল সহিত ভীমবেগে ;
লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেনা ছুটিছে পশ্চাতে—
যথা ঘোর রঙ্গে ধায় ঘুরিতে ঘুরিতে
ঘূর্ণবায়ু সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, পত্রকুল !
শত খণ্ডে খণ্ড করি মুণ্ড দানবের
ফেলিলা মার্ত্তণ্ড দেব ; নিমেষে নাশিলা

সহস্র দনুজ বীর, শূন্যে ঘুরাইয়া
দীপ্ত চক্র ভয়ঙ্কর। পড়িলা সমরে,
দুরন্ত বরুণ-হস্তে দানব দুর্জ্জয়
সিংহতুণ্ড—সিংহের সদৃশ মুণ্ড গ্রীবা!
কাঁপিত নাবিকবৃন্দ সদা যার ভয়ে
পশিতে পিঙ্গলার্ণবে—পশিতে যেমনি
কৃতান্ত-ভবনে পাপী। কেশরি গর্জ্জনে
বরুণে নেহারি দৈত্য প্রসারি দ্বিভুজ
(উন্নত বিশাল শাল তরুকাণ্ড যথা)
ছুটিলা বিকট বেগে গগন আঁধারি।
দিলা রড় বরুণের অনুচর সেনা
দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড। গর্জ্জিলা বরুণ—
গর্জ্জিলা যে রূপে, পূর্ব্বে যবে অহিরাজ
উগারিলা কালকূট নীলকণ্ঠ পেয়!
কহিলা—"যা পলায়ে, রে ভীরু
ফেরুপাল!
লুকা গিয়া নরকান্ধকারে সুরাধম!
অমরকুল-কলঙ্ক! ভঙ্গ দিলি রণে,
পৃষ্ঠদেশে থাকিতে বরুণ? হা পামর!
দেখ, দেব-কুলাঙ্গার, দেখ দূরে থাকি,
সে সাহসও থাকে যদি, পাশীর কি
তেজঃ।"
বলি হুঙ্কারিলা, যথা হুঙ্কারি প্রলয়ে
আন্দোলি অতলতল তরঙ্গ ছুটান;
ধরিলা সাপটি মহাপাশ—দিলা ছাড়ি!
মেঘমন্দ্র মন্দ্রিল অম্বরে, পড়ে দৈত্য
ভীমনাদে, নখে দন্তে মনঃশিলা ঘাতি—
ছাইল সমরাঙ্গণ দৈত্য-শবদেহ।
যুঝিছে অমরসৈন্য প্রাচীর-শিখরে,
নিম্নদেশে হীনবল দনুজবাহিনী,
নিরখি মহাদানব গর্জ্জিলা ভীষণ—
বাসুকিগর্জ্জন ভীম যথা; মহাদম্ভে
হানিলা প্রাচীরমূলে ঘোর পদাঘাত;
টলিল অটল ভিত্তি বিশাই নিৰ্ম্মিত!
পড়িল ভাঙ্গিয়া শত খণ্ড খণ্ড হয়ে,
ভূকম্পনে ভাঙ্গে যথা ভূধরশরীর।

তুলিলা তখন মহাখড়্গ—ভিন্দিপাল—
দুই হস্তে মুষ্টিতে সাপটি; পরশিল
বিশাল অনন্ত প্রান্ত সে খড়্গ ভীষণ।
আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য বিক্রমে দৈত্যেশ,
খণ্ড খণ্ড করি শূন্য ভীমভিন্দিপালে,
মথিতে লাগিলা বেগে দেব-চমূরাশি।
উড়িল অমরতনু আচ্ছাদি অম্বর,
যথা সে কার্পাসরাশি উড়ায় ধুনারী
টঙ্কারি ধূননযন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে।
প্রবাহিল শ্বেত স্বচ্ছ অমর-শোণিত;
দেব-অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে ধারা
মনোহর—সৌরভে পূরিয়া অপরূপ।
অক্ষত দেবের তনু অস্ত্রের আঘাতে,
(অশরীরী মারুত যেমন) ছিন্ন নহে
ক্ষণকাল সে ভীম প্রহারে—কিন্তু দেহ
দহে অস্ত্রদাহে, দহে যথা নরদেহ
কূট হলাহলে ঘোরতর। সুরবৃন্দ
জ্বলনে অস্থির, দৈত্য-প্রহারে আকুল,
ছাড়ি স্বর্গতল শীঘ্র উঠিলা বিমানে;
উঠিলা নিমিষে শূন্যে কোটি ব্যোমযান
আভাময়—দেব-অঙ্গ-শোভা অঙ্গে ধরি:
অযুত নক্ষত্র যেন উদিল সহসা
নীলাম্বরে! অপূর্ব্ব কিরণ অভ্রময়
ছুটিতে লাগিল শূন্যে শতাঙ্গ-লহরী
নিনাদি মধুর নাদে; ছুটিল চকিতে
শিখিধ্বজ মহারথ ইরম্মদগতি,
ছুটিল সূর্য্যের একচক্র সুস্যন্দন
উত্তাপে ঝলসি নভশ্চর প্রাণিকুল;
অপূর্ব্ব নিনাদে পাশী বরুণ স্যন্দন
ছুটিতে লাগিল চক্রে চূর্ণি মেঘদল;
মনোরথগতি বায়ু-রথ দ্রুতবেগে
আকুল করিল ব্যোমদেশ। বৃষ্টিধারে
দেবপুরী অমরা-উপরে বরষিল
শরজাল—দৈত্যচমূ মুণ্ড, গ্রীবা, বক্ষ,
বাহু ভেদি; চমকে উজলি অভ্রতনু—
তড়িত নির্ঝর যথা। দনুজবাহিনী

অনুপায়!—দূর শূন্যে, অমর-সুরথী;
না পারে স্পর্শিতে অস্ত্রে কিম্বা ভুজপাশে
লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য-
সেনা অগণন। নিরখিলা বৃত্রাসুর—
ত্রিনেত্র ঘুরিল ঘন বহ্নিচক্রপ্রায়
উজলি বিশাল ভাল; দন্তে হুহুঙ্কারি
বাড়ায়ে বিপুল বপু করিলা দীঘল—
দীঘল ভূধর মেরু যথা, কিম্বা যথা
ফণীন্দ্র বাসুকি সিন্ধু-মন্থন-প্রলয়ে।
দাঁড়াইলা রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর;
প্রসারি সঘনে বাহু, ঘন লম্ফ ছাড়ি,
প্রচণ্ড চীৎকার-ধ্বনি হুঙ্কারি নাসায়,
দূর শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা,
আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে নিক্ষেপি।
দেবসেনাপতিবৃন্দ ত্রাসিত তখন
আরো দূরতর ঘোর অন্তরীক্ষপথে
চালাইলা দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল
চাপে বসাইলা দ্রুত, শিঞ্জিনী টঙ্কারি
ঘোর নাদে; মহাতেজে ছুটিল সঘনে
অস্ত্রকুল, বিশ্বহর প্রলয় পবন
ছুটে যথা ভাঙ্গি গিরিশৃঙ্গরাজি—ভাঙ্গি
দ্রুম কাণ্ড-শাখা বেগে; মুহূর্ত্তে উড়িল
দশ দিকে, লক্ষ লক্ষ দৈত্য মহাকায়;
লণ্ডভণ্ড দৈত্যব্যূহ! ভয়ঙ্কর বেগে
ছুটিল বারীশ-অস্ত্র মহাপ্রহরণ;
ত্রিভুবন স্তম্ভিত, কম্পিত চরাচর;
প্রলয়-প্লাবন-রঙ্গে টলিল ভূধর;
ভাসিল দনুজদল উত্তাল হিল্লোলে;
শূন্য জুড়ি পড়িতে লাগিলা ঊর্দ্ধপদ
অযুত দনুজ-তনু দূর নিম্নে বেগে—
পর্ব্বত, ভূতল, সিন্ধু, অতল আচ্ছাদি।
ঘন হাহাকার শব্দ দৈত্যমণ্ডলীতে!
বিকট মৃত্যু-আরাব দন্তের ঘর্ষণ!

দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাস্কর
বরষি প্রখর কর—কালানল যেন—
রণক্ষেত্রে অন্য দিকে। যুঝিছে কৌশলী
সমর-পণ্ডিত ধীর শূর উমাসুত;
দেখি বৃত্রে অন্য শরে অভেদ্যশরীর,
হানিছে সুতীক্ষ্ণতর শর চমৎকার;—
শূন্য ব্যাপি একেবারে বাহিরিছে যেন
কোটি ভুজঙ্গমমালা; মালার আকারে,
ঘেরিছে অসুর-অঙ্গ বিন্ধি খরতর,
বিন্ধে যথা বিষদন্ত বিষাক্ত তক্ষক
যমদূত। শরদাহে আকুল অসুর,
লক্ষ্য করি শিবসুতে ধরিলা সাপটি
সংহারীর শেষ শূল—দিলা শূন্যে ছাড়ি।
চলিলা সে অস্ত্রবর অম্বর উজলি,
জ্বলিল দুর্জ্জয় শিখা ঝলকে ঝলকে;
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল শূল-গর্জ্জনে ভৈরব।
ঘোর-রঙ্গে ভ্রমে অস্ত্র—গ্রহপিণ্ড যেন
হইলে স্বস্থানচ্যুত ভ্রমে শূন্যদেশে—
কভু বক্র চক্রগতি, কভু স্থির ভাব,
কখন নক্ষত্র তুল্য গতি অদভুত!
স্তম্ভিত দনুজ দেব, অস্থির আকাশ,
নেহারি শম্ভুর শূল। কুমার-আদেশে
অদৃশ্য হইলা সূর্য্য আদি ক্ষণকালে—
লুকাইয়া তনু-আভা গভীর তিমিরে!
ডুবিল, মরি রে, যেন আঁধারি গগন
কোটি তারকার বৃন্দ! হরিল দেবতা
দেবতেজে গগনের তেজোরাশি যত—
না রহিল শর-লক্ষ্য অন্তরীক্ষে আর!
এক মাত্র প্রজ্বলিত শূলের কিরণ
জ্বলিতে লাগিল শূন্যদেশে ক্ষণে ক্ষণে।
প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিলা ত্রিশূল
ঘুরি অন্তরীক্ষময়, লক্ষ্য না হেরিয়া
ফিরিলা দৈত্যেন্দ্র-করে অভিমানে নত।
দেখিলা দনুজপতি সে অস্ত্র-আলোকে

রণস্থল—ভীম শবস্থল এবে ! একা
সে প্রাঙ্গণ-মাঝে ! যথা নগরাজচূড়া
মৈনাক, মীনেন্দ্র তিমি বেষ্টিত সাগরে,
গজ-কূর্ম্ম-রণে যবে উড়ে বৈনতেয় ।
দেখিলা অদূরে, হায়, ধূলি-বিলুণ্ঠিত
দনুজবিজয় কেতু ! নেহারি দুঃখেতে
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা
ধীরগতি আলয়ে ফিরিলা চিন্তাকুল ।

ষোড়শ সর্গ

নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন ভিতর,
চারু শোভাময় মুনি মোহকর,
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর ; থর থর থর
মঞ্জরী দোলে ।
সুগন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ-কাননে
সুমন্দ মারুত আনন্দিত মনে
চলিয়া চলিয়া মধুর নিস্বনে
ছুটিছে চৌদিকে—পড়িছে সঘনে
কুসুম-কোলে ॥
হাসে ফুলকুল তরুণ সুন্দর ;
সুললিত শোভা, রসে ভর ভর,
শ্বেত রক্ত নীল পীত কলেবর
থরে থরে থরে—হাসি মনোহর
মুকুল-মুখে ।
ঝরে সুধাকণা তনু স্নিগ্ধ করি
ঝরে হিম যথা নিশিগন্ধা 'পরি ;
ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহরী
সঙ্গীত-বাদন শ্রুতিমূল ভরি
অতুল সুখে ॥
ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখীকুল ;
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল ;
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে ; কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় ছুটে ।
ভ্রমে পঞ্চবাণ, পিঠে পুষ্পধনু
হাতে পুষ্পশর, সুমোহন তনু,
অরুণ অধরে প্রভাতিয়ে জনু
সুহাসি বিজুলী ; নেত্র কোণে ভানু
তরঙ্গে লুটে ॥
ঐন্দ্রিলা কহিছে "শুন হে মদন,
রচিলা নিকুঞ্জ বাসনা যেমন ;
আশার (ও) অধিক এ সুরভি বন
ত্রিদিবে অতুল—সফল সাধন
তোমার স্মর !
দৈত্যপতি হেরি এ কুঞ্জ সুন্দর
বাখানিবে তোমা, শুন গুণধর,
রণশ্রান্ত যবে মহাদৈত্যবর
ফিরিবে এখানে ; রতি-মনোহর,
সুখে বিহর ॥"
বলি কুঞ্জে পশি, ঐন্দ্রিলা সুন্দরী
হাসে চারু হাসি সুদর্পণ ধরি ;
হাসে চারু হাসি পীন-পয়োধরী
হেরি বিম্বাধর,—অপাঙ্গ-লহরী
নয়নে খেলা ।
"বামা আমি, ওহে দৈত্যকুলেশ্বর"
কহে দৈত্যরামা অর্দ্ধ-মৃদুস্বর,
"শচী ছাড়ি নাথ, আমায় কাতর
করিবে ভেবেছ—ইচ্ছায় আমার,
এতই হেলা ॥
আমি, দৈত্যনাথ, রমণী তোমার,
বাসনা পুরাতে আছে অধিকার
তোমার (ও) যেমন তেমতি
আমার,
হে দনুজপতি, দেখিবে এবার
বামা কেমন ।"

হেনকালে শুনি ভূষণের ধ্বনি
ফিরিলা ঐন্দ্রিলা—যেন ভুজঙ্গিনী
ডমরুর রবে, ফিরয়ে তখনি
ফণা দুলাইয়া—ভাবিয়া ইন্দ্রাণী
করে গমন ॥

দেখিলা একাকী অনঙ্গমোহিনী
রতি আসে ধীরে, বাজিছে কিঙ্কিণী
চিন্তা-অবনত চারু চন্দ্রাননী
যথা সূর্য্যমুখী, যবে সে যামিনী
হয় আগত।

জিজ্ঞাসে ঐন্দ্রিলা, "মদন-মহিলা,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী কোথায় রাখিলা?
বাসব-বনিতা, কহ, কি কহিলা
শুনে সে বারতা,—শিরোপা কি দিলা
মনের মত ॥"

"দৈত্যেশ-মহিষি, আমি তব দাসী
কেন ব্যঙ্গ কর, মুখে নাই হাসি;
ইন্দ্রের কামিনী যে অভিমানিনী
জান ত সকলি—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,
শচী না আসে।

না চাহে মোচন, চির কারাবাসে
রবে ইন্দ্রজায়া—এ স্বর্গ-নিবাসে
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল
দনুজ-প্রসাদে—সহিবে সকল
না ভাবে ত্রাসে ॥"

প্রফুল্ল-আনন গন্ধর্ব্ব-কুমারী
নয়ন-কোণেতে রতিরে নেহারি,
খেলায়ে অপাঙ্গে তড়িত-তরঙ্গ
দংশিলা অধর—করি গ্রীবা-ভঙ্গ
ক্ষণেক থাকি ॥

কহিলা, "কি. রতি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
না আসিবে হেথা? সাবাস্ মানিনী!
বৃথা কি হবে সে অসুরের বাণী
'শচীর উদ্ধার'?—যাব লো আপনি
এ সব রাখি ॥

সাজা দেখি, রতি, ভাল ক'রে মোরে,
কেশ-বেশন্যাস আসে ভাল তোরে;
সাজা লো তেমতি যেন হাসি-ডোরে
বাঁধি দৈত্যরাজে—রতি, মন ভ'রে
সাজা আমায়।

জিনিয়া সমর ফিরিলে অসুর,
রণশ্রান্তি তাঁর করিব লো দূর
এ নিকুঞ্জ-বনে!—মরি কি মধুর
মদন-কৌশল! মরি কি প্রচুর
সুগন্ধ বায়!"

সাজাইলা রতি গন্ধর্ব্ব-কুমারী,
(ধন্য রতি, তোর গুণে বলিহারি!)
নীলোৎপল যথা ধু'লে ধারাবারি
ঐন্দ্রিলার মুখ; অলকার সারি
ভ্রমর তায়।

সাজিলা ঐন্দ্রিলা; মধুর মাধুরী
বসন-ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি;
পড়ে যেন ঝুরি চারু-পয়োধরে!
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে
নাচিল পায়!

বসন্ত-সময়ে কিবা সাজে রতি
ভুলাতে কন্দর্পে—রূপ-কুলপতি?
শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্ব্বতী
সাজিলা বা কিবা? মোহিনী যুবতী
সুধা-তুমুলে?

নিন্দিয়া সে সব ঐন্দ্রিলা রূপসী
সাজিলা সুন্দর, বাসে কটি কসি;
কুন্তলে রতন ঝলিছে ঝলসি
তারকার মালা—মন্মথপ্রেয়সী
আপনি ভুলে!

অসুর-মোহিনী নেহারে মুকুরে
সে বেশ-লাবণ্য, গরবেতে পুরে;
শচীরে পাইবে ভুলায়ে অসুরে
ভাবিল নিশ্চিত; কোকিলা-কুহরে
কহে "লো রতি,

সাজা এইখানে যত অলঙ্কার,
যত বেশভূষা আছে লো আমার ;
রতন-মুকুট, মণিময় হার,
জয়লব্ধ ধন—ধনেশ-ভাণ্ডার
ঢাল যুবতি ॥

আন যান, পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ,
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ ;
আন বীণা, বেণু, মন্দিরা, মুরজ,
আমার যা কিছু ;—মানস-পঙ্কজ,
ফুটাব আজ।

বল্ চেড়ীদলে সশস্ত্র সাজিয়া
দাঁড়াক সকলে এখানে আসিয়া—
ত্রিজটা, ত্রিগুণা, কপালী, কালিকা,
যে যথা আছে লো গন্ধর্ব্ব-বালিকা,
দানবী-সাজ।

যাও, হে অনঙ্গ, ফিরিলে অসুর
জানাই(ও) বারতা, নিকুঞ্জে মধুর
ভ্রমি কিছুকাল।”—বাজিল ঘুঙ্ঘুর
নাচিয়া কটিতে, চরণে নূপুপ
মধুর তায়।

“ঐন্দ্রিলার গতি কে ফিরাতে পারে ?”
কহিলা দানবী মৃদুল ঝঙ্কারে ;
“হে দনুজনাথ, ঐন্দ্রিলা হে নারে
বাসনা ছাড়িতে—বাসব-প্রিয়ারে
ধরাব পায়।”

হেনকালে কাম কহিলা সংবাদ
ফিরিছে দৈত্যেন্দ্র সাধি নিজ সাধ
জিনিয়া সমরে—যথা সে নিষাদ
উজাড়ি অরণ্য, পুরাইয়া সাধ
কুটীরে যায় ॥

সুগম্ভীর গতি, অতি ধীর ভাব,
ভাবে দৈত্য মনে “এ জয়ে কি লাভ ?
সমূহ বাহিনী সংগ্রামে অভাব
করিল অমর—এরূপে দানব
ক'দিন রবে ?

আমি যেন রণে লভিনু বিজয়,
আমার(ই) যেন এ শরীর অক্ষয়,
প্রতি রণে যদি দৈত্যকুল ক্ষয়
হয় হেন রূপে—কারে লয়ে জয়
ভুঞ্জিব তবে ?”

চলিলা ঐন্দ্রিলা আগু বাড়াইয়া,
বসন্ত-সখারে সংহতি লইয়া,
চলন-ভঙ্গীতে তরঙ্গ তুলিয়া
ভুলায়ে কন্দর্প—মধুর অমিয়া
হাসিতে ঢালি।

দিলা আলিঙ্গন প্রফুল্ল লোচন,
নেহারি অসুর দানবী-বদন
ভুলিলা সকল ভাবনা বেদন
যা ছিল অন্তরে—নিমেষে ক্ষালন
মনের কালি।

কহিলা, “ঐন্দ্রিলে, এ কি মনোহর
শোভা হেরি আজ! মরি কি সুন্দর,
রুধিরে ফুটিছে সু-ওষ্ঠ, অধর—
অরুণের রাগে! তনু-স্নিগ্ধকর
এ ভুজলতা!”

“রণশ্রান্তি, নাথ, ঘুচাতে তোমার,
আমার আদেশে বিরচিল মার
মধুর নিকুঞ্জ ; শোভা হেরি তার
সাজিনু আপনি! রণচিন্তা-ভার
ঘুচাব চল।”

রুণু রুণু ধ্বনি কিঙ্কিণী, নূপুরে,
আগু হৈলা ধনী ধীরে ধীরে ধীরে,
অদীঘল-তনু এবে দৈত্যবরে
বাঁধি ভুজপাশে—চারু অঙ্গে ঝরে
শশাঙ্ক-আলো!

প্রবেশি নিকুঞ্জে শিহরে দানব!
চারিদিকে মৃদু মধুর সুরব—
যেন উথলিছে মাধুরী-অর্ণব
ঢলিয়া চৌদিকে।—মুকুল, পল্লব
অনঙ্গ-শর।

অচেতন দৈত্য ভুঞ্জিয়া মাধুরী !
জাগাইল হাসি ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
রণশ্রান্ত শূরে স্বরে শান্ত করি,
চলিলা ভ্রমণে—ভুজপাশে ধরি
অসুরবর ॥
কিছু দূরে গিয়া কহে দৈত্যরাজ
"এ কি হেরি, প্রিয়ে, তব ভূষা, সাজ !
কেন এ সকল কেন হেথা আজ
পড়িয়া এ ভাবে ? চেড়ীরা সসাজ !
এ কি সমর ?"
"কোথা তবে আর রাখিব এ সব,
কহ শুনি, ওহে হৃদয়-বল্লভ !
কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব,
দেখিছ ওখানে ?—অমর-বিভব !
শচী-ভবন !
অমরার রাণী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !
কহিলা রতিরে, কহিলা বাখানি,
এ ভুবন তার ! কহিলা কি জানি
তস্কর আমরা ? চাহে না সে ধনী,
কারা-মোচন ।
'দৈত্য-বাক্য ছার'—কহিলা আবার
'কারামুক্তি হায়, কে করে রে কার ?'
শুন হে দানব, পুলোম-কন্যার
এ সুখ-ঐশ্বর্য্য, তার(ই) অধিকার
হেথা সকলি !
কি জানি কখন্ আসিবে সে ধনী,
মনোদুখে তাই আইনু আপনি
লতার নিকুঞ্জে !—ছাড়িব যখনি
শচী আজ্ঞা দিবে ।" নীরব রমণী
এতেক বলি ।
শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীর
বাড়িতে লাগিল অসুর-শরীর
পর্ব্বত-আকার ; নিশ্বাস-সমীর
বহিল সবেগে—কহিল গম্ভীর
"রতি কোথায় !

রতি কাঁপি কাঁপি আসি দৈত্যপাশে
কহে—"ইন্দ্রপ্রিয়া রবে কারাবাসে ;
নাহি চাহে শচী আপন মঙ্গল
দৈত্যেশ-প্রসাদে—সহিবে সকল
থাকি এথায় ।"
রক্তবর্ণ আঁখি ঘুরিল সঘনে,
ফুলিল অধর ভীষণ বদনে,
কড় কড় ধ্বনি রদনে রদনে,
উঠিল বিকট—কহিলা গর্জ্জনে
ভীম অসুর ।
"আমার আদেশ হেলিলি, ইন্দ্রাণি ?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী ?"
বলি ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি,
ছুটিল হুঙ্কারি,—হেরি দৈত্যরাণী
বামা চতুর ।
নিল ফুলধনু আপনার হাতে,
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তা'তে)
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাঁটুগাড়ি
(সাবাস সুন্দরি !) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি ।
অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ-পরাণ ;
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব-কামিনী
লাবণ্য-রাশি !
দাঁড়াইলা শূর ; আসিয়া নিকটে
ঐন্দ্রিলা কহিলা মধুর কপটে
"এ নহে উচিত, হে দনুজনাথ,
তুমি যাবে সেথা করিতে সাক্ষাৎ
শচীর সনে ।
তবে গর্ব্ব তার হবে যে সফল --
সেই স্বর্গরাণী ! হবে কি বিফল
দাসীর আদেশে দৈত্যরাজ-বল ?
ঐন্দ্রিলা-বাসনা জান ত সকল,
আছে ত মনে !'

কহে দৈত্যপতি "তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র-সহচরী ;
যে বাসনা তব, তার দর্প হরি,
পুরাও মহিষি, —ফণা চূর্ণ করি
আনো ফণিনী

হরষে উন্মত্ত হাসিল ঐন্দ্রিলা ;
সুখে দৈত্যবরে আলিঙ্গন দিলা ;
চেড়ীদল সঙ্গে গরবে চলিলা
গজেন্দ্র-গমনে, কটাক্ষে হানিলা
ঘোর দামিনী ॥

সপ্তদশ সর্গ

দেবারি দনুজনাথ দৈত্য-সভামাঝে
বেষ্টিত অমাত্যবর্গ ; সমর-কুশল
মহাবল সেনাপতিবৃন্দ চা'রধারে।
নিকটে বসিয়া ধীর সুমিত্র ধীমান্
কহিছে গম্ভীর-স্বরে, "দৈত্যকুলেশ্বর,
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে ;
মরিলা যে কত, হায়, না হয় গণনা—
বীরবংশ ধ্বংস-প্রায় দেবতার তেজে।
ক্রমে দর্প, সাহস বাড়িছে দেবতার ;
বাড়ি' বরিষায় যথা তরঙ্গিনী-ধারা
ধায় রঙ্গে ভাঙ্গি বাঁধ দুকূল উছলি,
গৃহ, শস্য, পশু, প্রাণী নাশি অগনন।
হের দুর্নিবার তেজে জয়ন্ত, অনল,
সমরে অসুরে জিনি অসম সাহসে
প্রবেশিলা পূর্ব্বদ্বারে, লঙ্ঘিলা প্রাচীর
অসংখ্য অমর-সৈন্য ; হে দৈত্যশেখর,
অর্দ্ধেক অমরাবতী ভুজবলে দেব
অধিকার কৈলা এবে। উত্তর তোরণে,
আবার সাজিছে রণে দেবসেনাপতি—
মহারথী কুমার, বরুণ, সূর্য্য, বায়ু।
ভাবিলা হে দনুজেন্দ্র, পলাইলা তারা
লুকাতে ত্রিশূল ভয়ে পাতালে আবার,
সে আশা নিষ্ফল, প্রভু, ইন্দ্রজালে ছলি
করিছে কপট রণ অমর মায়াবী !
হৈলা দেব অসুর-কণ্টক ! কি উপায়ে ;
বুঝিতে না পারি, হায়, এ সুবর্ণ পুরী
হবে সুর-রথি-শূন্য—দুঃসহ সমর
সহিবে ক'দিন আর এরূপে দানব ;"
দানবকুল-ঈশ্বর বৃত্রাসুর তবে—
"সত্য যা কহিলা, মন্ত্রি ! কিন্তু কহ সুধি,
কি ফল বাঁচিয়া স্বর্গ ছাড়ি !—যার লাগি
কত তপ কৈনু কত যুগ নিরাহারে ;
জিনিতে সমরে যায় কত মহারথী
দৈত্যবীরকুলশ্রেষ্ঠ ত্যজিলা পরাণ ;
যার লাগি অসংখ্য অসংখ্য দৈত্যসেনা
পড়ে রণে, বীরদর্পে, শমনে না ডরি।
জনম বীরের কুলে—মরণ(ই) সফল
শত্রু ঘাতি রণস্থলে ! হে সচিবোত্তম,
কে কোথা রাজত্ব ভুঞ্জে বিনা যুদ্ধ পণে—
মৃত্যুভয়ে সমরে বিরত কবে শূর ?
কবে সে বীরের চিত্তে কৃতান্তের ভয়
হানিতে সমরে শত্রু ? ত্যজিতে পরাণ
যুঝি রঙ্গে রিপুসঙ্গে সমর-প্রাঙ্গণে ?
শুন, মন্ত্রি, যত দিন এ দনুজকুলে
একমাত্র অস্ত্রধারী থাকিবে জীবিত,
পারিব ধরিতে অস্ত্র এ প্রচণ্ড ভুজে,
বহিবে রুধির-স্রোত এ দেহে আমার,
নহি ক্ষান্ত তত দিন এ দুরন্ত রণে।"
হেনকালে রুদ্রপীড়, বীর-চূড়ামণি,
মণ্ডিত সমরসাজে আসি দাঁড়াইলা
নতশির, পিতার সম্মুখে কর যুড়ি।

শীর্ষক উজ্জ্বল শিরে, অঙ্গে সুকবচ,
রত্নময় অসিমুষ্টি ঝলসে কটিতে—
শরাসনে ; পৃষ্ঠদেশে নিষঙ্গ ঝলসে।
কহিলা "হে তাত, তোমা দেখাতে এ মুখ
পাই লাজ ; হে বীরেন্দ্র, তব পুত্র আমি
চির অরিন্দম রণে—সমরে হারিনু,
নারিনু রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল।
হারিনু অনল-হস্তে! জয়ন্ত বালক
অধিকার কৈল দ্বার রক্ষিত আমার!
রণে ভঙ্গ দিল, পিতঃ, দনুজ-বাহিনী—
আমি যার সেনাপতি! জীবিত থাকিয়া
তাহা চক্ষে নিরখিনু! এ নিন্দা ঘুচাব
ত্রিলোকবিজয়ী দৈত্যপতি, রণস্থলে :
সমর-বহ্নিতে—যথা দাবাগ্নিতে বন—
দহিব অমর-সৈন্য ; সমর-কুশল,
জিনিব অনল দেবে—জয়ন্তে জিনিব ;
নতুবা, হে তাত. এই শেষ দরশন
ও চরণ অরবিন্দ। আজ্ঞা দেহ সুতে।"
বলি পিতৃপদধূলি ধরিলা মস্তকে।
শুনিয়া পুত্রের বাণী বৃত্রের নয়নে
দেখা দিল বাষ্পবিন্দু, দ্বিভুজ প্রসারি
পুত্রে দিলা আলিঙ্গন, কহিলা দৈত্যেশ—
"এ প্রতিজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত(ই) তোমার,
দনুজকুলতিলক পুত্র রুদ্রপীড়!
চির-অরিন্দম তুমি—কিন্তু শুনি পুনঃ
সুরেন্দ্র আসিছে রণে, পশিবে সত্বর
অমরায়—সুরনাথ দুর্জ্জয় সমরে ;
না পারে যুঝিতে তারে ত্রিভুবনে কেহ,
মৃত্যুঞ্জয়ী বৃত্র বিনা, রক্ষঃ, সুরাসুরে!
তার সনে সমরে পশিবি একা তুই ?
রে সুধন্বি, একমাত্র পুত্র তুই মম।"
বলি পুনঃ গাঢ়তর দিলা আলিঙ্গন
রুদ্রপীড়ে বক্ষে ধরি দনুজ-শেখর।

কহিলা আবার ছাড়ি ঘন দীর্ঘশ্বাস
"কিন্তু বীর তুই—বীরপুত্র—মহারথী,
কেমনে নিবারি তোরে? কেমনে বা বলি
যাও, বৎস, দৈত্যকুল-রবি, অস্তে যাও।"
"হে পিতঃ," কহিলা বৃত্রনন্দন তখন
"কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে,
কি ফল তোমার(ই) তাত. হেন বংশধরে ?
নিন্দা যার আজীবন ত্রিলোকে ঘুষিবে,
হাসিবে অসুর. সুর যক্ষ যার নামে—
জীবনে, জীবন-অন্তে, জগতে ঘৃণিত!
ত্রিলোক-বিজয়ী পিতঃ, কহিবে সকলে,
কুলাঙ্গার—কাপুরুষ—তনয় তাঁহার!
পলাইলা প্রাণ ভয়ে, না ফিরিলা রণে
পুনর্ব্বার! এ কলঙ্ক নহিলে মোচন
জীবন নিষ্ফল মম! হে দনুজনাথ,
মরিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিয়া!"
উৎসাহ-প্রফুল্ল নেত্রে, আনন্দে অন্তর,
নিরখিলা পুত্রমুখ ছটাবিমণ্ডিত,
ভানু-বিমণ্ডিত যথা কনক-অচল
সহস্র কিরণমালী উদিলে শিখরে!
কহিলা সম্বরি বেগ—"না নিবারি তোমা,
যাও রণে, অরিন্দম, পুত্র রণজয়ী ;
পালো বীরধর্ম্ম, ভাগ্যে যা থাকে আমার।"
বলি কৈলা আশীর্ব্বাদ অশ্রুবিন্দু মুছি।
বন্দি পদ জনকের আনন্দে চলিলা
রুদ্রপীড় ; জননী-নিকটে গেলা দ্রুত।
দেখিলা ঐন্দ্রিলা চেড়ীদলে সুসজ্জিতা
চলে মন্দাকিনী-তীরে শচীরে বান্ধিতে।
আনন্দে জননী-পদ বন্দিলা বীরেশ ;
কহিলা "জননি, সুতে দেহ পদধূলি,
দিলা আশীর্ব্বাদ পিতা, প্রতিজ্ঞা আমার
নির্দেব করিব স্বর্গপুরী! কিন্তু মাতঃ,
কে কহিতে পারে ক্রূর সমরের গতি,

না হেরি যদ্যপি আর ও পদযুগল,
ও পদযুগলে, মাতঃ, এ মিনতি মম
রেখো মা, চরণে ইন্দুবালা সরলারে,
পতিগতপ্রাণা সতী স্নেহেতে পালিতা,
রক্ষা করো, জননি গো, স্নেহদানে তারে।"
হায় রে, ঝরিল অশ্রু বীরেন্দ্র-নয়নে!
স্মরি সে হৃদয়-ইন্দু—ইন্দুবালা-মুখ!
এ বিদায়ে কার, হায়, না আর্দ্রয়ে হিয়া?
ঐন্দ্রিলার(ও) শিলাময় হৃদয় তিতিল,
বাষ্প-বিন্দু নেত্রকোণে, কহিলা দানবী
তনয়ের মুখঘ্রাণ ল'য়ে ঘন ঘন;
"এ অশুভ কথা, বৎস, কেন রে শুনালি?
কাজ কি সমরে তোর? একা দৈত্যনাথ
নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে।
দৈত্যকুল পঙ্কজ, সমরে নাহি যাও।"
"না মাতঃ, অন্তর জলে অনন্ত শিখায়
সুর-হস্তে হারি রণে, নির্ব্বাণ-আহুতি
সমর্পিব এবে তায় অমরে দণ্ডিয়া,
তনয়ের শেষ ভিক্ষা মনে রেখো, মাতঃ!
পেয়েছি চরণধূলি জনকের ঠাঁই,
দেহ পদধূলি তব।" এতেক কহিয়া
ভক্তিভাবে প্রণমিলা জননী চরণে!
পুত্র কোলে করি স্নেহে দানব-মহিষী
বান্ধিলা শীর্ষক-চূড়ে বিল্ব সচন্দন,
কহিলা আশ্বাসি "বৎস, এ অর্ঘ্য সতত
অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে—এ মম আশীষ
যাও রণে, রণজয়ী অরিন্দম বীর!"
হেথা চারু ইন্দুবালা, কল্পতরু-মূলে,
(শুভ্র কুসুমের মালা লুটিছে উরসে)
বসি শ্বেত শিলাতলে, সখিদলে মেলি,
শুনিছে রণসংবাদ ভাসি অশ্রুনীরে।
আহা, সুমলিন মুখ! হৃদয় কাতর!
যেন রে নিদয় কেহ বিহঙ্গ ধরিয়া
হেমন্তের দেশ হ'তে আনিলা গ্রীষ্মেতে!
ভাবিছে দানববালা তেমতি আকুল!

কে পারে সহিতে, প্রাণ সুকোমল যার,
সমরের ঘোর শিখা—জ্বলিলে চৌদিকে?
অহরহ দিবানিশি রণ-কোলাহল?
করুণ ক্রন্দনাঘাত নিত্য শ্রুতিমূলে?
কহিতে লাগিলা শেষে ব্যাকুল হইয়া
"কত দিনে, হায়, সখি, এ সমরস্রোত
শুকায়ে নিঃশেষ হবে? কত দিনে, পুনঃ
ধরিবে পূর্ব্বের ভাব এ অমরাবতী?
পুত্র শোকাতুরা, আহা, মাতার রোদন,
সখি রে, বিদরে হিয়া!—বিদরে লো
প্রাণ
স্বামিহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন!
ভগিনীর খেদ স্বর ভ্রাতার বিয়োগে!
হায়, সখি, বল্ তোরা বল্, কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি?
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল,
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া!
সখি রে, বুঝিতে নারি, কিরূপে এ সব
অসুর-অমর-কুলে মহাবীর যত
(নিদয় নহে লো তারা) আপনা পাশরি,
জীবন-ঘাতক অস্ত্র হানে পরস্পরে?
না ভাবে মমতা লেশ, নাহি ভাবে দয়া,
সদাই উন্মত্ত-প্রায় নিঠুর সমরে;
হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে
কত যে যাতনা জীবে—জীবন-নিধনে!
সমর-সুরাতে, হায়, অমর, দানব,
হয় কি এতই, সখি, অজ্ঞান উন্মাদ?
কিম্বা, কি সে পরাণীর (ই) প্রকৃতি দ্বিভাব
কুটিল, কপটাচারী প্রাণীমাত্র সবে?
কেমনে বা ভাবি তাহা? হৃদয়বল্লভ
আমার যিনি লো সই, কপটতা তাঁরে
না পরশে কোন কালে; তবু কি কারণ
সমরে নাশিতে প্রাণী না হন বিমুখ?
দিব না দিব না নাথে সমর-প্রাঙ্গণে
প্রবেশিতে পুনরায়; রাখিব বাঁধিয়া

হৃদয়-উপরে এই ভুজলতা-পাশে,
নিদারুণ হ'তে তাঁরে দিব না লো আর।"
হেনকালে রুদ্রপীড় বৃত্রের তনয়
সজ্জিত সমর-সাজে, সুধীর গমন,
অধোমুখে ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশি,
অগ্রসর ক্রমে সেই কল্পতরুমূলে।
দূর হৈতে দেখি পতি, উঠিয়া শিহরি,
ছুটিলা উতলা হয়ে ইন্দুবালা বামা,
পড়িলা বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া,
তরুলতা তরুদেহ ঘেরে যথা সুখে।
কহিলা—কোকিলাধ্বনি কণ্ঠে কুহরিল,
(হায়, যবে ভগ্ন-স্বরে ডাকে পিকবধূ)
কহিলা, "হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ!
রণসাজে কেন পুনঃ সাজালে স্বতনু?
এখন(ও) সমর-ক্লেশ দূর নহে তব;
এখন(ও) নিশিতে, নাথ, নিদ্রা নাহি যাও।
কত স্বপ্ন সারা নিশি শুনাও, প্রাণেশ,
আবার এ বেশ কেন দহিতে আমায়?
ছলিতে আমায় বুঝি সাধ ছিল মনে -
ইন্দুবালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,
তাই ভয় দেখাইতে, আইলে, প্রাণেশ?
খোল, প্রভু, রণসাজ, না পারি সহিতে!
কি নিষ্ঠুর হায় তুমি, ললনা-হৃদয়
মথিতে আইলে, প্রিয়, ছলনা করিয়া!
ত্যজ রণসাজ শীঘ্র, দেখা(ই)ও না আর
বিভীষিকা, তরুণীর হৃদয় তাপিতে।"
"প্রেয়সি, নিষ্ঠুর আমি, সত্যই কহিলা;
পালিতে বীরের ধর্ম্ম, দিলাম বেদনা
তোমার হৃদয়ে, প্রিয়ে, লভিতে বিদায়
এসেছি, বিদায় দেহ যাই রণস্থলে।"
"যাবে নাথ?" বলি, ধীরে চারু চন্দ্রাননী
তুলিলা বদন-ইন্দু পতিমুখতলে,
প্রদোষ-কমল যথা মুদিতে মুদিতে
নেহারে শিশিরে ভিজি অস্তগত ভানু!

"যাবে নাথ, যাবে কি হে ছিঁড়িয়া এ লতা?
বেঁধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি'
ছিঁড়ে কি হে তরুবর, ঘেরে যদি তায়
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া?
ছিঁড়িলে, তবুও নাথ, লতিকা ছাড়ে না,
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ?
কোথা নাথ, বল বল, তরঙ্গের গতি
বিনা সে সাগরগর্ভ? হে সখে, নির্ঝর
খেলিতে না বাসে ভাল শৈল-অঙ্গ বিনা
শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ
ঝর ঝর নাদে সদা—তেমতি হে আমি
থাকিব তোমার এই হৃদয়ে জড়ায়ে!"
শুনি, স্নেহভরে বীর ধরিলা তরুণী,
চারু চন্দ্রানন চুম্বি, ফেলি অশ্রুধারা;—
শুকাইল ইন্দুবালা! নিদাঘে যেমন
শুকায় কুসুমলতা ভানুর পরশে।
কহিলা সরলা বালা—নয়নের জলে
ভিজিল বীরের বর্ম্ম, হৈম সারসন,—
"যাবে যদি, নাশো আগে এই লতাকুল
পালিনু যে সবে দোঁহে যত্নে এত দিন;
এই পুষ্প-তরুরাজি কিসলয়ে ঢাকা,
হের দেখ কত পুষ্প তুলি ডালে ডালে
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা—
স্বহস্তে অৰ্জ্জিনু যায় কতই আদরে!
নাশো আগে সেই সব বিহঙ্গমরাজি
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে—নয়নরঞ্জন!
প্রতিদিন পালিলা যে সবে দুগ্ধদানে;
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর!
নাশো এই সখীগণে, আজীবন যারা
সুখের সঙ্গিনী মম, আজীবনকাল
সম্প্রীতে পালিলা, সদা—সেবিলা প্রাণেশ,
প্রাণ, মন, দেহ, স্নেহ-রসে মিশাইয়া।
নাশো পরে এ দাসীরে—জীবন নাশিতে
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি, নাথ!

পাতিয়া দিলাম বক্ষ, হানো এ হৃদয়ে
সে রক্ত-পিপাসু অসি—রণে যাও বীর!"
বলি মূর্চ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী,
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন,
রুদ্রপীড় স্নেহে চুম্বি অধর ললাট,
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চলগতিতে।
নীরবে, চাহিয়া পথ, থাকি কতক্ষণ
কহিলা দানব-কন্যা চারু ইন্দুবালা—
"হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকতা হেন,
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ।"
হায়, ইন্দুবালা, তুমি কি জানিবে বলো,
জীবের হৃদয়ার্ণবে কি অদ্ভুত খেলা?
মূর্ত্তিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে!
দানব-কুলের চারু কোমল নলিনী!
আকুল সরলা বালা ব্যথিত চঞ্চল,
থাকিতে নারিলা স্থির স্নিগ্ধ শিলাতলে,
স্নিগ্ধ কুসুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি
তরু-ছায়া ত্যজি গৃহে করিলা প্রবেশ।
পতিগত-প্রাণা সতী ভাবিলা তখন
করিবে শিবের পূজা—পতির মঙ্গল
কামনা করিয়া চিতে; লভি শুভ বর
নিবারিবে চিত্তবেগ শান্তির সলিলে।
আজ্ঞা দিলা সখীগণে, পূজা-আয়োজন
করিতে বিধানমত, পবিত্র আগারে;
পরিলা সুপট্টবাস; স্নানে শুচি-তনু,
প্রবেশিলা পূজাগারে সাধ্বী শুদ্ধমতি;
সুবিল্ব, চন্দন, পুষ্পমালা, সুবসন
অর্পি শিবমূর্ত্তি 'পরে স্থির ভক্তি সহ
ধ্যানে শিবমূর্ত্তি ভাবি, জপি শিবনাম,
বর মাগিবার আগে উঠিলা সুন্দরী—
উঠিলা সবিল্বজল ঢালিতে মস্তকে;
ধরিলা মঙ্গল-ঘট ভক্তির উল্লাসে।
হায় রে, বিমুখ যারে বিধাতা যখন,
কোন সে কামনা সিদ্ধ নাহি হয় তার,
সহসা কাঁপিল হস্ত দানববালার,
কাঞ্চন মঙ্গলঘট পড়িল খসিয়া
মহাদেব-মূর্ত্তি 'পরে খণ্ড খণ্ড হয়ে,
বিল্বপত্র, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে!
অধীর হইলা হেরি ইন্দুবালা সতী,
দর দর দুনয়নে ঝরিল সলিল;
শিহরিল শীর্ণ তনু; 'হে শম্ভু' বলিয়া
ভূতলে পড়িল বামা স্বামি মুখ স্মরি।
সখীগণে মেলি সবে করি কোলাকুলি
পূজাগৃহ-বাহিরে লইল ইন্দুবালা,
রতি আসি নানা মতে বুঝাইলা তায়,
সান্ত্বনা করিয়া কিছু করিলা সুস্থির।
চেতন পাইয়া ঘন ফেলি দীর্ঘশ্বাস
কহে দৈত্যরাজবধূ দারুণ আক্ষেপে—
"হে শঙ্কর উমাপতি, দাসীর কপালে
এই কি আছিল শেষে? রতি লো, আমার
পতি-আরাধনা ভার এত কি মহেশে?
কি দোষে দোষী লো দাসী প্রমথেশ-কাছে?
পাব না কি, রতি, আর হৃদয়েশে মম।
জানি না সে পাদপদ্ম বিনা ত্রিভুবনে।"
কহিলা মদন-পত্নী "হে দানববধূ,
ভাবিতে কি আছে হেন এ অশুভ কথা?
বদনে এনো না, সতি, ইথে অকুশল—
প্রিয়জন-অকুশল অশুভ চিন্তায়।
নাহি কি ভাবিতে অন্য—হৃদয়-বেদনা
জুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে?
সমদুঃখী পরাণীর যাতনা সকলি
ভুলিলে কি চারুমতি? ভুলিলে শচীরে?
অমরায় ফিরে যবে আইলা তব প্রিয়
নৈমিষ-অরণ্য হৈতে শচীরে বান্ধিয়া
হে ইন্দু-বদনা, তুমি কাঁদিলা কতই—
শচী-দুঃখে কত দুঃখ করিলা তখন!
সে পুলোমকন্যা এবে নিভৃত মন্দিরে
নিরানন্দ দিবানিশি! ভুলি দুঃখ তার,

বৃথা ভয়ে হেন ভাবে ভাবিছ আপনি ?
আপন হৃদয়-ব্যথা এতই কি, সতি ?"
রতি-বাক্যে ইন্দুবালা সলজ্জবদনা,
স্মরি মনে মনে পতি, স্মরি শচীকথা,
অধোমুখে ভাবিতে লাগিলা অশ্রুমুখী ;
হিমবিন্দু-সিক্ত যেন শশাঙ্ক মলিন !

অষ্টাদশ সর্গ

কুল কুল ধ্বনি ! চলে মন্দাকিনী,
দেবকুল-প্রিয়, পবিত্র তটিনী ;
লতায়ে লুটিছে সুর-মনোহর
মন্দার দুকূলে—দুকূল সুন্দর
সুরভি বিমল ফুল-শোভায় ।
যে ফুলের দলে সুরবালাগণে
হেলাইত তনু বিহ্বলিত মনে ;
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি
খেলিত যখন অমর অমরী
সিতপুষ্পরেণু মাখিয়া গায় ॥
যখন অমরা ছিল অমরের,
সুরধামে দম্ভ না ছিল দৈত্যের,
সুরবালা কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত,
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত,
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে ।
যখন পৌলোমী আখণ্ডল-বামে
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে,
দেবঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক
অমৃত-হ্রদের—বাক্যে অমায়িক
দিত শচী-করে গরিমা-গুণে ॥
সেই মন্দাকিনী-তীরে ম্রিয়মনা,
মন্দির অলিন্দে, শচী সুলোচনা ।
কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী,
রতি চারুবেশে, বসি শোভা করি—
ঘেরেছে মাধুর্য্যে অমরা-রাণী ।
প্রভাতের শশী চারু ইন্দুবালা
শচী-পদতলে, বসি কুতুহলা
হেরিছে শচীর বিমল বদন,
শুনিছে কৌতুকে—বালিকা যেমন—
ইন্দ্রাণীর মৃদু-মধুর বাণী ।

কহিছে পৌলোমী কোথা ব্রহ্মলোক,
দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক
প্রকাশে সেখানে ; কিরূপ উজ্জ্বল
কনক-নির্ম্মিত ব্রহ্মার কমল,
সতত চঞ্চল কারণ-জলে ।
কিবা অদভুত সে রেণু-সমুদ্র ;
বীচিমালা তায় কি বিপুল, ক্ষুদ্র ;
কত অপরূপ সৃজনের লীলা
প্রকাশ তাহাতে ; কিরূপ চঞ্চলা
পরমাণুময়ী মহী সে জলে ॥
কোথা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ-ভুবন ।
ভকত-বৎসল কিবা জনার্দ্দন ;
কিবা সে লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার,
কতই অনন্ত দান কমলার ;
কিবা শ্রীপতির পালন-প্রথা ।
দেখিতে কিরূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ;
কি শোভা কৌস্তভে—কেশব-ভূষণ ;
কমলা-লাবণ্যে কি চারুমাধুরী,
ক্ষীরোদ মধুর যে মাধুর্য্যে পূরি ;
কিবা সুধাময় রমার কথা ॥
কৈলাস ভুবন কিরূপ ভৈরব ;
ভৈরব কিরূপ জটাধারী ভব ;
কিরূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়—
ত্রিলোক-ব্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়—
প্রলয়-বিষাণ কিবা সে ঘোর ।
কিবা দয়াময়ী শঙ্কর-গৃহিণী,
ভবে শুভঙ্করী, দুর্গতিহারিণী,
জীবদুঃখে উমা কতই কাতর,
কি, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নর,
ভক্তজন স্নেহে সদাই ভোর ॥

আগে সে কিরূপে বাসবে তুষিতে
বিধি, হরি, হর অমরপুরীতে
আসিতেন সুখে—আসিতেন উমা,
রাগ-মাতা বাণী, রমা পদ্মালয়া
ইন্দ্রত্ব-উৎসব যে দিন স্বরে।
ঘুচাইতে ইন্দুবালা-মনোব্যথা,
শুনাইলা শচী সে অপূর্ব্ব কথা,
হরষে ত্রিদিব মাতিত যখন,
ধরি পঞ্চতাল ভিজে পঞ্চানন
গায়িতেন যোগী গম্ভীরস্বরে॥
গণপতি জ্ঞানী সে গীত শুনিয়া,
ছাড়ি যোগধ্যান, ভাবেতে ডুবিয়া
মিশাতেন স্বর সে স্বর সহিত;
কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত,
আনন্দে অধীরা ভবেশ-জায়া।
শুনি গূঢ় তন্ত্র হরি-গান ভুলি,
ছাড়ি তুম্বযন্ত্র ঊর্দ্ধে বাহু তুলি,
নাচিত নারদ-হরষে বিহ্বল,
পঞ্চতালে ঘন ঘাতি করতল,
আনন্দ-সলিলে ভিজায়ে কায়া।
শুনাইলা শচী দনুজবালায়—
ত্রিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায়
মনুষ্য-জীবনে সফল সাধন
সাধু, পুণ্যশীল প্রাণী যত জন—
আত্মাসুখ-ভোগ কিবা সেথায়।
কহিলা ইন্দ্রাণী "শুন রে সরলে,
এই স্বর্গধামে আছে কত স্থলে,
সুপবিত্র ঋষি আত্মা মোহকর
কত নিরুপম মাধুরী সুন্দর,
দিতিসুতগণ না জানে যায়॥"
শুনি ইন্দুমুখী ইন্দুবালা বলে
"হে অমর-রাণি, আমি সে সকলে
শুনাইলে যাহা মধুমাখা স্বরে,
পাব কি দেখিতে?—শুনিয়া অন্তরে
কত কুতুহল উথলে হায়।"

কাতরহৃদয় কহে ইন্দ্রপ্রিয়া,
চারু ইন্দুবালা-চিবুক ধরিয়া,
মৃদুল নিশ্বাসে নাসিকা কম্পিত,
মৃদুল মধুর অধর স্ফুরিত,
বাষ্পবিন্দু ধীরে নয়নে ধায়;—
"রহিল এ খেদ শচীর অন্তরে,
অনুগত জনে মনে আশা ক'রে,
না পাইল ফল তাহার নিকটে!
বল, ইন্দুবালা, বল অকপটে
কি দিয়া এখন তুষি তোমায়॥"
কহিলা সরলা সুশীলা দানবী,
(যেন নিরমল সরলতা-ছবি)
"ইন্দ্রপ্রিয়ে, মম চিত্তে অভিলাষ—
চিরদিন তব কাছে করি বাস,
বচনে তোমার সুখেতে ভাসি!
চল, দেবি, চল আমার আলয়ে,
আমি নিত্য তোমা গন্ধ-পুষ্প লয়ে
করিব শুশ্রূষা; হৃদয়ের সুখে
হেরিব সতত, শুনিব ও মুখে
বীণা-বিনোদন বচন-রাশি।
কেন, ইন্দ্রপ্রিয়ে, এ কারা-মন্দিরে
দুঃখে কর বাস? আমি মহিষীরে
করি অনুনয়, রাখিব তোমারে
আপন আলয়ে—অশেষ প্রকারে
করিব যতন তোমার লাগি।
স্বামী গেলা রণে কাতর হৃদয়,
তোমা কাছে পেলে তবু স্নিগ্ধ হয়
এ দগ্ধ অন্তর—চল, সুরেশ্বরি,
আমার আলয়ে; হে সুর-সুন্দরি,
নিকটে তোমার ইহাই মাগি॥"
শুনি ইন্দ্রজায়া বাক্যেতে মৃদুল,
"হায় রে, সরলে, তুই দৈত্যকুল
করিলি উজ্জ্বল" কহিলা বিস্ময়ে,
নেহারি সঘনে, ব্যথিত হৃদয়ে,
তরুণীর আর্দ্র নয়নদ্বয়।

হেনকালে রতি চকিত, চঞ্চল,
(হরিণী যেমন কিরাতের দল
হেরিলে নিকটে) বলে,—"ইন্দ্রপ্রিয়া,
হের দেখ অই—চেড়ীদল নিয়া
ঐন্দ্রিলা আসিছে বাঘিনা-প্রায় ;
ইন্দুবালা, হায়, লুকা কোন(ও) স্থানে,
এখনি দানবী বধিবে পরাণে ;
না জানি ললাটে আমার(ই) কি ঘটে
মহেন্দ্র-রমণি, এ ঘোর সঙ্কটে
কি করি, সত্বর কহ উপায় !"
ইন্দুবালা ভয়ে, রতির-বচনে,
চাহি শচীমুখ কহে,—"কি কারণে
লুকাইব আমি ? কেন, সুরেশ্বরি,
বধিবে অমায় দৈত্যেশ-সুন্দরী ?
কোন দোষে আমি দোষী গো তাঁয় ?"
উত্তর করিলা সুরেশ-রমণী
(তানপুরাতারে যেন তারধ্বনি)
"মীনকেতু-জায়া, কি হেতু এ ভয়,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী অমরী কি নয় ?
নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার ?
যাও, লো চপলে, যেখানে অনল,
রণজয়ী সুর—কহিও সকল,
কৈও তাঁরে মম আশীষ বচন,
সত্বরে এথায় করিয়া গমন
করুন দনুজ-বালা উদ্ধার।
থাকো, অইখানে থাকো ইন্দুবালা,
কি ভয় তোমার ? কপটীর ছলা
শিখো না কখন, মেখো না হৃদয়ে
পাপ-পঙ্ক হেন কোন(ও) প্রাণী ভয়ে,
কপট-আচারে অনন্ত জ্বালা।
যাও কামবধূ, প্রাণে যদি ভয়,
লুকাইয়া থাক ; শচী রতি নয়,
দানবী-ঝঙ্কারে নহে সে অস্থির,
আছে সে সাহস এখন (ও) শচীর,
পারিবে রক্ষিতে এ চারুবালা।"

লুকাইল রতি। হেরে ইন্দ্রজায়া,
হেরে ইন্দুবালা (যেন প্রাণী-ছায়া)
আসিছে সাজিয়া চেড়ীরা করাল,
কিরণে জ্বলিছে প্রহরণ-জাল,
ভানু মাখি যেন তরঙ্গ-থর।
চলেছে কালিকা ঘন-নিতম্বিনী
মৃদু-মন্দগতি—যেন কাদম্বিনী
বিজুলী পরিয়া করিছে নর্ত্তন—
জ্বলিছে কবচ ভীম-দরশন,
হাতে প্রভান্বিত শাণিত শর।
চলেছে ত্রিজটা বিশাল-লোচনা,
সিন্দূরের ফোঁটা ভালে বিভীষণা,
ভীম ভল্ল হাতে—মদ-মত্ত করী
ধায় যেন রঙ্গে শুণ্ড উচ্চে ধরি—
দুলিছে ত্রিবেণী চলেছে বামা।
প্রচণ্ডা-কপালী চলে খড়্গ তুলি,
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি ;
চামুণ্ডা-করেতে অসি খরশান,
ধামলী-পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গেতে বাণ,—
চলে মহা দম্ভে শতেক রামা।
চেড়ীদল সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে
ঐন্দ্রিলা সুন্দরী, লাবণ্য-তরঙ্গে
সুবর্ণ উজলি, ঝরে যেন অঙ্গে
বিদ্যুৎ-লহরী—নয়ন অপাঙ্গে
খেলে কালকূট গরল-শিখা।
নিকটে আসিয়া চিত্ত চমকিত,
নেহারে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত,
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী-বদন ;
চারু দীপ্তিময় অতুল কিরণ
সুচিত্রে যেমন স্বপনে লিখা !
কোথা রে ঐন্দ্রিলে তোর বেশভূষা ?
অভূষিত তনু জিনি চারু উষা
ভাতিছে আপনি, প্রকাশিয়া বিভা
তনু-শোভাকর, মনের প্রতিভা
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে।

হায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন
হেরি দিনমণি, দানবী তখন
মলিন তেমতি শচীর উদয়ে,
ঈর্ষা-বিষদাহ জলিল হৃদয়ে
শচীরে নেহারি অধীর দুখে।
ক্ষণে ধৈর্য্য পেয়ে, চাহি ইন্দুবালা,
ঢালি নেত্রকোণে অনলের জ্বালা
কহিলা—"দানবকুল-কলঙ্কিনি,
বধু-বেশে তুই কালভুজঙ্গিনী;
বসিলি রিপুর চরণ-তলে?
আমার কিঙ্করী—তার পদতলে
স্থান নিলি তুই? অসুর-মণ্ডলে
অশ্রাব্য করিলি ঐন্দ্রিলার নাম,
পুরাইলি হায়, শচী মনস্কাম?
কি কব হৃদয়ে গরল জ্বলে!
এখনি মুছায়ে এ কলঙ্ক-মসী,
ভিজাতাম তোর শোণিতে এ অসি,
কি বলিব হায় পুত্র-অনুরোধ
না দিলা লইতে সেই প্রতিশোধ,
চেড়ী-হস্তে তোর বধিব প্রাণ।"
পরে ব্যঙ্গ-স্বরে বলিলা—"ইন্দ্রাণি,
জানিতাম তুমি অমরার রাণী,
বালিকা ছলিতে শিখিলা সে কবে?
ইন্দ্রজাল-শিক্ষা স্বর্গে আছে তবে?
হায়, এ ত্রিদিব অপূর্ব্ব স্থান!"
বলি, ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ
শচী-বক্ষঃস্থল করি নিরীক্ষণ;
বন্ধন ছিঁড়িয়া ছুটিল কুন্তল
যেন ফণা তুলি দোলে ফণিদল
সুন্দরী-রমণী-ক্রোধ কি কটু!
চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নিদয়া,
বান্ধি আনি দিতে রুদ্রপীড়-জায়া,
বান্ধিতে শৃঙ্খলে ইন্দ্রের অঙ্গনা,—
ছুটিল কিঙ্করী করালবদনা,
ভীমাজ্ঞা পালিতে সতত পটু।

হেনকালে রণবেশে বৈশ্বানর,
চপলার সনে আসিয়া সত্বর
বন্দিলা শচীরে; জয়ন্ত কুমার,
করতলে অসি ধরি খরধার,
নমিলা আসিয়া জননী-পদে।
পুত্রে কোলে করি শচী সুলোচনা,
বহ্নিরে তুষিলা, পীযূষ-তুলনা
বচনে মধুর; চাহি ইন্দুবালা
অনলে কহিলা—"সত্বরে এ বালা
লয়ে কোন(ও) স্থানে রাখ বিপদে
বধিতে উহারে দানব-মহিলা
দেখ দাঁড়াইয়া,"—বলি, শুধাইলা
চাহি পুত্রমুখ, কুশল সম্বাদ,
কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহ্লাদ
যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে।
ইন্দ্রজায়া-বাক্যে হয়ে অগ্রসর
ইন্দুবালা-পার্শ্বে উগ্র বৈশ্বানর
চলিলা তখনি, সতৃষ্ণ-নয়নে
হেরে দৈত্যবধূ শচীর বদনে,
কপোল বাহিয়া সলিল ঝরে।
দেখি ইন্দুবালা-বদন-মুকুল—
হায় রে, যেমন নিদাঘের ফুল
নব তরুশিরে কিরণ-তাপিত—
পুরন্দর-জায়া শচী ব্যাকুলিত,
হৃদয়ের বেগ ধরিতে নারে;
ভাবিতে লাগিলা বুঝি আকিঞ্চন,
"কিরূপে একাকী করিবে গমন
চারু ইন্দুবালা? এ চারুলতায়
স্নেহনীরদানে কে পালিবে, হায়!
কে জুড়াবে তপ্ত হৃদয় তার?"
অয়ি নিরুপমা সুরেশ-রমণি,
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মানসের মণি,
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা
কার চিত্তে শোভে, এ স্নেহ-মমতা
বিপক্ষবধূরে কে করে আর?

জয়ন্ত শচীরে করি অনুনয়
বুঝাইলা কত—ত্যজি সে আলয়
জুড়াতে সন্তপ্ত হৃদয়ের তাপ ;
কহিলা "হা মাতঃ, এ দাসের পাপ
ঘুচাও আদেশ করিয়া দাসে,
নারিনু রক্ষিতে নৈমিষে তোমায়,
সে মনোবেদনা, জননি গো, যায়
এ কারাবন্ধন ঘুচালে তোমার ;
আজ্ঞা কর, মাতঃ, দনুজ-বামার
দর্প চূর্ণ করি বাঁধিয়া পাশে।"
দনুজরাজেন্দ্র-বনিতা ঐন্দ্রিলা,
যথা বিস্ফারিত ধনুকের ছিলা,
ছিলা এতক্ষণ ; সহসা তখন
সাপটি ধরিয়া তুলিলা ভীষণ
চামুণ্ডার দীপ্ত খর কৃপাণ,
মনঃশিলাতলে শচী-তনু-ভাতি
প্রভান্বিত যেথা, চরণে আঘাতি
সঘনে তাহায়, দাঁড়াইল বামা ;
নিশুম্ভ-সমরে যেন দম্ভে শ্যামা
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট স্বান।
হেরি ক্রোধে বহ্নি জ্বলিতে লাগিলা,
জয়ন্ত টঙ্কারে কোদণ্ডের ছিলা ;
লজ্জিত আবার ভাবে দুই জনে
বামা-অঙ্গে শর হানিবে কেমনে,
কিরূপে দমন করে ভীমায়।

আসি হেনকালে দাঁড়ায় সম্মুখে
বীরভদ্র বীর, ব্যোমশব্দ মুখে,
হাতে মহাশূল, শিরে বহ্নি জ্বলে,
শিবাজ্ঞা শুনায়ে জয়ন্ত, অনলে,
সত্বরে দোঁহারে করে বিদায়।
সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র-রমণীরে
চলে শিবদূত ; চলে ধীরে ধীরে
শচী সুলোচনা, জননীর স্নেহে,
জড়াইয়া বাহু ইন্দুবালা-দেহে,
কনক-ভূধর সুমেরু যেথা ;
হাসিল ত্রিদিব—শচী পদতলে
ত্রিদিব-কুসুম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া,
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া
চিরদিন তরে রাখিবে সেথা।
বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী
চাহি ঐন্দ্রিলারে "শুন রে দৈত্যানি,
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া সুমেরুশিখরে
যত দিন বৃত্র সমরে না মরে—
অসুরনিধন নিকট অতি।"
মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ,
শুনি শিবদূত-নির্ঘোষ কর্কশ
তেমতি ঐন্দ্রিলা—রহিলা স্তম্ভিত,
কে যেন চরণযুগলে জড়িত
করিয়া শৃঙ্খল নিবারে গতি।

ঊনবিংশ সর্গ

গভীর ধরণীগর্ভে, গাঢ় তমোময়
নির্জ্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,
বিশ্বকর্ম্মা-শিল্পশাল ; ভীম শব্দ তায়
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ,

প্রকাণ্ড মুদ্গর-ধ্বনি কোটি কোটি যেন,
পড়িছে আঘাতি শূর্ম্মী ; নিনাদি বিকট—
সহস্র বাসুকি-গর্জ্জ ভয়ঙ্কর যথা,
দগ্ধ-ধাতুস্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।

ধূম-বাষ্প-পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ,
সপ্তদ্বীপ-শিল্পশালা একত্রিত যেন
হইলা গহ্বরে আসি ; গাঢ়তর ধূম,
ভস্মরাশি, বাষ্পরাশি, দগ্ধ-বায়ুস্তর
উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ঘ্রাণসহ।
প্রবেশিলা পুরন্দর সে কেন্দ্র-গহ্বরে
লইয়া দধীচি-অস্থি। উচ্চ-স্তম্ভ'পরে
দেখিলা জ্বলিছে উর্দ্ধে, জিনি সূর্য্য-আভা,
তড়িৎ-পিণ্ডের শিখা, দীপের আকারে
উজলি ভূমধ্যদেশ। দেখিলা আলোকে
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তরমালা,
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,
বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে
মহী-দেহ, নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি
যথা ঘনস্তর-দল নানা আভাময়
পশ্চিম গগনপ্রান্তে ভানুরশ্মি ধরি।
কোনখানে ধূমবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবী-গর্ভে,—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহীজঠরে ; কোনখানে শোভে
শুভ্র খড়ীকের স্তর তড়িত্-আলোকে
আভাময় ; রক্তবর্ণ তাম্রের তবক
কোনখানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ-আকৃতি ;
রজত-সুবর্ণরাজি অন্য ধাতুসহ
নিরখিলা আখণ্ডল সে মহী-জঠরে,
শোভাকর—শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজুলী উজ্জ্বল আভা কাদম্বিনীকোলে!
জ্বলিছে ভূমি-অঙ্গার-স্তর কত দিকে,
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি,
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ ; যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত বেশ!
পীতবর্ণ হরিতাল-স্তূপ কোন স্থানে
ধরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি খরতর ;
কোথাও পারদরাশি হ্রদের আকারে,
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায়।
অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্র—যেন বা আগ্নেয়
শৈলশ্রেণী, সারি সারি বদন প্রসারি
উগারে অনলরাশি ধাতুরাশি সহ।
মিশেছে যে সব যন্ত্রে বায়ু-প্রবাহক
বিশাল লৌহের নল শতদিক হ'তে—
জরায়ু সহিত যথা গর্ভিণী-জঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে।
নলরাজি-অন্তমুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িছে জাঁতা ধাতু বিনির্ম্মিত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি,—ছুটিছে পবন
কভু ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে।
যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,
প্রসারিত বক্ষদেশ, বাহু লৌহবৎ,
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময় ;
ঘর্ম্মাক্ত, ললাট-ঘর্ম্ম মুছি বাম করে।
ঘুরিতেছে একেবারে শিল্পশাল যুড়ি,
সংযোজিত পরস্পরে অদ্ভুত কৌশলে,
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ ;
শূর্ম্মীঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদ্গর,
ছুটিছে শূর্ম্মীর পৃষ্ঠে শত শত স্রোতে
গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাম্র আদি ধাতু,
মুহূর্ত্ত ভিতরে তায় শলাকা বৃহৎ,
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর তার, ধাতু-পত্র নানা,
গঠিত আপনা হ'তে ; গঠিত নিমেষে
কত মূর্ত্তি—সুবলনি গঠন সুন্দর।
শ্বেত কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে কত স্থানে সেথা
বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি, চারু অবয়ব,
বাহির হইছে নিত্য কত স্তম্ভরাজি
স্ফটিক-লাঞ্ছন আভা শোভে চারিদিকে
কখন বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি
শর্ব্বলা ধরিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে
ভেদিছে ভূধর-অঙ্গ, তখনি সে ঘাতে

শত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে
বিদীর্ণ গিরির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পূর্ণ করি নীরে।
কখন বা সুরশিল্পী খুলিছেন ধীরে
ধরা-অঙ্গে আগ্নেয় পর্ব্বত-আচ্ছাদন,
শিল্পশাল-বহ্নিধূম বাষ্প নিবারিতে,—
গর্জ্জিয়া গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর
উগারিছে অগ্নিরাশি, পাংশু, ধাতুক্লেদ
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন; শূন্য ভয়ঙ্কর
পরিপূর্ণ ধূমাশ্রিত বহ্নির শিখায়!
শিলাচূর্ণ ধাতুস্রাব ভস্ম-বরিষণে
ভস্মীভূত কত দেশ অবনীপৃষ্ঠেতে,
শত শত নগরী নিমগ্ন রেণুস্তরে!
গঠে শিল্পী কত সেতু কত অট্টালিকা,
প্রাচীর-দেউল-দুর্গ-প্রকরণ কত,
সুতৈজস অস্ত্র, বর্ম্ম, দেখিতে অদ্ভুত।
নিরখি চলিলা ইন্দ্র; সত্বর আসিয়া
দাঁড়াইলা শিল্পী-পাশে। বিশ্বকর্ম্মা হেরি
দেবেন্দ্র বাসবে সেথা ক্ষান্ত দিলা শ্রমে;
মুছি ঘর্ম্ম আসি কাছে, হইয়া প্রণত
কহে সুরশিল্পিরাজ, "কি ভাগ্য আমার
আমার এ ধূম্রশালে, দেবেন্দ্র আপনি!
সকল আয়াস মম এত দিনে, দেব!"
এতেক কহিয়া শচীনাথ-আগে-আগে
দেখায়ে চলিলা পথ; খুলিয়া অপূর্ব্ব
অন্যের অদৃশ্য দ্বার রত্ন-গিরিদেহে;
প্রবেশিলা ইন্দ্রসহ সুরম্য আলয়ে।
রজতনির্ম্মিত গৃহ, কারুকার্য্য চারু,
প্রাচীর-পটল-অঙ্গে দিব্য বাতায়নে,
খচিত কাঞ্চন, মণি, হীরক, প্রবাল,
চারি ধারে স্তম্ভরাজি; চারু শোভাময়,
চারু মূর্ত্তি চারিদিকে সুন্দর বলনি
কমনীয় বামাতনু, পুরুষ সুঠাম,
নিরুপম হেম, মণি, রজতনির্ম্মিত,
চলিতেছে, বসিতেছে, নর্ত্তন-বাদনে
রত সদা; সচেতন যেন বা সকলি!
কত রঙ্গে কত দিকে বাজিছে বাজনা
ললিত মধুর স্বরে! কত অদ্ভুত
রহস্য বিস্ময়কর সে হর্ম্ম্য ভিতরে;
কে বর্ণিতে পারে হায়, দেব-শিল্পীখেলা!
মণ্ডিত হীরকখণ্ড সুবর্ণ-আসনে
বসাইলা আখণ্ডলে—পার্শ্বে দাঁড়াইলা
শিল্পিগুরু; সুধাইলা কি হেতু দেবেন্দ্র
সে গহ্বরে? কি মহৎ কার্য্য হেন তাঁর
সুরেন্দ্র আপনি যাহা আসেন সাধিতে,
উদ্দেশে স্মরিলে আজ্ঞা সুসিদ্ধ যাঁহার?
"হে বিশাই, দেবশিল্পি, শিল্পি-কুলেশ্বর
সুনিপুণ!" কহিলা সুরেশ স্বর্গপতি,—
"কোথা স্বর্গ? কোথা বসি স্মরিব তোমায়?
বৃত্রাসুর পাপমতি এখনও ধ্বংসিছে
সুরপুরী। উদ্ধারিতে তায় শিবাদেশে
এ ধরণী-গর্ভে গতি মম; না মরিবে
দনুজ-ঈশ্বর অন্য শরে, বজ্র-বাণ
হে কৌশলি, করহ নির্ম্মাণ ত্বরা করি;
এই অস্থি—মহর্ষি দধীচি দিলা যাহা
দেবের মঙ্গলে তনু ত্যজি আপনার,
লহ বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ;
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে
সংহারত্রিশূলতুল্য তেজঃ সে আয়ুধে;
প্রলয় বিষাণ শব্দে হুঙ্কারিবে সদা;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।"
শুনি দুঃখে দেবশিল্পী কহিলা—"সুরেশ,
ত্রিদিব-উদ্ধার নহে আজও; হের দেখ,
সাজাইতে সে সুবর্ণময়ী অমরায়
করিয়া কতই যত্ন কতই গঠিনু
সুভূষণ! এখনও দনুজ দগ্ধ করে
সে নগরী? এত শ্রম বিফল আমার!

পালিব আদেশ তব, সুরকুলপতি,
ক্ষমা কর ক্ষণকাল।" বলিয়া প্রাচীরে
বসাইলা অতি ক্ষুদ্র রজতকুঞ্চিকা,
অমনি সুহেম-ঘট পূর্ণ হিমজলে,
স্বর্ণ-থালে সুরস অমরখাদ্য আহা!
কে পারে বর্ণিতে কোথা আম্র সুধাফল
ক্ষিতিতলে! রাখিলা বাসব-সন্নিধানে;
কহিলা বিশাই—"তব অভ্যর্থনা, দেব,
কি আতিথ্য সম্ভবে আমায়? দীন আমি,
ভোগবতী-বারি—এই স্বাদু সুশীতল।"
সম্প্রীত আতিথ্যে স্বরীশ্বর শচীনাথ
কহিলেন,—"হে শিল্পিশেখর বিশ্বকৃৎ,
সঙ্কল্প করেছি আমি না ছুঁইব কিছু
পেয় ভোজ্য ত্রিজগতে, ত্রিদিব উদ্ধার
না হইলে,—নহিলে এখনি সুখে আমি
পুরাতাম অভিলাষ তব; পূর্ণপ্রীতি
আতিথ্যে তোমার।" শুনি আখণ্ডলব্রত
অস্থি লয়ে কর্ম্মশালে ফিরিলা সত্বর
শিল্পিরাজ; পুরন্দর ফিরিলা পশ্চাতে।
দিলা ঘুরাইয়া চক্র,—স্বান্ স্বান্ ডাকি
পড়িতে লাগিল জাঁতা, প্রবেশিল বায়ু
অগ্নি-প্রজ্বালন-যন্ত্রে, খরতর তেজে
যন্ত্রগর্ভ শিখাময়; মুহূর্ত্ত-ভিতরে
অষ্ট জ্বালযন্ত্রে অষ্ট কটাহ বৃহৎ
বসাইলা সুরশিল্পী ভীম ভুজবলে;
দিলা অষ্টধাতু তায় লৌহাদি কাঞ্চন;
দাঁড়াইলা শূর্ম্মী-পাশে সাপটি মুদ্গর।
ছুটিল ধাতুর স্রোত কটাহ হইতে
অষ্টধারে একবারে—দৃশ্য ভয়ঙ্কর;
ঘন ঘন মুদ্গারের প্রচণ্ড আঘাত
পড়িতে লাগিল তায় বধিরি শ্রবণ।
এইরূপে ধাতুস্রাব একত্র মিশায়ে,
করি ভীম পিণ্ডাকৃতি, শিল্পিকুলরাজ,
নিষ্কাশিল মহাধাতু অদ্ভুত প্রকৃতি,
গলিত না হয় যাহা অত্যুষ্ণ অনলে
সে ধাতু, দধীচি-অস্থি; এক পাত্রে রাখি
উত্তাপিলা বিশ্বকর্ম্মা দুরন্ত উত্তাপ
ধরি তড়িত্তাপ যন্ত্র, দুই কেন্দ্র ছাড়ি
ছুটিল বিদ্যুৎস্রোত বিপুল তরঙ্গে
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর;
কাঁপিতে লাগিল ধরা ঘন ভূকম্পনে,
মাটিতে ছুটিল ঢেউ, উন্নত ভূধর
ডুবিয়া হইল হ্রদ ধরণী-অঙ্কেতে,—
সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলিল নিমিষে।
অষ্টধাতু-পিণ্ডসহ সে পিণ্ড মিশায়ে
মহাশিল্পী আরম্ভিলা বজ্রের গঠন,
প্রকাশি কৌশলে যত নিপুণতা তাঁর।
সুবিশাল দণ্ডাকৃতি গঠিলা প্রথমে,
পরে মধ্যগত স্থলকোণে বাঁকাইয়া
পিটিয়া গঠিলা ফলা অপূর্ব্ব-মূরতি,
দুই মুখ দ্বিবিধ আকৃতি, বিভীষণ।
পশাইলা অস্ত্র-অঙ্গে ভীম যন্ত্রযোগে
প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বিদ্যুৎ-অনল
জ্বলিতে লাগিল পৃষ্ঠে, ফলা ভুজদ্বয়ে।
গঠিলা হরিচন্দন-ত্বকে করত্রাণ,
নহে দগ্ধ যে পাদপ তড়িত-উত্তাপে;
অস্ত্রকোষ গঠিলা তাহাতে মনোহর।
বিবিধ বিচিত্র চিত্র দিব্য শোভাকর
যন্ত্রযোগে দেবশিল্পী সহর্ষ অন্তরে,
আঁকিলা অস্ত্রের দেহে, মূর্ত্তি নানাবিধ
(চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, সাগর, সুমেরু)
অনল-রেখায় দীপ্ত—জ্বলিতে লাগিলা!
আঁকিলা অমরোৎসব এক ফলাদেহে,
পারিজাত-মাল্য পরি অমর-অঙ্গনা
রত নৃত্য-গীত-বাদ্যে; দেবতামণ্ডলী
দেখিছে সহর্ষচিত্ত দাঁড়ায়ে অন্তরে।
আঁকিলা অন্য ফলকে কৃতান্ত-নগরী;
ভীষণ নরককুণ্ড, পার্শ্বে যমদূত

দণ্ড হাতে দাঁড়াইয়া ভীম আঘাতিছে
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে ; আঁকিলা কোথাও
কুম্ভীপাক ঘোর হ্রদ ; কোথাও ভীষণ
উচ্ছ্বাস নরককুণ্ডে প্রাণি-কলরব ;
বহিছে রুধির হ্রদে তরঙ্গ কোথাও ;
কোথাও শীতোষ্ণ কুণ্ডে কাঁপিছে পাতকী।
সপ্ত দিবা-নিশাভাগ ব্যাপিত এরূপে
শিল্পশালে দেবশিল্পী—অষ্টম দিবসে
পূর্ণ অবয়ব বজ্র-সৃষ্টি সমাধিলা।
অস্ত্র গড়ি বিশ্বকর্ম্মা সহাস্য-বদন
কহিলা সুরেন্দ্রে চাহি, "নিক্ষেপের প্রথা
নিবেদি চরণে, দেব, কর অবধান ;
মধ্যভাগে এইরূপে দৃঢ় আকর্ষিয়া,
করত্রাণে ঢাকি কর, ঘুরায়ে ঘুরায়ে
ছাড়িতে হইবে দ্রুত ; তখনি দম্ভোলি
(রিপু-দম্ভবিনাশন দ্বিতীয় এ নাম)
শত্রু নাশি ক্ষণকালে ফিরিবে নিকটে।"
হেনকালে অকস্মাৎ তিন দিক্ হ'তে
দীপ্ত করি শিল্পশালা, তিন মহাতেজঃ
লোহিত শ্যামল শ্বেত বরণ সুন্দর,
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্র-অঙ্গে প্রবেশিলা।
প্রণমিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি
স্মরি বিধি, বিষ্ণু, হরে ; তখনি গভীর
গরজিল ভীমনাদে দম্ভোলি ভীষণ।
দেবশিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রখর তেজে
না পারি ধরিতে অস্ত্র, এবে গুরুভার
ছাড়ি দিল অকস্মাৎ, ঘন ঘন ঘন
কাঁপিল ধরণী-কেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে।
মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিলা উদ্যম
পরখিতে অস্ত্রবরে, বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা—
"না নিক্ষেপ(ও) অস্ত্র দেব, এ মম আলয়ে,
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী ;
বহু পরিশ্রমে, প্রভু, করেছি সঞ্চয়
এ সকল ; হবে ভস্ম বজ্রের নিক্ষেপে।"
নিরস্ত, বিশাই-বাক্যে, দেবকুলপতি
স্বরীশ্বর, আশীর্ব্বাদ করিলা তাঁহারে ;
সানন্দ অন্তরে শীঘ্র ছাড়ি কেন্দ্র-গুহা
বজ্র লয়ে শূন্যপথে আরোহিলা পুনঃ।

বিংশ সর্গ

বাজিল দুন্দুভি রণরণ-নাদে
অসুর অমর উন্মত্ত সে হ্লাদে ;
ছাড়ে সিংহনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কার,
চলে দৈত্যসেনাদল অনিবার,
  তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ-কাছে।
ঘনস্তর যথা গগনমণ্ডলে
বায়ুমুখে গর্জ্জি মহাবেগে চলে,
চলে দৈত্যসেনা যোজন-বিস্তার ;
দুই পক্ষে দুই বাহিনী-প্রসার,
  মধ্যে অক্ষৌহিণী প্রধান বল।
  সমর-সাজে বীরবর
চলে রুদ্রপীড়, মহা ধনুর্দ্ধর,
চলে ভীম ধনু সঘনে টঙ্কারি ;
দুই পক্ষ নেতা, দুই অমরারি—
  কালভদ্র-বীর সুন্দনাসুর।
চলেছে বাহিনী অগ্রবর্ত্তী-সেনা
অস্ত্রমুখে ঘন অনলের ফেনা,
হতেছে নির্গত, ঝলকে ঝলকে,
বহ্নি তাল তাল পলকে পলকে
  ছুটিছে নিক্ষিপ্ত নক্ষত্র প্রায়।

হেরি দেবদল ভাঙি দুই দলে
জয়ন্ত-অনল-আদেশেতে চলে ;
ঘন ধনুর্ঘোষ, ঘন সিংহনাদ,
দেবতনু দীপ্ত কিরণের বাঁধ
তিমির-তরঙ্গে যেন ভেটিতে।
অগ্নি অগ্নিময় চাপ ধরি করে,
দৈত্যসেনাপরে শরবৃষ্টি করে ;
বহ্নি-বৃষ্টি যেন দেখিতে ভীষণ ;
জয়ন্ত-কার্ম্মুকে বাণ বরিষণ
যেন শিলাপাত দনুজে ঘাতি।
ক্রমে অগ্রসর দুই মহাবল,
মহাশব্দে যেন ধায় জলদল,
বরুণ যখন আপনি সারথি,
মহাসিন্ধু-বারি শতচক্রে মথি,
শতচক্র-রথ চালান বেগে।
মিলিল দুদল,—দুই মহানদ,
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়া উন্মদ,
ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে
ছুটে কোলাহলি দুই নদ-অঙ্গে
দু'নদ বিস্তার সমূহ যুড়ি।
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ ঘন ঘন ঘন,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীষণ ;
সেনার গর্জ্জন, তুরী-শঙ্খ-নাদ,
রথচক্রধ্বনি, অশ্ব-হ্রেষা-হ্রাদ ;
বিপুল তুমুল সমর-স্রোত।
ধূলি-ধূমজালে গগন আচ্ছন্ন,
রথচক্র অশ্ব-ক্ষুরেতে উৎসন্ন
অমরা নগরী ; ঘোর অন্ধকার
দৃষ্টি নাহি চলে, দীপ্ত অস্ত্রধার
চমকে চমকে নয়ন ধাঁধে।
ছোটে রুদ্রপীড়-রথ ভয়ঙ্কর,
ভীমরুদ্রমূর্ত্তি ভীম ধ্বজে যার—
ছোটে জয়ন্তের অরুণ স্যন্দন,
ছোটে বহ্নিরথ ঘোর দরশন
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে যোজন-পথ।
কালভদ্র কৃষ্ণ তুরঙ্গ-উপরে
মহাখড়্গ করে ফিরিছে সমরে ;
স্যন্দন অসুর ভীষণ করাল ;
ঘোর গদা হাতে জিনি তরু শাল
ফিরিছে উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ।
পড়ে সৈন্যগণ সংখ্যা অগণন,
শস্য-স্তম্ভরাশি অঘ্রাণে যেমন
কৃষকের অস্ত্র-আঘাতে লুটিয়া
পড়ে শস্যক্ষেত্রে ভূতল ছাইয়া
খেলাইয়া ঢেউ ধরণী-অঙ্গে ;
শালবনে কিম্বা যথা পত্রকুল,
উড়িয়া পবনে উত্তাপে আকুল,
নিদাঘ আরম্ভে পড়ে রাশি রাশি
নীরস, পিঙ্গল বরণ প্রকাশি
যোজন-বিস্তার অরণ্য ঢাকি।
পড়ে দেবসেনা থরে থরে থরে—
পুষ্পরাশি যেন রণস্থল 'পরে,
কিম্বা বহ্নিগর্ভ বাজে শূন্যে উঠি
শূন্যপথে যেন ভাঙ্গি পড়ে লুটি
ছড়ায়ে সহস্র কিরণকণা !
ভীষণ সমর-হুতাশন জ্বলে
অমরা ভিতরে স্থলে স্থলে স্থলে
যোঝে দলে দলে দেবতা অসুর ;
রণতেজে ঘন কাঁপে সুরপুর
ঘোর আড়ম্বর বীর-আরাব।
সুমেরু-শিখরে চপলা চাহিয়া
দেখাইছে শচী অঙ্গুলি তুলিয়া
"হের লো চপলে, কিবা ভয়ঙ্কর
রণ অইখানে—কি ঘোর ঘর্ঘর—
একাদশ রুদ্র যোঝে ওখানে ;
ভৈরব-বিক্রমে যুঝিছে দানব,
মহাখড়্গ ধরি—মুখে ভীম রব—
হানিছে চৌদিকে, পড়িছে অমর ;

কোন্ বীর, রতি, অই খড়্গধর,
ক্রোধিত বৃষভ ছুটিছে যেন ?
সর্ব্ব-অঙ্গে ঝরে রুধির-প্রবাহ,
সর্ব্ব-অঙ্গে জ্বলে প্রহরণ-দাহ,
তবু যুঝে একা একাদশ সনে
মত্তহস্তী যেন ভাঙ্গে নলবনে—
অমর-বাহিনী দেখ্ পলায় ।”
চারু ইন্দুবালা সরলা সুন্দরী
সুধিলা—“ইন্দ্রাণি বল গো
কি করি,
এ ঘোর আঁধার শর-ধূমময়
শূন্যপথে দৃষ্টি কিরূপেতে হয়,
কিরূপে দেখিতে পাও এ দূরে ?
আমি ত কিছুই নারি নিরখিতে,
শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে
হেরি অস্ত্রজ্বালা, শুনি কোলাহল
বহুদূরে যেন চলে সিন্ধুজল
উথলি হিল্লোলে অনন্ত পথে !”
শচী বুঝাইলা দানব-বালায়
দেবচক্ষু বিনা দেখিতে না পায়
ধূমাচ্ছন্ন দেশে, কিবা তমসায় ;
ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবতায়,
দানব-মানব-নয়ন স্থূল ।
কহিছে শচীরে মদনের প্রিয়া
কালভদ্র-দৈত্য-বীর্য্য বাখানিয়া,
হেনকালে রৌদ্র অজ-রুদ্র-শর
দ্বিখণ্ড করিয়া খড়্গ খরতর
বিন্ধে কক্ষদেশে আঘাতি তায় ;
অস্থির ব্যথায় পড়িল অসুর,—
একাদশ রথচক্র, অশ্বক্ষুর
ক্ষুব্ধ করি স্বর্গ তখনি ছুটিল,
খেদায়ে দনুজ-বাহিনী চলিল,
কালভদ্রে বধি শাণিত শরে ।
হেরি রুদ্রপীড় ভগ্ন নিজ দল
চালাইলা রথ—অমরা চঞ্চল
মহাঘোর শব্দে কোদণ্ডে টঙ্কার,
বাণে বাণে বাণে সাজাইল হার
ভুজঙ্গের শ্রেণী যেন আকাশে ।
স্যন্দনে কহিয়া পশ্চাতে থাকিতে,
চলিলা বিশিখ ছাড়িতে ছাড়িতে,
রুদ্রগণে গিয়া আগে আগুলিলা,
মুহুর্মুহুঃ গুণে বাণ বসাইলা—
হেন লক্ষ শর একত্রে ছাড়ে !
কাটিলা নিমেষে রথের ধ্বজিনী,
রথচক্র, নেমি, অশ্বের বন্ধনী ;
একাদশ রুদ্র নিমিষে নীরথ,
ফিরিতে স্যন্দন নিবারিলা পথ,
পড়ে রুদ্রগণ ঘোর বিপদে ;
মুখে বাণবৃষ্টি, বাণবৃষ্টি পিঠে,
শূন্য অন্ধকার, নাহি চলে দিঠে,
বহে শতধারে অমর-শোণিত,
অপূর্ব্ব সুগন্ধি সৌরভ-পূরিত,
অস্ত্রের দাহনে দহে শরীর ।
জয়ন্ত কহিলা “হের বৈশ্বানর,
বৃত্রসুত-শরে দেহ জরজর,
রুদ্র একাদশ—পশ্চাতে স্যন্দন—
না পারে দানবে করিতে দমন,
অস্থির শরীর অসুর-তেজে ।”
শুনি অগ্নি, বেগে চালাইলা রথ,
চক্রের ঘর্ষণে অগ্নিময় পথ,
সর্ব্ব অঙ্গে দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
নলবনে যেন দাবাগ্নি পশিল,
তেমতি ক্রোধিত অনল-বেশ ।
চারিদিকে দৈত্যসেনা ঝরি ঝরি
পড়ে তীক্ষ্ণ শরে, সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী-
আঘাতে যেমন পড়ে নলবন,
দনুজ-চমূতে অনল তেমন
করিছে নিধন দনুজ-রাশি ;

দেখিতে দেখিতে ভীম হুতাশন
দৈত্য চমূ দলি, নিবারি স্যন্দন,
দাঁড়াইলা গিয়া রুদ্রগণ-আগে,
কালাগ্নির তেজে ; ভয়ঙ্কর রাগে
বহ্নি রুদ্রপীড়ে তুমুল রণ !
কহিলা হুঙ্কারি দনুজকুমার
"বৈশ্বানর, শিক্ষা দেখিব এবার,
বুঝিবে এবার বৃত্রের তনয়
সমরে না জানে জীবনের ভয়,
এ ভুজদণ্ডের সামর্থ্য কত।"
বলি শরে শরে কৈলা অন্ধকার,
ছাড়িতে লাগিলা বিকট হুঙ্কার ;
কোদণ্ড-টঙ্কার নিমিষে নিমিষে,
বাণের গর্জ্জন স্তব্ধ করি দিশে
বধির করিল শ্রবণমূল।
অনল তৎপর সে আশুগ-জাল
এড়াইলা, রথ রাখি ক্ষণকাল,
শর-লক্ষ্য-স্থান-অন্তরে আসিয়া,
আবার ঘর্ঘর নির্ঘোষে ঘুরিয়া
বিজুলি-গতিতে অতি নিকটে,
ফিরিল নিমিষে ক্রোধে হুতাশন,
না করিতে লক্ষ্য দনুজ-নন্দন,
দীপ্ত অসি ধরি, লম্ফে ছাড়ি রথ,
রুদ্রপীড়-রথ-অশ্বে জালাবৎ
হানি দীপ্ত অসি করিল নাশ ;
শতখণ্ড করি ফেলিল শতাঙ্গ—
নেমি, নাভি, ধুর, ধ্বজ, রথ-অঙ্গ,
ভীম অসি-ঘাতে—বিনাশিয়া সূত,
উঠি ভগ্ন-রথে লম্ফ দিয়া দ্রুত,
রুদ্রপীড়-ধনু দ্বিখণ্ড করি ;
হানিবারে যায় বক্ষঃস্থলে তার,
মহাজ্যোতির্ম্ময় তীব্র তরবার,
হেনকালে দৈত্যসূত সুচতুর
ছাড়ি নিজ রথ রথেতে শক্রর
উঠিল বেগেতে প্রলম্ফ ছাড়ি।
পদাঘাতে সূতে ফেলিয়া অন্তরে,
নিজে রশ্মি ধরি, ঘোর বেগভরে
চালাইল রথ, কিছু দূরে গিয়া
রাখিলা স্যন্দন, চরণে চাপিয়া
ধরিলা অশ্বের রশ্মির ডোর ;
নিলা অনলের ধনুর্ব্বাণ তূণ,
কার্ম্মুকে বসায়ে দিব্য নব গুণ,
গর্জ্জিতে লাগিলা ভুজঙ্গের প্রায়
লক্ষ লক্ষ শর অনলের গায়
ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষণে নিমিষে ফেলি !
"সাধু রুদ্রপীড়—ধন্য মহাবল"
ছাড়িল হুঙ্কার দানবের দল ;
শরেতে অস্থির শূর বৈশ্বানর,
ভগ্নরথ'পরে ক্রোধে থর থর
না পারি রোধিতে অরাতি-বাণ।
ছুটাইল রথ অনলে রক্ষিতে
জয়ন্ত সারথি পল না পড়িতে ;
ছুটাইল রথ কুবের দুর্ব্বার,
ছুটাইল অশ্ব অশ্বিনীকুমার,
অনল-সহায়ে বিজুলী-বেগে।
হেনকালে বৃত্রসুত সুনিপুণ,
মহাধনুর্দ্ধর কর্ণে টানি গুণ,
হানে ভয়ঙ্কর সুশাণিত বাণ,
হুতাশন-কণ্ঠ করিয়া সন্ধান্ ;
বিন্ধিল সে শর ভেদিয়া লক্ষ্য।
জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
ঘেরিল বহ্নিরে কাছে আসি তাঁর,
বিশিখ-জ্বলনে অস্থির অনল
কহিল—"বীরেশ, ঐন্দ্রি মহাবল,
দেও তব রথ জানাই দৈত্যে—
বহ্নির কি তেজ!" প্রবোধিলা সবে
"এস মহাভাগ, ক্ষণ শ্রান্তি ল'ভে ;
এ যাতনা তব হ'লে কিছু দূর

রণে এস পুনঃ ; বৃত্রসুতে ক্রুর
যুঝিয়া আমরা রোধিব রণে।”
বলি ইন্দ্রাত্মজ-রথে বৈশ্বানরে
তুলিলা সকলে ; রাখিয়া অন্তরে
সমরে ফিরিলা—জয়ন্ত সুধীর
কুবেরের রথে, দুই মহাবীর
অশ্বিনীকুমার অশ্বেতে চলে।
দনুজনন্দন বহ্নিরে বিমুখি
মহাদর্পে ছাড়ে—অন্তরেতে সুখী—
তীব্র শরজাল দেবসেনা'পরে ;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিন্ধিছে সে শরে
অমরবাহিনী দহি যাতনে।
জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
রুদ্রপীড়-রথ ঘেরিল আবার ;
আবার বাজিল সমর তুমুল
ভীম অস্ত্রাঘাতে ক্ষুব্ধ সৈন্যকুল,
শরে হুলুস্থুল সমরস্থল।
বেগে লম্ফ দিয়া কুবের তখন
গদা ঘুরাইয়া করিল গমন,
উড়াইয়া শরে শুষ্ক পত্রাকারে
ঘূর্ণবায়ুগতি গদার প্রহারে,
পদভরে ঘন কাঁপে ত্রিদিব।
সমরকুশল অসুরকুমার
ছাড়ি ধনুর্ব্বাণ, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
দাঁড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি,
কুবেরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করি
বেগে ছাড়ি দিলা বিপুল তেজে।
বিন্ধিল ভীষণ শেল বক্ষঃস্থলে,
দারুণ প্রহারে শ্বাস নাহি চলে,
পড়িল ধনেশ হ'য়ে হতচিত,
জয়ন্ত-স্যন্দন ছুটিল ত্বরিত,
ধনেশেরে ঐন্দ্রি তুলিলা রথে।
শিঞ্জিনী টানিয়া আকর্ষিলা বাণ,
দনুজনন্দনে করিয়া সন্ধান ;—

শচী নিরখিয়া আতঙ্কে উতলা,
কহে ভীতস্বরে “হের লো চপলা,
যাও শীঘ্রগতি, নিবার সুতে ;
না প্রবেশে রণে রুদ্রপীড়-সনে ;
মহাধনুর্দ্ধর দনুজ-নন্দনে
নারিবে সংগ্রামে করিতে বারণ,
যার হাতে হারে দেব হুতাশন,
তার সনে একা যুঝিতে ধায় !
নিবার নিবার নিবার চপলে,
যাও দ্রুতগতি, যাও রণস্থলে,
বাজিবে হৃদয়ে শেল সম ব্যথা,
পড়ে যদি পুত্র, পড়েছিলা যথা
নৈমিষ-অরণ্যে দানবাঘাতে।”
চপলা চলিলা সুচপল-গতি
দেবদূত-বেশে যথা দেবরথী।
কহে ইন্দুবালা “হায়, ইন্দ্রপ্রিয়া,
তব বাক্যে, সতি, কাঁদে মম হিয়া,
কেন প্রাণনাথ হেন নিদয় !
কহ চপলারে আনিতে এখানে,
ঘুচাতে এ ভয় তোমার পরাণে,
পুত্রে আনি কাছে ; পুরন্দরজায়া,
বুঝিবারে পারি তব চিত্তমায়া,
আমার (ই) হৃদয়-বেদনা-বেগে !
হায় নাথ, যেন ব্যথিলে আমায়,
ব্যথা দেও কেন অন্যে পুনরায় !”
বলি অশ্রুজলে বক্ষঃ ভিজাইলা ;
দেবদূত-বেশে এখানে চপলা
বাসব-কুমারে সম্ভাষে কয়—
“রণে ক্ষান্ত হও সুরেশ-নন্দন,
সহিতে নারিবে ভীম প্রহরণ,
রুদ্রপীড়-হাতে—জননী-আদেশ,
একাকী সমরে করো না
প্রবেশ,
বিঁধো না তাঁহার হৃদয়ে শেল ;

একাকী যে বীর নিবারে সমরে,
একাদশ রুদ্র, যক্ষ, বৈশ্বানরে,
তারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে ?
লও অন্যস্থানে এ রথ ত্বরিতে ;
কুবেরে অনলে সুস্থ কর।"
বলিয়া তখনি হৈল অদর্শন,
শুনি দূতমুখে জননী-বচন,
জয়ন্ত দুঃখেতে ফিরাইল রথ
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ—ধরি অন্য পথ
কুবেরে লইলা অনল-পাশে।
জয়ন্তে বিমুখ দেখি বৃত্রসুত,
ঘোর সিংহনাদে—শিক্ষা অদভুত,
অযুত অযুত শর নিক্ষেপিলা,
দেব-চমূ ঘাতি রথে তুলি নিলা
আপন সারথি, নিষঙ্গ, ধনু ;
মথিতে লাগিলা সুরসেনাদল—
বাড়বাগ্নি যেন দহি রসাতল,
জলজন্তুকুল আকুল করিয়া
ভ্রমে সিন্ধুগর্ভে ছুটিয়া ছুটিয়া
দুরন্ত প্রচণ্ড ভীষণ দাপে—
অদূরে দেখিলা অশ্বিনীকুমার
যুঝিছে অবাধে বিক্রমে দুর্ব্বার ;
দিব্য অশ্ব 'পরে দেব দুই জন
হানিছে কৃপাণ সুতীক্ষ্ণ ভীষণ,
লণ্ডভণ্ড করি দনুজদল।
তখনি দৈত্যেশ-সুত মহাবলী
আদেশে সারথি সুরাসুরে দলি
চালাইলা রথ ঘর্ঘর নিনাদে
বেগে সেই দিকে,—রুদ্রপীড় সাধে
ধরিলা কার্ম্মুক টঙ্কারি গুণ।
চক্ষের পলকে লক্ষ্য করি স্থির.
দুই তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিলা বীর,
নিক্ষেপিলা পুনঃ আর দুই শর
নিমেষ না ফেলি—কাঁপি থর থর

পড়ে দেব-অশ্ব আরোহী সহ ;
ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ে দৈত্যদল,
ভঙ্গ দিল রণে অমরের বল ;
পশ্চাতে চলিল দানবের সেনা
(বন্যা যেন চলে বুকে করি ফেনা)
দনুজনন্দন, সুন্দন বীর।
ধায় রণমত্ত কেশরী যেমন
ছাড়ি সিংহতুল্য ভীষণ গর্জ্জন ;
দেখিতে দেখিতে অমরবাহিনী
প্রাচীর বাহিরে তাড়িত তখনি,
লতা পত্র যথা ঝটিকা-মুখে।
দেবব্যূহ ভেদ করি মত্তগতি
চলে দৈত্য সেনা, চলে দৈত্য রথী ;
রণক্ষেত্র দূরে ছাড়িয়া চলিল,
যথা চলে বেগে তটিনী-সলিল
তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙ্গিলে কূল।
শচী, সুমেরুর শিখর-উপরে,
হেরে সেনাভঙ্গ কাতর অন্তরে ;
রুদ্রপীড়-বীর্য্য হেরে চমকিত
চাহে দৈত্যবধূ-বদনে ত্বরিত,
বুঝিতে তাহার হৃদয়ভাব।
তেমতি বিমর্ষ ভাবেতে সরলা
দেখিলা ভাবিছে —তেমতি উতলা !
কহিলা ইন্দ্রাণী "এ কি দেখি ভাব,
চারু ইন্দুবালা, পতির প্রভাব
দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ।
আমার তনয় হইলে এখনি
ভাবিতাম এরে জগতের মণি,
কি বীর্য্য, সাহস, কি শিক্ষা-কৌশল !
একা হারাইল ত্রিদশের দল,
শক্র বটে, ধন্য বীর বাখানি !"
ইন্দুবালা অশ্রু ফেলি দরদর
কহে "সুরেশ্বরী, কাঁদিছে অন্তর,
নাহি চাহি আমি প্রভাব, প্রতাপ,

পরাণে না সহে এ ঘোর উত্তাপ,
ইন্দ্রিপ্রিয়া, হায়, অভয় দেহ—
না দেবে ঘটিতে কোন(ও) অমঙ্গল
প্রিয়ের আমার—হে শচি, সম্বল
একমাত্র অই এই দুঃখিনীর !
আমার (ই) অদৃষ্ট-দোষে হেন বীর,
না জানি কপালে কি আছে শেষ
কহে ইন্দ্রজায়া "ললাট-লিখন
অরে ইন্দুবালা, কে করে খণ্ডন ?
চিন্তা নাহি কর, কি আশঙ্কা তব ?
ইন্দ্র নাহি হেথা, সতি, তব ধব
বাসব-অভাবে অমর প্রায় !"
হেথা রুদ্রপীড় গর্জ্জিছে ভীষণ,
সমর-প্রাঙ্গণে, দেবরথিগণ
দূর হ'তে তায় কৈলা দরশন ;—
কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, বরুণ, পবন,
দেখিলা অগ্নির শতাঙ্গ-ধ্বজ।
বুঝিলা তখনই পূর্ব্বদ্বারে রণ
হইলা কিরূপ ; জয়ন্ত তখন
অশ্বিনীকুমারে কুবেরে অনলে
সংহতি লইয়া আইলা সে স্থলে
বিবরিলা রণ-বারতা যত।
সুররথিগণ শুনি চিন্তাকুল—
বৃত্র, বৃত্রসুত করিলা আকুল
অমর-সেনানী ; কিরূপে উদ্ধার
সে দোঁহার হাতে হইবে আবার,
পিতাপুত্র দোঁহে অজেয় রণে।
কহিলা ভাস্কর—"শুন দেবগণ,
বিনা ইন্দ্র যদি সমরে নিধন
না হবে ইহারা,—কি হেতু হে তবে
এ দারুণ ক্লেশ, এ ঘোর আহবে ?
ইন্দ্র লাগি সবে বিরত হও।
নতুবা যদ্যপি রাখ মম কথা,
করহ সমর ধরি অন্য প্রথা,
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ, বাহন, স্যন্দন,
নিজ নিজ তেজে করহ ধারণ
প্রলয়ের মূর্ত্তি যেরূপ যার !
দ্বাদশ প্রচণ্ড রূপে জ্বলি আমি,
জ্বলুন কালাগ্নি-বেশে বহ্নিস্বামী,
প্রলয়-প্লাবন ছুটান বারীশ,
পবন উড়ান ঝড়ে দশ দিশ,
দেখি কি না দৈত্য-নিধন হয়।'
সূর্য্য-বাক্যে বায়ু ছুটিতে উদ্যত,
সিন্ধুপতি তারে করিলা বিরত,
কহিলা "কি কহ, ওহে প্রভাকর,
দনুজে নাশিতে তেজঃ বিশ্বহর
প্রকাশি, ব্রহ্মাণ্ড করিবে লয় ?
নাশিবে নিখিল পরাণীর প্রাণ
নাশিতে দুজনে ? করিবে শ্মশান
বিশ্ব-চরাচর ? কহ কি উচিত
দেবের এ কাজ ?"
"না জানি কি হিত,
জানি দেহ দগ্ধ" কহিলা রবি।
হেনকালে শূন্যে ভৈরব-নির্ঘোষ
কোদণ্ডটঙ্কারে—যুড়ি শত ক্রোশ
ঘন সিংহনাদে পুরে শূন্য দূর,
ঘন সিংহনাদে পুরে সুরপুর,
অমর দানব শূন্যেতে চায়,
দেখে—ইন্দ্রধনু গগন যুড়িয়া
শোভে মেঘশিরে দুলিয়া দুলিয়া,
নামে ধীরে ধীরে দেব আখণ্ডল,
মস্তক বেড়িয়া কিরণমণ্ডল,
চির-পরিচিত সুনীল তনু।
পরশিলা ইন্দ্র অমরা আবার,
কত কল্প পরে, করিতে সংহার
বৃত্র মহাসুর, দিলা আলিঙ্গন
সুররথিগণে পুলকিত মন,
দেব শচীপতি অমরনাথ।

হবে সিংহনাদ দেবসৈন্যদলে,
অমরনগরী শুদ্ধ কোলাহলে ;
সহর্ষ বদন চাহিয়া চপলা
কহে শচী "সখি, গেল চিত্তমলা,
জুড়াল হৃদয়, নয়ন মন।"

বলি, অকস্মাৎ চাহি ইন্দুবালা
মলিন-বদনে, শচী শিহরিলা ;
স-অশ্রু নয়ন ফিরায়ে তখন,
চপলার সনে বিবিধ কথন
কহিতে লাগিলা সুরেশ-রামা

একবিংশ সর্গ

কৈলাসে নগেন্দ্রবালা জানিলা যখন
পুরন্দরজায়া শচী-বক্ষঃ লক্ষ্য করি
ঐন্দ্রিলা তুলিলা পদ,— দলিলা চরণে
পৌলোমীর প্রতিবিম্ব চারু আভাময়
কিরণে অঙ্কিত স্বর্গ-মনঃশিলাতলে,
বাষ্পবিন্দু নেত্রকোণে, জয়ারে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা মহামায়া মৃদুস্বরে ;—
"জয়া রে, কি হেতু বল্ জগতীমণ্ডলে
পর-চিত্তে পীড়া দিতে প্রাণিবৃন্দ হেন
তিলার্ধ না ভাবে দুখ, না চিন্তে মানসে
কি দারুণ ব্যথা প্রাণে তার, পর-দত্তে
পীড়িত যে জন! হায়, সখি, মনস্তাপ
কতই এখন ভুঞ্জে শচী—মনস্বিনী
চেতন-রূপিণী, চিন্তাময়ী! শুন জয়া,
হেন চিত্তজ্বালা নিত্য ভুঞ্জে যে পরাণী,
সেই বুঝে নররক্তে কেন নিরন্তর
আর্দ্র-তনু মহীতল ; কি মহা পীড়ন
ত্রিজগতে দম্ভ, দ্বেষ, দর্প, ভুজবলে!
এত দিনে ইন্দ্রজায়া বুঝিল রে জয়া,
বিজিতের হৃদিদাহ কিবা বিষময়!
কি বিষম কালকূট-জ্বালা অধীনতা।
হে সঙ্গিনি, তুমিও সে বুঝিলে এখন
শুভঙ্করী নাম ধরি কেন কালে কালে
করাল কালিকা-রূপে আবির্ভূতা উমা।"
কহিতে কহিতে চিত্তে ঈষৎ চঞ্চল,

কহিলেন ক্রোধস্বরে মহাকাল-জায়া
জীবদম্ভ-সংহারিণী—"এ দম্ভ তাহার
থাকিত কি এতক্ষণ? দানবী ঐন্দ্রিলা
এই দণ্ডে জানিত সে ভীম-ভামিনীর
বীর্য্য কিবা! চণ্ডবিলাসিনী চণ্ডীরোষ।
রে ভৈরবি, কি কব সে ইন্দ্রে অগৌরব
আমি যদি বৃত্রে বধি দণ্ডি সে বামারে।"
এত কহি, ভবানী ভাবিয়া ক্ষণকাল
ত্যজিয়া কৈলাসপুরী শূন্যে প্রবেশিলা ;
বিশ্ব-মধ্য-কেন্দ্রমাঝে যথা ব্রহ্মলোক
উত্তরিলা ব্রহ্মময়ী ইরম্মদগতি।
দেখিলা সে মহাশূন্যে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি,
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা—শোভাময়
অদ্ভুত আলোকে! নীল অনন্তের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভানুর হিল্লোল,
বিবিধ সুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া!
দেখিলা ভৈরব-কান্তা সে বিশ্ব-প্রদেশে,
কর্ব্বুর, দানব, কিংবা সিদ্ধ, দেবযোনি,
ব্যোমচর প্রাণী যেবা আইসে সেখানে,
ভ্রমে ভুলি শূন্যপথ, প্রণমি তখনি
যায় দূরে, উচ্চেতে উচ্চারি ধাতা-নাম,
ভক্তি-পুলকিত কলেবর! চারি দিকে
ঘেরি সে মহামণ্ডল—কিরণপূরিত—
পার্শ্ব নিম্ন ঊর্দ্ধদেশে অপূর্ব্ব মূরতি

নবীন ব্রহ্মাণ্ডরাজি সতত নির্গত!
দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে
সে ব্রহ্মাণ্ডকুল-গতি অকুল শূন্যেতে,
কত দিকে কতরূপে, কত শোভাময়।
ভেদি সে ভানুমণ্ডল, প্রবেশিলা সতী,
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক-মধ্যভাগে।
দেখিলা সেখানে, সীমাশূন্য মহাসিন্ধু-
সদৃশ বিস্তার – স্রোত-পারাবার ঘোর;
তরঙ্গিত সদা—ঘূর্ণ্যমান উর্ম্মিরাশি
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে
বিধাতার আসন ঘেরিয়া। নিরাকার,
নির্ঘ্রাণ নির্জ্যোতিঃ, আভাহীন, তাপশূন্য
সে স্রোতঃ উর্ম্মির সিন্ধু;
উর্দ্ধদেশে তার
বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার;
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,
অচিন্ত্য কবি-কল্পনে—সে বাষ্পমণ্ডলী,
আবর্ত্ত-ভিতরে কোটি আবর্ত্ত যেন বা!
জনমি তাহায় মৃদু আলোক-মণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত তনু—কেন্দ্র আভাময়;
আভাময় সূক্ষ্মতর তরল কিরণ
সে কেন্দ্রের চারিধারে; দূরতর যত,
তত গাঢ়তর দৃঢ় পরমাণুব্রজ—
বায়ু, বহ্নি, বারি, ধাতু মৃৎপিণ্ডরূপে।
ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ড-কলাপ
সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র-আকারে
নানা বর্ণ, নানা কায়—অপূর্ব্ব নিনাদে
পুরিয়া অম্বরদেশ; কোথাও ফুটিছে
মনোহরা মনুজ-ভুবন মোহময়!
বিরাজে সে উর্ম্মিময় অকুল-অর্ণবে
বিধির সৃজনাসন—অচিন্ত্য নিগমে!
চারিধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর
ছুটিছে তরঙ্গমালা, লুটিতে লুটিতে
উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে;
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি
খেলিছে আসন-পার্শ্বে; বিধি-পদাম্বুজ
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা
সে অপূর্ব্ব স্রোতঃমালা জীবন-মণ্ডিত,
পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর—
পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃরেখা অঙ্গে পরকাশ!
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে
সে জীব-আত্মা-মণ্ডলী, হেরেন হরষে
সৃষ্টির ললাম শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,
দেব-নর-প্রাণিদেহে স্নেহ সুখাধার!
বিরিঞ্চি কারণসিন্ধু গর্ভে হেন রূপে
গঠিছেন কত প্রাণী সকৌতুক মনে।
নবীন জীবনাস্বাদে মুগ্ধ জীবকুল
ভুঞ্জিছে অভূতপূর্ব্ব কতই উল্লাস!—
সে মুহূর্ত্ত সুখ! আহা, কে পারে বর্ণিতে,
কে পারে চিন্তিতে, হায়! আভাস তাহার
(দীপভাতি যথা সূর্য্য-কিরণ-আভাস)
ভাব মনে, হে ভাবুক, শিশুর উল্লাস,
যবে পয়ঃসিক্ত তুণ্ডে, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে,
ধরি জননীর কণ্ঠ হাসে চিত্ত-সুখে,
প্রকাশি পীযুষপূর্ণ স্নেহ-ফুল্লাননে!
এ হেন আনন্দরসে হইয়া বিহ্বল
প্রথমে যখন, হেরে সে প্রাণিমণ্ডলী
স্রোতগর্ভ অর্ণবের উর্ম্মিকুল-ক্রীড়া
হেরে শূন্যে বায়ু, বাষ্প, বিদ্যুৎ, আলোক-
সৃজন-লীলা অদ্ভুত, তখনি সভয়ে
শুষ্ক, শীর্ণ পুষ্পপ্রায় মুদ্রিত নয়ন,
ধায় বিধাতার অঙ্কে ভয়ে লুকাইতে,
ধায় ভয়ে শিশু যথা জননীর কোলে!
পশি বিধাতার ক্রোড়ে যখনি আবার
হেরে সে করুণাপূর্ণ নির্ম্মল আনন,
তখনি নির্ভয় পুনঃ—পাশরি সকলি,
তখনি আপনা হৈতে চিত্তের উচ্ছ্বাস

সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে বহে অপূর্ব্ব-ধ্বনিতে !
অপূর্ব্ব ধ্বনিতে উচ্চে পরব্রহ্মনাম
ডাকিতে ডাকিতে উঠে যে যার ভুবনে,
জগৎ-সীমন্ত-রত্ন জীবরূপ ধরি।
আনন্দে আনন্দময়ী কারণ-সিন্ধুতে
হেরিলা কতই হেন সৃজনের লীলা,
পুঞ্জ পুঞ্জ জড়, জীব, ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ,
সূর্য্য, তারা, শশধর, স্বর্গ, রসাতল,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি—অপূর্ব্ব দেখিতে !
দেখিতে দেখিতে সুখে শঙ্কর-মোহিনী
চলিলেন ধীরগতি—দাঁড়াইলা আসি
বিপুল কারণ-সিন্ধুতটে মহামায়া।
সহসা উদিল ছটা—অতুল শোভায়
উজলি মহা অর্ণব। হেরি সে কিরণ,
সবিস্ময়ে পদ্মযোনি উন্মীলি নয়ন
চাহিলা, যে দিকে চারু শোভার উদয়।
সম্ভ্রমে আইলা কাছে শঙ্করী হেরিয়া।
সম্ভাষি সুমিষ্ট স্বরে সুরজ্যেষ্ঠ বিধি
জিজ্ঞাসিলা "কি বারতা হে ত্র্যম্বকজায়া
কি কারণ গতি এথা? কোথা বিশ্বনাথ?
কি হেতু বিধিরে আজি হেন অনুকূল?"
"হে বিরিঞ্চি, তুমি ভিন্ন" কহিলা অম্বিকা,
"দেবকুলকন্যা-মান কে রাখিবে আর?
ভয়ে নারি কহিতে মহেশে এ সম্বাদ;
শুনি পাছে করেন প্রলয় বামদেব।
দুষ্ট বৃত্রাসুর জায়া দানবী দাম্ভিকা
তুলিলা হানিতে পদ শচী-বক্ষস্থলে,
হে কমলযোনি, ব্যথিলা শচীর হৃদি;
কে আর হে তবে পরচিত্তে পীড়া দিতে
হইবে শঙ্কিত, ইন্দ্রজায়া পৌলোমীর
এ দশা যদ্যপি? দর্প চূর্ণ কর, দেব,
দনুজবামার অচিরাৎ—কর বিধি,
হে বিধাতঃ, বৃত্র-বধ যাহে; বধি তারে
দানবীর দৌরাত্ম্য ঘুচাও স্বর্গধামে,
ঘুচাও, হে পদ্মাসন, উমা-মনস্তাপ!"
বিরিঞ্চি উমার বাক্যে চিন্তি কতক্ষণ,
নগেন্দ্রনন্দিনী-সঙ্গে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে
গেলা যথা রমাপতি; মাধব-সংহতি
ফিরিলা সত্বরে পুনঃ ভুবন কৈলাসে।
বসিয়া ভবানীপতি, ভাবে নিমগন,
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি চারিধারে,
হেরিছেন কুতূহলী যোগীন্দ্র মহেশ
ধ্বংসের অপূর্ব্ব গতি!—বিশ্বচরাচরে,
কতরূপে কত জীব, কত জড়তনু,
মুহূর্ত্তে হইছে লীন। নিগূঢ় রহস্য—
নিসর্গ বন্ধন-সূত্র-ছেদন-প্রণালী!
বোধাতীত, চিন্তাতীত, অতীত কল্পনা—
জড় জীব-ধ্বংসগতি! কাল-সংগঠন!
কিবা সূক্ষ্মতর ক্ষুদ্র সূত্রেতে জড়িত
জীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ, প্রতাপ!
কি সূক্ষ্ম মিলন বিশ্ব-চরাচর মাঝে
অচেতনে সচেতনে—ভূলোকে দ্যুলোকে!
প্রাণিকুলে, জড়জীবে, আত্মায় শরীরে!
কিবা মনোহর ক্ষুদ্র শৃঙ্খল-মালায়
জড়িত ব্রহ্মাণ্ড-বপুঃ! কেশাগ্র সদৃশ
সূত্রের রেখায় বদ্ধ আত্মা, মন, দেহ।
শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বিকল;
দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কৌতুকে
সে লয় প্রলয়-রঙ্গ ভুবনে ভুবনে।
দেখিছেন যোগিবর কালের প্রভাবে
জীবব্রজ কত মর্ত্তে সৃষ্টি-শোভাকর,
জীবমূর্ত্তি পরিহরি, হতেছে বিলীন
গভীর কালের গর্ভে! কত জ্ঞানদীপ
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ক্ষণে ক্ষণে
নিবিছে—ডুবিছে ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে,
সুষমা কতই রূপ, কতই জগতে
হতেছে কলঙ্কময়—অচিহ্ন কোথাও
অসীম লাবণ্যরাশি চক্ষের নিমিষে!

চতুর্দ্দশ লোকমাঝে আত্মা সুবিমল
নির্ব্বাণ নক্ষত্রপ্রায় জ্যোতিঃ হারাইয়া
পড়িতেছে কত দিকে কত শত, হায়,
পাপপঙ্ক-পরিপূর্ণ অন্ধতম কূপে—
পুড়িতে সন্তাপ-তাপে। দেখিছেন দেব
সে সবার অধোগতি ব্যথিত অন্তরে,—
যথা নরচিত্ত হেরি সূর্য্যের মণ্ডল—
রাহুর গভীর গ্রাসে যবে প্রভাকর!
কোন (ও) বা অবনী, এই প্রাণিপুঞ্জময়
উদ্ভিদ্-লতায় সুশোভিতা, ক্ষণপরে
হইছে পাষাণপিণ্ড মণ্ডিত হিমানী—
প্রাণিশূন্য তুষারের মরু ভয়ঙ্কর!
কোথাও আবার কোনও বিপুল জগৎ
বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ—রেণুর আকারে
মিশিতেছে শূন্যদেশে। কত জনপদ
উন্নতি সোপান ছাড়ি ডুবিছে কালেতে
অচিহ্ন হইয়া ভবে চিরদিন তরে!
দেখেন কোথাও কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
ভীষণ প্রলয়-রঙ্গ—জীব, জড় যত,
উদ্ভিদ্, ভূধর, বারি, ভূমণ্ডল, বায়ু;
কালানলে দগ্ধীভূত শূন্যেতে লুকায়
অণুরূপে ব্যোমগর্ভে—শূন্যময় করি
সে ধরামণ্ডল ধাম; কোথাও আবার
দেখিছেন ভূতনাথ যুগ-বিপর্য্যয়—
দুর্জ্জয় প্লাবনে মগ্ন বিশাল ধরণী,
পশু, পক্ষী, নরকুল অদৃশ্য সকলি,
ভ্রমিছে বিমানমার্গে; ডাকিছে পবন
ভীষণ প্রবল শব্দে মিশি সে প্লাবনে।
সে ঘোর প্লাবনে বিশ্ব-ভুবন চকিত;
এইরূপ লয়প্রথা ভুবনে ভুবনে
কি দেব-মানব-বাস; কিবা সিদ্ধধামে,
দেখিছেন যোগীন্দ্র নিমগ্ন গাঢ় ভাবে;
মৃদুতর কখন(ও) ঈষৎ হাস্য মুখে।
হেনকালে মুরহর, স্বয়ম্ভু, ভবানী,
দাঁড়াইলা ব্যোমকেশ শঙ্করে সম্ভাষি;
সদানন্দ মহানন্দে কৈলা আলিঙ্গন
কেশব, হিরণ্যগর্ভে—উমারে চাহিয়া
তুষিলেন আশুতোষ মধুর হাসিতে;
মাধব তখন—সদা প্রিয়ম্বদ দেব—
গম্ভীর বচনে শুনাইলা বিশ্বনাথে
সকল বারতা—শুনাইলা শচীদুঃখ,
শুনাইলা শিবে অম্বিকার মনস্তাপ।
শুনিতে শুনিতে জটা ধূর্জ্জটি-মস্তকে
কাঁপিতে লাগিল ধীরে—ললাট-ফলকে
শশধর খরতর আভা প্রকাশিল।
মহাকাল-ক্রোধমূর্ত্তি উদয় দেখিয়া
সান্ত্বনিলা হৃষীকেশ সত্বর শঙ্করে।
বিষ্ণুর বচনে মৃত্যুঞ্জয়ী মহেশ্বর
কহিলেন "হে মাধব, উমার বাসনা
পূর্ণ কর এই দণ্ডে—হে কমলযোনি,
কর যাহে বৃত্রাসুর নাহি জীয়ে আর,
জানি আমি আমার(ই) বরেতে স্পর্দ্ধা তার,
কিন্তু কহ শুনি, কেশব কৈটভহারি,
স্বয়ম্ভূ বিধাতা, কেবা সে নহ তোমরা
ভক্তির অধীন সদা—যথা ভক্তাধীন
ভ্রান্তমতি আশুতোষ? ভ্রান্তি যদি তায়
এই দণ্ডে সেই ভ্রান্তি ঘুচাতে বাসনা
দনুজের অদৃষ্ট খণ্ডিয়া; হের ইন্দ্র
সসজ্জ সমরক্ষেত্রে; বজ্রপ্রহরণ
নির্ম্মাইলা বিশ্বকর্ম্মা, দিলা তোমা দোঁহে
নিজ নিজ তেজঃ অস্ত্রে অব্যর্থ করিয়া;
একমাত্র অন্তরায়—অস্ত নহে আজ (ও)
বিধাতার দিনমান—সে ব্যথা ঘুচাও
অকালে অসুরে নাশি, হে বিধি, কেশব!
আপনার কর্ম্মদোষে মজে যে আপনি,
কে রক্ষিতে পারে তারে?" বলি শূলপাণি
ভকত-বৎসল দেব বৃত্রে ভাবি মনে
ত্যজিয়া গভীর শ্বাস, বসিলা নীরবে।

হেরি মহেশের মূর্ত্তি দেব চক্রপাণি,
মন্ত্রণা করিয়া ক্ষণকাল ব্রহ্মাসহ,
উত্তরিলা মহেশ্বরে—"হে অন্তকহারি;
কর্ম্মফলে প্রাণিবৃন্দে উন্নতি, পতন,
স্বতঃ পরিবর্ত্তশীল প্রাক্তন-প্রভাব!
তথাপি উমেশ, উমা-অনুরোধে আমি,
দেবপ্রজাপতি বৃত্র-ভাগ্যলিপি-নাশে
হইনু সম্মত!" বলি, লুকাইলা তনু;
লুকাইলা প্রজাপতি মূর্ত্তি ক্ষণকাল;
অতনু হইলা মহাদেব;—তিন গুণ
একত্রে মিলিয়া অকস্মাৎ, প্রকাশিলা
পরব্রহ্মরূপ নিরুপম!—অতুলিত
শোভাপূর্ণ কৈলাসভুবন ক্ষণমাঝে।
ক্ষণমাঝে ঘোরশূন্যে হৈল ঘোরধ্বনি—
"বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত।"
হেথা ভাগ্যদেব গাঢ় চিন্তা-নিমজ্জিত;
বসিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রান্তে, বিস্তৃত সম্মুখে
বিশাল প্রাক্তন-লিপি—দৃশ্য মনোহর।
ছায়া-ইন্দ্রজালে যথা ধূর্ত্ত যাদুকর
দেখায় অদ্ভুত-রঙ্গ—অদ্ভুত তেমতি
অনন্ত আলেখ্য অঙ্গে ক্রীড়া নিরন্তর!
কোনখানে ভূমণ্ডল-বিজয়ী বীরেশ
ছুটে চতুরঙ্গ দলে পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া,
আবার মুহূর্ত্তকালে সে বীর কেশরী
মরুভূমে পদব্রজে ভ্রমে চিন্তাকুল!
এই রাজ-অভিষেক;—আনন্দ হিল্লোল
খেলিছে ধরণী-অঙ্গে, প্রবাহে প্রবাহে
কত গজ, তুরঙ্গম, কত প্রাণিকুল
সুসজ্জ প্রাঙ্গণমাঝে! তখনি আবার
আলেখ্যে শ্মশানছায়া ভয়ঙ্কর বেশ।
রাজতনু চিতা'পরে, অপত্য, বান্ধব,
বাষ্পাকুলনেত্রে ঘেরি শবে। ক্ষণকালে
চিতা-পার্শ্বে কোথা আচম্বিতে অট্টালিকা
সুসজ্জিত—রঞ্জিত বসনাবৃত চারু—
বিবাহমণ্ডপে সুখে দম্পতি আসীন!
মুহূর্ত্তে আবার, মৃত পতি কোলে করি
কাঁদিছে যুবতী, ছিন্নভিন্ন কেশবেশ;
বসন-ভূষণ বিলুণ্ঠিত। ক্ষণে ক্ষণে
কতই যুবক আহা, ভূষিত সুষমা,
প্রতি অঙ্গে সুখে যেন স্বাস্থ্য মূর্ত্তিমান—
হারাইছে সে লাবণ্য—যৌবনে স্থবির!
যৌবনে উচ্ছিন্ন কত রামারূপরাশি!
কোন চিত্র, ঊর্ণনাভজাল-পূর্ণ এই;
উজ্জ্বল নিমেষমধ্যে! কোন
দীপ্ত ছবি
প্রভান্বিত নিরন্তর—সহসা মলিন!
কোন সে আলেখ্য-দৃশ্য—দারিদ্র্য-প্রতিমা
মূর্ত্তিমান এই যেন—দেখিতে দেখিতে
মনোহর চারুবেশ মণি, মরকত-
ময় রত্ন-সুশোভিত! কত পর্ণশালা
ধরিছে সুহর্ম্ম্যরূপ চক্ষের পলকে!
কত সে আবার দিব্য স্বর্ণ অট্টালিকা
ধরিছে কুটীর-বেশ, কালের কালিমা,
তৃণ, গুল্ম, লতা আচ্ছাদিত কলেবর!
মিশাইছে কত চিত্র ফুটিতে ফুটিতে
যথা তরু-শৈলকুল! প্রভাত-কুহেলি
আবরিলে মহীদেহ মিহিরে লুকায়ে!
কত দৃশ্য মিলাইছে চিরদিন তরে!
এইরূপে জগতের যে কোন প্রদেশে
কালধর্ম্মে, কর্ম্মাকর্ম্মে, সুযোগে, কুযোগে,
ঘটিছে যখন যাহা সুগতি, অগতি;
কিবা জীব, কিবা জড়, কি উদ্ভিদকুলে।
তখনি সে চিত্রপটে, নিত্য ক্রীড়াময়,
অঙ্কিত হইছে তাহা;—নিমগ্ন মানসে
দেখিছেন ভাগ্যদেব নিশ্চল নয়নে।
বৃত্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্য'পরে
কত শোভা-বিভূষিত, কত আভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল মূর্ত্তি—প্রদীপ্ত ছটায়
ত্রিভুবন প্রজ্বলিত!—হেরিছেন ভাগ্য
কুতূহলে! হেনকালে অম্বর বিদারি

ধ্বনিল ভৈরব ধ্বনি—আকাশবাণীতে
প্রকাশিয়া ব্রহ্মরূপী ত্রিমূর্ত্তি-আদেশ।
সভয়ে প্রাক্তন শীঘ্র ফিরায়ে নয়ন
নিরখিলা চিত্রপটে,—দেখিলা সহসা
বৃত্রের বিশাল চিত্র, কালিমামণ্ডিত,
মিশাইছে ধীরে ধীরে, শোভা-বিরহিত

দ্বাবিংশ সর্গ

বসিয়া অসুর পার্শ্বে অসুর-ভামিনী ;
নবীন নীরদরাশি,
লুকায়ে বিজুলি হাসি,
বুকে ইন্দ্রধনু-রেখা, ঢাকিয়া মিহির,
পরশি ভূধর-অঙ্গ রহে যেন স্থির !
যেন ঢল ঢল জলে নীলোৎপলদল,
প্রসারিত নেত্রদ্বয়,
দৈত্যমুখে চাহি রয়,
নিস্পন্দ শরীর; ধীর, গম্ভীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন।
দেখিয়া দনুজনাথ সে মুখের ভাব
বিস্ময় ভাবিয়া মনে,
কর ধরি সযতনে
করতলে চাপি ধীরে মধুর উল্লাসে,
কহিলা উৎসাহপূর্ণ মৃদুল সম্ভাষে ;—
"এ কি হেরি দৈত্যরাণি, যামিনী উদয়
এ সুখ-মধ্যাহ্নকালে ?
রুদ্রপীড় শরজালে
নির্দেব করিলা পুরী অনলে জিনিয়া,
পরিলা অতুল যশঃকিরীট মণ্ডিয়া,
পলাইলা সুরসেনা শিবা যেন ভয়ে ;
জয়ন্ত শশকপ্রায়
রথ লয়ে বেগে ধায়,
পালটি না ফিরে চায় ; দৈত্যের তাড়নে,
অমরার প্রান্তে দেব ভাবে ক্ষুণ্ণ মনে ;
ভাসে অসুরের দল আনন্দ উৎসাহে ;
পুত্রের সুযশঃগান,
ত্রিভুবনে দৈত্যমান,
আজি প্রভাবিত কত !—সার্থক জীবন,
আজি সে সফল প্রিয়ে, সফল সাধন !
হেন পুত্রে গর্ভে ধরি, এ সুখের দিনে
চিত্তে নাই সুখোচ্ছ্বাস,
মুখে নাই প্রীতিভাষ,
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গল-কামনা ;
এ ভাবে মনের খেদে কেন হে বিমনা ?
হের দেখ করতলে ধনেশভাণ্ডার !
ঘোষিতে পুত্রের জয়,
কর যাহা চিত্তে লয়,
ভাসাও ত্রিদশালয় উৎসব-হিল্লোলে,
এ দিন কখন (ও) যেন কেহ নাহি ভুলে
কি অভাবে মনোদুঃখে, দনুজমহিষি ?
কি নাহি করিতে দান,
কিবা স্থান, কিবা মান,
কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পুরাতে—
কোন্ রাজসিংহাসনে কাহারে বসাতে ?
আজন্ম দরিদ্র যেবা দনুজের কুলে
সে-ও আজি আশাবান্
আশায় জুড়ায় প্রাণ,
স্বপনে কল্পনা করি অসাধ্য কামনা।
ইচ্ছাময়ী ঐন্দ্রিলা হে মলিন-বদনা ?
জননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাণ—
কে কোথা বিস্মৃতি-জলে,
ভাসায়ে, হৃদয়-তলে,
বিষাদে আশ্রয় দিলে, কি হেন ভাবনা ?
ঐন্দ্রিলে, চিত্তের বেগে ভুলিলে আপনা।

উত্তরিলা দৈত্যরাজ-মহিষী তখন ;—
"খলের চাতুরী মায়া,
বহুরূপী দেহচ্ছায়া,
ধরে কত রূপ তাহা, কে বুঝিতে পারে ?
রমণীর চাতুরীতে রমাপতি হারে !—"
উত্তরিলা—"হে দনুজকুল-অধীশ্বর,
অভাগা যখন যার,
তখনি অদৃষ্টে তার,
কত যে লাঞ্ছনা ভোগ কে বর্ণিতে পারে !
নহিলে নির্দয় হেন কেন হে আমারে ?
ঐন্দ্রিলা পাষাণ-প্রাণ !—তনয়ে ভুলিলা ?
আপনার তুচ্ছ জ্বালা,
ভেবে, মুখ করি কালা,
আইলা পতির কাছে ? হে হৃদয়নাথ ;
হৃদয় ব্যথিতে আর পেলে না আঘাত ?
কবে সে কঠিন হেন দেখেছ আমায় ?
কারে বধিয়াছি প্রাণে,
কাহার জীবন-দানে
নিদয়া হইয়া তোমা কৈনু নিবারণ ?
কি দেখিলে কবে বল নিষ্ঠুর তেমন ?
হায়, ঐন্দ্রিলার হেলা তনয়ের প্রতি,
ধিক্ ঐন্দ্রিলার নামে,
এই ছিল পরিণামে,
শুনিতে হইল তারে এ পুরুষ-বাণী !
পতির বদনে, হায় ! ধিক রে পরাণী !
কারে জানাইব আর মনের বেদনা ?
জন্মকাল যাঁর সনে,
নিদ্রাহার একাসনে,
তিনিই আমারে যদি ভাবিলা এমন,
কি জানাব কে জানিবে মনের যাতন !
থাক, হে দনুজ-নাথ তনয়-বৎসল,
কর ভোগ একা সুখে,
যে খেদ আমার বুকে,
থাকুক তেমতি, দুখে পুড়ুক পরাণী !
থাক সুখে দয়াময়—চলিল পাষাণী।"
বলি ভাক্ত ক্রোধে বামা উঠি দাঁড়াইল ;
কত অনুরোধ করি,
কত যত্নে করে ধরি,
বসাইলা মহিষীরে নিকটে আবার,
ঘুচাইলা কত যত্নে চিত্তের বিকার।
কহিলা তখন রামা মধুর কপটে ;—
"হে বীর সমরপ্রিয়,
রণক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
জান তুমি শুধু রণ-রঙ্গ-ক্রীড়া যত ;
তুমি কি জানিবে কহ বামা স্নেহ কত ?
কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয় ?
সন্তানের মমতায়,
কত ব্যথা চিন্তা তায়,
কত দিকে ধায় চিত্ত ? হে দৈত্যভূষণ,
পুরুষ বুঝে কি কভু রমণীর মন ?
বিজয়-উল্লাসে এবে তুমি সে উন্মাদ,
ভাবিছে আমার মন,
পুত্রে দিয়া দরশন
দেখাব কিরূপে তারে এ বদন ছার—
পাপীয়সী-কোলে যবে বসিবে কুমার।
সুধিবে যখন 'মাতা, ইন্দুবালা কোথা ?
দিয়াছিনু তব করে,
পালিতে সোহাগভরে,
কোথা সে স্নেহের লতা রাখিলে আমার ?'
কি ব'লে হৃদয়ে শেল বিঁধিব তাহার ?
হারায়েছি, দৈত্যনাথ, পুত্রের মাণিক,
হারায়েছি হৃদয়েশ,
অঞ্চলের নিধি শেষ,
দনুজেন্দ্র, হারায়েছি, 'সুশীলা' তোমার ;
ইন্দুবালা বিনা এবে পুরী অন্ধকার।"
বলি বাষ্পাকুলনেত্র হইল নীরব !
অচল নগেন্দ্র প্রায়,
দৈত্যপতি শুষ্ক-কায়,

চাহি ঐন্দ্রিলার মুখ থাকি কতক্ষণ,
ছাড়িলা অরণ্য-শ্বাসে গভীর নিস্বন।
"কি কহিলা ঐন্দ্রিলা" বলিলা গাঢ় স্বরে,
"ইন্দুবালা নাই মম,
সে সুধাংশু নিরুপম,
ডুবেছে কি অস্তাচলে? পাব না
কি আর
দেখিতে সে নিরমল পীযুষ-আধার?
আর কি সে স্নেহময়ী সরলার কথা
হৃদয় শীতল করি,
চিন্তার উত্তাপ হরি,
জুড়াবে না এ শ্রবণ—জুড়াত যেমন
নিন্দিয়া বীণার ধ্বনি ঝরিত যখন?
না ঐন্দ্রিলে, নিধনের নহে সে প্রতিমা—
হরিতে সে সুষমায়,
কৃতান্ত কাঁদিবে, হায়!
চিরায়ু সে ইন্দুবালা অক্ষয় রতন;—
বিজয়ী বীরের যশ চিরায়ু যেমন!"
"হেন অমঙ্গল কথা, হে দনুজপতি!
কি হেতু আন হে মুখে,"
ঐন্দ্রিলা কৃত্রিম দুখে
কহিলা বিমর্ষভাবে চাহি দৈত্যপানে,
"এ বেদনা কেন দাও দুখিনীর প্রাণে?
চির-আয়ুষ্মতী হ'ক বধূ সে আমার!
চিরায়তি থাক্ তার,
পরশে না যেন তার
কেশের শতাংশ ভাগ শমন দুর্ম্মতি!
হে নাথ, শমন হৈতে নিদারুণ অতি।
ইন্দ্রের কামিনী শচী—সাপিনী কুটিলা;
কপটে ছলিলা, হায়,
শিশুমতি বালিকায়,
সাধিতে নারিল যাহা দেবতারা বলে;
সুসিদ্ধ করিল তাহা কুহকীর ছলে!
হা ধিক্ ঐন্দ্রিলা-প্রাণে—ধিক্ দৈত্যরাজ,
তোমার কুলের বধূ,
ভুলি দৈত্যস্নেহ-মধু,
ভুলি কুল-মান-গর্ব্ব হেলিয়া সকল,
আশ্রয় করিলা কি না শচী-পদতল!
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, দনুজকেশরি,
শচী আনিবারে যাই,
হতভাগ্যে পোড়া ছাই,
নিরখিনু ইন্দুবালা সেবে শচীপদ!—
ব্রহ্মাণ্ডে রহিল, নাথ, এ কলঙ্ক-হ্রদ!
অসহ্য হৃদয়বেগ না পারি ধরিতে
শচীরে গঞ্জনা দিয়া,
বধূরে আনিতে গিয়া,
ঘটিল যা ছিল শেষ কপালে আমার,—
যেমন দুরাশা হায়, পুরস্কার তার!
বলি নাই, ভাবি নাই, চাহি না বলিতে
সে দুঃখের কথা কভু,
সহিতে হইল প্রভু,
স্বর্গজয়ি-জায়া হয়ে শচী-পদাঘাত।
সে দুঃখ 'পাষাণ'-প্রাণে সহেছি হে নাথ।
সহিতে না পারি কিন্তু এ অখ্যাতি তব;
স্বামীর কুখ্যাতি যায়,
নারীর কলঙ্ক তায়,
ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘুচাব কেমনে—
ইন্দুবালা পড়ে মনে জাগ্রতে স্বপনে।
চল, দেখাইব চল, স্বচক্ষে দেখিবে,
বুঝিবে সে কি কারণ,
দহে 'পাষাণী'র মন,
কেন এ সুখের দিনে হয়েছি হতাশ!
নারীর বচনে, নাথ, কি কাজ বিশ্বাস!"
ঈষৎ কম্পিত নাসা, কুঞ্চিত ললাট,
সঘনে নিশ্বাস ঘন,
আরক্তিম ত্রিনয়ন,
চলিল দনুজপতি দানবী-সংহতি;
চলিল দৈত্যেশ-বামা গর্ব্বিত মূরতি;

ধন্য রে ঐন্দ্রিলা, তোর পণে বলিহারি !
চলেছ নদীর বেগে,
চাপি চিন্তা, চিত্তবেগে,
সাধন করিতে নিজ সাধের মনন ;
জান না হৃদয়ে কভু নিরাশা কেমন।
চলিলা অসুরপতি, মহিষী-সংহতি
উঠিলা প্রাচীর'পরে,
নিরখিলা স্তরে স্তরে,
অকূল সাগর-তুল্য সুরাসুরদল ;
নিরখিলা স্বর্ণময় সুমেরু অচল।
শোভিছে অমরা-প্রান্তে—সহস্র-শিখর
উঠেছে অনন্ত ভেদি,
যেন কল্পনার বেদি,
সুরবিমোহিনী মূর্ত্তি. সাজান(ও) রয়েছে !
নির্ম্মল কিরণমালা সর্ব্বাঙ্গে সেজেছে !
কোন সে শিখরে তার, আহা, কিবা শোভা
ছায়া-কিরণেতে মিলি,
খেলিতেছে ঝিলিমিলি !
দেখায় তর্জ্জনী তুলি দনুজমহিষী—
বসিয়া সুরেশ-কান্তা উজলিছে দিশি ;
পদতলে ইন্দুবালা মলিন-বদনা—
শীর্ণালস কলেবর,
অস্ফুট কুসুম-থর,
মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে বিরস যেমন,
নিশ্চল, অলস, অর্দ্ধমুদিত নয়ন ;
কাছে রতি স্তব্ধমতি, চপলা অচলা,
হেরিছে সমরাঙ্গণে,
মুগ্ধচিত্ত কয়জনে—
চারু চিত্রপটে যেন তুলির লিখন !
নিরখি দনুজরাজ বিস্ময়ে মগন।
বিস্ময়ে মগন দৈত্য কতক্ষণ থাকি
করিল নাসিকা-ধ্বনি,
গরজিল যেন ফণী,
লম্ফ ছাড়ি লম্ফিতে সুমেরু দেহ বাড়ে ;

হেনকালে সুরাসুরে সিংহনাদ ছাড়ে,-
পুরিয়া সমরক্ষেত্র সেনা-কোলাহল
সহসা শূন্যেতে উঠে,
রথ অশ্ব বেগে ছুটে,
করিব্রজ শুণ্ড তুলি গর্জ্জিল ভীষণ,
বাজিল পটহ, ভেরী, দামা, অগণন !
নিমেষে পালটি নেত্র দেখিলা প্রাঙ্গণে,
রুদ্রপীড় রথে রথী,
যেন বিদ্যুতের গতি,
ছুটিছে বাহিনী-অগ্রে, উঠেছে পতাকা.
ভয়ঙ্কর রাহুরূপ কেতু-অঙ্গে আঁকা।
নিরখি ভুলিলা দৈত্য সকল ভাবনা ;
স্থির-নেত্র স্তব্ধবৎ,
একদৃষ্টে চাহি রথ,
দেখিতে লাগিলা বৃত্র অনন্যমানস
রথের তরঙ্গগতি, অশ্বের তরস্।
সমর-আহ্লাদে চিত্ত সদাই বিহ্বল,
তাহে পুত্র যুদ্ধসাজে,
প্রবেশিছে শত্রুমাঝে,
নিরখি অপূর্ব্বভাবে হৃদয় মথিল,
অদ্ভুত আনন্দস্রোত চিত্তে প্রবাহিল ;
দেখিলা অসুর, সুর-মধ্যস্থলে আসি,
স্থির হৈল রথগতি,
অতুল সানন্দমতি,
পুত্রের সমরসজ্জা হেরে বৃত্রাসুর—
রতন-সম্ভবা বিভা উজলিছে ধুর,
শুভ্র সারসের পুচ্ছ মণিগুচ্ছে নত
দুলিছে শীর্ষকে বাঁকা,
অঙ্গত্রাণে অঙ্গ ঢাকা.
হীরকমণ্ডিত অসিমুষ্টি কটিতটে,
সারসনে অসিকোষ দুলিছে দাপটে ;
বক্র ধনুঃ বামকরে ; রথ-অঙ্গে শোভে,
হেমময় নানা তূণ,
নানা বর্ণ ধনুর্গুণ,

শাণিত কৃপাণশ্রেণী, গদা, প্রক্ষেড়ন,
ধনুঃদণ্ড বিবিধ আয়ুধ অগণন !
ধনুঃপৃষ্ঠে করতল, উঠি মহেষ্বাস,
দাঁড়াইলা রথোপরে,
গভীর বিশদ স্বরে,
কহিলা সম্ভাষি সূতে, প্রফুল্ল নয়ন—
"হে সারথি, আজি মম সফল জীবন ;
দুর্জ্জয় ত্রিদশনাথে সমরে সম্ভাষি
পরিব অতুল যশ
উজ্জ্বল করি শিরস্
রাখিব অক্ষয় খ্যাতি অসুরমণ্ডলে,
দেখাব কার্ম্মুক-শিক্ষা সুররথীদলে !
জানি মৃত্যু সুনিশ্চয় বাসবের হাতে,
আজি এ সমরাঙ্গণে,
ত্যজিব অক্ষুব্ধ-মনে
এ দেহ, হে সূতবর—সৌভাগ্য আমার,
ভালে না লিখিলা ভাগ্য অন্য মৃত্যু ছার
ত্রিলোকে-অজেয় ইন্দ্র ত্রিদিবের পতি,
শরক্ষেপ প্রথা যার,
বীর-চক্ষে চমৎকার
তার সনে আজি রণে যুঝিব হরষে,
এ মরণে কার মনে সুখ না পরশে ?
সারথি, মৃত্যুর চিন্তা ঘুচেছে এখন,
আজি সুরাসুরগণ,
দেখিবে অদ্ভুত রণ
দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন,
এক কথা, সারথি হে, রাখিও স্মরণ,—
অন্তিম-শয়নে যবে দেখিবে আমায়,
দেখ(ও) যেন শত্রু কেহ,
রণক্ষেত্রে এই দেহ,
ঘৃণিত চরণে নাহি করে পরশন,
রাক্ষস, পিশাচে যেন না
করে ভক্ষণ।
এই অগ্নিচক্র রথ লভিনু যা রণে,
হারাইয়ে হুতাশনে,
দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বলো—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন !
এই অর্ঘ্য, সূত-শ্রেষ্ঠ, দিলেন জননী,
রক্ষিতে সমরক্ষেত্রে,
তাঁর প্রাণাধিক পুত্রে,
দিও জননীরে পুনঃ বলিও তাঁহায়
মৃত্যুকালে এই অর্ঘ্য ধরিনু মাথায়।
দিও, সূত, এ সারসপুচ্ছ মণিময়,
উজ্জ্বল শীর্ষক 'পরে
আজি যাহা শোভা করে,
দিও ইন্দুবালা-করে, করিতে স্মরণ
উন্মাদিনী প্রেমে যার সুধা আজীবন,
বলো তারে, সারথি হে", বলিতে বলিতে
কপোলে সলিল ধারা
ঝরে হিমবিন্দু ঝারা,
ভাবি সে হৃদয়ময়ী স্নেহের পুতলী ;
ঘনশ্বাসে কণ্ঠরোধ—নীরবিলা বলী ;
বসিলা সমরাসনে ভীম শঙ্খ নাদি,—
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি,
ঘন ঘন ঘন স্বনি,
বাজিল সমরতূরী যুড়িয়া প্রাঙ্গণ ;
দানবের সিংহনাদে কাঁপিল গগন।
হেরি ষড়ানন শীঘ্র সেনা-অগ্রভাগে
আইলা নক্ষত্রগতি,
স্বদল-বিপক্ষ মথি,
দাঁড়াইল শিখিধ্বজ রথ থর থরি ;
উড়িল বিশাল কেতু-শূন্য শোভা করি।
কহিলা উমানন্দন জলদ-গর্জ্জনে,—
মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ সব,
রণতূর্য্য ঘনরব,
রথের ঘর্ঘরশব্দ, হস্তীর গর্জ্জন,
হয়ব্রজ স্তব্ধভাব, উন্নত শ্রবণ ;—

কহিলা জলদস্বনে—"রে দাম্ভিক শিশু,
বহ্নিরে নিবারি রণে,
উন্মত্ত হইলে মনে,
অমর-সেনানী-অগ্রে আ(ই)লে একা রথী,
ভুলিলে শমন-ভয় আরে ছন্নমতি ?
যে শিবিরে আদিতেয় মহারথীগণ,
এক এক জন যার
নিমিষে ব্রহ্মাণ্ড ছার,
বিক্রমে করিতে পারে, অবহেলি তায়,
সমরে পশিলে একা অবোধের প্রায় ?
না চিনিলে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড গ্রহনাথে ?
পবন ভীষণ দেবে ?
সিন্ধু যারে নিত্য সেবে,
আক্রুদ্ধ বরুণ পাশী ? যম দণ্ডধরে ?
ফণীন্দ্র বাসুকি ফণাধর-কুলেশ্বরে ?
ভীম অঙ্গারক কুজ, সৌরি শনৈশ্চর,
বৈনতেয় খগেশ্বর,
নৈঋ‍্ত নৈঋ‍্তধর,
জয়ন্ত বাসবপুত্র অসীম-সাহস,
আমি দেব-সেনাপতি ভবেশ-ঔরস।
এ বীরবৃন্দের মাঝে বল কার সনে
যুঝিবি সাহস করি ?
যুঝিবি রে ধনুঃ ধরি,
দেবের বিক্রম কত দাম্ভিক বালক—
সমুদ্র শোষিতে চাও হইয়া শুষক ?"
"হে পার্ব্বতীসুত" দর্পে উত্তরি তখন,
কহিলা বৃত্রতনয়,
"পাবে শীঘ্র পরিচয়,
শিশু কি প্রাচীন এই অসুর-আত্মজ,
রণে অগ্রসর শীঘ্র হও শিখিধ্বজ ;
কি ফল বিচারি কার সনে করি রণ,
করেছি অলঙ্ঘ্য পণ,
পরাজিব সর্ব্বজন,
নির্দ্দেব করিব স্বর্গ আজি এ সমরে ;
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ব্যাকুলি অমরে ;
যত জন, যেবা ইচ্ছা, হও অগ্রসর,
নহিব বিমুখ আজ,
সাধিতে বীরের কাজ,
আজি সমরের পণ উদ্‌যাপন মম,
ঘুচাব সমরে পশি দেব-চিত্তভ্রম।
ভেটিব সমরাঙ্গণে সুরনাথে আজি,
বীরচক্ষে চমৎকার,
শিঞ্জিনীর ক্রীড়া তাঁর,
দেখিব সে জ্যার ভঙ্গী নাহি চাহি আন,
আশু পূর্ণ কর আশা, ধর ধনুর্ব্বাণ।"
বলি সব্যসাচী বৃত্রসুত ধনুর্ধর,—
লঘু হস্তে খর শর,
ফেলিল শতাঙ্গ'পর,
লক্ষ্য করি বরুণ, পবন, প্রভাকরে,
সেনাপতি শিখিধ্বজ বিন্ধি খর শরে।
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি স্বর্গ কোলাহলি,
বাজিল সমর-শঙ্খ,
ভীরুর প্রাণে আতঙ্ক,
ঝড়গতি চারি রথ ছুটিল সম্মুখে,
উড়িল ধূলির জাল গাঢ় অভ্রমুখে।
চারি কোদণ্ডের ছিলা বধিরি শ্রবণ
ভীমশব্দে একেবারে,
নিনাদিল চারিধারে,
ছুটিল কলম্বকুল তারারাশি হেন ;
ছুটে ঘনঘটা-কোলে তড়িল্লতা যেন।
ছুটিছে নৈঋ‍্ত হ'তে ভাস্করের রথ,
তেজস্কর সাত হয়,
নাসাতে পবন বয়,
ক্ষুরে না পরশে ক্ষণে মনঃশিলা-তল—
ক্রোধিত তপনতেজে স্যন্দন উজ্জল ;
অগ্নিকোণে বরুণের শঙ্খময়-রথ,
ছুটিল মেঘের মন্দ্রে,
ফেনরাশি নাশারন্ধ্রে,

চারি কৃষ্ণ হয় ফেনময় কলেবর,
শতচক্র বায়ুগতি ঘুরিছে ঘর্ঘর ;
ঈশানে পার্ব্বতীসুত-স্যন্দন ভীষণ—
বিশাল কেতন চুড়ে,
উড়িছে আকাশ যুড়ে,
খেলে যেন ইন্দ্রধনু আভা ছড়াইয়া,
অশ্বের তরলগতি তরঙ্গ জিনিয়া !
বায়ুকোণে পবনের শতাঙ্গের খেলা,—
যেন কিরণের রেখা,
যায় কি না যায় দেখা,
ছুটিছে মানসগতি জিনিয়া তরসে,—
কুরঙ্গ-অঙ্কিত কেতু গগন পরশে।
দেখিয়া দনুজসুত সমর-কুশলী—
আজ্ঞা দিলা সারথিরে,
মণ্ডলে মণ্ডলে ফিরে,
বেগে চালাইতে অশ্ব, না হয় যেমন
শরলক্ষ্য ক্ষণকাল ঘোটক, স্যন্দন !
বিজুলির বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল,
চক্রাকারে মহারথ,
অনল স্ফুলিঙ্গবৎ
ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্রপীড় ভীম ধনুঃ ধরি,
কিবা শিক্ষা অদভুত, চারি রথোপরি,
হানিতে লাগিল শর শিলাধারাবৎ,
চক্রাকারে শূন্য'পর,
একে ঘেরি অন্য স্তর
মণ্ডল-আকারে বারি-লহরী যেমন,
ছুটিল তড়িৎগতি বিচিত্র মার্গণ ;
পড়িল ভাস্কর-রথচূড়া আচম্বিতে,
কাঁপিল সূর্য্যস্যন্দন,
শরাঘাতে ঘন ঘন,
বরুণের তুরঙ্গম বাণেতে অস্থির,
ধারাকারে কৃষ্ণ-অঙ্গে ছুটিল রুধির।
অচল বায়ুর রথ—কুরঙ্গ উধাও,
শতখণ্ড ধনুগুর্ণ,
বাণ-মুখে উড়ে তূণ,
ধনুঃশূন্য প্রভঞ্জন নিমেষে বিকল,
ছুটিতে লাগিল বেগে ভ্রমি রণস্থল।
অস্থির পার্ব্বতীসুত বৃত্রসুত-তেজে,
এই নিবারিছে শর,
তখনি মুহূর্ত্ত 'পর,
সর্ব্ব-অঙ্গ কলেবর শরজালে ঢাকা,
সঘনে কাঁপিছে রথ, ভগ্নচূড়া, পাখা !
চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিত,
উন্মত্ত অসুর দল,
হেরি দৈত্যসুত-বল,
সুরাসুর দুই দলে ধ্বনি ঘন ঘন,
"সাধু রুদ্রপীড়—সাধু বৃত্রের নন্দন"।
অধীর সে ধ্বনি শুনি তনু পুলকিত,
উল্লাসে দনুজনাথ,
উচ্চৈঃস্বরে অকস্মাৎ,
"সাধু রুদ্রপীড়" বলি নিস্বন ছাড়িল,
দূর শূন্যদেশে যেন জলদ গর্জ্জিল।
দেখিল অসুর, সুর, প্রাচীর-শিখরে,
গাঢ় ঘনরাশি-প্রায়,
বৃত্রাসুর মহাকায়,
দাঁড়ায়ে, বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া,
আশীর্ব্বাদ করে যেন পুত্রে
সঙ্কেতিয়া !
চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাটস্থল,
শ্রবণে বীর-কুণ্ডল,
ধটিনী-বেষ্টিত কটি, প্রশস্ত উরস,
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিমা-পরশ।
বৃত্রে হেরি দেব-যোধ পদাতিকদল,
ভীত কুরঙ্গের প্রায়
বেগে শত দিকে ধায়,
রণক্ষেত্রে নিক্ষেপিয়া চর্ম্ম প্রহরণ,
পালটি ফিরিয়া নাহি করে দরশন।

নিরখি উদ্দেশে বৃত্রে ধনু হেলাইয়া
রুদ্রপীড় প্রণমিলা,
ক্ষণ ক্ষান্ত ধনু-ছিলা,
আবার কোদণ্ডঘাতি টানিলা শিঞ্জিনী
চমকিলা জ্যা-নির্ঘোষে অমরবাহিনী।
অধৈর্য্য অমররথী, সরোষে তখন,
আজ্ঞা দিলা তিনজন,
চালাইতে অনুক্ষণ,
রুদ্রপীড়-রথমুখে নিজ নিজ যান,
সতর্কে কোদণ্ড ধরি করিল সন্ধান।
চলিল দৈত্যারি-রথ অব্যর্থ গতিতে,
না মানি শরের গতি,
না মানি বিপথ, পথি,
অবিচ্ছেদ ঋজুগতি চলিল সম্মুখে—
দুর্ব্বার-বিশিখ-স্রোতবেগ ধরি বুকে!
তিন মুখে তিন দেব সুরথী নিপুণ,
বরুণ বারিধীশ্বর,
গ্রহপতি প্রভাকর,
তারকসূদন শূর পার্ব্বতী-নন্দন—
অন্যদিকে গদাহস্তে ভীম প্রভঞ্জন!
রুদ্রপীড়-রথগতি মন্দীভূত ক্রমে
ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর,
চক্র ভ্রমে রথবর,
শেষে স্থির মধ্যস্থলে নিবারি গমন,
হেরি সুররথিবৃন্দ ছাড়িল গর্জ্জন।
"মা ভৈ মা ভৈ" শব্দে ভীষণ নিনাদি,
কহিল দনুজেশ্বর,
"হের পুত্র ধনুর্দ্ধর,
ক্ষণকাল নিবার এ সুররথিগণে,
এখনি বাহিনী-সঙ্গে প্রবেশিব রণে!
গোকর্ণ, শালিবাহন, গার্দি, ঘটোৎকচ,
সোমধৃতি, তৃণগতি,
হে দৈত্য-রথিক-পতি,
বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠেতে শীঘ্র হও অগ্রসর"—
রণক্ষেত্রে চাহি উচ্চে ডাকি দৈত্যেশ্বর
নামিলা প্রাচীর হ'তে।—এখানে ত্বরিত
মিলি সুর-রথিগণ
আরম্ভিলা মহারণ,
ঘেরি রুদ্রপীড়-রথ বিষম হুঙ্কারি
দৈত্যসুত-শররাশি শরেতে নিবারি,
কাটিলা ভাস্কর অগ্নি-স্যন্দনের চূড়া,
কাটিলা রথের চক্র,
তারকারি-শরে বক্র,
বরুণ শাণিত অস্ত্র হানিতে লাগিলা;
সদাগতি গদা ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা—
লম্ফে লম্ফে প্রদক্ষিণ করি চারিদিকে,
ঘন ঘন ঘোর ঘাতে,
রথচক্র পাতে পাতে,
চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে, অশ্বের বন্ধনী
ছিঁড়িলা নিমিষে, চূর্ণ যুগন্ধর, অণী!
অচল দেখিয়া রথ দনুজকেশরী
লম্ফ দিয়া রণস্থলে,
নামি মনঃশিলাতলে,
সিংহ যেন দাঁড়াইল কিরাত-বেষ্টিত,
দীপ্ত তরবারি বেগে মস্তকে ঘূর্ণিত;
শত খণ্ডে খণ্ড কৈল পবনের গদা;
নিমিষে কার্ম্মুক পুনঃ,
লয়ে করে দিলা গুণ,
শিঞ্জিনী অপূর্ব্ব রঙ্গে খেলিতে লাগিল,
ক্ষণে ক্ষণে শরজাল গগনে ছুটিল।
আঘাতিল প্রভাকরে, বরুণে আঘাতি,
আচ্ছাদি কুমার-অঙ্গ,
শতদিকে হ'য়ে ভঙ্গ,
পড়িতে লাগিল, ঢাকি শতাঙ্গ, গগন,
বিমুখি সংগ্রামে শরদগ্ধ প্রভঞ্জন।
তখন পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি,
দিব্য অস্ত্র ধরি করে,
দ্বিখণ্ড করিলা শরে,

রুদ্রপীড়-শরাসন ভীষণ আঘাতে—
নিমিষে বীরেন্দ্র ধনুঃ নিলা অন্য হাতে ;
না টানিতে শিঞ্জিনী, প্রচণ্ড দিবাকর
খণ্ড করি থুরে থুরে,
কোদণ্ড ফেলিলা দূরে,
বসাইলা চাপে অস্ত্র ঘোর আভাময়,
নিরখি তিলার্দ্ধ কালে বৃত্রের তনয়
ধূমদণ্ড—ধূমকেতু-আকৃতি ভীষণ—
ধরিলা সাপটি করে,
বাহিরিল থরে থরে,
কিরণের রেখাকারে গগনে বিস্তারি
তাম্রময় শলাকা সহস্র সারি সারি ;
ঝাপটে ঝাপটে ঝাড়ি যেদিকে হেলায়ে
ধরিছে আকাশমুখে,
সে দিকে শলাকামুখে
শলাকার ধাতুর বর্ত্তুল বাহিরিছে,
ঘোর শব্দে শূন্যমার্গ ছিঁড়িয়া ছুটিছে ;
ক্ষণকাল কভু যাহে পরশে বর্ত্তুল,
ছিন্ন-ভিন্ন চূর্ণকায়,
অদৃশ্য করি উড়ায়,
চিহ্ন নাহি রহে তার দেখিতে কোথায়,
ভীষণ বর্ত্তুল হেন কোটি কোটি ধায় !
লণ্ড-ভণ্ড দেব-রথী-বিমান-মণ্ডলী।
প্রচণ্ড নিনাদ ঘন,
শলামুখে বরিষণ,
ধাতুর বর্ত্তুল পিণ্ড ঝলকে ঝলকে,—
ভাঙে রথ, ধনু, অস্ত্র পলকে পলকে ;
ভাঙে প্রভাকর-রথ ক্ষার দগ্ধ যেন ;
বরুণের দিব্য যান,
ক্ষণমধ্যে খান খান,
কোটিখণ্ডে কার্ত্তিকেয়-বিমান ভাঙ্গিল,
দেবরথি-কুল ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল।
তখন দেবেন্দ্র ইন্দ্র সাপটি কার্ম্মুক,
অগ্রসর হৈলা রণে,
টঙ্কারি ভীষণ স্বনে,
দিব্য চাপে বসাইলা অস্ত্র খরশান,
টানিলা ধনুর ছিলা করিয়া সন্ধান—
ছুটিল বিদ্যুৎগতি নিঃশব্দে অম্বরে,
সুশাণিত মহাশর
পড়ে ধূমদণ্ড'পর,
কাঁপিতে কাঁপিতে খণ্ড তখনি নিমেষে,
হইল সে ধূমদণ্ড কাশতৃণ-বেশে।
উড়িল শলাকাকুল দণ্ডমুষ্টি ছাড়ি,
আচ্ছাদি গগন-তনু,
যেন পরমাণু-অণু,
অদৃশ্য হইল শূন্যে কোটি পথে ছুটি ;—
রুদ্রপীড় হস্ত হৈতে পড়ে দণ্ডমুঠি।
নিকটে আসিয়া ইন্দ্র প্রসন্নবদন,
শত সাধুবাদ দিয়া,
বৃত্রসুতে বাখানিয়া
কহিল "সুধন্বি, ধন্য শরশিক্ষা তব,
দেখাইলা বীরবীর্য্য আজি অসম্ভব ;
এখন প্রস্থান কর রণস্থল ছাড়ি ;
সংগ্রাম না কর আর,
মনোমত পুরস্কার,
পেয়েছ হে বৃত্রসুত, লভ গে বিশ্রাম,
নহে দ্বন্দ্ব তব সনে, না চাহি সংগ্রাম।"
কহিল দনুজনাথ তনয় বাসবে—
"হে ইন্দ্র মেঘবাহন,
শুনিয়াছ মম পণ,
স্বর্গেতে থাকিতে দেব না ফিরিব রণে,
জীবিতে লঙ্ঘিয়া পণ ফিরিব
কেমনে ?
বৃথা আকিঞ্চন তব, দেবেন্দ্র বাসব,
করেছি জীবন পণ
করিব তা উদ্‌যাপন,
আজি পুরাইব মম জীবনের আশা,
মরিতে যদ্যপি হয় মিটাব পিপাসা—

মিটাব পিপাসা যুদ্ধ করি তব সনে,
আজি এ সমরক্ষেত্রে,
দেখিব প্রফুল্ল নেত্রে
জ্যা-বিন্যাস তোমার কোদণ্ডে, সুরেশ্বর,
ধর ধনু, যোধবাক্য রাখ ধনুর্দ্ধর।"
বুঝাইলা নানামত ইন্দ্র মহামতি,
সমরে হইতে ক্ষান্ত,
দৈত্যহতে রণশ্রান্ত,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসম বিপক্ষে সংঘাতিতে,
সতত বিরাগ-ভাব দেবেন্দ্রের চিতে!
নারিলা বুঝাতে যদি, কহিলা তখন,
"কর রথে আরোহণ,
শর-বেগ সম্বরণ,
কর তবে, পার যদি বেগে নিবারিতে;"
আজ্ঞা দিলা সারথিরে অন্য রথ দিতে।
মাতলি অপূর্ব্ব যান যোগাইল ত্বরা—
বৃত্রসুত দ্রুতগতি,
ক্ষণে আরোহিলা তথি,
বাছি বাছি প্রহরণ তুলিলা তাহায়;
ছুটিল অমররথ অপূর্ব্ব প্রথায়।
বাজিল অদ্ভুত রণ দুই ধনুর্ধরে;
কে বর্ণিতে পারে তাহা,
ভুবনে অতুল যাহা,
সুরেন্দ্র অমরপতি খ্যাত ত্রিভুবন—
মহাযোদ্ধা ধনুর্ধর দনুজ-নন্দন।
কিবা কোদণ্ডের গতি—শিঞ্জিনীর ক্রীড়া,
ফিরিছে বিমানদ্বয়,
রণক্ষেত্র সমুদয়,
ক্ষণে দূরে—ক্ষণে কাছে—ঘেরি পরস্পরে,
সহসা সংঘাত যেন আবার অন্তরে!
ফিরিছে বিপুলবেগে, না পরশে তবু
চূড়া, অঙ্গ কেহ কার,
যেন রঙ্গে নিত্যকার
নর্ত্তকের সঙ্গে ফিরে প্রমোদ-মন্দিরে—
না ঠেকে বাহুতে বাহু—শরীরে শরীরে
কখন দৈত্য-বিমান পুষ্পকে লঙ্ঘিয়া
শূন্যে উঠি ক্ষণকাল,
বিস্তারে বিশিখজাল,
সৌদামিনী খেলে যেন নির্ঝরে ভাঙ্গিয়া
আবার ইন্দ্রের রথ নিকটে আসিয়া,
পবন বিদারি বেগে মহাশূন্যে ধায়,
দেখিয়া কপোতে দূরে,
শূন্যে যেন ঘুরে ঘুরে,
দুই বাজপক্ষী ফিরে পক্ষ সাপটিয়া,
নখে খণ্ড খণ্ড দেহ, রুধিরে ভিজিয়া।
কখন বহু অন্তরে অচল সমান,
দুই ব্যোমযান স্থির,
ধনু ধরি দুই বীর,
খেলায় শর-তরঙ্গ দেখিতে অদ্ভুত।
নিঃশব্দে অনন্ত-দেহে অযুত অযুত
ঘুরয়ে মণ্ডলাকারে দুই শরশ্রেণী,
প্রান্ত-সীমা অনুমান,
দূরস্থিত দুই যান,
তরঙ্গ আসিছে এক, ছোটে অন্য ঝারা
দুই কেন্দ্র-মাঝে যেন বিদ্যুতের ধারা।
যুঝিল এ-হেন রূপে সমর-নিপুণ
ধনুর্ধর দুই জন,
চমকিত ত্রিভুবন,
যতক্ষণ রুদ্রপীড়-অস্ত্র না ফুরায়—
নেহারে অসুর সুর অসাড়ের প্রায়!
যে মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইল তার তূণ,
তখনি ইন্দ্রের শরে
বীরেন্দ্র শতাঙ্গ'পরে
পড়িল, সহস্র শরে জর্জ্জরিত-তনু,
খসিল শীর্ষক শিরে, করতলে ধনু;
পড়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত,
শূন্য ছাড়ি ব্যোমযান,
অছিদ্র নাহিক স্থান,

ত্রেতায় কর্ব্বুরপতি-শরেতে অস্থির,
পড়িল গতায়ু যথা জটায়ু-শরীর!
উঠিল সমরক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি।
আকুল দনুজদল,
বক্ষ ভিজাইয়া জল,
পড়িতে লাগিল স্রোতে, ভাসায়ে নয়ন;
নীরব অমর-দল বিষণ্ণ বদন।
উঠিল সে কোলাহল—ক্রন্দন-কল্লোল,
কনক-সুমেরু-শিরে
নেত্রযুগে ধীরে ধীরে,
শচীর শোকাশ্রুধারা বহিতে লাগিল;
সহসা বিবর্ণ-তনু—চপলা কাঁপিল।
জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি,
"কে পড়িলা রণস্থলে,
কোন্ রামা-হৃদিতলে,
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার—
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে সুখের সংসার?"
চপলা অস্ফুটস্বরে রুদ্রপীড় নাম
উচ্চারিলা অকস্মাৎ,
হৃদে যেন বজ্রাঘাত,
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মূলে—
পড়িল দানব-বধূ ইন্দ্রজায়া-কোলে!
শুকাইল ইন্দুবালা—নিদাঘের ফুল,
হায় রে, সে রূপরাশি,
যেন স্বপনের হাসি,
লুকাইল নিদ্রাকোলে—ফুটিবে না আর!
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার!
"কেন রে চপলা, হেন নিদারুণ হ'লি?
কেন সে দারুণ শ্বাস,
ঘুচায়ে সুরভি বাস,
পরশিলি এ কুসুমে?"— বলি,
হৃদে তুলি
ধরিলা ইন্দ্রের রামা সে স্নেহ-পুত্তলী।
এখানে সমরাঙ্গনে সুরেশ্বর-কাছে,

যুড়িয়া যুগল কর,
নয়নে শোকাশ্রুধর,
রুদ্রপীড়-সারথি কহিছে খেদস্বরে—
গহ্বরের মুখে যথা গিরি-ধারা ঝরে!
"পুরাও সদয় হ'য়ে, হে অমরনাথ,
কুমার-বাসনা আজি,
প্রভাতে সমরে সাজি,
আইলা যখন বীর, কহিলা আমায়—
'এক কথা, সারথি হে, আদেশি তোমায়,
দেখিবে অন্তিমকাল যখন আমার,
দেখো যেন রণস্থলে,
মম দেহ শত্রুদলে,
চরণে পরশি কেহ না করে হেলন—
রাক্ষস পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।
এই অগ্নিচক্ররথ লভিনু যা রণে,
হারাইয়ে হুতাশনে,
দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বলো—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন।'
সে রথ উৎসন্ন এবে, হে অমরনাথ,
আজ্ঞা দেহ বীরতনু,
কবচশীর্ষক ধনু,
ল'য়ে তাঁর পিতৃপদে সমর্পণ করি—
পুরাও বীরের সাধ, হে বীরকেশরি!"
বাসব ত্রিদশপতি সারথি-বচনে
কহিলা—"শুন রে সূত,
দৈত্যসুত অদভুত,
দেখাইলা রণে আজি সমর-কৌশল,
স্তব্ধ সুরাসুর তার হেরি ভুজবল।
এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে;
চিন্তা নাহি কর চিতে,
আমি সে দিব বহিতে
এ বীরেন্দ্র-মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ—
ইথে ল'য়ে পূর্ণ কর বীর-মনোরথ।"

সারথি সজলনেত্র সুরেন্দ্র-আদেশে
সৈনিক সহায় করি,
তুলিলা পুষ্পকোপরি,
রুদ্রপীড়-মৃততনু অস্ত্রাদি ভূষণ ;
ইন্দ্রাদেশে শব-সঙ্গে ফিরে দৈত্যগণ।
বাজিল সমর-বাদ্য গম্ভীর নিনাদে,
রথ-পার্শ্বে সারি সারি
চলিল পতাকাধারী,
পদাতি, মাতঙ্গ, অশ্ব পশ্চাতে চলিল,—
ধীরে ধীরে অমরার দ্বারে প্রবেশিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

পুত্রে আশ্বাসিয়া বৃত্র, ফিরিয়া আলয়ে,
করিলা সমর-সজ্জা, রণক্ষেত্রে ত্বরা
প্রবেশিতে পুত্রের সহায়ে। আজ্ঞা দিলা
যোধবৃন্দে সমরে সাজিতে অচিরাৎ।
সহস্র কোদণ্ডধর, শত যুদ্ধে যারা
যুঝি দেবরথী-সনে মথি সুরদল,
লভিলা বিপুল যশ, অতুল উৎসাহে
সাজিতে লাগিলা দৈত্য-
আদেশে তখনি
ফিরিলা সভামণ্ডপে বৃত্র মহাসুর।
মহাপাত্র সুমিত্রে চাহিয়া ধীরভাবে
কহিতে লাগিলা বৃত্র, "কি কৌশল ধরি
যুঝিবে দানবগণ—রক্ষিবে নগরী ;
কে রক্ষিবে পূর্ব্বদ্বার ? কেবা সে দক্ষিণে
থাকিবে স্বদল সঙ্গে ? কোন্ সেনাপতি
পশ্চিম-তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে ?
কেবা সে উত্তর-দ্বারে প্রহরী নিয়ত ?"
হেন কালে ঘোরতর ক্রন্দন-আরাব
উঠিল বিমানমার্গে ; স্তব্ধ সভাজন
শুনি সে ক্রন্দনস্বর ; স্তব্ধ সে নিনাদে
ইন্দ্রারি দনুজেশ্বর, চাহি অমাত্যেরে,
জিজ্ঞাসিলা "কোন্ বীর আবার পড়িলা
শরাঘাতে ? কহ হে সচিব, সহসা এ
কেন হাহাকার ?
কেন হেন কোলাহল ?
শুভক্ষণে, হে সুমিত্র, লভিলা জনম
দানবের কুলে পুত্র, বীর রুদ্রপীড় !
ধন্য রণশিক্ষা তার—ধন্য বাহুবল !
সফল সাধন এত দিনে ! ভুজ-বলে
সমূহ অমরসৈন্য নিবারিলা একা ;
জিনিলা সমরে বহ্নি দুর্নিবার দেব ;
জিনিলা কুবেরে ভীম-বলী ; বিমুখিলা
রুদ্রে একাদশ—রণে রৌদ্র-তেজ যার ;
ইন্দ্রের নন্দনে খেদাইলা ফেরু হেন।
নিঃশত্রু করিলা পুরী ; প্রাচীর-বাহিরে
মথিছে সমরে এবে অমর-বাহিনী
দুরন্ত বিশিখজালে, স্বচক্ষে দেখিনু—
সে দুর্জ্জয় সাহস, সমর-নিপুণতা
চারি মহারথী-সঙ্গে যুঝিছে একাকী !
জানি মন্ত্রি, জানি তার বীর্য্য-রণোল্লাস,
পারে সে যুঝিতে একা প্রচণ্ড ভাস্করে
ভীমবলী প্রভঞ্জনে, কিবা শক্তিধরে,
কিম্বা মহাপাশধারী বারি-কুল-নাথে ;
কিন্তু সুরপতি ইন্দ্রে, কি জানি উৎসাহে,
একাকী ভেটয়ে পাছে ? মন্ত্রি হে, সত্বর
আজ্ঞা দেহ রথিবৃন্দে হইতে বাহির।"
হেনকালে রুদ্রপীড়-সারথি বহ্লিক
রাখিলা পুষ্পক রথ অঙ্গনের মাঝে !
নতমুখে সুপতাকি-বৃন্দ দাঁড়াইল :
মৃদুমন্দ রণ-বাদ্য বাজিল গম্ভীর ;
শিহরিলা সভাসীন অসুর-মণ্ডলী ;
কাঁপিল বৃত্রের বক্ষঃস্থল ঘন বেগে ;

বহ্লিক সজল-আঁখি রথ হৈতে নামি,
কুমারের রণসজ্জা ল'য়ে ধীরে ধীরে
প্রবেশিল সভাতলে। হেঁটমুখে আসি
রাখিলা দনুজরাজ-চরণের তলে,
সুদিব্য কবচ, আভাময় সুমেখলা
অসিকোষ - নিসঙ্গ—কার্ম্মুক—
চন্দ্রহাস
রাখিলা, হায়, ফেলি অশ্রুধারা, শীর্ষক
শোভিত সারসপুচ্ছগুচ্ছে মনোহর।
দৈত্যরাজে নমি, দাঁড়াইলা যোড়হস্তে;
কহিলা কাঁদিয়া "প্রভু,
কি আর কহিব?"
বৃত্রাসুর, পুত্রশোকে অধীর-হৃদয়,
অশ্রুবিন্দু নেত্রকোণে সহসা ঝরিল;
কহিতে লাগিলা সূতে—হায় বায়ু-স্বন
বনরাজি-মাঝে যথা—"হবে না বলিতে
বার্ত্তা তোর, রে বহ্লিক,
জেনেছি সকলি,
দৈত্যকুলোজ্জ্বলরবি গেছে অস্তাচলে।"
দূরে নিক্ষেপিলা শূল এখন নিষ্ফল।
নিরবে বসিলা মহাসুর। ক্ষণ পরে
তুলিয়া লইলা বক্ষে পুত্র-তনুচ্ছদ;
চাপিলা হৃদয়ে ধরি, পুত্রে পেয়ে যেন
আলিঙ্গন দিলা তায়; করিলা চুম্বন
কবচ, শীর্ষক, নেত্রনীরে ভিজাইয়া।
উচ্ছ্বাসিল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস।
যথা মৃদু মৃদু স্বরে সাগর-হিল্লোল
উচ্ছ্বাসে বেলায় পড়ি সিন্ধুগর্ভে যবে
ডোবে কোন নীরকন্যা, মৃদুশ্বাসে তথা
উচ্ছ্বাসিল সভাজন রুদ্রপীড়-শোকে!
শোকাকুল বহ্লিক তখন খেদস্বরে
কহিলা; "হে দৈত্যরাজ, হে বীরমণ্ডলী,
হে মিত্র অমাত্যগণ, না দেখিলা, হায়,
কি বীরত্ব দেখাইলা অন্তিমে কুমার!
সূত আমি তাঁর, কত যুদ্ধে নিরখিনু

সে বীরের বীরদর্প—কিন্তু কভু হেন
অদ্‌ভুত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিনু!
না শুনিনু এ শ্রবণে! বীরচূড়ামণি
মৃত্যুকালে দেখাইলা বীরত্বের শেষ।
সূত আমি, কি বর্ণিব, কি জানি বর্ণিতে,
সে কার্ম্মুক-ক্রীড়াভঙ্গী—সে ভুজ-চালন
বিজুলি তরঙ্গ-লীলা জিনি চমৎকার!
স্তব্ধ হেরি দেবকুল, সুররথিগণ,
সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, পার্ব্বতীপুত্র ধীর,
অস্থির আকুল বাণে নারিলা তিষ্ঠিতে,—
চারিজনে একবারে যুঝিলা কুমার!
কি বলিব, দনুজেন্দ্র, চক্ষে না হেরিলা!
না শুনিলা সে বিস্ময়-প্লাবিত উল্লাস,
সাধুবাদ ঘন ধ্বনি কত শত বার।
উঠিল সমরক্ষেত্রে কুমারে বাখানি।
বাসব আপনি—হায়, শরে যার বীর
গতজীব—বিস্মিত অদ্ভুত বীর্য্য হেরি,
দিলা নিজ পুষ্পরথ, ত্রিভুবনে খ্যাত,
বহিতে বীরেন্দ্র-সজ্জা, অর্পিতে ও পদে।"
শুনিতে শুনিতে বৃত্র স্ফুরিত-নাসিকা,
বিস্ফারিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে;—
"সাজ, রে দানববৃন্দ—সংহারের রণে।"
হেনকালে সেথা শিশুহারা কেশরিণী
বন আন্দোলিয়া, ভ্রমে যথা গিরিমাঝে,
আইলা ঐন্দ্রিলা বামা—আলুলিত কেশ,
বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা সুঘন নিশ্বাস
কম্পিত নাসিকারন্ধ্রে, অঙ্কিত কপোলে
শুষ্ক অশ্রু-জলধারা; কহিল দানবী
ঘোরস্বরে—উন্মত্ত করিণী যেন ভীমা,
"দৈত্যকুলপতি, দৈত্যকুল নির্ব্বংশ হে
জানিয়া, এখনো স্থির আছ দগ্ধহিয়া?
শোকে অবসন্ন তনু হতাশের প্রায়?
ধিক্ হে তোমারে, ব্যাধে না বধি এখন(ও)
নিরখিছ শূন্য নীড়, উচ্ছিন্ন অটবী?

হের, দৈত্যপতি, হের তপ্ত অশ্রুজল
দহিছে এ গণ্ডতল ! আরো উষ্ণতর
শোকদাহে দহে হৃদি। তুমি পিতা হয়ে
এখনো অসাড় দেহ, না সরে চরণ ?
কি কব, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ ঐন্দ্রিলা কামিনী !
নহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে ?
জ্বালাতাম ঘোর শিখা, চিত্ত দহে যাহে,
সেই তস্করের চিত্তে—জায়া-চিত্তে তার
জ্বালাতাম পুত্রশোক-চিতা ভয়ঙ্কর !
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা !"
সহসা পড়িল দৃষ্টি দনুজবামার
রুদ্রপীড়-রণসাজে ; হেরি পুত্র-সাজ
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার !
বহিল শোকাশ্রুধারা গণ্ড ভিজাইয়া।
"হা পুত্র !হা রুদ্রপীড় !" বলি উচ্চৈঃস্বরে
লইলা দনুজবামা যতনে তুলিয়া
পুত্রের সমর-সজ্জা—দেখিলা শীর্ষকে
সেই মাঙ্গলিক অর্ঘ্য রয়েছে তেমতি !
জ্বলিল বিষম শোক সে অর্ঘ্য হেরিয়া,
কান্দিল মায়ের প্রাণ ! হায় রে, পাষাণে
পশিল অনলদাহ যেন অকস্মাৎ !
উচ্চৈঃস্বরে, কোলে করি পুত্র-রণসাজ,
"হা বীরেন্দ্রচূড়ামণি" বলিয়া উচ্ছ্বাসি,
কান্দিলা দারুণ নাদে ঐন্দ্রিলা দানবী।
"কে হরিলা ? কারে দিলা অহে দৈত্যরাজ
আমার অমূল্য নিধি ? হৃদয়-মাণিক
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম !
এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব তাহায়,
এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্রুনীরে
সেই চারু চন্দ্রানন ! দৈত্যকুলমণি,
দেখিব হে একবার। জীবন-পীযুষে
জুড়াব তাপিত দেহ !—এ জগতমাঝে
'মা' বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর
'ধরাসনে নহ, বৎস, জননীর কোলে',
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া,
নিদ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্র মম—
দৈত্যপতি, এনে দাও সে ধন আমার।"
কহিলা দনুজপতি "হে দৈত্যমহিষি,
জানি সে কঠোর বিধি করেছে নির্মূল
বৃত্রের হৃদের আশা কুঠার-আঘাতে !
এ শোক চিতার বহ্নি জ্বলিবে হৃদয়ে,
হা ঐন্দ্রিলে, যতদিন ভস্ম নহে দেহ !
কি হবে বিলাপে এবে ? হা রে অভাগিনি !
বিলাপের বহুদিন পাইবে পশ্চাৎ,
আক্ষেপের এ নহে সময় ; আগে ঘাতি
পুত্রঘাতী ইন্দ্রের হৃদয় এ ত্রিশূলে,
পরে বিলাপিব দোঁহে। হের যুদ্ধসাজে
সসজ্জ সুরথিবৃন্দ—সমর-প্রস্থানে
গমন-উদ্যত আমি, বিলাপি এখন
চিত্তের উৎসাহ-বেগ না হর, মহিষি !"
দানবের তেজঃপূর্ণ বচনে ঐন্দ্রিলা,
পাইলা স্বভাব পুনঃ, অশ্রুধারা মুছি,
কহিলা "দনুজনাথ, প্রতিশ্রুত হও—
পুত্রঘাতি-পুত্রে বধি দিবে প্রতিশোধ ?
তবে সে হৃদয়জ্বালা-ঘুচিবে কিঞ্চিৎ।
তবে সে বুঝিব বীর শূলধারী তুমি !
তবে সে জগতমাঝে এ মুখ আবার
দেখাব দনুজকুল-মহিলার কাছে।"
কহিলা দনুজেশ্বর উত্তরি বামায় ;—
"পুরাইব মনোবাঞ্ছা, মহিষি, তোমার—
এ শূল-আঘাতে পারি যদি পুরাইতে।"
"পারি যদি পুরাইতে ?—কি কহিলা,
হায়"
কহিলা ভুজঙ্গশ্বাসে ঐন্দ্রিলা দানবী,
"হৃদয়-শোণিত তব গেছে কি শুকায়ে ?

প্রতিহিংসা নাহি তায়? নহ কি সে তুমি
সেই মহাসুর বৃত্র দেব-অন্তকারী?
এখন(ও) তৃতীয় অংশ নহিল অতীত
ব্রহ্মার দিবসমানে,—ভৈরব-ত্রিশূল
এখন(ও) ধরেছ হস্তে তেমতি প্রতাপে
'পারি যদি পুরাইতে'—বলিলে দৈত্যেশ?"
বুঝাইলা বৃত্রাসুর সান্ত্বনিয়া তায়,
প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনঃ মস্তক পরশি,
নাশিতে ইন্দ্রের সুতে।—স্থিরচিত্তে তবে
ধীরগতি ঐন্দ্রিলা ফিরিলা ইন্দ্রালয়ে।
তখন দনুজপতি সুমিত্রে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা পুত্র-অন্ত্যেষ্টি যেরূপে
সমাধা হইবে অন্তে। হেনকালে সেথা
প্রবেশিলা বীরভদ্র মহাকাল-দূত।
সম্ভ্রমে দনুজপতি প্রণতি করিয়া
সম্ভাষিলা শিবদূতে। কহিলা প্রমথ
"বৃত্র, তব পুত্রতনু সুমেরু-শিখরে
লইতে বাসনা মম। অন্ত্যেষ্টি-সৎকার
সে বীরের করিবেন ইন্দ্রাণী আপনি।
ইন্দুবালা-তনু-সঙ্গে অনন্ত-মিলনে
মিলায়ে সে বীর-তনু সুমেরু-অঙ্গেতে
রাখিবেন সুরেশ্বরী;—হে দনুজনাথ,
পতিশোকে পরাণ ত্যজেছে পতিপ্রাণা!
ইন্দুবালা, দানবেন্দ্র, লুকায়েছে, হায়,
সে সুষমা-রাশি আজি সুর-রমা-কোলে!
নিষেধ না কর, দৈত্যনাথ, পুত্রনাম
প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রিদিবে চিরদিন।"
নীরবিলা শিবদূত এতেক কহিয়া।
কহিলা দনুজনাথ—"শুকায়েছে হায়,
সে চারু কোমললতা ইন্দুবালা মম;
হের, মন্ত্রি, বিধাতার বিধি অদ্ভুত—
দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্কজ
ডুবিল হে একিকালে! ছাড়িলা যখন
রুদ্রপীড় বৃত্রাসুরে, থাকে কি সে আর
দৈত্য-কুল-লক্ষ্মী তার ঘরে? জানিলাম,
এত দিনে অসুরকুলের অবসান!
হা মাতঃ সুশীলে! তব অন্তিমকালেতে
চক্ষে না দেখিনু তোমা! সেবিলে মা কত
তনয়ার স্নেহে বৃত্রে—বৃত্র জীবমানে
মরিলে শক্রর কোলে! মৃত্যুর সময়
না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে!
হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে
পারে?"
আক্ষেপি এরূপে বৃত্র নিশ্বাসি গভীর,
কহিলা লইতে তনু মহেশের দূতে,
বীরভদ্রে প্রণমিয়া করিলা বিদায়।
চাহি পরে মহাসুর সৈনিক-বৃন্দেরে
সাজিতে আদেশ দিলা—আদেশিলা শূর
সাজিতে দনুজকুলে। কি বৃদ্ধ তরুণ
চলিল দনুজবীর যে যার আলয়ে,
ঘোষিল অমরামাঝে—সূর্য্যোদয়ে রণ!
হায় রে, সে নিশি যেন গাঢ়তর বেশে
দেখা দিল অমরায়! প্রতি গৃহে পথে
মৃদুল করুণ স্বর! আলয়ে আলয়ে
গৃহীর হৃদয়োচ্ছ্বাস মধুর গভীর!
পিতাপুত্রে, মাতাসুতে, ভগিনী-ভ্রাতায়
কত ধীর আলাপন, মধুর সম্ভাষ,
বিনয়, করুণা, স্নেহ, মমতা-পুরিত!
বনিতার সুললিত কতই বিলাপ!
পতির আশ্বাস প্রেমময় মোহকর!
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রে সাজাইছে মাতা
চুম্বি কতবার স্নেহে পুত্রের ললাট!
মুছি নেত্রনীর বীর অলীক আশ্বাসে
বুঝাইছে কত তায়! জননীর প্রাণ
ভুলে কি ছলনে, হায়? আরো গাঢ়তর
অন্তরে ছুটিছে বেগ পরাণে আঘাতি!
কত শতবার খুলি তনুত্র কঠিন
তনয়ে ধরিছে বুকে! কোন বা আলয়ে

সোদরের পদচ্ছদ বাঁধিতে বাঁধিতে
ভগিনী কাঁদিছে শোকাকুল—অৰ্দ্ধভগ্ন,
অস্ফুট নিশ্বাস, নীর-ধারা দর দর
নয়ন-যুগলে ! পতি-আজ্ঞা শিরে ধরি,
কোন বা রমণী বান্ধে পতি-কটিবন্ধ !
কোন বা রমণী, ধীরে তুলি শিশু-কর,
কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠ
সে কোমল করে ! হায় ! কেহ বা ধরিছে
পতির অধরদেশে শিশুর অধর !
সুমধুর হাসি মুখে খেলিছে বালক
কিরীটের গুচ্ছ তুলি—আনন্দে দুলায়ে !
অশ্রুতে মিশায়ে হাসি হেরিছে রমণী,
সজল-নয়ন, মরি, এবে অবিচল।
চাহে কোন সীমন্তিনী স্বামীর বদনে
করে তুলি খড়্গ-কোষ ! কোন বা বালক
পিতার কবচ অঙ্গে ; হাসিতে হাসিতে
আসিছে জননী-কাছে—কাঁদিছে জননী।
পুত্রে সাজাইছে পিতা, পিতার পৃষ্ঠেতে
কুতূহলে পূর্ণ তূণ বান্ধিছে তনয় !
বুঝাইছে বধূকুলে বৃদ্ধ পুররামা !
মায়ে সান্ত্বনিছে সুতা, জননী কন্যায় !
শুকাইছে কত ফুল্ল প্রফুল্ল আনন,
গত নিশি প্রস্ফুটিত অরবিন্দ সম,
ছিল প্রস্ফুটিত যাহা ! হায়, কত আঁখি
দুঃখেতে মুদিছে আজি ! গত বিভাবরী
যে বদন দেখিবারে হৃদয় উৎসুক,
আজি নিশি নাহি চাহে নিরখিতে তায়
যে হৃদয়-পরশনে শীতল পরাণে
সিঞ্চিত পীযূষ-ধারা, তপ্ত তাহা আজি—
পরশনে দগ্ধ হৃদিতল। শ্রুতিমূলে
যে বচন কালি সুমধুর, আজি তাহে
বিন্ধিছে কণ্টক ! কত স্নেহ, আশা, আহা
কত চিন্তা, ভয়, প্রতিদিন দানবের ঘরে
একত্রে তরঙ্গ তুলি ফিরিছে সে নিশি,
না হয় বর্ণন, হায়, সে হৃদি প্লাবন !
পুড়িছে সবারি বুক, কোলে করি কেহ
হেরিছে শিশুর মুখ—চুম্বনে বিহ্বল !
কেহ প্রিয়তমা-অশ্রু মুছিছে যতনে
হৃদয়ে চাপিয়া সুখে ! কেহ বা কাঁদিছে !
ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আহা, সে কাল নিশাতে
বিদায় কতই মত ! সখায় সখায়
শেষ প্রণয়ের দেখা কতই স্নেহেতে !
আলিঙ্গন পিতা-পুত্রে—জননী-আশীষ,
সে তামসী অমরায় নিরখিলা কত !

চতুর্বিংশ সর্গ

অমরায় বিভাবরী হইল প্রভাত ;
খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, তূণ, তরল কিরণে
প্রদীপ্ত হইল দশ দিকে ! সিন্ধু যেন
সে ঘোর সমরভূমি—অকূল—গভীর !
দেব-দৈত্য-চমূদল ঊর্ম্মিকুল-প্রায়
ভাসিছে কিরণ মাখি সে রণ-সাগরে !
সে কিরণে প্রভাতিল ভীম শোভাময়
অপূর্ব্ব অমর-ব্যূহ বাসব-রচিত।
বহু দেশ যুড়িয়াছে বাহিনী-বিন্যাস—
অস্তাচল, হেমকূট, তাম্রকূট গিরি,
পর্ব্বত-পারদ-গর্ভ, প্রবাল-ভূধর,
মনঃশিলা শৈলকুল আদি আচ্ছাদিয়া।
মণ্ডল-ভিতরে সৈন্য-মণ্ডল স্থাপিত
অপূর্ব্ব শ্রবণাকৃতি !
মধ্যস্থলে তার
যক্ষপতি আদি সুররথী—শরাহত

দেবগণ ; চৌদিকে স্তবকে সুরসেনা,
রক্ষিত সেনানীবৃন্দ রণে সুনিপুণ !
ব্যূহ বিরচিয়া ইন্দ্র অরুণ-উদয়ে
দেব সেনাপতিগণে করিলা আহ্বান
আপনার পটগৃহে। বাসব-আদেশে
আ(ই)লা জলকুলপতি বরুণ সুধীর ;
বৃত্রসুতবাণে বিদ্ধ বাম উরুদেশ,
পাশে রাখি দেহভার, শঙ্খের গতিতে
আইলা ইন্দ্রের পার্শ্বে। সূর্য্য মহাবলী
তীক্ষ্ণ শরে দগ্ধতনু, আইলা সত্বর
ইন্দ্রপটগৃহে বিদ্ধ বাম ভুজ ধরি।
আ(ই)লা অগ্নি ভীমদেব অস্থির দহনে ,
আ(ই)লা দেব প্রভঞ্জন চঞ্চল-গতিতে ;
আ(ই)লা দণ্ডধর যম করাল-মূরতি ,
জয়ন্ত বাসব-পুত্র, দেব ষড়ানন।
যথাস্থানে যে যাহার কৈলা অধিষ্ঠান।
সুরপতি, চাহি সূর্য্যে, অনলে, বরুণে,
কহিলেন,—"হে অমর মহারথগণ,
চিত্ত মম আকুলিত হেরি তোমা সবে
হেন শরদগ্ধ-তনু—না জানি এরূপে,
দুর্গতি করিলা দেবে বৃত্রের তনয় !"
জিজ্ঞাসিলা, "কোথা এবে যক্ষ ধনপতি ;
না আইলা কেন দুই অশ্বিনীকুমার ;
কোথা একাদশ রুদ্র, অন্য বীর আর ?"
উত্তরিলা বারীশ বরুণ পুরন্দরে,—
"আমা সবা হৈতে শরদগ্ধ গুরুতর
সে সকলে, হে সুরেন্দ্র, গতিশক্তিহীন
কোন দেব, মূর্চ্ছাগত কেহ, বৃত্রসুত-
শরঘাতে !" শুনি ইন্দ্র আক্ষেপিলা কত।
কহিলা অমরপতি—"হে সেনানীগণ,
হত এবে সে অসুর ভীম ধনুর্দ্ধর।
কিন্তু দুষ্ট বৃত্রাসুর জীবিত এখন(ও),
দৈত্যপতি সমরে দুর্ব্বার ! রণে যার
অমরা-বঞ্চিত দেবগণ ! সে দুরাত্মা
সংগ্রামে পশিবে অচিরাৎ ; কি উপায়ে
নিবারিবে তায় এ সময়ে ? কহ শুনি।
দধীচির অস্থিবলে, পিনাকি-আদেশে,
পেয়েছি অব্যর্থ অস্ত্র—বজ্র প্রহরণ ;
কিন্তু সে অসুর ইথে নহিবে নিপাত
না হইলে ব্রহ্মদিবা শেষ। কি উপায়ে,
কহ, দৈত্যে দুরন্ত সমরে নিবারিবে ?"
বলি কোষ হৈতে তুলি ধরিলা দম্ভোলি
দৃঢ়করে পুরন্দর। ধক্ ধক্ জ্বালা
জ্বলিতে লাগিল অস্ত্রে, করি দীপ্তিময়
সে দেব-পটমণ্ডপ—অনন্ত শিবির ;
উত্তাপে অস্থির দেবকুল, দেখি ইন্দ্র
ভীম বজ্র রাখিলা আবার বজ্রাধারে।
ভীষণ দম্ভোলি-তেজ হেরি বৈশ্বানর,
আহ্লাদে অধীর, অঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
কহিল—অসহ্য কণ্ঠ-বেদনা উপেক্ষি,
"অমরেন্দ্র ! শুন কহি মম অভিলাষ,
তিলার্দ্ধ নিমেষ আর বিলম্ব না কর,
অসুরে সংহার বজ্রে ; অদৃষ্ট-লিখন
কে বলে খণ্ডিত নয় ? সুযোগে সকলি
শুভফল। না থাকিলে এ বেদনা মম,
এখনি সুরেশ, বধিতাম বৃত্রাসুরে
এ অস্ত্র-আঘাতে।" শান্ত কৈলা সুরপতি
উগ্র হুতাশনে, বুঝাইয়া নানা মত।
তখন ভাস্কর—গ্রহকুলপতি দেব—
তীব্রতর স্বরে উচ্চে নিনাদি কহিলা,—
"হে সুরেন্দ্র, ভয় যদি দম্ভোলি-নিক্ষেপে,
দেহ তবে মম করে, দেখিবে এখনি
খণ্ড-মুণ্ড হয় কি না দুরন্ত অসুর !
প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে, বজ্রের সহায়ে
লুটিবে অসুর-মুণ্ড—বিস্তীর্ণ শ্মশানে
শূন্য কুম্ভ ঝড়ে যথা !
না জানি, সুরেশ,
কি হেতু অসাধ তব হেন রিপু-নাশে !

আপনি অক্ষত-দেহ ! জর জর তনু
দেবকুল অস্ত্রাঘাতে ! কি জানিবে কহ,
ছিলে লুকাইয়া দূর কুমেরু-গহ্বরে !”
সূর্য্যের বচনে ক্রুদ্ধ জলদলপতি
কহিলা—”হা ধিক্, ধিক দেব দিবাকর,
দেবেন্দ্রে এ ভাষা ? সর্ব্বত্যাগী সুরপতি
দেবতার হিতে, ঘৃণা, লজ্জা পরিহরি
বিশ্বদ্বারে ভ্রমিলেন ভিক্ষুকের বেশে !
তাঁরে এ পরুষ-বাক্য ? হে ধ্বান্তবিনাশী,
অন্ধ কি হইলা ক্লেশে ? কহ সে কাহার
নহে শরদগ্ধ দেহ ! একাকী সমরে
বঝিলা কি দৈত্যসুতে ? কি সাহসে হেন
অহঙ্কার, হে সবিতঃ—ভীরু অপবাদ
দিলা ইন্দ্রে এ সুরমণ্ডলে ? লজ্জাহীন
ভীরু যে আপনি, অন্যে ভাবে সে তেমনি”
এত কহি নীরবিলা সিন্ধুকুলপতি।
সুরেন্দ্র তখন শান্ত করি বারিনাথে,
কহিলা, সুধীরভাবে গম্ভীর বচন ;—
”হে সূর্য্য, অসুর-নাশে অসাধ আমার !
দেব-দুঃখে নহি দুঃখী—নহি হে ব্যথিত
শরব্যথা বিহনে শরীরে ? অকারণ
অরাতি নাশিতে করি হেলা ?—
হে দিনেশ,
সহস্রাংশু, ঘুচাও সে চিত্ত-ভ্রম তব,
লহ এ সংহার-অস্ত্র, বিনাশ অসুরে !”
এত কহি সূর্য্য-অগ্রে রাখিলা দম্ভোলি।
আগ্রহে ভাস্কর হেরি সে ভীম আয়ুধ,
তুলিতে করিলা যত্ন দুই ভুজে ধরি ;
প্রকাশিলা যত শক্তি ভুজদণ্ডে তার ;
তুলিতে নারিলা বজ্র—লজ্জানত-মুখে
দাঁড়াইলা দূরে গিয়া দেব-অন্তরালে।
হাসিলা অমরবৃন্দ উচ্চ অট্টহাসে
হেরি সূর্য্য-পরাভব, ব্যঙ্গ স্বরে কত
বিদ্রূপিলা কত জন কূট তিরস্কারে।

তখন বাসব শীঘ্র পীযূষ-তুলনা
বচনে শীতল করি চিত্ত সবাকার
নিবারিলা সর্ব্বজনে—“হে দেবমণ্ডলী”
কহিলা বিশদস্বরে—“গৃহ-বিসম্বাদ
সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগতী মাঝে ;
বিপদের কালে মনোমিলন(ই) সম্পদ্ !
কে না পারে সখ্যভাবে সম্পদ্ ভুঞ্জিতে ?
দেবতার কত হীন মানবের জাতি,
তাদের(ও) সম্প্রীতি কত
সোদরে সোদরে,
কতই সখ্যতা স্নেহ অত্মীয় স্বজনে,
সৌভাগ্য সে যত দিন। সৌভাগ্য ফুরালে
সুখের সংসার ছার—শার্দ্দূল-কলহ
আত্মীয়-কলহে গৃহে ! ভ্রাতৃত্ব উচ্ছেদ !
বিপদে বন্ধুর ক্ষয় মানবে প্রবাদ !
সে প্রবাদ দেবকুলে করিতে প্রবল
চাহ কি অমরগণ ! আত্ম-বিস্মরণ
বিপদে এতই দেবে, অহে ত্রিদিবেশ !”
এতেক বলিয়া ইন্দ্র নীরব আবার ;
ভাবিতে লাগিলা চিত্তে কিরূপে অসুরে
ভেটিবে সমরে পশি। পার্ব্বতীনন্দন
কার্ত্তিকেয় সেনাপতি, সমর-কুশল,
কহিলা যুদ্ধের প্রথা ব্যূহমধ্যে থাকি,
রক্ষিতে স্বপক্ষবল ; বরুণ বিচারি
রণে ক্ষান্তি ক্ষণকাল দিলা উপদেশ ;
অন্য দেবগণ মত দিলা যে যাহার।
ভাবিত অমরপতি অমর-শিবিরে,
হেনকালে মহাশূন্য বিদারি বেগেতে
আ(ই)লা শিব-পারিষদ ভীম মহাকাল ;
সুধিলা বাসব শিবদূতে—শিবশিবা-
বারতা, কৈলাস-সুসম্বাদ ; শিবদ্বারী
নন্দী ইন্দ্রে বন্দিয়া তখন কহিলা, “হে
অমরেন্দ্র, উমেশগেহিনী পাঠাইলা,
শচী-দুঃখ হরিতে সতত চিন্তা তাঁর ;

পাঠাইলা, হে বাসব, জানাতে তোমায়
বৃত্রের খণ্ডিল ভাগ্য—অকালে অসুর
পড়িবে দম্ভোলি-ঘাতে। হে শচীবল্লভ,
বিলম্ব না কর আর, বজ্রে বিদারিয়া
বক্ষঃচূর্ণ কর তার ; ভৈরব আপনি
কুপিত ঐন্দ্রিলা-দম্ভে কৈলা এ বিধান।"
এত বলি শিবদূত ফিরিলা কৈলাসে,
ধূমকেতুবেগে গতি, উজলি অম্বর।
মহানন্দে কোলাহল দেববৃন্দ মাঝে,
ক্ষণকালে ত্রিভুবনে ঘোষিল সম্বাদ—
ইন্দ্র-বৃত্রাসুরে রণ—বৃত্রের সংহার
বজ্রাঘাতে। বিহ্বলিত কৌতুকে, হরষে
চতুর্দ্দশ লোকবাসী, সিন্ধু-ব্যোমচর
ছুটিল বিমানমার্গে। আ(ই)ল যক্ষকুল,
বিদ্যাধর, অপ্সর, কিন্নরবর্গ যত ;
আইল কর্ব্বুরগণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ;
আ(ই)ল সিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ,
দেবর্ষি, মহর্ষি, যতি, শুচি-আত্মা যত ;
আইল ব্রহ্মাণ্ডবাসী প্রাণী শূন্যদেশে।
আকাশের দূরপ্রান্তে, শূন্যযানে চাপি
রহিলা সকলে ব্যগ্র। সে রণ দেখিতে
খুলিল ব্রহ্মাণ্ডদ্বার অম্বর সাজায়ে ;
নানাবর্ণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স,
রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ,
কত দিব্য বাতায়ন খুলে চন্দ্রলোকে,
ছড়ায়ে বিমানপথে চন্দ্রালোক-শোভা!
সূর্য্যলোকে কত কোটি বাতায়ন, আহা,
খুলিল অতুলমূর্ত্তি লোম-হর্ষকর,
অদ্ভুত সৌন্দর্য-রশ্মি প্রকাশি গগনে!
প্রতি গ্রহে এইরূপে নক্ষত্রে নক্ষত্রে
খুলিল কতই দ্বার, গবাক্ষ, তোরণ,
বিপুল অনন্ত-কোলে—অনন্ত শোভায়,
প্রতি বাতায়ন-পথে, গবাক্ষের দ্বারে
প্রাণিবৃন্দ অগণন ; শূন্য যেন আজি
প্রাণিময়,—পরিপূর্ণ জীবন প্রবাহে।
সে শোভা হেরিতে রমা শ্রীপতি-সহিত
খুলিলা বৈকুণ্ঠদ্বার! খুলে ব্রহ্মলোক
অতুল্য তোরণ আজি ব্রহ্মলোকবাসী।
খুলে দ্বার মহাকাল কৈলাস-ভুবনে!
অতুল সুরভি-গন্ধে পুরিল জগৎ!
বিহ্বলিত চৌদ্দলোকে প্রাণীর মণ্ডলী
সে সৌরভ-ঘ্রাণ লভি! আকুলিত প্রাণ
দেখিতে লাগিল শূন্যে বৈকুণ্ঠ ভুবন,
অতুল ব্রহ্মার পুরী, বিশাল কৈলাস,
মোহে অচেতন যেন ভুলি ক্ষণকাল
ইন্দ্র, বৃত্রাসুর, স্বর্গ, সমর-প্রাঙ্গণ!
হেথা ইন্দ্র ব্যূহ-মাঝে প্রবেশি তখন
নিরখিলা একে একে দেবরথিগণে
সমরে আহত যত, কিবা সে মূর্চ্ছিত।
ধনেশ্বর কুবের, অশ্বিনীসুতদ্বয়ে,
সান্ত্বনিলা মিষ্টস্বরে। রুদ্র একাদশে
স্নিগ্ধ করি, স্নিগ্ধ করি অন্য দেবে যত
আহত সমরক্ষেত্রে, ফিরিলা বাসব
করি ব্যূহ প্রদক্ষিণ। আসি বহির্দ্দেশে
আজ্ঞা দিলা মাতলিরে আনিতে পুষ্পক।
আজ্ঞা দিলা নিজ নিজ রথ সাজাইতে
অন্য যত সুর রথী। শিবির ঘুড়িয়া
সাগর-কল্লোলধ্বনি উঠিল আরাবে।
সাজাইলা অরুণ সূর্য্যের সুবিমান
একচক্র রথবর অদ্ভুত দেখিতে।
গতি মনোহর অতি, প্রদীপ্ত চূড়াতে
সপ্ত স্বর্ণকুম্ভ-শোভা। নিয়োজিলা তায়
সপ্ত শ্বেততুরঙ্গম বঙ্কিম নিগাল,
জিনি দুগ্ধফেনরাশি শুভ্র-তনুরুহ,
ক্ষণে পারে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে! বৈনতেয়
উঠি শীঘ্র বসিলা স্যন্দনে। ভীমাদেশে
অনল-সারথি রথ সাজাইলা দ্রুত ;
সুলোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাময়,

রক্তবর্ণ দুই অশ্ব, নাসারন্ধ্রে শ্বাসে
প্রশ্বাসে ছুটিছে ধূম! আনি যোগাইলা
কৃষ্ণ হয় কৃষ্ণবর্ণ শমন-স্যন্দনে
কৃতান্ত-সারথি ভীম! শঙ্খবিরচিত
শত-চক্র শতাঙ্গ সুন্দর বরুণের.
বেগে যার রসাতল সদা বেগময়,
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সিন্ধুর শরীর,
যবে বারিনাথ রঙ্গে, বারিধি-বিহারে,
ভ্রমেন বারুণী-সঙ্গে—সাজাইলা সূত।
কুমার-সারথি দ্রুতগতি সাজাইলা
শতচূড় শিখিধ্বজ স্কন্দের বিমান;
কুরঙ্গ-বাহন বায়ুবিমান সাজিল;
সাজিল শতাঙ্গ অন্য যত অমরের।
হেনকালে মাতলি সারথি কৃতাঞ্জলি
নিবেদিলা পুরন্দরে "পুষ্পক বিমান
বাহিলা অসুর-পুত্র-শব তবাদেশে,
কি বাহনে সুররাজ পশিবেন রণে?"
চিন্তি ক্ষণে দেবেন্দ্র কহিলা আনিবারে
উচ্চৈঃশ্রবা মহা অশ্ব—অশ্বকুলপতি।
মাতলি ঘোটক আনি দিলা ইন্দ্রপাশে।
হেরিয়া বাসবে, উচ্চৈঃশ্রবা ঘন ঘন
ছাড়িলা নাসিকাধ্বনি, দুলাইয়া সুখে
ফুলাইলা গ্রীবাদেশে কেশর সুন্দর;
ঘন হ্রেষাধ্বনি ঘ্রাণে, ঘন খুরাঘাতে
খুঁড়িতে লাগিলা মনঃশিলা স্বর্গতলে,
তরল পারদ জিনি চঞ্চল অধীর!
অভ্র জিনি তনুশোভা শুভ্র সুচিকণ,
ক্ষীরোদসমুদ্র-জাত ঘোটক অদ্ভুত!
সাজাইলা আপনি সে অশ্বে সুররাজ;
সুদিব্য আসন পৃষ্ঠে, রশ্মি তেজোময়
গলদেশে শোভিতে লাগিল—সৌদামিনী
বেড়িল যেমন গ্রীবাদেশ! মহাহর্ষে
শচীনাথ ধরিলা দম্ভোলি, আরোহণে
করিলা উদ্যোগ। হেনকালে শূন্যপথে
সুমেরু হইতে দ্রুত নামিল পুষ্পক;
চপলা সুন্দরী বসি তায়, তড়িল্লতা
হাস্যছটা মুখে! হেরি ইন্দ্রে দ্রুতগতি,
নামিলা চপলা, নিবেদিলা শচীনাথে
শচীর কুশলবার্ত্তা, কহিলা, যে রূপে
পাইলা পুষ্পকরথ হেমাদ্রি-শিখরে;
ইন্দুবালা-বারতা সংক্ষেপে বিবরিয়া
দাঁড়াইলা নম্রমুখে। চপলারে হেরি
সুধাইলা সযতনে কতই সম্বাদ
সুরনাথ বার বার; কত চিত্তসুখে
শুনিতে লাগিলা যত কহিলা চপলা।
সহর্ষ উৎসুক মনে আশীষি তখন,
কহিলা পৌলোমীনাথ, "হে চারুরঙ্গিণি,
চিরসহচরি ইন্দ্রাণীর, কহিও সে
স্বর্গসুখ-সুখিনীর, স্বর্গরাজ্য তাঁর
উদ্ধারি আবার শীঘ্র অর্পিব তাঁহারে,
চিরতৃষ্ণা মিটাব চিত্তের! ফির এবে
সুহাসিনি, সুমেরু-শিখরে নিরাপদে।"
এত বলি শচীনাথ চপলার পানে
চাহিলা প্রফুল্লমতি; হেরিলা—রঙ্গিণী
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্র-কলেবর,
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন! ইন্দ্রে হেরি
সলজ্জ-বদনে বামা, মুদিল নয়ন;
রাঙিল সুগণ্ডতল, কাঁপিল অধর!
বিস্ময়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা এ দিকে
ভীমরূপ ত্যজি বজ্র দিব্য তেজোময়
ধরেছে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিধি-হরি-হর-
তেজে নিত্য সচেতন; হেরিছে সঘনে
স্থির সৌদামিনী-শোভা অস্থির নয়নে!
হাসিলা বাসব, আজ্ঞা দিলা মাতলিরে
আনিতে কুসুমদাম, কহিলা—"চপলে,
পূরাব বাসনা তোর—লাবণ্যে মিশাব,
আজি সুর-রণভূমে, ত্রিলোক সাক্ষাতে,
তেজঃকুলেশ্বর বজ্রে; বিবাহ উৎসব
হবে পরে।" মাতলি আনিলা
পুষ্পমালা,

দিলা সুখে ইন্দ্র-করে, আনন্দে বাসব
অর্পিলা চপলা-বক্ষে সে কুসুমদাম!
স্বয়ম্বরা হইলা চপলা মনসুখে;
বরিল লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাজে;
অমর-সমরক্ষেত্রে—বৃত্রবধ-দিনে!
বাজিল সমরভেরী, তূরী, শঙ্খ কত;
উঠিল আনন্দধ্বনি ঘন ঘনোচ্ছ্বাসে
পূরিয়া সমরক্ষেত্র—অনন্ত যুড়িয়া
অবিশ্রান্ত পুষ্পধারা হইল বরিষণ।
কোলাহলে পূর্ণ দশদিক্। দ্রুতগতি
ইন্দ্রপদে নমিলা চপলা; হাসি দেব
দিলেন বিদায়! ভীম অস্ত্রমূর্ত্তি পুনঃ
ধরিলা দম্ভোলি—শক্রদম্ভ-সংহারক!
রচিয়াছে মহাব্যূহ বৃত্র মহাসুর
দিগন্ত অর্দ্ধেক যুড়ি—উদয়-অচল,
পিঙ্গল, ত্রিকূট নগ, গোত্র ধরাধর,
লোকালোক ক্ষ্মাভৃৎ, অচল মাল্যবৎ,
ভূধর রজতকূট হিমাঙ্গশিখর,
ছেয়েছে দানবসৈন্য। রচিয়াছে ব্যূহ
একাদশ মণ্ডলীতে বাহিনী সাজায়ে,
বিন্যাসিয়া রথ অশ্ব গজ পদাতিক!
পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন বিস্তারিয়া পাখা
বসেছে নগেন্দ্র-শিরে—দেখিতে তেমতি
দৈত্য-চমূর গঠন। মধ্যে নিজদল,
বৃত্র ঐরাবত'পরে, ঘেরিয়া তাহায়
শরাক্রান্ত দৈত্যসেনা; সৈনিক সুরথা
পর্ব্বতের শ্রেণী যেন নগেন্দ্রে বেষ্টিয়া।
হেনকালে দুই দলে বাজিল দুন্দুভি,
নাচিল বীরের হিয়া। লহরে লহরে,
সাগর-তরঙ্গ-তুল্য বিপুল বিশাল
ঠেলিয়া, ভাঙ্গিয়া, পুনঃ মিলিয়া আবার
চলিল দনুজ-দল সেনানী চালনে।
দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকারে।
ঝক্ ঝক্ কিরণ চমক্ অস্ত্র'পরে,
রথধ্বজ কলসে, তনুত্রে, ধনুহুলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিয়া!
সেজেছেন মহাহবে দৈত্যকুলপতি
বৃত্রাসুর—বান্ধি কটি কটিবন্ধে দৃঢ়,
দুই খণ্ড গণ্ডারের দৃঢ় চর্ম্মপেটী
দুই উপবীতাকারে, বান্ধিয়াছে ঘেরি
বক্ষোদেশ। বাম করে ধরেছে ফলক
সূর্য্যের মণ্ডলবৎ—প্রচণ্ড, বৃহৎ,
দক্ষিণে ভৈরব-দত্ত শূল বিভীষণ।
ঐরাবত-করি-পৃষ্ঠে বসেছে অসুর,
শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যেন। করিকুল-রাজ,
গত রণে জিনি যায় লভিলা দানব,
চলিলা বৃংহিত করি—চলিলা পশ্চাতে
দনুজ-বাহিনী যেন তরঙ্গের মালা।
ছুটিল ইন্দ্র-বিমান গগন আন্দোলি;
কভু শূন্যে, কভু নিম্নে, কভু পার্শ্বদেশে
বিজুলির বেগে গতি, ছিন্ন-ভিন্ন করি
দৈত্য অনীকিনী পার্ষ্ণি, কক্ষ, বক্ষোদেশ!
ঘনদল, অম্বর, বিদীর্ণ চক্রাঘাতে।
ইরম্মদে রথচক্রে জ্বলিতে লাগিল,
তড়িদ্দাম—জ্বলিল সহস্রঅক্ষি তেজে।
শরজাল ভয়ঙ্কর শূন্যে বরষিল,
মুষলের ধারে যেন বরিষার ধারা!
অপূর্ব্ব শিঞ্জিনী-ভঙ্গী! মুহূর্ত্ত-ভিতরে
দিগন্ত ব্যাপিয়া শর—সর্ব্বজন পরে,
সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বদিকে, রণস্থল ঢাকি।
পড়িতে লাগিল প্রহরণে অশ্ব, হস্তী,
অসংখ্য পদাতি—মহাঝড়ে তরু যেন!
কিম্বা বজ্রাঘাতে যথা শৈলকুলচূড়া!
ব্যূহ ভেদি প্রবেশিল সুরেশ স্যন্দন,
ভ্রমিতে লাগিল বেগে দাবাগ্নি যেমন
ভ্রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন দগ্ধ করি;
কিংবা যথা ঊর্ম্মিকুল সিন্ধু উথলিলে,
ধায় রঙ্গে বেলাভূমে উপল বিছায়ে!

ভিন্ন হৈল দুই পক্ষ সুরেন্দ্রের শরে
ব্যূহ-কলেবর ছাড়ি—যেথা বৃত্রাসুর
বেষ্টিত দানব-বীরদলে। রক্তস্রোত
প্রবাহিল বিপুল তরঙ্গে শতদিকে।
দেখি দৈত্য মহাকায় দম্ভে চালাইলা
মহাহস্তী ঐরাবত ; ছাড়িল মাতঙ্গ
কোটি শঙ্খনাদ শুণ্ডে। গর্জ্জিল তখন
ভীম শব্দে দৈত্যনাথ, গর্জ্জিল যেমন
অম্বরে জলদদল ; কহিলা হুঙ্কারি—
"রে পাষণ্ড, এ প্রচণ্ড ভুজতেজ আগে
না নিবারি, মথিছ দনুজ-পদাতিক ?
তস্করের প্রায়, বৃত্রে এড়ায়ে সমরে,
ভ্রমিছ রে রণভূমে, ভীরু হীনমতি ?
তুল্যজনে সংগ্রামে না ভেটি, হস্তী, হয়,
বধিছ নির্লজ্জ-প্রাণ ! ধিক্ হে বাসব !
কি হেতু আইলে রণে ভয়(ই) যদি এত
অসুরের ভুজবলে ? সে ভুজ-প্রতাপ
হের পুনঃ।" কহি, শূন্যে তুলিলা অসুর
মহাকাল-শূল ভয়ঙ্কর ! না উত্তরি
সুরনাথ কোদণ্ড ধরিলা ভীমতেজে,
লক্ষ্য করি ঐরাবতে নিমেষ ভিতরে
কর্ণমূলে নিক্ষেপিলা সুতীক্ষ্ণ বিশিখ।
অস্থির জ্বালায় মহাবারণ মাতিল ;
ঘোর শব্দ শূন্যে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে
না মানি অঙ্কুশাঘাত। ভীম লম্ফ ছাড়ি
দাঁড়াইলা মহাশূর মনঃশিলাতলে—
শূলহস্তে। লক্ষ্য করি ইন্দ্রবক্ষঃস্থল
ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র—দূরে হেনকালে
দেখিলা দনুজপতি জয়স্তপতাকা।
নিরখি ইন্দ্রের পুত্রে নিজ পুত্রশোক
জ্বলিল হৃদয়তলে। স্মরিলা তখন
ঐন্দ্রিলার ভীমবাক্য, প্রতিজ্ঞা কঠোর,
হুঙ্কারিলা ঘোর স্বরে অসুর দুর্জ্জয়,
ছুটিলা উন্মাদ যেন মথি সুররথী,
মথি অশ্ব, মাতঙ্গ, পদাতি অগণন।
লুক্কায়িত শার্দ্দূলেরে যথা বনমাঝে
খুঁজে ব্যাধ, বনরাজি আন্দোলন করি,
কিম্বা পক্ষিরাজ বাজ কপোতে হেরিয়া
ধায় যথা শূন্যপথে—ছুটিলা দিতিজ।
হেথা ইন্দ্রে ঘোর রণে দৈত্যবীর যত
ঘেরিল নিমেষকালে। তুমুল সংগ্রাম
বাজিল বাসব-সঙ্গে। কম্বোজ, খড়ক,
খরখুর ধবলাক্ষ, ঘেরিল পুষ্পকে
স্বদল সহিত এককালে। সুরপতি
যুঝিতে লাগিলা রণমদে। পশুরাজে
বনমাঝে নিষাদ ঘেরিলে, উন্মাদিত
পশুরাজ ভীম লম্ফ ছাড়ি, ভ্রমে যথা
দশদিকে, লণ্ডভণ্ড করি ব্যাধকুলে,
তীক্ষ্ণ নখে, দন্তাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি
নিক্ষিপ্ত তোমর, ভল্ল, কুঠার, মুদ্গর—
তেমতি সুরেন্দ্র-রথগতি ! ক্ষণে পূর্ব্বে,
ক্ষণপরে উত্তরে আবার, অকস্মাৎ
পশ্চিমে, দক্ষিণে—যেন খেলে তড়িদ্দাম
সর্ব্বস্থান দিগন্ত ব্যাপিয়া একেবারে !
যুঝিছে দনুজদল অসীম বিক্রমে,
ভিন্দিপাল, ভীষণ পরশু, প্রক্ষেড়ন,
নিমেষে নিমেষে ক্ষেপি ইন্দ্ররথোপরে।
কাটিছে সে অস্ত্রকুল ইন্দ্র মহাবল
ভুজদণ্ড মুণ্ড সহ শরে ; উড়াইছে
খণ্ড উরু বিশিখে বিন্ধিয়া, জঙ্ঘা, বাহু,
কক্ষ, বক্ষ, ললাট বিন্ধিছে লক্ষ বাণে।
নিরস্ত্র দনুজসৈন্য হৈল অচিরাৎ ;
পড়িল সমরক্ষেত্রে কোটি দৈত্যবীর।
ছাড়ি সিংহনাদ ক্রোধে
দৈত্যসেনা তবে
ধাইল উপাড়ি বৃক্ষ, ছিঁড়ি শৈলচূড়া—
ছুটিল সচল যেন অরণ্য ভূধর,
ছুটিল পুষ্পক শূন্যে মেঘমন্দ্রে ঢাকি,

নিনাদিল ধনুর্গুণ ইন্দ্রের কার্ম্মুকে,
ছাইল কলম্বকুল ঘনাম্বর-পথ,
সুরপুরী অন্ধকার হৈল ক্ষণকালে।
পড়িল কাম্বোজ, হলায়ুধ মহাসুর,
খরখুর, খড়ক পিঙ্গল, শ্বেতকেশ,
সেনাধ্যক্ষ আরো শত শত। ভঙ্গ দিল
দৈত্যদল রণস্থল ছাড়ি—ফেলি অস্ত্র,
গিরিশৃঙ্গ, মহাদ্রুমরাজি,—ফেলি রথ,
অশ্ব, হস্তী। ছুটিল তেমতি ঊর্দ্ধশ্বাসে—
বায়ু-মুখে উড়ে যথা কাশ। কিম্বা যথা
মহাঝড় উঠিলে ভূধরে, ধায় রড়ে
পশুপাল, পশুপাল সহ, ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণভয়ে পুচ্ছ তুলি করি ঘোর রব!
হেথা মহাসুর বৃত্র জয়ন্ত-উদ্দেশে
ছুটে ঝটিকার গতি। হেরি মহারথ
কার্ত্তিকেয় আদি সুর রক্ষিতে কুমারে,
চালাইলা দিব্য যান বেগে দ্রুততর;
ছুটিলা অনল, দিবাকর, অম্বুপতি,
বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জন ভীম দেব,
করাল অন্তকমূর্ত্তি যম দণ্ডধর।
জ্বালাময় তিন চক্ষু, ভীষণ হুঙ্কারি,
দাঁড়াইল দৈত্যরাজ, সুররথিগণে
হেরি দূরে! হেরি দৈত্যে যমদণ্ডধর
কালিম জলদবর্ণ, ঘোর স্বরে ভাষি,
কহিলা অমরবৃন্দে—"হে দেবসেনানি;
শ্রান্ত সবে, বহু রণে যুঝিলা তোমরা,
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম, আমি যুঝি
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।"
চাহি তবে
সম্বোধিলা বৃত্রাসুরে—"হে দানবপতি,
পরেতপতিরে আজি ভেট রণভূমে।"
প্রেতপতিবাক্যে বৃত্র দুর্জ্জয় হুঙ্কারি
কহিলা, 'হে ধর্ম্মরাজ, এত যদি সাধ
যুঝিতে বৃত্রের সহ—ধর দণ্ড তবে;
হের, দেখ রাখিনু ত্রিশূল, আজি ইহা
না ধরিব অন্য দেবরণে, ইন্দ্রসুতে
কিম্বা ইন্দ্রে না আঘাতি আগে।"
পার্শ্বদেশে
বিন্ধিলা, ভৈরবশূল মনঃশিলাতলে
দৈত্যপতি; ভীম গদা ধরিলা সাপটি,
ঘুরাইলা ঘনস্বনে; ঘুরাইলা যম
প্রচণ্ড করাল দণ্ড। দুই করী যেন
বনমাঝে রণমদে করে করাঘাত,
তেমতি আঘাতে দোঁহে দোঁহা! দণ্ড, গদা
প্রহারে বিদীর্ণ নভস্থল; ঘোর রব
উঠিল গগনে, ঘূর্ণপাকে ডাকে বায়ু,
চূর্ণ মনঃশিলা চারি চরণ-ঘর্ষণে।
দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে, কেহ নারে
নিবারিতে কারে, ভ্রমে নিরন্তর ঘুরি;
দুই ঘন মেঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর।
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ঘরে ঘুরায়ে,
অঘাতিলা ভীমাঘাত বৃত্র-মুষ্টিতলে!
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড—ফিরে বৃত্রগদা,
গজদন্ত-বিনির্ম্মিত বর্ত্তুল যেমন
প্রহারি অন্য বর্ত্তুলে। তখন অসুর
বামস্কন্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে
করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া।
যমরাজ বসিলা আঘাতে ভগ্নকটি,
দ্রুম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড়মড়ি।
তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল,
লক্ষ্য করি জয়ন্তের বিচিত্র পতাকা।
দিলা রড দেবরথিগণ ঝাড়বেড়ে
হেরি সে ভীষণ অস্ত্র। দূর হৈতে হেরি
চালাইলা পুষ্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে
মাতলি—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি
ঘর্ঘর নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি;
জয়ন্তের রথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া
দাঁড়াইল ক্ষণকালে। বিদ্যুতের গতি
বাসব অমরনাথ, ছাড়ি সে স্যন্দন,
আরোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশ্বর।

শোভিল সুনীল তনু তনুচ্ছদ ভেদি,
শুভ্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর !
স্ফটিক জিনিয়া স্বচ্ছ সুদিব্য কাচ,
শিরস্ত্রাণ—দৃঢ় জিনি কঠিন অয়স ;
অপূর্ব্ব কিরণছটা কিরীট আকারে
বেড়েছে নিবিড় কেশ—আভা ছড়াইয়া
স্বর্ণমেঘমালা যেন ঘেরেছে মস্তক !
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি—ভীষণ দম্ভোলি
শূন্যে তুলি সুরনাথ অশ্বে আরোহিলা ;
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়
মহাশূন্য ভেদ করি ; সুমেরু ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্যবপু—নগেন্দ্রসদৃশ ;
বক্ষঃ সমসূত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়া
স্থির হৈলা অশ্বপতি।—ডাকিল দম্ভোলি
শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।
ছাড়ি ঘোর ঘন স্বরে ভীষণ অসুর
কহিলা নিনাদি উচ্চে,—"হা দম্ভী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিবে সুতে বৃত্রের প্রহারে !
কর তবে এ শূল-আঘাত সম্বরণ
পিতা পুত্র দুইজনে"—
বেগে দিলা ছাড়ি।
ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল-অঙ্গে ! হেনকালে, হায়
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে,
বাহিরিল শ্বেত বাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূলমধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে।
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য-কোলে !
হেরিয়া দনুজপতি কাতর-হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
"হা শম্ভু, তুমিও বাম !" দগ্ধ হতাশ্বাসে
ছুটিলা উন্মাদপ্রায় হুঙ্কারি ভীষণ;
ছিন্নমস্ত রাহু যেন ! অগ্নি চক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্র ঘোর—দন্তে কড় নাদ।
প্রলয়-ঝটিকাগতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্দ্র-করে ভীম বজ্র—উচ্ছিন্ন করিতে
অসুবর। বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক্
জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর ! সে দহন
মহাসুর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বজ্র, ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী,
ছুঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে—
বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়,—কাঁপিল জগৎ,
উজাড় স্বর্গের বন, উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড ! গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে !
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল,
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চূর্ণ রেণুপ্রায় !
সে চীৎকারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক ! সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন !—মহাকাল
শিবদূত কৈলাস-দুয়ারে, নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে ! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে !
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার। ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবনমুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয় !"
এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্য্যোগে
ছিলা হতচেতপ্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন, বজ্র দিলা ছাড়ি ;

না ভাবিলা, না জানিলা ছাড়িলা কখন্।
ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্য-পথে,
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে; সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিঙ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল!
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল-শরীর,

বিশাল নগেন্দ্র তুল্য; ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে—পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে!
বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি!
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়!
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে
মুদিল নয়নত্রয় দুর্জ্জয় দানব!
দহিল ঐন্দ্রিলাচিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে
চিরদীপ্ত চিতা যথা! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে!

দশমহাবিদ্যা

সতীশূন্য কৈলাস

দীর্ঘ ত্রিপদী

ছিন্ন হৈল সতীদেহ,*
শূন্য হৈল শিবগেহ,
বামদেব বিরসবদন।
চাহেন কৈলাসময়,
দেখেন কৈলাস নয়,
অন্ধকার বিঘোর ভুবন॥
সতীমুখ-বিভাসিত
যে আলোক শোভা দিত,
পুলকিত কুসুম-কানন।
পেয়ে যে কিরণমালা,
সুবর্ণ মণি উজালা,
সে আলোক নহে দরশন॥
শুষ্ক কল্পতরু-সারি
শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,
শূন্যকোল সতীসিংহাসন।
নিস্তব্ধ জগৎ-প্রাণ,
নিরুদ্ধ সৌরভ ঘ্রাণ,
কণ্ঠে বদ্ধ বিহঙ্গকূজন॥
নন্দী শুয়ে রেণু'পর,
কান্দিছে বৃষভবর,
প্রাণশূন্য মৃগেন্দ্রবাহন।
হেরিয়া ত্রিপুরহর
দূরে রাখি বাঘাম্বর,
বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন॥
আনন্দ-আলয় যিনি,
আজি চিন্তাময় তিনি,
ধ্যানে ধরি সতীদেহ-ছায়া
ছুঁড়ে ফেলি হাড়মাল,
করে দলি ভস্মজাল,
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া
মুখে "সতী"—"সতী" স্বর
বিনির্গত নিরন্তর,
দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন।
করে জপমালা চলে,
মুখ "ববম্" বলে,
অন্য শব্দ সকলি মলিন॥
জটালগ্ন ফণিমালা,
মিলাইয়ে জিহ্বাজালা,
লুকাইল জটার ভিতর।
নিস্পন্দ পবনস্বন,
নিরানন্দ পুষ্পগণ
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণু'পর॥
থামিল গঙ্গার রব,
নির্ব্বাক্ প্রমথ সব,
কৈলাস জগৎ অচেতন।
কদাচিৎ "মা" "মা" নাদে,
অসম্বিৎ নন্দী কাঁদে,
"বম্" শব্দ সহ সম্মিলন॥
কৈলাস-অম্বরময়,
তারা সূর্য্য অনুদয়,
ক্ষণকালে নিভিল সকল।
তমঃ-ছন্ন দিগাকাশ,
কেবলি করে উল্লাস
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল॥

*সুদর্শনচক্রে ছিন্ন হইবার পর

ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ,
স্কন্ধে কভু তুলি হাত,
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার,
সুকুমার তনু তাঁর,
মমতার অভ্যাস যেমন॥
তখন নয়ন ঝরে,
পূর্ব্বকথা মনে সরে,
সরে যথা নদী-প্রস্রবণ।

বিশ্বনাথ শোকময়,
নিমীলিত নেত্রত্রয়
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন॥
হারায়ে অর্দ্ধাঙ্গ সতী,
কাঁদেন কৈলাসপতি,
যুগযুগান্তের কথা মনে।
জগতের জড় জীব,
কান্দিছেন হেরি শিব,
কান্দিতে লাগিলা তাঁর সনে॥

মহাদেবের বিলাপ

দীর্ঘ ভঙ্গত্রিপদী*

"রে সতি রে সতি", কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥
শবহৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ,
জগত-নিরূপণ জ্ঞানে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে॥
"রে সতি রে সতি", কান্দিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে॥
জলনিধি-মন্থনে, অমৃত উছালিল
যত সুর বাঁটিল তাহে।
ভস্ম-ভকত হর, হরষিত অন্তর,
গ্রাসিল গরল-প্রবাহে॥
"রে সতি রে সতি", কান্দিল পশুপতি
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, হরষিত অন্তর,
সংসাররতি-নিরবাণে॥
কারণবারি'পরে হরি কমলাসন
ঘৃণা করি যে ক্ষণ হেলে।

*(—) চিহ্নিত বর্ণ দীর্ঘ এবং অকারন্ত পদের অন্তেস্থিত 'অ' উচ্চারিত হইবে।

নির্ঘূর্ণ ত্রিনয়ন, আহ্লাদে সেইক্ষণ,
শব'পরি আসন মেলে ॥
প্রাত কমলাপতি রতনবর-পাত্রে,
নর-ভালে প্রীত গিরীশ।
পুষ্পকবাহন বাসব সুরপতি,
বৃষবর-বাহন ঈশ ॥
"রে সতি অরে সতি", কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥
ভিক্ষুক-আচরম, ঘুচিল অতঃপর,
তব সহ মেলন শেষ।
জটাধর শঙ্কর, নবসুখ-সাগর,
পরিশেষ সংসারিবেশ ॥
হরষ সুধাসম, হৃদয় উচাটিত,
দম্পতী-পরিণয়-বাসে
কত সুখে যাপন, অহরহ বৎসর,
দক্ষ-দুহিতা ছিল পাশে ॥
যোগ-ধরমপর গৃহস্থ-ধরমে
নিমগন এখন শম্ভু।
পান-পিয়াসরত সবহি আগম
চারিবেদ সাগর অম্বু ॥
"রে সতি অরে সতি", কান্দিল পশুপতি
পাগল প্রমথেশ শম্ভু ॥
কতবিধ খেলন, মূরতি-প্রকটন,
ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা।
থাকিবে চিরদিন, হৃদিপটে অঙ্কন
সে সব বিলসিত লীলা ॥
কুশা কেশিনীরূপে, রাজিলা যেহ দিন,
চারি হাতে বাদন ধরি।
শঙ্খ ডমরু বীণা নিনাদনে নাচিলে
ত্রিভুবন চেতন হরি ॥
দ্রব হ'ল বাসব, দেবী অমর সব,
আদ্রব বিধিহৃষিকেশ।
বিঁসরিতে নারিব সেই দিন-কাহিনী,
যে কাল রবে চিতলেশ ॥
"রে সতি অরে সতি", কান্দিল পশুপতি,
পাগর শিব প্রমথেশ ॥

সেহ যোগ-সাধন কি হেতু ঘুচাইলি
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি,
সে সাধ এতদিন পরে॥

"রে সতি রে সতি", কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥

নারদের গান

ধীরললিত ত্রিপদী

আনন্দ-ধ্বনি করি,
মুখে বলি হরি হরি,
নারদ ঋষি রত স্থললিত নটনে।
প্রবেশিলা হেন কালে,
ত্রিতন্ত্রী বাজে তালে,
বিচেত বিভুগানে ত্রিভুবন ভ্রমণে॥—
"কেবা হেন মতিমান্,
কে ধরে সেই জ্ঞান,
জানিবে স্থগভীর জগদীশ মরমে।
অনন্ত পরমাণু,
বিকট বিদ্যুদ্‌ভানু,
উদ্ভব কোথা হ'তে, কি হইবে চরমে?
হর হরি ব্রহ্মন্ সচেতন জীবগণ,
আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে?
মানস কিরূপ ধন,
জড়েই কি বিশেষণ,
জড় সনে সঞ্চারে কিবা বিধিমননে?
স্থখ কি জীবিতমানে?
কিবা অথ নির্ব্বাণে?
কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ স্বজন কার?
নিরমল বিধাতার
মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা?
ক্ষিতি অপ্ তেজ নভঃ,
ভিন্ন কি, এ কি সব?
পঞ্চ, কি আদিভূত অগণন গণনা?
সে তত্ত্ব-নিরূপণ
করিবারে কোন্ জন
সমর্থ দেব ঋষি মানবের ভাবনা?
গাও বীণা হরি-গান
দুর্ল্লভ যেই জ্ঞান,
নিষ্ফল মানি তারে পরিহর মানসে।
প্রকাশ মন-স্থখে
হরিনাম লিখি বুকে,
যে জ্ঞানে জীবলোক প্রকটিত হরষে॥
জগৎ কি স্থখধাম,
মধুর কি বিভুনাম,
গাও রে প্রেমভরে মনোহর বাদনে।
ঝঙ্কার ঝঙ্কার,
উল্লাসে বল আর
আহ্লাদ সদা কিবা সাধুজন-জীবনে!
ধরম ধরমপর
আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে॥

মোক্ষদ সার বাণী
শুনা রে জাগায়ে প্রাণী,
সুস্বরে নাদ করি রঞ্জিয়া পরমে
ত্রিগুণে যে গুণময়
যাঁ হ'তে এ সমুদয়
উচ্ছ্বাসে ডাক্ বীণা অবিরত
তাঁহারে।
দিবানিশি নাহি আন্,
সপ্তমে তুলি তান,
নারদ-মনোমত ধ্বনি, বীণা, বাজা রে ॥"

নারদের বীণাবাদন

ভঙ্গপদা পয়ার*

আনন্দগদগদ নারদ মাতিল।
তন্ত্রী তুলিয়া, তার্ মার্জ্জিত করিল ॥
মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে।
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে ॥
রুণু রুণু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া।
ক্রমে গুরু গর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া ॥
মিশ্রিত নানাস্বরে কভু উতরোল।
স্বর-সরিতে যেন খেলিছে হিল্লোল ॥
চেতন আজি যেন ঋষিবর হাতে।
বীণা ভাষিল ধ্বনি মধুর ভাষাতে ॥
রাগরাগিণী যত জাগ্রত হইল।
রূপ প্রকাশিয়া ত্রিভুবন রাজিল ॥
গ্রহ আদি ভাস্কর ছিল যত ভুবনে।
রোধিল নিজ গতি সঙ্গীত-শ্রবণে ॥
সুরলোক মোহিত মোহন কুহকে।
স্তম্ভিত বীণাপাণি সুরতান্ পুলকে ॥
কৈলাস-তামস বিরহিত নিমিষে।
মধুঋতু ভাতিল মনের হরিষে ॥
আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল!
আনন্দে তরুডাল বিহঙ্গে সাজিল ॥
শিব-শিবাবাহন বৃষভ কেশরী।
চঞ্চল-চিত উঠে হরষেতে শিহরি ॥
সে ধ্বনি পশিল শিবহৃদি ভেদিয়া।
জাগিল পশুপতি ঈষৎ চেতিয়া ॥
"ববম্" শবদ নিনাদি সদানন্দ।
মেলিলা-ত্রিলোচন মৃদু মৃদু মন্দ ॥
নিরখিলা নারদে প্রমত্ত বাদনে।
বিহ্বল শঙ্কর ভকতের সাধনে ॥
সাদরে তুষি তাঁরে কাছে দিলা স্থান।
ভোর হইলা ভোলা শুনে বীণাগান ॥

* হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে অকারান্ত পদের অন্তেস্থিত 'অ' এবং গুরুবর্ণ যথাযথ উচ্চারিত হইবে।

শিবনারদ-সংবাদ

লঘুত্রিপদী

চেতন পাইয়া চেতনানন্দ
নারদ সঙ্গীত শ্রবণে।
ঈষৎ হাসিতে অধর-মণ্ডিত
কহেন সুধীর বচনে ॥—
"অহে ভক্তিমান্ ভ্রান্তিবিলাসে
শিবেরো প্রমাদঘটনা।
অনাদ্যারূপিণী ভবপ্রসবিনী
সতীরে মানবীভাবনা!
আমারি এ ভ্রম স্নেহেতে যখন
না জানি তখন ভুবনে;
ভালবাসাময় জগত নিখিলে
যমব্যথা কত জীবনে!
মমতা মায়াতে জগতের লীলা
খেলিছে আপনা আপনি।
মমতা মায়াতে সকলি সুন্দর,
পশু পক্ষী নর অবনী ॥
জীবনে জীবন এ ডোরবন্ধন,
যদি না থাকিত জগতে।
বিধু বিভাকর সকলি আঁধার
হইত অসার মরতে ॥
বুঝে তথ্য সার কুহকের হার
নারায়ণ জীব-পালনে,
রচেন কৌশলে সোণার শিকলে
পরাণী বাঁধিতে বন্ধনে—
শুন হে নারদ, সে প্রমাদ নাই
তোমার গভীর বাদনে।
চৈতন্যরূপিণী সতীরে আবার
নিরখিতে পাই নয়নে ॥
পরমাপ্রকৃতি পরমাণু-মূল
কারণকলাপ-মালিনী।
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা
নিখিল অঙ্কুররূপিণী ॥
নিরখি আবার লীলাবিলাসিনী
ব্রহ্মাণ্ড জড়ায়ে বপুতে।
ক্রীড়ারঙ্গে রত প্রমত্ত মহিলা
নিবিড় রহস্যমধুতে ॥"
বলি বিশ্বনাথ জাহ্নবী-প্রপাত
জটা হ'তে দিলা খুলিয়া।
ববম্-ধ্বনি উঠিল তখনি
কৈলাস-আকাশ পুরিয়া ॥
হেরি মহাদেবে এ হেন প্রকৃতি
নারদ চকিত মানসে।
জিজ্ঞাসিলা হরে কি মূরতি ধ'রে,
দক্ষসুতা এবে নিবসে ॥
"হে শিব শঙ্কর মম দুঃখ হর
কৃপাতে কহ গো তনয়ে।
দয়াময়ী শিবা প্রকাশিলা দিবা
উদিয়া কিবা সে আলয়ে ॥
জননীর স্নেহ না জানি ভবেশ
না পশি কখনও জঠরে।
ব্রহ্মার মানসে জনমে নারদ,
জননী কভু না আদরে ॥
সে ক্ষোভ আমার ছিল না, দেবেশ,
দাক্ষায়ণীস্নেহ-সুধাতে।
জননী পেয়েছি যখনি কেঁদেছি
প্রাণের পিপাসা ক্ষুধাতে!
কহ, ত্রিপুরারি, কোথা গেলে তাঁরি,
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙা চরণ, মনের মতন,
সাধনে আবার পুজিব।"
নারদে কাতর হেরি কন হর
"অধীর হইও না ঋষি।

দেখিবে এখনি মহামায়াকায়া-
ছায়া আছে বিশ্বে মিশি ॥
বিশ্ব-আবরণ হবে নিবারণ
দেখিবে এখনি নিমিষে।
বিশ্বরূপধরা বিশ্বরূপহরা
খেলেন আপন হরিষে ॥
দেখিবে এখনি অনাগ্ধা মূরতি
অপার আনন্দে মাতিয়া।
বিশ্বারূপ দশ ভুবন পরশ
করেছে আকাশ জুড়িয়া ॥
মহাযোগী যায় দেখিতে না পায়
সে রূপ দেখিবে নয়নে।
এই ভবলীলা যেবা বিরচিলা
দেখিবে সে আদি কারণে

শিবকর্ত্তৃক সৃষ্টি-আচ্ছাদন অপসারিত

ত্রিপদী পয়ার*

মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকালে ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল ॥
বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর ঘটা ভীম জটা আকাশেতে উঠিল॥
ছড়াইল জটাজাল দিকে দিকে ছুটিয়া।
দীপ্ত যেন তাম্রশলা ভানুকরে ফুটিয়া ॥
হিমময় ধবলের গিরি যেন উঠেছে।
শূন্যপুরী শিরে করি বিশ্ব'পরে ধরেছে ॥
মৌলিদেশে কলকল তরঙ্গিণী জাহ্নবী।
ঝরিতেছে ঝরঝর শতধারা প্রসবি ॥
শশিখণ্ড ধবক্ ধবক্ জলিতেছে কপালে।
ত্রিনয়নে তিন ভানু জলে যেন সকালে ॥
ব্রহ্ম-অণ্ড যেন খণ্ড মেরুদণ্ড পরিয়া।
বিশ্বনাথ উর্দ্ধহাত কৌতূহলে পুরিয়া ॥
ওঁকার তিনবার উচ্চারিয়া হরষে।
ব্যোমকেশ বিশ্বতনু ধীরে ধীরে পরশে ॥
শ্বাসরোধ করি ভীম শুষিলেন অচিরে।
বিশ্ব-অঙ্গ লুকাইল মহাকাল-শরীরে ॥
একে একে জগতের আভরণ খসিল।
চন্দ্র-তারা-রশ্মি মেঘ অভ্রসনে ডুবিল ॥
গিরি নদ পারাবার ছিল যত ভুবনে।
অনুক্ষণ অদর্শন মহাদেব-শোষণে ॥
স্বর্গপুরী রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব-অঙ্গে মিশিল ॥
ঘুরে ঘুরে শূন্যপথে বিশ্বকায়া ধায় রে।
ঝড়ে যেন অরণ্যেরে পল্লবেতে ছায় রে ॥
জগতের আবরণ নিবারণ পলকে।
দাঁড়াইলা মহাদেব বিভাসিত পুলকে ॥
বিশ্বময় ঘোরতর অন্ধকারে ঢাকিল।
শিবভালে প্রজ্বলিত হুতাশন জ্বলিল ॥
দাঁড়াইলা মহেশ্বর করপুট পাতিয়া।
ধরিলেন বিশ্ববীজ-পরমাণু তুলিয়া ॥
গরাসিলা বীজমালা গণ্ডুষেতে শুষিয়া।
দাঁড়াইলা মহেশ্বর হুহুঙ্কার ছাড়িয়া ॥
মহাকাশ পরকাশ বিশ্বশূন্য ভুবনে।
শূন্যময় ব্যোমগর্ভ নীল অভ্রবরণে ॥
অতি স্বচ্ছ পরিষ্কৃত পারদের মণ্ডলী।
ছড়াইয়া আছে যেন দিক্‌চক্র উজলি!
ভবদেব বিশ্বকায়া আবরণ খুলিয়া।
কহিলেন নারদেরে "হের দেখ চাহিয়া ॥"
ব্যোমকেশ-রূপ ত্যজি মহাদেব বসিল।
মহাঋষি চমকিত পুলকেতে পুরিল ॥

* প্রত্যেক পংক্তিতে তিন তিন পদ; প্রথম দুই পদের আট অক্ষরের পর মধ্য যতি এবং শেষ পদের সর্ব্বশেষে পূর্ণ যতি। শেষ পদ কিছু দ্রুত উচ্চারিত।

নারদের মহাকাশ দর্শন

দ্রুতললিত পয়ার । *

মহাঋষি নারদ পুলকিত হরষে ।
অনিমেষ লোচনে নিরখিছে অবশে ॥
চক্ররেখাতে ঘুরি সারি সারি সাজিয়া
দশদিকে শোভিতে দশপুরি হাসিয়া ॥
পরতেক মণ্ডলে মহারূপ-ধারিণী ।
লীলানিরত সতী স্মরহর-ভামিনী ॥
চক্রজঠর-ভাগে নীলবর্ণ আকাশে ।
শত শত সুন্দর ব্যোমরথ বিকাশে ॥
খেলিছে কতদিকে কতমত ক্রীড়নে ।
দামিনীলতা যেন ঘনঘটা মিলনে ॥
চক্রগতিতে রেখা গগনেতে পড়িছে ।
বক্র কিরণ ঋজু কিরণেতে কাটিছে ॥
পূর্ণ বর্ত্তুলাকার কভু ডিম্বশোভনা ।
সুন্দর নানা গতি নানারেখা চালনা ॥
রুনু রুনু গুঞ্জন রথগতি-স্বননে ।
কোটি নক্ষত্র যেন বিহারিছে ভ্রমণে ॥
অনন্ত পথে গতি অনন্ত গণনা ।
মঞ্জুল মনোহর ব্যোমযান খেলনা ॥
নিরখিলা নারদ বিকলিত মানসে ।
অন্ত্য সূরয তারা সে গগন পরশে ॥
কিবা আলো উজ্জ্বল সেহ দশ ভুবনে ।
নরলোকে সে আলো নাহি জানে স্বপনে ॥
দিনমণি হেথা যায় সেথা তায় রজনী ।
রাজিছে দশপুরি নিন্দিয়া অবনী ॥
পরাণী কতই খেলে দশপুরি-ভিতরে ।
মধুর কতই ধ্বনি জীবকণ্ঠে বিহরে ॥
বায়ু পথে শিক্ষিত প্রাণিগণ-ভাষাতে ।
ভাসিত তারা শশী মধুকণ্ঠধারাতে ॥
নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা ।
"হে শিব, দাসানুজে কৃপা যদি করিলা ॥
বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি ।
মোহন মায়া ইহ কে বা আছে বিথারি ॥"
মৃদু হাসি রঞ্জিল মহাদেব-বদনে ।
বিচলিত কৈলাস মৃদু মৃদু চলনে ॥

---

* প্রত্যেক পংক্তিতে দুই চরণ, প্রত্যেক চরণ দ্রুত পাঠ্য । (—) চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং অকারান্ত শব্দের অন্তেস্থিত 'অ' উচ্চারিত হইবে ।

ধীরমৃদুলগতি কৈলাস চলিল।
মধ্য গগনভাগে শিবপুরি বসিল।
দশদিকে সুন্দর দশপুরি রাজিত।
কেন্দ্র নিমজ্জিত কৈলাস থাপিত।
দেখিল ঋষিবর অনিমেখ নয়নে।
মুরতি অপরূপ সেহ দশ ভুবনে॥

মহাশূন্যে দশ ব্রহ্মাণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ

দীর্ঘ ললিতত্রিপদী

১

নিরখে নারদ ঋষি কতই আনন্দে রে
নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত!
রজনীতে তারকায় যেখানে গগনগায়
সিংহের আকার ধরি রাশিচক্রে ফিরিত;
সেইখানে মনোহর, অভিনব শোভাধর,
নবীন ভুবন এক—প্রভাজালে জড়িত!—
বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে।
কালরূপিণী কালী সে ভুবনে হাসিছে॥

২

নিরখে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে!
উদয় গগনগায় গুটিকত তারকায়
মানবকন্যার রূপে যেইখানে থাকিত,
সে ভুবন বামদেশে ব্রহ্মাণ্ড নবীন বেশে
উদয় হয়েছে শূন্যে দিক্‌চক্র শোভিত!—
কন্যারাশি-কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।
তারা-রূপিণী বামা সে ভুবন শাসিছে॥

নেহারি নারদ ঋষি কুতূহলে মাতিল!
মনোহর নভঃপটে আকাশের সেই তটে

আগে যেথা ধনুরূপে তারারাজি আছিল,
সেইখানে মহাঋষি কুতূহলে দেখিল !—
ভীম ব্রহ্মাণ্ডকায়া এবে সেথা ভাসিছে।
ষোড়শী-রূপে বামা সে ভুবনে হাসিছে ॥

৪

পুলকিত মহাঋষি পুনঃ হেরে প্রমোদে !
বারিকুম্ভ কাঁখে করি যেখানে গগনোপরি
তারকারূপিণী যত সখীগণে খেলিত ;
সেখানে সে রাশি নাই, ঘেরেছে তাহার ঠাঁই
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক কিরণেতে ভাসিত।
অপরূপ প্রভাময় বিশ্ব সেথা ফুটেছে।
বামা ভুবনেশ্বরী-রূপ তাহে সেজেছে ॥

৫

নেহারে নিকটে তার নারদ উন্মনা রে !
বিচিত্র জগত-কায়া, অনন্ত ধরেছে ছায়া,
ফুটেছে অনন্ত শোভা, কিবা তার তুলনা,
নেহারে স্তিমিত হয়ে, নারদ উন্মনা !—
রাশি-চক্রেতে যথা মকর ভাসিত।
ভীমা ভৈরবী বিশ্ব সেখানে উদিত ॥

৬

মহাঋষি নিরখিল উচাটিত পরাণে—
সুদূর গগনকোলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড দোলে,
মহাকায়া বিথারিয়া সেই মত বিধানে।
মহাঋষি নেহারিল উচাটিত পরাণে !—
মিথুন ডুবেছে শূন্যে সে ভুবন-ছায়াতে।
জগৎ দুলিছে বেগে ছিন্নমস্তা-মায়াতে ॥

৭

স্তম্ভিত মহাঋষি মহামায়ানটনে !
নিরখে ভুবন আর, ঘোরতর রূপ তার,
তারার কর্কটশোভা ছিল যেথা গগনে,
সেখানে সে রাশি নাই মহামায়ানটনে।—

সেহ ঠাঁই এক্ষণ সেই রাশি ডুবেছে।

ধুমাবতী- রূপিণী সে ভুবনে বসেছে ॥

৮

মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে,
নেহারিতে মনোহর, সে মহাগগন'পর,
সুন্দর শোভাযুত মণ্ডল ঝলসে,
মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে !—

রাশিচক্রেতে বৃষ যেইখানে থাকিত !

ভীমা বগলাবিশ্ব এবে সেথা উদিত ॥

৯

বিমোহিত অন্তরে মহাঋষি নেহারে,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকায়া কাছে তার বিহারে !
কিবা মনোহর বেশ ধরেছে গগনদেশ,
মহাশূন্য বিভাসিত সে ভুবন আকারে !
মহাঋষি নিরখিলা বিমোহিত অন্তরে ॥—

মাতঙ্গী-ভুবন এবে সে আকাশে ফুটেছে।

মীনরাশি মজ্জিত কোন্‌খানে ডুবেছে !

১০

নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে

মণ্ডিত-কির-থির মঞ্জুল গগনে।—

নিরখিলা নারদ, কৌতুকে গদগদ,

রমপুরী রঞ্জিত সুন্দর বরণে,

নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে !—

শ্বেত বারণ বারি চারি কুম্ভে ঢালিছে ।

কমলাত্মিকাবিশ্ব, মহাশূন্যে শোভিছে ॥

শিবনারদবার্ত্তা

ললিত পয়ার

নারদ কাতর হেরি আদ্যাশক্তি-রঙ্গিমা ।
শিবে ক'ন, এ কি দেব, কিবা দেখি মহিমা
তত্ত্বচিন্তা করি ফিরি ভবপুরী ভিতরে ।
না দেখিনু হেন রূপ কোন ঠাঁই বিহরে ॥
এ কি মায়া মহামায়া জড়াইলা জগতে !
এ দশ ভুবন মাঝে লহ, দেব, ভকতে ॥
কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা ।
হেরিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা ॥
শুনি শিব ক'ন, ঋষি, নিকটে না যাও রে ।
কৌতুক-বিলাস-বেগ এখানে জুড়াও রে ॥
বুঝিতে নিগূঢ় তত্ত্ব শিব ব্যর্থবাসনা ।
সে রহস্য বুঝিবারে কেন চিত্তে কামনা ॥
নারিবে হেরিতে সর্ব্ব হেরিবে যা সেখানে ।
মনোব্যথা পাবে বৃথা ও ভুবন সন্ধানে ॥
ভয়ঙ্করী মায়ালীলা অসহ সে সহনে ।
বিধি বিষ্ণু পরাজিত নাহি সহে কল্পনে ॥
সে রহস্য নিরখিতে নিকটে না যাও ।
এখানে যা পাও তাহে বাসনা মিটাও ॥

নারদ।—পাব না কি সতীনাথ, সৎস্বরূপা হেরিতে ?
ভক্তিমালা পায়ে দিয়ে জগদম্বা পুজিতে ?
হে হর শঙ্কর, পুরিল না বাসনা !
নারদের বৃথা জন্ম বৃথা ধর্ম্ম-যাপনা !

শিব।—হবে না হবে না, ঋষি, বৃথা তব সাধনা।
ভক্তে কি রে ভক্তাধীন পারে দিতে বেদনা ?
ভবকেন্দ্র এই স্থান জানিও রে গেয়ানী।
দিবাসন্ধ্যা এইখানে সদা প্রাণি-মেলানি ॥
মহাবিদ্যা-দশপুরী না করি' প্রবেশ।
জগতের জটিলতা বুঝহ বিশেষ ॥

ললিত দীর্ঘত্রিপদী

নারদে আনন্দ তায়, দেখিল গগনগায়
আকাশ উজ্জ্বল করি প্রাণিগণ চলেছে।
বসন-ভূষণ-ছাঁদে মানব-নয়ন ধাঁধে,
বরণে অঙ্গের আভা জ্যোৎস্না যেন ধরেছে !
আকাশ উজ্জ্বল করি প্রাণিগণ চলেছে ॥
পবনে উড়িছে বাস, কঠোর মধুর ভাব,
কঠোর মধুর রসে রসনাতে ভরেছে,
হৃদয় দর্পণছায়া বদনেতে পড়েছে !
আকাশ উজ্জ্বল করি প্রাণিগণ চলেছে ॥
নানাবন্ধে বাঁধা চুল যেন বা শিরীষ ফুল,
কিরণে কাহারও কেশ বিথারিয়া পড়েছে ॥
বিবিধ-বরণ প্রাণী শূন্যপথে চলেছে !
তার মাঝে অগণন নিরখিলা তপোধন
বিমানেতে প্রাণিগণ বায়ুপথে চলেছে,
হৃদয়দর্পণছায়া বদনেতে ফুটেছে ॥
প্রতি জনে জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার,
নানা-পাশ নানা ফাঁশে গলদেশে পরেছে।
বিবিধ শৃঙ্খলহার কর-পদ বেঁধেছে—
কত প্রাণী হেন-রূপে বায়ুপথে চলেছে !

ঋষি ক'ন, মহাদেব, এ কি দেখি যোজনা।
কারা এরা, কহ হেন, সহে এত যাতনা?
এরূপে শৃঙ্খলে বাঁধা, কে ইহারা কহ গো।
ভবনাথ, তব দাসে ভবঘোরে রাখ গো॥

জ্ঞানময় যত জীব, সদানন্দ কন।
সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণিগণ॥
মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা।
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ে বেদনা॥
আধভাঙ্গা সাধ যত পরাণে জড়ায়।
অসুখে কতই দুখে জীবনে পোয়ায়॥
দেবতুল্য বাসনায় উর্দ্ধদিকে গতি।
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দগ্ধমতি॥—
মানবের নাম এরা জীবলোকে ধরে রে,
অসুখী পরাণী যত জগতী-ভিতরে রে!

দয়াময়! হর তবে সেই সব বন্ধনী।
মানবের পীড়া যায় সদা দিবারজনী॥
হর তবে তাহাদের দেহ রূপ পিঞ্জরে,
মন-শিখা বাঁধা যাহে ধরা হেন বিবরে!
ফেল তবে ষড়রিপু-রজ্জুমালা ছিঁড়িয়া।
আশানল লহ, দেব, হৃদি হ'তে তুলিয়া॥
হর তবে অন্ধকার জীবনের যামিনী।
হর গো কুহকজাল আলো কর অবনী॥
মানবের চিত্তমাঝে হেমময় মন্দিরে।
স্ফটিকের মূর্ত্তি যত চূর্ণ হয় অচিরে,
নিবার কালেরে, দেব, ভাঙ্গিতে সে সব—
ধরাতে তবে গো সুখী হইবে মানব॥

শিব ক'ন, হের ঋষি, অই সব ভুবনে।
যেখানে খুলে রে জীব জীবদেহ-বন্ধনে॥
মহাবিদ্যা দশ পুরি হের অই আকাশে।
অদ্যাশক্তিরূপে সতী লীলা যাহে প্রকাশে॥

নারদের মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন

লঘুললিত ত্রিপদী

শিব-বাক্যে ঋষি নারদ তখন
হেরিলা অনন্ত দেশ।
হেরিলা গগনে সে দশ ভুবন,
অপূর্ব্ব নবীন বেশ!—
যুড়ি দশ দিক জ্বলে দশ পুরি
অদ্ভুত আভা তায়।
অনন্ত উজ্জ্বল সে আলো-ছটাতে
অনল নিবিয়া যায়!
দেব-ঋষিবর আত্মাশক্তি লীলা
দেখিতে তুলিলা আঁখি।
পলক না পড়ে স্থির নেত্রতারা
ক্ষণমাত্র শূন্যে দেখি॥
বিশ্ব অন্ধকার দেখে তপোধন
দৃষ্টিহারা চক্ষু দহে।
দুরন্ত কিরণে কাতর নারদ,
অন্ধের যাতনা সহে!
বুঝি মহেশ্বর ইঙ্গিতে তখন,
ললাট বিস্ফার করি।
সে বিষম তেজ রাখিলেন নিজ
ললাটলোচনে ধরি॥
নিস্তেজ যখন, সে ঘোর কিরণ,
নারদে কহেন হর।
"অই দেখ ঋষি, অনাদি ভুবনে
শক্তিলীলা নিরন্তর॥"
অভয় হৃদয়ে হেরিয়া নারদ
শিব-বরে চক্ষু লভি।
দেখিলা শূন্যতে দুলিছে সঘনে
ভীষণ ব্রহ্মাণ্ডছবি॥
তাম্রবর্ণ যথা দিবাকর-কায়া
ডুবিলে রাহুর গ্রাসে।
দেখিতে তেমতি সে ভীম ব্রহ্মাণ্ড
অঙ্গে আভা পরকাশে॥

রুধিরের ধারা চারি ধারে বহে,
বসুধারা যেন ধায়।
সে ঘোর জগৎ জীবে নিরখিলে
হৃদয় শুকায়ে যায়॥
বহিছে উচ্ছ্বাস, সে জগৎ পুরি,
অম্বর বিদার করি।
প্রলয়ের ঝড় বহে যেন দূরে
অরণ্য নিশ্বাসে ভরি!
কিম্বা যেন হয় লক্ষ তূরিনাদ
পুরিয়া শোকের তানে—
তেমতি প্রচণ্ড দারুণ উচ্ছ্বাস
নিনাদে ঋষির কাণে!
দয়াময় ঋষি নিদারুণ ধ্বনি
শ্রবণে বিষাদ প্রাণে।
মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে শিবপদে
জীববৃন্দ-শোকগানে!
চেতন পাইয়া চেতন-আনন্দ
শিববরে পুনর্ব্বার।
নয়নে গলিত দর অশ্রুধারা,
হৃদয়ে বেদনাভার॥
নিরানন্দ-চিতে সদানন্দ ঋষি
কহেন কাতর মন।
"হে শিব শঙ্কর জীবে দয়া কর
নিবার ভব-ক্রন্দন॥
জীবদেহ ধরি জীবের ক্রন্দনে
হৃদয়ে বেদনা পাই।
না কাঁদে পরাণী ত্রিলোক ভিতরে
নাহি কি এমন ঠাঁই?
তুমি আশুতোষ, তব ভক্ত আমি,
গূঢ় তত্ত্ব নাহি জানি।
জীব-দুঃখে, দেব, রোগ কিম্বা শোকে,
নিয়ত কাঁদে পরাণী॥

নারদের ঠাঁই ত্রিভুবনে তাই
কোনওখানে নাহি মিলে।
বেড়াই ঘুরিয়া ত্রৈলোক্য যুড়িয়া
বিষ্ণুনাম করি নিখিলে ॥
জননী আমার সতী শুভঙ্করী
তুমি, দেব, পিতাসম।
তবু কি কারণ এ দীন পরাণে
এরূপে আঘাতে যম!"
শুনিয়া কাতর দেব-ঋষীশ্বর
মহেশ্বর ক'ন বাণী।—
"শুন তপোধন না কাঁদে পরাণে
নাহিক এমন প্রাণী।
কিবা দেব নর, ব্রহ্মাণ্ড ভিতর,
জীবদেহ ধরে যেই।
যমের তাড়না, রিপুর যাতনা,
হৃদয়ে ধরে রে সেই ॥
জীবের জীবনে সে দৃঢ় বন্ধন
দেখিতে বাসনা যার।
হৃদয়-বেদনা, সমূহ যাতনা,
পরাণে জাগিবে তার ॥
আদ্যাশক্তিবলে, যে নিয়ম চলে,
অনাদি যাহার মূল,
নিরখিবে যদি হের দশ রূপ,
ভবার্ণবে পাবে কূল ॥"

মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড

লঘুভঙ্গ পয়ার

মহাঋষি নিরখিলা
মহাশূন্যে ঘুরিতেছে
দলমল্ টলমল্
তুলে দেন চক্রনেমি
হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে
ধূমকেতু ভীমগতি
আপনার বেগে স্থির
স্রোতরূপে খেলে তাহে
সচেতন অচেতন
কৃমি কীট প্রাণিকায়া
বিশ্বরূপ প্রাণী জড়
ঘোররূপা মহাকালী
অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ
করাল বদনা কালী
ঘুরে ঘুরে শূন্যদেশে
বিভীষণ চিত্র এক
কালিকার জগতী!
ভয়ঙ্কর মূরতি ॥
আপনার ভ্রমণে!
অতি দ্রুত গমনে ॥
নাহি ধরে কল্পনা।
নহে তার তুলনা ॥
মেরুদণ্ড উপরি।
বেগধারা লহরী ॥
যত আছে নিখিলে।
জনমে সে কল্লোলে ॥
জন্মে যত সেখানে।
গ্রাসে মুখব্যাদানে ॥
বেগধারা বিহারে।
নৃত্য করে হুঙ্কারে ॥
বিশ্বকায়া ফিরিল।
নেত্রপথে ধরিল ॥—

অন্তহীন হিমরাশি হিমালয় আকারে,
ধবলের চূড়া যেন ধূ ধূ করে তুষারে!
নিরখিলা মহাঋষি বিথারিত নয়নে।
প্রলয়ের ঘোর বহ্নি হিম দহে দহনে॥
খণ্ড হয়ে হিমরাশি চণ্ডমূর্ত্তি ধরিয়া।
ভীমশব্দে পড়িতেছে মহাশূন্যে খসিয়া॥
ব্রহ্মাণ্ডের লয় যেন কালান্তের নিনাদে।
বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ- পুরী কাঁপে শবদে॥
প্রতিধ্বনি ঘনঘোর মহাকাশে ছুটিল।
দশ দিকে দশ বিশ্ব ঘন ঘন দুলিল॥

দ্রুত ঘনপদীচ্ছন্দ*

নারদ ঋষিবর কম্পিত থরথর
বিশ্ব-বিদারণ হুঙ্কার শ্রবণে।
মানস বিচলিত নেত্র বিকাশিত
সংযুত শ্রুতিপথ নিরখিলা গগনে॥
নিরখিলা অম্বরে অন্য মূরতি ধ'রে
চণ্ডিকা-মহাপুরী পুনরপি ফিরিল।
পুনরপি দুঃসহ দৃশ্য ভয়াবহ
শক্তি-কেলিক্রম প্রকটিত করিল॥
দেখিল স্রোতময়, খেলিছে বীচিচয়,
শোণিত-অর্ণব কলকল ডাকিছে।
শুক্তি শম্বুক শাখ মুখব্যাদান ফাঁক
রক্তজলধিদেহ লেহি লেহি চলিছে
পন্নগ সুভীষণ ফটা-প্রসারণ
উৎকট-গর্জন তরঙ্গে দুলিছে।
কূর্ম্ম কমঠীকুট উর্ম্মিতে লটপট
লোহিত তৃষাতুর সংপুট খুলিছে॥
শ্বাপদ হৃদি ক্রূর শার্দ্দুল কুক্কুর
লোলরসনা তুলি সিন্ধুতে ভাসিছে

* (—) এইরূপ চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ, এবং পদের অন্তেস্থিত 'অ' স্পষ্ট উচ্চারিত হইবে।

উদ্‌ভিজ্জগণও তাহে স্বদেহ অবগাহে আদ্যা প্রকৃতিরূপ সে জগতে ফুটিছে।
রক্তপিসাসু হয়ে শোণিত শুষিছে॥ 'সংহার্ সংহার্' ভিন্ন নাহিক আর
অ-চিন্ত্য লীলা সেহ, না বুঝে মানব কেহ, রক্ষিতে নিজ নিজ এ উহারে গ্রাসিছে॥

ললিত পয়ার

দয়ার্দ্রচিত ঋষি মহাদেবে কহিলা।
"এ কি দেব ঈশ্বর, মা আমার মহিলা॥
উৎকট ইহ লীলা তাঁহারে কি সম্ভবে?
সতী কি অশিব, শিব, আছিলেন এ ভবে?
জীব-দুঃখ তবে কি গো অনাদ্যারি রচনা?
অদম্য তবে কি, দেব, পরাণীর যাতনা?
জগৎ-সৃজন-লীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে!
না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেবশরীরে!
এ চণ্ড বিদ্যুত-দ্যুতি কেন দিয়ে পরাণে,
কাঁদাইছ জীবলোক মায়াডোর বন্ধনে?
তত্ত্বাতত্ত্ব নাহি বুঝি তব ভক্ত, ঈশ্বর,
না বুঝি তোমার, দেব, কি কঠোর অন্তর॥
ভক্তগণে দিয়ে ক্লেশ নিজে কর ভঙ্গিমা।
না জানি জগদ্বন্ধু, এ কি তব মহিমা!"
স্মরহর শঙ্কর কহিলেন নারদে—
"সর্ব্বদুঃখ দমনীয় মুক্তি আছে বিপদে॥
জানিবি রে নিরখিবি যবে অন্ত ভুবনে।
বিরাজিতা সতী যাহে জীবদুঃখ-হরণে॥"

ললিত ত্রিপদী

হেন কালে সুবিচল
মহাঋষি নিরখিল
কালরূপিণী চণ্ডী কালিকার ভুবনে।
বিখণ্ডিত নরদেহ
পড়ে পচা শব সহ,
রুধিরে মুষলধারা, ধরা যেন শ্রাবণে!
জনমিছে পুহু তায়
পশু-পক্ষী-নর-কায়
সংগ্রামে পুনরায় এ উহারে বধিছে!
জীবন-ধারণ হেতু
ভবের কলঙ্ককেতু
কাহারও নাসিকা নাই,
কারও মুণ্ড ঝুলিছে!
কেহ নিজ মুণ্ড কাটে,
জীয়ে পুহু রক্ত চাটে,
শাঁকিনীরূপিণী ঘোরা
কালিকারে ঘেরিয়া।
অস্থি ঝরিছে অঙ্গে,
মাংস ঝরিছে সঙ্গে,
কাঁদে জীব উচ্চনাদে
তারা নাম ডাকিয়া॥

কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে
ছুটিছে তাদের সঙ্গে
খিলি খিলি হাসি মুখে
কি বিকট ভঙ্গিমা
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া
করে করতালি দিয়া,
ডাকিনী ধাইছে কত—
সৃক্কণী রক্তিমা!
জগতে যতেক মন্দ
চলেছে ডাকিনীবৃন্দ,
ললাটের ঘোর ছটা উৎকট ছুটিছে,
রুধিরবন্দনা বামা
ত্রিনয়না ঘোর শ্যামা,
বহ্নি বরুণ বায়ু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিছে;
জড় প্রকৃতির ছলে
শবদেহ পদতলে—
নৃমুণ্ডমালিনী কালী
হুহুঙ্কারি নাচিছে।
সংহার নিরূপণ
রদনেতে বিদারণ
শিশুকর কড়মড়ি চর্ব্বণে গিলিছে!

লতিকাপদী

সদানন্দ ঋষি নিরানন্দ মন
কহেন তখন শঙ্করে।
দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা,
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে॥
এ ঘোর রহস্য পারি না সহিতে,
দেখাও আমারে জননী!

যিনি সতীরূপে সংসার-পালিকা
সর্ব্বজীবদুঃখহারিণী।
না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্
ভূতেশ কহেন নারদে!
দুঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা,
মোচন আছে রে আপদে॥

কণামাত্র তার হেরিলা নয়নে,
অনাদ্যার আদি জগতে।
পূর্ণ-সুখ ইহ-জগত-ভাণ্ডারে,
দেখিতে পাবিরে পশ্চাতে ॥
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী,
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন,
এমনি বিধানে যোজনা ॥
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,
অনন্ত জীবিতমণ্ডলী ॥

শুনিয়া নারদ কহিলা শঙ্করে,
নারিব হেরিতে নয়নে।
প্রচণ্ড প্রভাত আদ্যাশক্তিলীলা
নিগূঢ় ও সব ভুবনে ॥
কহ ক্ষেমঙ্কর, দাসে ক্ষমা করি,
বচনে জুড়ায়ে পরাণী।
কোন্ বিশ্বমাঝে কিবা রূপ ধরি
ক্রীড়াতে নিরতা ভবানী ॥

দেব আশুতোষ কহিলা ঋষিরে,
অম্বরে দেখ রে নেহারি।
পরে পরে পরে জগতীমণ্ডল
রয়েছে গগনে বিথারি ॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরি শক্তিরূপা
জীবের নিস্তার কারণে।
হের ঋষি অই তারার ভুবন
উজলিছে কিবা গগনে ॥

(২) তারামূর্ত্তি

ধীর যমপদীচ্ছন্দ

ভীমা লম্বোদরা ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরা,
খর্ব্ব আকৃতি বামা নৃমুণ্ডমালিনী।
জটা-বিভূষণা পিঙ্গল-বরণা
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী।
খড়্গ কত্তরী করে কপাল উৎপল ধরে,
রক্তিম রবিচ্ছবি দৃশ্য ত্রিনয়নে।
জলন্ত চিতামাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে,
লোলরসনা বামা ঘোর হাসি বদনে ॥—
জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহৃদয় ভরি
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে ॥

(৩) ষোড়শী

নেহার তাঁর পাশে কি জ্যোতি দেহে ভাসে,
শ্বেতবরণ বামা পূর্ণকলা কামিনী।
প্রেমসঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে
ঐখানে রাজিছে ষোড়শী-রূপিণী ॥

(৪) ভুবনেশ্বরী

তা জিনি সুন্দর উন্নত শোভাধর
ভুবনেশ্বরী ঋষি, হের তাঁর নিকটে।
পীনস্তনী বামা প্রফুল্লা ত্রিনয়না
প্রভাত-আভা দেহে, ইন্দু ভাতি কিরীটে॥

অঙ্কুশাভয়বর পাশ-সজ্জিত কর
সর্ব্বমঙ্গলা সতী জীবদুঃখ বিনাশে।
সদা সুহাস্যযুতা ঐখানে বিরাজিতা—
স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে॥

(৫) ভৈরবীমূর্ত্তি

তার উপর আর নেহার ঋষিবর
কিবা শোভা সুন্দর, ভৈরবী-ভুবনে :
মাল্যে সুশোভিত মস্তক বিভূষিত,
রক্ত লেপিত স্তন, বৃতা রক্ত বসনে॥

জ্ঞান-অভয়-দাত্রী জীব-উদ্ধার-কর্ত্রী—
সহস্র মিহির তুল্য শোভা দেহে ধারিণী :
রত্ন-কিরীটময় চন্দ্র উদয় হয়
ভক্তি-বিধায়িনী ভৈরবী-রূপিণী॥

(৬) মাতঙ্গীমূর্ত্তি

সুচারু মন-হর, হের নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে—
বীণা বাজিছে করে বাদনে থরে থরে
কুন্তল দলমল সুন্দর বদনে॥

কলহংস শোভা সম শ্বেত মাল্য নিরুপম,
শ্যামাঙ্গী শঙ্খের বালা দুই করে পরেছে।
প্রীতি তুলি ভবতলে সর্ব্বজীব-দুঃখ দলে
মাতঙ্গীর রূপ সতী পদ্মদলে বসেছে॥

(৭) ধূমাবতী

কাছে তার দলমল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্ম্মল জিনি অন্য ভুবনে—
দীর্ঘা বিরলরদ শুভ্রবরণচ্ছদ,
কুটিলনয়না বামা ধূমাবতী ধরণে ॥
লম্বিত-পয়োধরা ক্ষুৎপিপাসাতুরা
বিমুক্তকেশী বামা জীব-দুঃখ বিনাশে।
শ্রম-কান্ত প্রাণিক্লেশ ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হেথা বিকাশে!
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা হস্তে স্থাপিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে ॥

(৮-৯) বগলা ও ছিন্নমস্তা

জীব-নিস্তারে সতী ঐ হের চিন্তাবতী
দারিদ্র্যদলনীরূপ বগলার শরীরে।
হের আর উর্দ্ধদেশে মদনোন্মত্তার বেশে
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে ॥
বিকট উৎকট ফূর্ত্তি বিপরীত রতিমূর্ত্তি
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া।
আপনার ঘৃণাকর নগ্নবেশ ঘোরতর
বিশ্বময় দেখাইছে নিজ রক্ত শুষিয়া ॥

(১০) মহালক্ষ্মী

নেহার তারপরি, শোভে কমলার পুরী,
রোগ শোক তাপ হরি, জীবিতের জীবনে ॥
কিবা বেশ সুমোহন, লীলারসে নিমগন,
পরমাপ্রকৃতি সতী সর্ব্ব শেষ ভুবনে ॥
সুবর্ণ-বরণোত্তম কটিতে পিঙ্কন ক্ষোম,
স্বর্ণ ঘটে চারি করী শিরে নীর ঢালিছে।
পদ্মাসনা, করে পদ্ম, সতী সর্ব্বসুখসদ্ম,
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব-দুঃখ হরিছে ॥

ললিত দীর্ঘ ত্রিপদী

আনন্দে হৃদয় ভরি,
দেবঋষি বীণা ধরি,
তারে তার মিলাইয়া ঝঙ্কার তুলিল ॥
নিবিড় রহস্য-সুধা
পানে জুড়াইয়ে ক্ষুধা,
মধুর সঙ্গীতস্রোতে মহাঋষি ডুবিল ॥
ছুটিল বীণার স্বর,
ছুটে যেন নির্ঝর,
হৃদয় প্লাবন করি সুগভীর বাদনে।
"প্রকৃতির আদি লীলা
ভবে কেবা নিরখিলা ?"
মহাঋষি গাইলেন বিকলিত বচনে ॥
"জগৎ অশুভ নয়,
কালেতে হইবে লয়
জীবদুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।
এই কথা বুঝে সার
আনন্দে নিনাদ তার
সত্যপথে রাখি মন অনাত্মার স্মরণে ॥

লিখি বুকে মোক্ষ নাম
পূরা, জীব, মনস্কাম
'নিখিল নিস্তার পাবে' শিব কৈলা আপনি।
লক্ষ্য করি তারি পথ
চালা নিত্য মনোরথ
জীবজন্মে ভয় কি রে ?—জগদম্বা জননী !
ডাক বীণা উচ্চৈঃস্বরে
ডাক রে আনন্দভরে
নারদ ভুলে না যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে !
সকলের মূলাধার
সকল মঙ্গল-সার,
নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে ॥
জড় জীব দেহ মন
যাঁ হইতে প্রকটন,
অনুক্ষণ সেই রূপ হৃদিমাঝে জাগা রে।
পাই যেন পুনরায়
পূজিতে সে রাঙা পায়
জগৎ মধুর করি তারা নাম শুনা রে ॥"

ভঙ্গপদী পয়ার

নারদের গানে শিব শঙ্কর মোহিল।
বিদীর্ণ রসাতলে পদতল পশিল ॥
ধীরে বিপুল দেহ ক্রমে বাড়ে সঘনে।
ধূর্জটি-জটাজূট পুনঃ ছুটে গগনে ॥
চণ্ড প্রকৃতি-লীলা মিলাইল চকিতে।
অম্বরে বায়ু মেঘ ছড়াইল ত্বরিতে ॥
উজ্জ্বল দিনমণি পুনঃ পেয়ে
কিরণে।
দেখা দিল সুন্দর জগতের নয়নে ॥
পুনঃ সে দ্বাদশরাশি নিজ নিজ
আলয়ে।
মনোহর বেশ ধরে জগতের উদয়ে !

ধীরে মলয়-বায়ু প্রবাহিল স্বননে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্য বদনে ॥
কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিল পুনঃ স্রোতধারা তরসে ॥
পতঙ্গ কীট পশু পুনঃ পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিতসুখে প্রকটিত জীবনে ॥
মিলাইল দশরূপ, উমারূপ ধরিল।
হরগৌরীরূপে সতী হিমালয়ে উদিল ॥
হাসিল কৈলাসপুরী উমা হেরি নয়নে।
কেশরী বৃষভ ছুটি লুটাইল চরণে ॥
ববম্ ববম্ ধ্বনি শিব ধরিল।
মহাঋষি পুলকিত শিবশিবা পূজিল ॥

কবিতাবলী

॥ স্বদেশ ও সমাজ ॥

ভারত-সঙ্গীত

[ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদশাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র-অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারত-সঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।]

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষুমেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।
নের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
াচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।—
হাথা আমেরিকা—নব অভ্যুদয়,
থিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
য়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
াড়ে হুহুঙ্কার,
ভূমণ্ডল টলে,
ধন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।
াধ্যস্থলে হেথা আজন্ম পুজিতা
ের বীর্য্যবতী বীর-প্রসবিতা,
নন্তযৌবনা যুনানীমণ্ডলী,
হিমা-ছটাতে জগত উজলি,
াগর ছেঁচিয়া, মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়॥
ারব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
াতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
ীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,

তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
বাজরে শিঙা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"
এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গায়িতে লাগিল জনেক যুবা।
আয়ত-লোচন, উন্নত-ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।
নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারত-ভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা!

ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার!
হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার॥
এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব্বপিতৃগণ
যখন তাঁহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাঁহারা কজন ছিল?
আবার যখন জাহ্নবীর কূলে
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাঁহারা কজন ছিল?
এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।
তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন?
অই দেখ সেই মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু-বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম?
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধিসীমা?
সকলি ত আছে, সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা
হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি!
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!
আর কি ভারত সজীব আছে?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।"
এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে—
"এখন(ও) জাগিয়া ওঠ রে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকরসম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে॥
একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমাধ্বজা।
জপ, তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা,

এ সকলে এবে কিছুই হবে না
তূণীর কৃপাণে কর রে পুজা।
যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্র শিখা ধ'রে,
স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও!
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।
ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
এখন সেদিন নাহিক রে আর,
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না হবে না,
খোল্ তরবার;
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
অস্ত্রপরাক্রমে হও বিশারদ,
রণরঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।
কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দু জাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও?
অই দেখ সেই মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল;
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখন(ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?
বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

ভারত-বিলাপ

ভানু অস্ত গেল গোধূলি আইল,
রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল,
মেঘ হতে মেঘে, খেলিতে লাগিল,
গগন শোভিল কিরণজালে;—
কোথা বা সুন্দর ঘন কলেবর
সিন্দুরে লেপিয়া রাখে থরে থর,
কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার ঝালর
যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে॥
সোনার বরণ মাখিয়া কোথায়
জলধর জলে, নয়ন জুড়ায়,
আবার কোথায় তুলারাশি-প্রায়
শোভে রাশি রাশি মেঘের মালা
হেনকালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে
হেরি মনোহর সে তট উপরে
রাজধানী এক, নব শোভা ধরে,
রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা॥
দ্বিতালা ত্রিতালা চৌতালা ভবন
সুন্দর সুন্দর বিচিত্র-গঠন
রাজবর্ত্ম পাশে আছে সুশোভন
গোধূলিরাগেতে রঞ্জিত কায়।

অদূরে দুর্জ্জয় দুর্গ গড়খাই,
প্রকাণ্ড মূরতি, জাগিছে সদাই,
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই,
চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী ধায় ॥
গড়ের সমীপে আনন্দ-উদ্যান,
যতনে রক্ষিত, অতি রম্যস্থান,
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্যগান,
নয়ন শ্রবণ তনু জুড়ায় !
জাহ্নবীসলিলে এদিকে আবার
দেখ জলযান কাতারে কাতার
ভাসে দিবানিশি গুণবৃক্ষ যার
শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায় ॥
অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা ?
অলকা-জিনিয়া হেন মনোহরা
কার রাজধানী ? কি জাতি ইহারা ?
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায় ।
নাহি যদি জান, এস এইখানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায় ॥
অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে-শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রীটনবাসিয়া—
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায় !
হায়রে কপাল, ওদেরি মতন
আমরাই কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে—বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?
ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস ॥
কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন,
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে ।
সাজে না এখন অভিলাষ করা,
আমাদের কাজ সুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে করিয়ে দাসত্বের ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে !
হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে,
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে,
পুরাতে নারিলে মনের আশা ।
রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়,
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা
হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার ? কেন না গঠিলি
মরুভূমি ক'রে—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হতো না তায় ।
তাহ'লে এখানে করিত না গতি,
পাঠান, মোগল, পারস্য দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায় !
এই যে দেখিছ পুরী মনোহর
শতগুণ আরো শোভিত সুন্দর,
এই ভাগীরথী ক'রে থর থর
ধাইত তখন কতই সাধে !
গাইত তখন কতই সুস্বরে
এই সব পাখী তরু শোভা ক'রে,
কতই কুসুম পরিমল ভরে,
ফুটিয়া থাকিত কত আহ্লাদে ॥
আগেকার মত উঠিত তপন,
আগেকার মত চাঁদের কিরণ
ভাসিত গগনে, গ্রহ তারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ঘেরিয়া ধরা ।

যখন ভারতে অমৃতের কণা
হ'তো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস বাল্মীকি—বিপুল বাসনা
ভারত হৃদয়ে আছিল ভরা॥
যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
গাইত সমরে মাতি বীররসে
হিমালয় চূড়া গগন পরশে
গাইত যখন ভারত-নাম।
ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গাইত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ-মহিমা পুলকিত স্বরে,—
জগতে ভারত অতুল ধাম॥
ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল,
হেন ভূভাগ করে করতল,
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল—
তোমার তেজের নাহি উপমা।

এখন কিঙ্কর হয়েছি তোমার
মনের বাসনা কি কহিব আর,
এই ভিক্ষা চাই করগো বিচার—
অথর্ব্ব দাসীরে কর গো ক্ষমা॥
দেখ্ চেয়ে দেখ্ প্রাচীন বয়সে
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ গাহি মহিমা।
আগে ছিল রাণী ধরা-রাজধানী
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা॥
তোমারো ত বুকে কত শতবার
রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার-
এই কথা সদা করিও ধ্যান।

বিধবা রমণী

১

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে।
না হলে এমন দশা নারী আর কই রে;
মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ!
রমণীর চিরসাধ চিকুর-বন্ধন,
হাদে দেখ সে সাধেও বিধি-বিড়ম্বন!
আহা কি চাঁচর কেশ পড়েছে এলায়ে!
আহা কি রূপের ছটা গিয়াছে মিলায়ে!
কি নিতম্ব কিবা উরু, কিবা চক্ষু কিবা ভুরু।
কি যৌবন মরি মরি শোকে দগ্ধ হয় রে!

২

কুসুম চন্দনে আর নাহি অভিলাষ ;
তাম্বুল কর্পূরে আর নাহি সে বিলাস ;
বদনে সে হাসি নাই, নয়নে সে জ্যোতিঃ ;
সে আনন্দ নাই আর মরি কি দুর্গতি !
হরিষ বিষাদ এবে তুল্য চিরদিন ;
বসন্ত শরত ঋতু সকলি মলিন !
দিবানিশি একি বেশ, বার মাস সেই ক্লেশ ;
বিধবার প্রাণে হায় এতই কি সয় রে !

৩

হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়,
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার ।
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ ?
পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে
অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে ?

৪

কেঁদেছি অনেক দিন কাঁদিব না আর ;
পুরাইব হৃদয়ের কামনা এবার ।
ঈশ্বর থাকেন যদি করেন বিচার
করিবেন এ দৌরাত্ম্য সমূলে সংহার
অবিলম্বে হিন্দুধর্ম্ম ছারখার হবে !
হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে !
দেখ রে, দুর্ম্মতি যত চির ম্লেচ্ছ-পদানত-
বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় রে ।

৫

হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ,
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ ;
সোনার প্রতিমা গ'ড়ে বিধবা নারীর,

রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারত ভূমির ;
বিদেশের স্ত্রীপুরুষ এদেশে আসিত,
পতিব্রতা ব'লে কারে নয়নে হেরিত।
লিখিতাম নিম্নদেশে "কি স্বদেশে, কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই রে !"

সে ধন-সম্পদ নাই দরিদ্র কাঙ্গাল,
অনাথ-বিধবা-দুঃখ রবে চিরকাল
আমার অন্তরে গাঁথা ; যখনি দেখিব
সুগন্ধ কুসুমে কীট তখনি কাঁদিব ;
রাহুগ্রাসে শশধর, নক্ষত্র-পতন
যখনি দেখিব, হায়, করিব স্মরণ
বিধবা নারীর মুখ ! হায় রে বিদরে বুক
ইচ্ছা করে জন্মশোধ দেশত্যাগী হই রে।
ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে ॥

ভারত-কামিনী

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হয়ে আর্য্যবংশ—অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে !

এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনও রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?

বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি
অনাথা করিয়া গলে দিয়া ফাঁসি,
কাড়িয়া লয়েছ কবরী, কঙ্কণ,
হার, বাজু, বালা, দেহের ভূষণ—
অনন্ত দুখিনী বিধবানারী।

দেখরে নিষ্ঠুর, হাতে লয়ে মালা
কুলীন সধবা অনূঢ়া অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে—
কেহ বা করিছে বরমাল্য দান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি।

চারি দিকে হেথা ভারত যুড়িয়া,
সরসী-কমল যেন রে ছিঁড়িয়া—

কামিনী-মণ্ডলী রেখেছ তুলিয়া—
কোমল হৃদয় করেছ হতাশ,
না দেখিতে দেও অবনী আকাশ—
করে কারাবাস জগতে রয়ে।

অরে কুলাঙ্গার, হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ, অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে?

এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়া,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী-মাঝে!

দেখ না কি চেয়ে জগত উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী, জমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে?

জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশল,
এই খানে ছিল কলিঙ্গ, পঞ্চাল,
মগধ কনৌজ—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে?

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা—
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে।

এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া—
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে—

কোথা সে এখন অসিভল্লধারী
মহারাষ্ট্র-বামা, রাজোয়ারা নারী?
অরাতিবিক্রমে পরাজিত হলে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে
পতি, পিতা, সুত, সংহতি লয়ে।

বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল,
মহিমা-কিরণে জগত ভাতিল—
কোথা এবে তারা—কোথা সে কিরণ?
আনন্দ-কানন ছিল যে ভুবন
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে!

আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বরা
বিজয় নিনাদে বসুন্ধরা ভরা?
আর কি আছে সে মনের উল্লাস,
জ্ঞানের মর্য্যাদা, সাহসবিভাস
সে সব রমণী কোথা রে এবে?

সে দিন গিয়াছে—পশুর অধম
হয়েছে ভারতে নারীর জনম;
নৃশংস আচার, নীচ দুরাচার
ভারত-ভিতরে যত কুলাঙ্গার
পিশাচের হেয় হয়েছে সবে।

তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি
নাম হিমালয়, শৃঙ্গ উচ্চে ধরি?
তবে কেন আজও করিছে হুঙ্কার

ভারত বেষ্টিয়া জলধি দুর্ব্বার ?
কেন তবে আজও ভারত ভিতরে
হিন্দুবংশাবলী শুনে সমাদরে
ব্যাস বাল্মীকি, বারিধারা ঝরে
সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী-রবে ?—

গভীর নিনাদে করিয়ে ঝঙ্কার,
বাজ রে বীণা বাজ একবার,
ভারতবাসীরে শুনায়ে সবে।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ হোথা একবার—
প্রফুল্ল-কোমল কুসুম-আকার
য়ুনানী মহিলা হয় পারাপার
অকূল জলধি অকুতোভয়ে।

ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিতে
কানন, কন্দর উন্নত গিরিতে—
অপ্সরা-আকৃতি পুরুষ-সেবিতা,
সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ভূষিতা—
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে।

আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার ?—
পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ
জ্ঞান, দম্ভ, তেজে পূরে নিজ দেশ,—
বীর-বংশাবলী-প্রসূতি হবে ?

এহেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড-মাঝে
নাহি কি রে কোন বীরাত্মা বিরাজে—
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড—
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে ?

চৈতন্য গৌতম নাহি কি রে আর,
ভারত-সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?—
ঋষি বিশ্বামিত্র, রাঘব, পাণ্ডব,
কেন জন্মেছিলা মহাত্মা সে সব—
ভারত যদি না উন্নত হবে ?

ধিক্ হিন্দুজাতি, হয়ে আর্য্যবংশ,
নর কণ্ঠহার নারী কর ধ্বংস !
ভুলে সদাচার, দয়া, সদাশয়,
কর আর্য্যভূমি পুতিগন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে !—

দেখ না কি চেয়ে জগত-উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে ?

জান না কি সেই অযোদ্ধা, কোশল
এইখানে ছিল কলিঙ্গ পঞ্চাল ?
মগধ, কনৌজ,—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী—নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ, কলুষ হরে ?

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা—
সাবিত্রী, ভারত পবিত্র করে ?*

* পরের দুটি স্তবকে কবিতার প্রথম স্তবক দুটির পুনরুক্তি।—সম্পাদক

ভারতে কালের ভেরী

[১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষ্যে]

১

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার !
অই শুন ঘোর ঘন ভীম নাদ তার।
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে
আকুল অধীর বঙ্গে ;
উঠিছে পুরিয়া দিক্ প্রাণী-হাহাকার !—
বাজিল অকাল-ভেরী, বাজিল আবার ॥

২

চলেছে প্রাণীর কুল হের চারি ধার ;
চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আঁধার—
স্থবির বালক নারী
"হা অন্ন, হা অন্ন বারি"
বলিতে বলিতে ধায়, চক্ষে নীরধার ;
ধরাতলে চলে ধীরে কালীর আকার।

৩

দেখ রে চলেছে আহা শিশু কত জন,
শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী বদন ;
আকুল জননী তার
মুখ চাহি বার বার
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ !

৪

হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে
পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে,
বলিছে কামিনী কেহ,
"কই নাথ, অন্ন দেহ,
কালি আর চাহিব না, রাখ আজ প্রাণে"
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।

৫

ছুটিছে যুবতী কন্যা ফেলিয়া পিতায় ;
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ, সকলি বৃথায় !—
কেবা কন্যা, কেবা পিতা,
কে জননী, কেবা মিতা—
অন্নদাতা, পিতামাতা, আজি বঙ্গালয়—
হের হেন কত জন আজি এ দশায়।

৬

হের কত জন আহা উদর-জ্বালায়—
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পালায়—
তুলিয়া যুগল পাণি
শিশু ডাকে "মা মা" বাণী,
ক্ষুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়—
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়।

৭

চলেছে প্রাণীর কুল এরূপে আকুল ;
নৃত্য করে অনশন, মুক্ত করি চুল—
নৃত্য করে ভেরীনাদে,
কঙ্কাল তুলিয়া কাঁধে,
খর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
দেখ বঙ্গবাসি, দেখ মূর্ত্তি কি ভীষণ !

৮

ছুটিছে নয়নে বহ্নি স্ফুলিঙ্গ সমান ;
ফিরিছে উন্মত্তভাব উল্কার প্রমাণ ;
দন্ত-ঘরষণে শব্দ,
ভারতভুবন স্তব্ধ,
করাল বিকটগ্রাস মুখের ব্যাদান—
আকাশে উঠিছে সঙ্গে কালের নিশান

৯
কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ-আলয়,
নন্দিনী-নন্দন-রূপ, সুখ পুষ্পময়,
আজি পূর্ণ কলরবে,
অচিরে নীরব হবে,
শকুনী বায়স কিম্বা পেচক আশ্রয়—
ধরিবে শ্মশান-বেশ মৃত অস্থিময়।

১০
কত সে জনতাপূর্ণ পণ্যবীথি, হায়,
এ রাক্ষস-অনাচারে হবে মরুপ্রায়—
ভীষণ গহন সাজ
ধরিবে পুরীর মাঝ,
পূরিবে বনের গুল্ম পাদপ লতায়,
ভ্রমিবে শার্দ্দূল শিবা আনন্দে সেথায়।

১১
আজি হাসি-ভরা মুখ প্রফুল্ল যে সব,
আজি সুখপূর্ণ বুক আশার পল্লব,
কালি আর নাহি রবে,
শবদেহ হবে সবে,
শৃগাল কুক্কুরে মেলি করিবে উৎসব—
কর্ণমূলে গৃধ্র বসি শুনাইবে রব!

১২
কেমনে হে বঙ্গবাসি নিদ্রা যাও সুখে!
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে নাকি দুখে?
নিজ সুত পরিবার
না জানিছে অনাহার,
ভাবিয়ে না চাহ কি হে অভুক্তের মুখে
স্বজাতি-শোকের শেল বিন্ধে নাকি বুকে?

১৩
প্রিয়ে বলি গৃহে আসি ধর যবে কর,
হয় না উদয় কিরে হৃদয়-ভিতর—
কত সতী অনাথিনী
পথে পথে কাঙ্গালিনী
ভ্রমিবে হতাশ হৈয়ে ত্যজি শূন্যঘর—
নাহি লজ্জা কুলমান, ক্ষুধায় কাতর!

১৪
ক্রোড়ে ধরি হের যবে কন্যা পুত্রগণ,
ভাবিয়া জগত মাঝে অমূল্যরতন—
কভু কি পড়ে না মনে
সেই সব শিশুগণে
অন্ন বিনে মরে যারা করিয়া রোদন,—
তাহারাও অইরূপ নয়ন-রঞ্জন!

১৫
হে বঙ্গ-কুলকামিনি আর্য্যা যত জন,
জান যারা পতি পুত্র পিতা সে কেমন—
ভাব দেখি একবার
বদন সে সবাকার
ঘরে যারা প্রাতঃসন্ধ্যা করে দরশন
নিরন্ন বিষণ্ণ পতি, জনক, নন্দন!

১৬
এক দিন অনশনে দিন যদি যায়,
জান না কি বঙ্গবাসি, কি যাতনা তায়!
আজি সেই অনশনে
দারুণ হতাশ মনে
লক্ষ নর নারী শিশু করে হায়, হায়—
তবুও চেতনা কি হে নাহি হয় তায়!

১৭
ভাব অহে বঙ্গবাসি, ভাব একবার
কি কাল রাক্ষস আসি ঘেরিয়াছে দ্বার—
নাশিতে সে দুরাচার
বৃটনের হুহুঙ্কার,
বৃটিশ কেশরী-নাদ শুন একবার—
ঘুমাইও না, বঙ্গবাসি, ঘুমাইও না আর;
ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার।

ইউরোপ্ এবং আসিয়া

আবার উঠিছে অই রণবাদ্য-ঘোষণা !
শোন হে ভারতবাসী
কি উল্লাস পরকাশি
হিন্দুকুশ-চূড়ে আজি বৃটিশের বাজনা !
এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা ;
আতঙ্কে "আসিয়া" কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ ব্যাণ্ডে" বিজয়ের বাজনা !
উড়িল পাঠান-রাজ্য ইংরাজের ফুৎকারে—
সমভূম ভস্ম ছার
অৰ্দ্ধেক "বালাহিসার"
"স্থতরগৰ্দ্দান্"-শিরে "হাইলণ্ডর" বিহারে !
"সের আলি", "ইয়াকুব," "দোরাণী" আফ্গানা
"ঘিলিজী"-"হেরাটী"-দল
পদে দলি ছোটে বল—
অশ্বারোহী, পদাতিক,
"আইরিশ", গুরুখা, শিখ,
পাহাড় পৰ্ব্বত ছিঁড়ে দউড়ে তোপখানা !
ইংরাজ আফ্গানে খালি নহে এ যোঝনা,
জানিহ ভারতবাসী
"ইউরোপ" "আসিয়া" আসি
এই রণ-তরঙ্গে ভাসি কৈল শক্তি-তুলনা !
তুলনা করিল শক্তি পুনরায় দু'জনে
হের তুরস্কের গায়
"প্লেভানা"-দুর্গ যেথায় ;
চমকি ধরণীতল
শিরে বাঁধি যশোজ্জ্বল
লুটাইল "আসমান্" রুসিয়ার চরণে !
লুটাইল "জুলুরাজ" পশুরাজ-বিক্রমে
যুঝিয়া ইংরাজ সনে
দুৰ্জ্জয় সমর-পণে,
ঘুচাইয়া বন্যজাতি "আফ্রিকে"র বিভ্রমে !
লুটে "গোলন্দাজ" পায় এখনও "জাভায়"

"আচিনী" সমর-প্রিয়
হারায়ে সর্ব্বস্ব স্বীয় !
লুটিয়াছে বারবার
ব্রহ্ম, পারসিক আর
চীন, শ্যাম, আরবীয়,—ইউরোপের পায় !
পূর্ব্বে যথা হিমালয়-অধিবাসী-দেবতা
করিল অসুরে জয়
ঐশ্বরিক প্রতিভায়,
যার তরে আর্য্যজাতি-খ্যাতি আজও জাগ্রতা
সেই ঐশ্বরিক তেজে এ ধরণীমণ্ডলে
উন্নত উন্নতি-পথে,
সদা-সিদ্ধ-মনোরথে,
বিজ্ঞান বিদ্যুতাভাসে
দুর্জ্জয় দ্যুতি প্রকাশে,
চলেছে ইউরোপ-বাসী উপহাসি অচলে !
বেঁধেছে পৃথিবী-অঙ্গ লৌহপাত প্রসারি,
পবনে শকটে বাঁধি
চলেছে উড়ায়ে আঁধি,
ফেলেছে ধরণী-পৃষ্ঠে লতা যেন বিথারি !
শূন্য হতে টানি আনি উন্মাদিনী দামিনী
আজ্ঞাবহা করি তায়
ঘুরাইছে বসুধায়,
অগাধ অতল স্পর্শ
সিন্ধুতল করি স্পর্শ
খেলাইছে সে লতায় কিবা দিবা যামিনী !
খুলিতে বাণিজ্য-পথ মিশাইছে সাগরে
অন্য সাগরের জল,
ভেদ করি মহীতল,
ভূধর, বালুকামাঠ—দূর করি অন্তরে।
নদীর উপরে নদী সশরীরে তুলিয়া
চলেছে দেখায়ে পথ—
কোথা বা সে ভগীরথ !
উপরে অর্ণবপোত
ধারাবাহী বহে স্রোত—

জঠরে প্রশস্ত পথ দুই কুল ঘুড়িয়া !
কি গড়েছ, হে বিশাই, এ সবের তুলনা !
দেবতার শিল্পী তুমি,
হের দেখ মর্ত্ত্যভূমি
নির্ভয়ে চলেছে তব স্বর্গে দিতে লাঞ্ছনা !
শোন হে গর্ব্বিত বাণী কি বলিছে বদনে—
শূন্য-পথে বায়ু-স্রোতে
চালাবে মারুৎ-পোতে,
জলে যথা জলযান
শূন্যে তথা ভ্রাম্যমাণ
কর্ণ দণ্ড পাল তুলি গগনের গহনে !
না দিবে থাকিতে রোধ ধরাতল আকাশে
না কাটি "প্যানেমা"-চল
সসজ্জ তরণীদল
"অতলন্ত"-সিন্ধু হ'তে উর্দ্ধে তুলি বাতাসে
নামায়ে "শান্তসাগরে" পূর্ব্বভাবে ভাসাবে !
স্থির করি চপলায়,
নগর-নগরী কায়
ফুটায়ে সূর্য্য-আকারে,
ঘুচায়ে নিশি-আঁধারে,
ইচ্ছামত ক্ষণপ্রভা দামিনীরে হাসাবে !
বল হে "আসিয়া"-খণ্ড-অধিবাসী যাহারা—
অর্দ্ধভাগ ধরাতল
তোমাদের বাসস্থল—
কোন্ পথে—কি উদ্দেশে চলেছ হে তোমরা ?
"ইউরোপ" ব্রহ্মাণ্ডজয়ী যে বীর্য্যের ধারণে,
শরীরে কিবা অন্তরে
কোন অংশ তার ধ'রে,
বিরাজিছ এ জগতে ?
সাধিতেছ কোন ব্রতে ?
চলেছ কালের সঙ্গে কি চিন্তায় মগনে ?
অদৃষ্টে নির্ভর করি নামিতেছ পাতালে !
"ইউরোপ" বাঁধিছে সিঁড়ি
আকাশ ভূধর ছিঁড়ি,
কেবলি উর্দ্ধেতে গতি দিবা সন্ধ্যা সকালে !
তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী

সকলি সমান জ্ঞান !—
আছে কিনা আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্ব্বের প্রায়
ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষি তুষ্ট হবে তখনি ?
কি দোষ রে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে
কি'না, বল, দিলা বিধি ?
করিতে ধরার নিধি
বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে !
দিয়াছে এতই এরে স্বপনে কখন
"ইউরোপ" না হেরে তায় !
বল হে কোথা সেথায়
এমন পর্ব্বত, নদ,
এমন দারু, নীরদ,
এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্য-রতন !
কোথায় সেখানে, হায়, হেন রশ্মি তপনে !
এত জাতি ফুল ফল,
এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্ত্য কোথা হেন শশিকিরণে ।
সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি—
আমাদেরি হৃদিতলে
সে স্রোত নাহিক চলে
আশ্রয় করিয়া যায়
পাশ্চাত্ত্য আগুয়ে ধায়—
বাঁচিতে—মরিতে, হায়, জানিনা রে কেবলি !
অই দেখ জানে যারা করিতেছে ঘোষণা—
শোন হে "আসিয়া"-বাসী
কি উল্লাস পরকাশি
"হিন্দুকুশ"-চূড়ে বাজে বৃটিশের বাজনা ।
এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা ;
আতঙ্কে মেদিনী কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে,
নাচায়ে বীরের পদ,
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ-ব্যাণ্ডে" বিজয়ের বাজনা !

॥ রঙ্গ ও ব্যঙ্গ ॥

বাঙালীর মেয়ে

কে যায় কে যায় অই উঁকিঝুঁকি চেয়ে ?
হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
তাম্বূলে তামাকুরস—রাঙা রাঙা ঠোঁট,
কপালে টিপের ফোঁটা, খোঁপা-বাঁধা চুল,
কসেতে রসনা ভরা—গালে ভরা গুল,
বলিহারি কিবা শাটী ডুকুলে বাহার,
কালাপেড়ে শান্তিপুরে, কল্কে চুড়িদার,
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যেন ধেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মুখের সাপটে দড়, বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে, কথায় তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ—পা-ছড়ায়ে-বসা,
আঁচলের খুঁট্রি তুলে অঙ্গমলা-ঘষা !
নমস্কার তাঁর পায়—পাড়ায়-বেড়ানী
পেট্রি ভরা কুঁজড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি,
কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
রসনা কলের গাড়ী চলে রাত্রি দিন,
ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গিন,
খেয়ে যান্, নিয়ে যান্, আর যান্ চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ-পড়া,
পেটের ভিতরে গজে দাশুরায়ী ছড়া !
চিত্রিকাজে চিত্রগুপ্ত—পিঁড়িতে আল্পনা,
হদ্দ বাহাদুরি—"ছিরি", বিচিত্র কারখানা !
অঙ্কশাস্ত্রে—বররুচি, গ্যালিলো, নিউটান,
গণ্ডা করি গুন্তে হ'লে জানের বাড়ী যান ;
পাত্তেড়ে প'ড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ-লেখা সাধ !

ক্ষীরপুলি, পায়েস, পীঠা, মিষ্টান্নের সীমা,
বলিহারি বঙ্গনারী, তোমার মহিমা!
জলো দুধে পুষ্টদেহ তেলে জলে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
সমুখে দুধের কড়া—কাঠিতে ঘোটন,
খোলা চুলে চুলো জ্বেলে ধোঁয়াতে ক্রন্দন!
তপ্ত ভাতে ভরা হাঁড়ী বেড়ী ধ'রে তোলা,
মদ্গুর-মৎস্যের ঝোলে ধনেবাটা গোলা,
খাড়া বড়ী শাক পাতাড়ে বিলক্ষণ টান্,
কালিয়ে কাবাব্ রেঁদে দেমাকে অজ্ঞান!
শাখেতে পাড়িতে ফুঁক চূড়ান্ত নিপুণ,
হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্ম্মুখ খুন!
রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া, গাড়ী-মুদে-যাওয়া,
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া!
বাসরঘরে ঝুমুর কবি চখের মাথা খেয়ে,
প্রভাত হ'লে পিস্‌শাশুড়ী ঘোম্‌টা মুখে ছেয়ে—
সাবাস্ সাবাস্ তোরে বাঙালীর মেয়ে!

ব্রতকথা, উপকথা, সেঁজুতি-পালন,
কালীঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহণ!
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্ব্বে গাজনের গোল,
যাত্রা-সঙে নিদ্রাত্যাগ—ছেলে-ভরা কোল,
ভূত পেরেতে দিনে ভয়, অন্ধকারে কাঠ,
শক্ত রোগে রোজা-ডাকা, স্বস্ত্যয়ন. পাঠ,
তীর্থস্থানে পা পড়িলে আহ্লাদে পুঁতুল,
হাট-বাজারে লজ্জাহীনা, ঘরে কুঁড়ি ফুল!
গুঁড়িকাষ্ঠ, নুড়িশিলা, ভক্তিপথে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
রসের মরাল যেন জলটুকু ছেড়ে
দুধটুকু টেনে স্নান আগে গিয়া তেড়ে,
চিনের পুঁতুলে সাধ, বাক্‌স টিনে পেটা!
"র‍্যাফেল"-বধা ছবিগুলি ঘরে দোরে সাঁটা!
খেলায় দিগ্‌গজ কেঁয়ে, চোরের সদ্দার,

লুকোচুরি যমের বাড়ী—স্পষ্ট করে ঠার !
আয়েস্ খালি খোঁপা বাঁধা, নয় বিননো ঝারা,
হদ্দ হলো কচি ছেলে টেনে এনে মারা !
কার্পেটে কারচুপি কাজ কারু নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধতে ডাল !
নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে, মুক্‌সাপটে দড়,
হুজুতে হারিলে কেঁদে পাড়া করে জড় ;
বাঙালী মেয়ের গুণ কে ফুরাবে গেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মৃদু মৃদু হাসিটুকু অধরে রঞ্জন,
সাবাস্ সাবাস্ নাক চোকের গড়ন ;
কালো চুলে কিবা ঘটা, চোখে কাল তারা,
দেখে নাই যারা কভু দেখে যাক্ তারা !
ভাসা ভাসা খাসা চোখ তুলি দিয়ে আঁকা,
তা উপরি কিবা সরু ভুরুযুগ বাঁকা !
থমকে থমকে থির গতি কি সুন্দর,
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর !
আহা আহা লজ্জা যেন গায়ে ফুটে আছে—
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে ?
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখো চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে।

সাবাস হুজুক আজব সহরে

ছেলাম টেম্পল্ চাচা, আচ্ছা মজা নিলে।
ভোজং দিয়ে, ভোটিং খুলে, মিউনিসিপাল বিলে
ফ্যাক্‌ট বলি, সহর যুড়ে ভারি আড়ম্বর।
এক্‌ট জারি হবে নূতন, পয়লা সেপ্তম্বর ॥
বলিহারি সুবেদারি সুসভ্য কেতায়।
ভেল্কিবাজি ইংরাজের হদ্দ মজা হায় !

ফুরায় আগষ্ট নিশি একত্রিশা বাসরে ।
সহরে পড়িল চব্ব, পর্ব্ব ঘরে ঘরে ॥
শয্যা ছাড়ি রাতারাতি না হইতে ভোর ।
বাসাড়ে, বাসিন্দা, বেওয়া, রেস্তা করে ঘোর ॥
প্রাতঃকালে জারি হবে নূতন আইন ।
ফ্রেম্ বাঁধা "ফ্রান্চাইসে" নেটিব স্বাধীন্ ॥
কেরাণী, কারিন্দা, ক্লার্ক, মুচ্ছুদ্দি, দেওয়ান ।
মোল্লা, মুন্দি, মিউনিসিপেল বেঞ্চে পাবে স্থান ॥
সহর খোঁড়া কলের কাটি নেটিব প্রজার হাতে ।
দেখবো জারি বাহাতুরী কল্য দিবা প্রাতে ॥
দর্প ক'রে তুপুর রেতে "ক্যাণ্ডিডেট্" যত ।
ব্যস্ত হয়ে, বস্তা খুলে, সজ্জা করে কত ॥
বনেদি বাবুর বাড়ি টোটাবাতি জ্বলে ।
গ্যাস লাইটে ফ্লাইন আলো আধুনী মহলে ॥
উকিল, এটর্নি, মুন্দি, পোদ্দারের ঘরে ।
রেড়ির তেলে আলো জেলে, পিরান পোষাক পরে ॥
খোসপোষাকে সজ্জা করি বহাল তবিয়ৎ ।
স্বর্ণ চাঁপা স্মরণ করেন, সভ্য তরিবৎ ॥
দুর্গা, কালী, শিব নাম শিকেয় তুলে রাখি ।
সিদ্ধ হ'ন ফুলকুমারী, কিরণময়ী ডাকি ॥
বিল্বপত্র বিনিময়ে "বটন হোলে" আঁটা ।
শ্রীমতীর কুন্তলের বাসি ফুলের বোঁটা ॥
হৃদ্দ জপ পদ্মমুখে গন্ধ শুঁকি সুখে ।
মন্দ যান "মৌনী শিয়াল" হতে, ছাতি ঠুকে ॥
কোন বা বাবুজী বালা-সহিত বাগানে ।
চক্ষু রাঙা, ওঠেন ঝেড়ে ভোরের কামানে ॥
চোগা, ঘড়ি, টুপি, ছড়ি টাঁকিয়া চাপকান ।
গড়াগড়ি পায়ে ধরি, নাছোড় বিবিজান ॥
ছাঁদন দড়ি বাহুলতা, ছেদন কঠিন ।
বাবুজী ভয়েতে ভেকো, বদন মলিন ॥
দুঃখ দেখে মায়াবিনী বাঁধন দল খুলে ।
টপ্পা গেয়ে তেরিয়ান্ উঠিলেন ফুলে ॥
রুমালে মুছিয়া মুখ ঝাড়িয়া চাপকান ।
"দেহি পদপল্লব"—বলিয়া প্রস্থান ॥

কোথাও কর্কশ কথা, বিষম ব্যাপার।
কর্ত্তাটি বলেন, খেপি, তলব রাজার ॥
প্রত্যূষে হাজির যদি না হইতে পারি।
সর্ব্বনাশ হবে, খেপি, পর্ব্ব আজ ভারি ॥
দয়াল দাদা "রয়াল" চড়ে যাচ্চে করে জাঁক।
কম্‌বক্তি, ওকৃত গেলো, তক্ত যাবে ফাঁক ॥
ব'লে, আঁচল খুলে একদাপটে পগার হলো পার।
ঘোষজা খুড়ী অবাক্ ভেবে ভোটের ব্যাপার ॥
পীরবক্স, রামগোবিন্দ, নব্য ভোটর যত।
"ফ্রান্‌চায়িসে"র ফ জানে না, ভয়ে বুদ্ধিহত ॥
সারা রাত্রি বসে জাগে ভোটের রগড়ে।
হদ্দ তরিবৎ পায় মশার কামড়ে ॥
হগের হুকুম শক্ত, সময় যদি বয়।
চাবুকে করিবে লাল, সদা প্রাণে ভয় ॥
পরিবার, পুত্র, কন্যা হাহাকার করে।
সাবাস হুজুক আজ আজব সহরে ॥
সবাই তুফান ভাবে, ভয়ে হবুথবু
কবি বলে, "সাধন বিনে সভ্যতা কি কভু ॥"

"ভোটিং হলে" মিটিং এবার যোটে কত লোক।
কেহ গোরো, কেহ দুধে, কেহ কৃষ্ণ জোঁক ॥
বাঁকা তেড়ি, হাতে ছড়ি, এক্‌লেঠে গড়ন।
কামিজ-আঁটা নধর বাবু নাগর কোন জন ॥
কেহ বা দোমেটে গাঁদা, কেহ ঘেঁটুরাজ।
মাথাছাঁটা মেইদি কেহ, কেহ সিমুল ভাঁজ ॥
গাড়ি গাড়ি নামে বাবু, বণিক, কেরাণী।
কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাণ্ডিডেট, ফ্রেণ্ডের কোম্পানি ॥
কেহ চড়ে যুড়ি ফেটিন্, কেহ আপীস্-যানে।
কেরাঞ্চি কাহারো ভাগ্যে, কারো বা ঠন্‌ঠনে ॥
কেহ বা আড়ানি তোলা "ব্লাক্‌বুটে"র ছাল।
কারো শিরে "প্যারাসল্" বিবিয়ানা চাল ॥
"এল্‌বো" ঠেলে "হলে" ঢোকে সেথো লয়ে সাং।
ইংরেজী ধরণে গতি সাবাস্ ক্যাবাং ॥
"মার্চ" করে পিছে পিছে ভোটর ভায়ারা।
আগে আগে যষ্টিধারী ফুলিস্ পাহারা ॥

কেঁদে বলে হুঁসিয়ার ভোটর সে কোনো।
ছেড়ে দেও "দণ্ডবিধি," কাণ্ড কি তা শোনো ॥
ঘরে আছে পাঁচটি ছেলে, একা রোজগারী।
আমার ওপর বিনি দোষে "পত্তর" কেন জারি ?
"ফরণ চীজ্" চাই না বাবা ছেড়ে দাও যাই।
ঘরের খেয়ে, বনের মোষ কি হেতু তাড়াই ॥
তার সঙ্গে অন্য কেহ বলে কিন্তু হয়ে।
যমের ঘরে আমাদের কেন যাও বয়ে ॥
আমীর উজ্বীর ওরা, কেহ বা মনিব।
ওদের সাতে পরবো কিসে আমরা গরিব ॥
ভোটের লড়াই এমনধারা আগে জানে কেটা।
তা হলে কি ধরা দিয়ে ভুগি এত লেটা ॥
কান্নাকাটি, ঝটাপটী, কত করে সোর।
"হগের" পুণ্যে কত পিণ্ডি—পুলিসের জোর ॥
"ব্যাটন" গুঁতোর চোটে তোলে ভোটের কলে !
মর্ম্ম "হীটে" চর্ম্ম ফাটে, ভাসে ঘর্ম্মজলে ॥

বার খাড়া দুই দল "হলের" দু ধারে।
মধ্যস্থলে মধ্যবর্ত্তী "সাইন" হাঁকারে ॥
"ইলক্‌টর" "ক্যাণ্ডিডেট" হবে জোঁকাজুঁকি ॥
পল্লিবাসী "ফ্রেণ্ড"দের গাত্র শোঁকাশুঁকি
কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত তুমি এ সময়।
চতুর রসিকরাজ চির রসময় ॥
দেখিলে না চর্ম্মচক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গোগৃহ-রঙ্গ ব্যঙ্গের বাজার ॥
কিছু কাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে !
"লিবার্টি"র জন্ম দেখে কলম নিতে কেঁচে ॥
সাজাতে কতই রঙে নব্যতন্ত্র সঙ্।
তসর গরদ, গজে ঢালতে কত রঙ ॥
বল্‌তে কেমন পাকা গোঁফে কলপ শোভা পায়।
বলিহারি জরির টুপী বুড়োর মাথায় ॥
ঝুঁটিদার মোড়াসার আহা কিবা ঘটা।
বা(ও)য়াত্তুরে শিরে তাজ, কুরুক্ষেত্রে ছটা ॥
ঘুণধরা বনেদি বুড়ো, শিরে ত্যাড়া টুপী।
লেস্ বসানো "বেলাক্ ক্যাপে" ঝোলে "শিল্ক" থুপী ॥

অপরূপ শোভা, আহা, বাবরিছাঁটা চুলে।
শ্মশানশায়ী কান্ত হেরি কান্তা যাবে ভুলে ॥
সাম্‌লায় সুকাপিশ, যোড়াসাঁর ফের।
মোগলাই কুর্ত্তির মাথা ধরা ঘের ॥
"ব্লাক হাট্", "ফেল্‌ট" টুপী, বোম্বেয়ে লণ্ঠন।
লাইন বাঁধা সারি সারি "জাইন্" কেমন ॥
বাঙ্গালী বাবুর সাজ আমার চখে বালি।
নকলে মজবুৎ বজ, আসলে কাঙালি ॥

ফর্দ্দ হাতে মধ্যস্থলে মধ্যস্থ দাঁড়ায়।
মেম্বর বাছনি হলে "ব্যাটন" হেলায় ॥
ভোটর ধরে "আস্ক" করে তুমি কারে চাও ?
কোনজন বলে, সাহেব, ঐটি আমায় দাও ॥
কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্ত্তি, বগলে যাহার।
এলেম-ভরা, "ডি এল" মারা পছন্দ আমার ॥
"রাইট" বলে "ব্যাটন্" তুলে বাছন্দার চায়।
"ইলক্‌টর" অন্য জনে ইঙ্গিতে শুধায় ॥
সে জন বলে পরিপক্ক খাসা কালো জাম ॥
"নিগর্-কুলে" কালাচাঁদ ঐটি নেব হাম্ ॥
একভূরূপে, টেক্কা মেরে, "ব্যোম্" করে বসেছে !
"অথর" থেকে "অনারেবেল," আর কে অমন আছে ॥
হেসে পুনঃ "আপীসার" "ব্যাটন্" ধরে তুলে।
বৈষ্ণব ভোটর বলে মনের কথা খুলে ॥
আমি লবো রাঙা অই মুরলী রসিক।
রস-ভরা মুখখানি, হাসি ফিক্ ফিক্ ॥
মাথা ঘুরে পড়ে হেরে নয়নের ঠার।
অমন সুন্দর ছেলে কোথা পাব আর ॥
বলিছে ভোটর কোন অই যে ও-সেরে।
ছাঁটা গোঁফ কাঁচা পাকা, ঘটা করে ফেরে ॥
দোহারা চেহারা খাসা, চোগা বুটিদার।
টাকার আণ্ডিল উঠি "ফণ্ডের" ভাঁড়ার ॥
দানাদার দাঁতা তবু "পর্স" নহে "লুস্"।
ঈশপের উপন্যাসে অই সে "গোল্ড গুস" ॥
গিনি-কাটা খাঁটি সোণা, আছে "টুক" রিং।
দেখে শুনে নিতে হলো "থাট ঈজ দি থিং ॥"

কেহ বলে আমি চাই অই সুব্রাহ্মণ।
পাকা দাড়ী,—সাদা চুল, ঋষিটি যেমন ॥
বিদ্যের জাহাজ বুড়ো, বুদ্ধের নবীন।
খ্রীষ্টানের মুখপাৎ, চোখানো সঙ্গিন ॥
আমার পছন্দ অই খ্রীষ্টভেকধারী।
সাপোর্টে দিলাম ভোট, জিতি আর হারি ॥
"হোর্রা" দিয়ে, হেনকালে, ঢোকে দেখি "হুল"।
ভঙ্গিতে বুঝিনু তারা উকিলের দল ॥
চমকে চমক ভাঙে, "টাণ্ট" হ'তে নামি।
"এণ্ট্রান্স" আটক করে দাঁড়াই গিয়া আমি ॥
সকলের আগে এক মর্দ্দ দিল সাড়া।
দিগ্‌গজ ছ হাত, যেন তালের কাঁড়ি খাড়া ॥
আদ্‌পাকা চুলেতে তেড়ি, বুরুসে বাগানো।
"পারফিউমে" ভরা কেশ, রুমালে ছড়ানো ॥
সখের প্রাণ, শাদাশিদে, বল্‌ছে যেন হাসি।
"দেল্‌দারিতে" খ্যাতি আমার, আর সকলি বাসি ॥
"সেকেন্" করে ছাড়ি তারে অন্য কথা নাই।
হীরে বাঁধা হৃদয়খানি, ঐটি আমি চাই ॥

এবার টিকিট হেরে হাসি নাহি ধরে।
লেখা তাতে গোটা গোটা ছাপার অক্ষরে ॥
গণিত, গায়ক, গাড়ী, "চটকে মস্থর"।
হিঁদুয়ানী হেকমতে হদ্দ বাহাদুর ;
বারো মাসে তের পর্ব্ব, বাই, খেমটা নাচ।
"হেল্‌থ্" ভালো, চিরকাল ঢালাই করা ছাঁচ ॥
রাষ্ট্র জুড়ে "ফার্ষ্ট" খ্যাতি, ডঙ্কা মারা নাম।
সর্ব্ব ঘটে অধিষ্ঠান, বর্ণচোরা আম ॥
দুই "পাস" একেবারে শূন্যেতে উত্থান।
এইবার রক্ষা কর মুস্কিলে আসান ॥
দুই বাঙালে এক সঙ্গে "হুলে" যেতে চায়।
কারে রাখি কারে ছাড়ি, পড়ি ঘোর দায় ॥
এক বাহাদুর "হুক্কে" ভারী বক্ষ ফাঁপা পেট।
হাড্ডাদেহ কঞ্চিকাটী অন্য ক্যাণ্ডিডেট ॥
ছিপ্‌ছিপে বাঙাল বাবু রাগেতে ফোঁপায়।
হুদো-পেটা ভুঁদো দাদা মজবুৎ কথায় ॥

রাকাড়ে রাকাড়ে ওটে কন্দলের ঝড়।
হাঁকাহাঁকি চেঁচাচেঁচি, বেহদ্দ বেগড় ॥
বিদ্‌কুটে বাঙালে গোসা বড়ই বালাই।
আহেলী বেলাতী বোল্, আন্‌কোরা ঢাকাই ॥
গরম গরম আচ্ছা রকম ইংরাজি ফোড়ন।
ভাস্‌চে তাতে সাধু ভাষা, মিষ্ট বিলক্ষণ ॥
ভোটিং গেল ভ্যাস্তা হয়ে, "ফ্রেন্‌সিপ্ কুল"।
কবি বলে দুজনাই "ডাউন রাইট ফুল্" ॥
"অনর্" বজায় কত্তে হলে, ঘুষি সাফাই চাই।
"ভল্‌গার" ব্যবস্থা কেন কথার লড়াই ॥

আলীপুর যুড়ি জুড়ি গাড়ীতে ছয়লাপ।
চোপদার, চাপরাসি, ভৃত্য, কটিকষা চাপ ॥
পেগম্বর জমিদার, খোস্ক রদ্দি রাজা।
শিল্ক, সাটিন্, গরদ, চেলি, চাপকানেতে ভাঁজা ॥
গলবস্ত্র সেক্রেটার সাহেবানে ঘেরে।
"পাইমেণ্ট" পাস পাইতে দ্বারে দ্বারে ফেরে ॥
কেহ বলে খোদাবন্দ দুই লক্ষ আয়।
কেহ বলে "ভারত-তারা" আমার গলায় ॥
কেহ বলে আমার "ফনে" ব্যাঙ্ক খাড়া আছে।
কেহ বলে "ফ্যামিন্ ফনে" অনেক টাকা গ্যাছে
"মা বাপ" সাহেব তুমি রক্ষা কর মান।
নৈলে ঘরে ফিরে গেলে, বোঁচা হবে কাণ ॥
অতি বৃদ্ধ পিতামহের খেলাৎ তুলে কেহ।
বলে সাহেব, সবার আগে আমায় "পাস্" দেহ ॥
কেহ বলে কৃষ্ণদাস আমার প্রতিবাসী।
খোদাবন্দ ফেল্ কল্লে পাড়া শুদ্ধ হাসি ॥
মৌলভী বলেন আমি মুসলমানের চাঁই।
হুজুর যেন ইয়াদ থাকে, বান্দার দোহাই ॥
নবাব বলেন আমি নমুদী উজীর।
হকিয়তে আমার হক্ ফিদ্ বি হাজির ॥
ফেসাদ করে, কত সেধে, মাথা কুটে, কেঁদে।
একে একে ফেরেন সবে জয়পত্র বেঁধে ॥
বাঙ্গালায় বন্দনীয় যত অবতার।
বলিহারি বঙ্গবাসী তারিপ্ তোমার ॥

নগর ভিতরে হেথা নাগরীর হাট
নবীন তরঙ্গ তুলে করে কত নাট ॥
বাছনি "ভোটিং হলে" নাচনি পাড়ায়।
ব্যঙ্গভরা বামাস্বরে শ্রবণ যুড়ায় ॥
বিবিয়ানা তেরিকাটা তরুণ তরুণী।
তেক্কেরা সাড়ীতে বেড়া, গজের উড়নি ॥
"রুজ" মাখা মুখখানি, পাখা নিয়ে হাতে।
গরবে গজেন্দ্রগতি ঘুরিছেন ছাতে ॥
উদ্দেশে কাহারো বলে ভাল বুকের পাটা!
মিউনিসিপেল কমিসনর হবে আবার সেটা ॥
মেগের হাতে রাঁড়া রুলি, পেগের বড়াই খালি।
বাগীচা, বাগান, বোট, নাই একটি মালী ॥
সে আবার হইতে চায় ভোটের মেম্বার।
পোড়া কপাল, কালামুখ, ধিক্ ধিক্ ছার ॥
বাড়ীর নিকট ছাতে, সাড়ী কালাপেড়ে।
আঁচলে চাবির থোবা ঝোলে গলা বেড়ে ॥
বসিয়া জনেক বামা "উলেন্" বিনায়।
সিঁথিতে সিন্দূরছটা চাঁদের শোভায় ॥
শুনে কথা, মরালের মত মাথা তুলে।
বলে হায়, হাসি পায়, যম আছে ভুলে ॥
কড়িতে কি যোটে মান, বড়িতে পিচুড়ি।
গুড়েতে কি খাজা হয়, এক আঙ্গুলে তুড়ি ॥
আঙ্গটি, ঘড়ির চেন, বানরে কি সাজে।
আমার ভাতার হলে, আমি পালাতাম লাজে ॥
হরপের এক অক্ষর যার বটে নাই।
সে হবে মেম্বর! তার মেগের মুখে ছাই ॥
কোন গবাক্ষের কাছে রমণী আহ্লাদে।
লক্ষ্য করি অন্য জনে কথা কহে ছাঁদে ॥
কিপ্‌টে ভাতার, কেয়া কাঁটা, কুম্‌ড়ো বলিদান।
মুখ মিষ্টি মধুপর্ক, সকলি সমান ॥
সে বলে তলানি, জানি পুরুষ বড দাতা।
লম্বা কোঁচা পরের কাছে, ঘরে ছেঁড়া কাঁথা ॥
বল্যে—পালটা গেয়ে, আল্‌তা-মাখা পা দুখানি তুলে
আয়না ফেলে, জান্‌লা দিয়ে, চল্লো খোলা চুলে ॥

কবি কহে "ফিমেল" বাছাই হয় যদি কখন।
বাছুনির বাহাদুরী দেখাব তখন ॥

পোলিং শেষে হাজ্‌রে ডাকা, পরক্ ভারী দড়।
বাছাই করা মেম্বরেরা কাউন্সেলে জড় ॥
কাগজ হাতে, হগ্‌ বাবাজী, হাকিমি ধরণ।
একে একে, ডাকেন সবে ত্যাড়া উচ্চারণ ॥
নবাব নমুদ আলী; খান্‌সামা গোলাম,
রায় রাজেন্দ্র, শ্রীরাম যুগী ? উত্তর—"সেলাম"
কুমার ভেকেন্দ্রকৃষ্ণ; কানাই নাজির;
সাহেবজাদা সেকেন্দর ? উত্তর—"হাজির" ॥
নাপিত্ত নবেরচাঁদ, পদ্মবাহাদুর;
ছিদাম মালী, শ্রীধর মুচী ?—"হাজির হুজুর" ॥
রামভদ্র চেতলজী, নবি বর্কন্দাজ,
আনারেবেল শিষ্টদাস ?—"গরিব নমাজ" ॥
প্যাগম্বর "সি, এস, আই," পরেশ তৈনং,
শ্রীরাম মস্তকি হায় ? "সাহেব দণ্ডবং" ॥
মৌলভী তালিম্ মিয়া; ইন্দ্রেন্দ্র পিরালী,
ঘড়েল সাবুই বাগ্‌ ?—"হাজির হুজুরালি" ॥
ডিপুটি মফর বক্স, সৈয়দ নবিশ্তে,
জো হুকুম পিরপ্যাঁচা ?—"আপ্‌ কি ওয়াস্তে"।
হাজ্‌রে ডেকে, সাহেব গেল যাত্রা ভঙ্গ গোল!
হল্লা দিয়ে ছুটলো পাছে তারুই মাঝের "শোল"
কোলাকুলি, গলাগলি, "সেকেনে"র ধুম।
মিউনিসিপেল মজা দেখে, আক্কেল গুড়ুম ॥

নেভার—নেভার

[রচনা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ইল্‌বার্ট বিল উপলক্ষে]

(১)

গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান্,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌শন্ কেণ্ডয়িক মিলার্—
"নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার!"

"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা ?"
বিবিজান্ ! দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না ॥
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হ্যাট্ কোট্ বুট্ পরে
সরা ভাবে জগতেরে— তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে ?—"নেভার—নেভার" !!
"নেভার"—সে অপমান হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা ?"
দেহে প্রাণ, বিবিজান ! কখনো তা হবে না ॥

(২)

কাঁপিল মেদিনীতল, ধরা যায় রসাতল,
অস্ত্র ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে "ভলেন্টিয়ার" ছুটেছে,
কাগজ কলম ধরে কামিনীরা উঠেছে !!
হুরে হিপ্—হুরে হো, শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার।"

(৩)

বিলাতি বৃষের রব কামিনী খেপিল সব,
বলদের কাছে গিয়া কাণে দিল পাক,
পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দভরে
ডাকিল বৃটিষ-বৃষ গাঁক্ গাঁক্ ডাক ॥
হুরে হিপ্—হুরে হো, শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা—"ফ্রীডম্—এভার।"
"নেভার"—সে অপমান হতমান বিবিজান
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা।"
দেহে প্রাণ বিবিজান, কখনো তা হবে না ॥

(৪)

আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই সিন্ধুপারে চলে যাই
সেখানে "লিবার্টি হল" আমাদেরই সভা।
পাত্র মিত্র যত জন সকলেই গবা !—
বুঝাইব খাঁটি হাল আছিলাম এত কাল
হিন্দুদেশে ভালবেসে হিন্দুর সন্তানে,
সিংহ যেন মৃগ কোলে স্বর্গের উদ্যানে !!

লাথি কিল পটাপট, জুতো চড় চটাচট্,
"লিভর্" পীলে ফটাফট আপনি যেতো ফেটে।
আমরাই করুণায় মলম মাখায়ে গায়
রাখিতাম কোলে করে হিন্দুর সন্তানে।
সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের বাগানে!
হুরে হিপ্—হুরে হো—শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার"।

(৫)

হুঁসিয়ার ইলবার্ট দেখো হে রিপন লাট—
সাহেব-রক্ষণী সভা সংগঠিত হয়েছে।
ছুপোঁচ তেপোঁচ মিলে লক্ষ টাকা দেছে তুলে
চামড়া কটা কতগুলো "এঙ্কিবিয়স্" যুটেছে।—
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে,
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা?
আয়রে ফিরিঙ্গি ভাই, সবরঙা ডাকে সবাই—
সিন্ধুপারে দেখে আসি ইংরেজের সভা।
পালে ঢুকে মিশে যাব আন্দ্রু পিন্দ্রু নাহি রব
সিংহদলে স্থান পাব বেছে নেবে কেবা!
হুরে হিপ্—হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
এ-দিশী "বৃটন" মোরা গোরাদের ব্যাটা!!

(৬)

জয় জয় বৃটনের জগৎ পেয়েছে টের—
ভারত উদ্ধার হবে আমাদের "মিসনে"।
সে বাসনা যত কাল পূর্ণ নহে, তত কাল
আমরা থাকিব হেথা কি করিবে রিপনে?—
ভারত উদ্ধার হবে, আমাদেরই "মিসনে"!!!
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হুরে, হ্যাট কোট বুট পরে
বেড়াব শিকার ধরে যেথা পাব ভুবনে—
কি করিবে আমাদের "টেরেটর" রিপনে!!
শত্রু যদি করে গোল, ধরিব বৃষভ-বোল,
উচ্চতানে শুনাইব নিছক খেউড়।
সাবাস ইংরেজ জাতি সাবাস বুকের ছাতি,
লাঙ্গুলে বেঁধেছ ভাল সভ্যতা নেজুড়!!

হুরে হিপ্—হুরে হো—শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার।"
হুরে হিপ্—হিপ্—হুরে, হ্যাট কোট বুট পরে
সবা ভাবে জগতেরে তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে?—"নেভার—নেভার!"

(৭)

কলরবে কুতুহলী নেটিবের দল।
জনবুলে দেখাইল শিঙভাঙা কল॥
দেখাইল বাড়ী গাড়ী জুড়ি বাছা বাছা।
"ম্যাঙ্গো ফিশ" মনোহর আনন্দের খাঁচা॥
ছড়া ছড়া পরিপক্ক তাজা মর্ত্তমান।
দেখিলে ইংরেজ যাহে সদা মুগ্ধপ্রাণ॥
দেখাইল রত্নগর্ভা বাঙ্গালার সুবা।
মান্দ্রাজ বোম্বাই দেশ চক্ষুমনোলোভা॥
রত্নমঞ্চ "রেসিডেন্সি" দেখাইল কত,
জ্বলিছে ভারত জুড়ে মাণিক পর্ব্বত!
চলেছে তাহার তলে এদেশী রাজারা,
পৃষ্ঠপরে শ্বেতকায় রাণীর প্রজারা!!
হুরে হিপ্—হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার॥"

(৮)

হঠাৎ পড়িল ডাক সামাল সামাল।
বলি শোন্ ওরে ভাই ইংরেজছাবাল।
এ রাজত্ব ছেড়ে আর কোথা যাবি বল?
চির শিক্ষা বৃটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাবো—টুট টুট টুট!!
ধূপছায়া ভায়ারা সবে শোন তবে বলি,
আরমেনিয়া যাও হে কেহ—কেহ চুণাগলি॥
স্পষ্ট কথা বলা ভাল বিঘ্ন বড় ভারি—
"মিল্চ্ কাউ" ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি!!
সবাই মিলে "অ্যা হেম্" বলে পকেট পানে চায়,
উচ্চতানে ধীরে ধীরে হাম্বা স্বরে গায়—
হুরে হিপ্—হুরে হো—শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা—"হেথা ফরেভার"॥
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হুরে হেথা ছেড়ে যাব ফিরে?
"ড্যাম্ দি নেটিব বিল" "নেভার—নেভার!!"

হায় কি হলো?—

(১)

হায় কি হলো—কলম ছুঁতে হাসি এলো দুখে!
ভেবেছিনুম—মনের কথা বল্‌বো ছাতি ঠুকে!
এলো হাসি—হাসিই তবে, ঢেউ খেলিয়ে চ'ল্যে
ছড়াক্ খানিক্ রসের কথা—"হায় কি হলো" বল্যে!

(২)

হায় কি হলো দেশের দশা রিপণরাজার ভুরে?
সাদা-কালো সমান হবে,—সবার মুণ্ডু ঘুরে!
আসল কথা রইল কোথা, কেউ না সেটা খোঁজে;
কথার লড়াই, কথার বড়াই,—হাওয়ার সঙ্গে যোঝে!
সফেদ-কালা মিশ খাবে না, সমান হওয়া পরে!
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুল্লে উঁচু ক'র্যে?

(৩)

হায় কি হলো—পেটের কথা বেরিয়ে গেল কত!
ইস্তক্ সে লাট্ টম্‌সন্,—বেরাল ইঁদুর যত—
ব'ল্যে দিলে "রাষ্ট্র ক'র্যে গুপ্ত প্রেমের কথা,"
নেটিভদিগের উচ্চপায়া, সেটা কথার কথা!
ধর্ম্মভীতু এ দিশীও তাদের ভিতর ছিল,
পষ্ট কথা ব'ল্যে দিয়ে "পুরস্কারি" নিল!

(৪)

হায় কি হলো—কত লোকের ভ্রমটা গেলো ঘুচে,
বিলেত ফেরা এ দেশীতে তফাৎ নাইক ছুঁচে,
যতই বলুন, যতই শিখুন তাদের চলন চাল,—
ইংরাজেরা ভোলে না তায়,—হায় রে কলিকাল!

(৫)

হায় কি হলো—কপাল পোড়া উমেদারের পেসা
পড়লো চাপা, জাঁতার তলে—সাহেব বড় গোষা!
অন্ন গেলো বাঙালিরই, আর কি হলো তায়!
এ পোড়া ছাই "ইল্‌বার্ট বিল্" কেন হায় হায়!

(৬)

দেশের দশা হায় কি হলো—বিলেত গেলো রমা,
তিন দিন না যেতে যেতে—খ্রীষ্ট ভজে, ওমা!
পুরুষ পাছে মেয়ে আগে—সুফল তাতে ফলবে না,
চাই এ দেশে, আর কিছু দিন, এ দিশী "জানানা"!

(৭)

হায় কি হলো—আকাল এলো আবার ধ্বজা তুলে,
রাজার পুণ্যে প্রজার কুশল—লেখাই আছে মূলে!
তাদের আবার, হায় কি হলো—অন্ন যাদের ঘরে?
জমিদারের গলা-টিপে স্বত্ব চুরি করে।
"টেনেন্সি বিল্" নামে আইন হচ্চে তৈয়ের করা,
গয়া-গঙ্গা-গদাধর—ভূস্বামী প্রজারা!

(৮)

হায় কি হলো—কথার দোষে সুরেন গেলো জেলে!
ইংলিসম্যানে "কন্‌টেম্পট্" ও "সিডিসন" ও চলে?
আহেল্ বেলাত নরিস্ সাহেব ধর্ম্ম-অবতার
দেশের ছেলে খেপিয়ে দিয়ে কল্লে একাকার!
ফিন্‌কি ছুটে ভারত জুড়ে আগুন গেলো লেগে;
হায় কি হলো—ছেলেগুলো পুলিস দিলে দেগে!

(৯)

হায় কি হলো—বঙ্গদেশের কপাল গেলো ফিরে,
গুলি পুরে গোরা ফউজ দাঁড়িয়ে বারাকপুরে!
আস্‌চে সুরেন ঘরে ফিরে—এই ত কথা সাদা,
এতেই এতো আড়ম্বরি—ইংরেজ কি গাধা!

(১০)

বোঝে যারা "হায় কি হলো—তাদের কাছেই বলি,
"ন্যাসনেল্ ফনের্" ব্যাপারটা নয় কি ঢলাঢলি?
পরের অধীন দাসের জাতি "নেসেন্" আবার তারা?
তাদের আবার "এজিটেসন্"—নরুন উঁচু করা!

(১১)

হায় কি হলো—দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে!
পার্টি-খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত-রাজ্য পরে!
সবাই "লীডর্"—কর্ত্তা স্বয়ং—আপনি বাহাদুর,
কতই দিকে তুল্‌চে কত কতইতরো স্বর!

(১২)

হায় কি হলো—বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম দেছে ছেড়ে!
হায় কি হলো—দেশটা গেছে "সাপ্তাহিকে" জুড়ে!
হায় কি হলো—ভূদেব গেলো. ছেড়ে গুরুগিরি!
হায় কি হলো—হেম নবীনের, নাইকো জারিজুরি!

(১৩)

সবার চেয়ে হায় কি হলো—ওই যে হাসি পায়,
"হেষ্টি-পিগট্" মিষ্টি কথা—"মিষ্টিরি" তলায়!
কি কাণ্ডটা ছি ছি ছি ছি—"নজ্জা"র কথা বড়,
পাদ্রী হয়ে উভয় দলে—রগড় ভারী দড়!

(১৪)

হায় কি হলো—আধখানা মাঠ জুবার্ট নেছে ঘেরে!
বিষয়টা কি, বুঝতে নারি কাণ্ডখানা হেরে!
আদ্দেক্ বাড়ী সহর মাঝে হচ্চে ম্যারামৎ;—
শুন্‌তে ভালো "এক্‌জিবিসন্"—এক জনার কিস্‌মৎ!
দেশের শিল্পী কারিগুরি শিখবে বিলাতীরা—
অন্নাভাবে দুদিন বাদে মরবে এদিশীরা!
হাস্‌বো কত—"একজিবিসন্" দেশের ভালো করে!
খেতে অন্ন নাইক যাদের—একি তাদের তরে?

(১৫)

হায় কি হলো, দাঁড়াই কোথা?—ইংরেজে ইংরেজে
তুমূলকাণ্ড বেধে গেছে—সবাই মল্লসাজে!
বল্‌চে যত "কলোনিয়া" আমরা হিঁস্তে চাই,
ভাগ বসাবে "অষ্ট্রেলিয়া" অন্য কথা নাই!
এদিশী ইংরেজে সবাই বাঁধ্‌ছে আবার দল,
রাখ্‌বে ভারত নিজের হাতে—দেখিয়ে বাহুর বল!

"ইংলিস্‌ম্যানে"র ফরেল্ সাহেব কচ্চে "কম্যাণ্ডরি",
পেছন থেকে "পাইওনিয়ার" হাঁকুছে হাওলদারি !
বাপ রে বাপ—কি চেহারা "ভলন্টিয়ার্"গণ
সাঙ্গিন্ হাতে দাঁড়িয়ে গেছে—কাঁপচে কলা-বন।
আর কি থাকে রাণীর রাজ্য ?—নীলকর, চা কর
দিচ্চে সাড়া সাঙ্গিন্ খাড়া—উঁচিয়ে হাতিয়ায় !
ছেড়ে দেবে ছর্‌রা-ভরা—পাখী-মারা "গন্",—
দু লাখ সেপাই উড়ে যাবে—"আর্ম্মি"—"সেলর"গণ !
তাই ত বলি "হায় কি হলো"—রাজ্য আলমগিরি !
একেই বলে দেশোন্নতি—সাবাস্ বলিহারি !
বুঝবে যদি "হায় কি হলো"—পয়সা কটি দিও,
যত্ন ক'রো বঙ্গদর্শন কাগজখানি নিও ॥

দেশেলাইএর স্তব

নমামি বিলাতী অগ্নি—দেশেলাইরূপী,
চাঁচাছোলা দেহখানি, শিরে কালো টুপি !
যেন বা ডিপুটি খাঁটি একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বিঁড়ে—রাগে প্রাণ ভরা !

নমামি গন্ধকগন্ধ—মাথাটি গোলালো,
সর্ব্বজাতি-প্রিয়দেব, গৃহ কর আলো !
শান্ত সভ্য অতি ধীর শুয়ে যত ক্ষণ,
গা ঘেষিলে চটে লাল—গৌরাঙ্গ যেমন !

নমামি সর্ব্বত্রগামী দারু অবতার,
চৌর্য্যবিঘ্ন-বিনাশন, শ্যালক টীকার !
নিদ্রিতের গুপ্তচর, রাঁধুনীর প্রাণ,
লম্বাদাড়ি কাবুলীর শিরে পীঠস্থান !

নমামি খদ্যোতশিখা তিমির-হরণ,
লালেতে নীলের আভা দিব্য দরশন !
পোয়াতির প্রিয়বঁধু, তরুণীর অরি,
বিরাজ, রে দিয়াকাটি, কত রূপ ধরি !

প্রণমামি অগ্নিশিখ শুভ্র দেশেলাই,
সাহেব গোলাম তব, সাবাস্ বাদসাই !
সোণা টিন্ রূপা তামা বাঁধা তব গায়,
লাটের পকেটে ফেরো, লেডির ঝাঁপায় !

নমামি অত্যম্যতেজ বরষা-দমন,
আঁচড়ে কিরণধর সখের দহন !
আখা জলে বিনা ফুঁয়ে বিনা চখে জল,
দিয়াকাটি, তোর প্রেমে মাগীরা পাগল !

উনিশ শতাব্দী সূর্য্য কাষ্ঠের চক্‌মকি,
তোমার চমকে বিশ্বকর্ম্মা গেছে ঠকি !
বন, জল, বিল, খাল, যেথা সেথা যাই,
শিরে ভাঁটা শাদাকাটি দেখি সেই ঠাঁই !

নমামি ভাস্কররূপী দারু-দেশেলাই,
কড়ি দিয়ে কিনে নিয়ে ঘরে তারা পাই !
পয়সা যোড়া বাক্স-বাঁধা ক্ষুদ্র প্রভাকর
ঘরে ঘরে আলো করে ধরণী উপর !

নমামি নমামি দেব স-অগ্নি ইন্ধন,
তোমার প্রসাদে হয় সাগরে রন্ধন!
সভ্য জগতের তুমি সোহাগের বাতি,
চুরুটভক্তের মোক্ষ পদার্থ বিলাতি!

নমামি ফর্‌ফরশব্দ "ফস্ফর"-বেষ্টন,
ধনি-মানি-জ্ঞানি বন্ধু, কাঙ্গালের ধন!
সন্ধ্যার সোণার কাটি, জোছনার ছবি,
সাবাস্ বিলাতি বুদ্ধি বাক্সে বাঁধা রবি!

নমামি কিরণদণ্ড কোপনস্বভাব,
রাজগৃহ খড়ো ঘরে সমান প্রভাব!
সিন্ধুজলে, পথে, ঘাঠে, গাড়ী, ঘোড়া, রেলে,
সকলে তোমায় খোঁজে সূর্য্য শশী ফেলে!

ভিখারী কুটীরে সুখী, ভীরুতে সাহসী,
তোমা পেয়ে খঞ্জ খাড়া, প্রাচীনা ষোড়শী
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি মানবতারণ,
দিয়াকাটি, তোর গুণ কে করে কীর্ত্তন!

নমামি কলির দেব আগুনের শলা!
নমামি স্বর্থর্ব্বদেহ খড়কে মোমে গলা!
নমামি অনলযষ্টি অবনী-বিহারী,
দেশেলাই, প্রণমামি অন্ধকারহারী!
তোর গুণে, দিয়াকাটি, মুগ্ধ জগজন,
প্রণমামি দেশেলাই দেবের ইন্ধন!

বাজিমাৎ

বেঁচে থাকো মুখুর্য্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে
"ফিক্র" দানে, এক তড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়!
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুলতলায়!
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে॥
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে।
কোথায় কৈশবী দল? বিদ্যাসাগর কোথা?
মুখুর্য্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা॥
হরেন্দ্র নগেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি,
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥
ধন্য মুখুর্য্যের বেটা বলিহারি যাই!
সস্তা দরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই!
ও যতীন্দ্র কৃষ্ণদাস! একবার দেখ চেয়ে
বকুলতলার পথের ধারে কত শত মেয়ে—
কালো, ফিকে, গৌর, সোণা হাতে গুয়া পান,
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান॥

আস্‌বে রাজা রাজপারিষদ, লাট সাহেবের মেয়ে—
মাবুবেল মারা গিল্‌টি হলে, একবার দেখ চেয়ে ॥
বেলগেছেতে থানা দিয়ে খেটে হলে খুন।
বিষ্ণুপুরে মিজের দেখ বড়ে টেপার গুণ ॥
ছি! রাজেন্দ্র! কাল কাটালে পুথি ঘেটে ঘেটে।
শেষে আইনপেসার পেস্কারিতে মান্‌টা গেল ঘেটে।
ধন্য হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপ্টা দরে সাৎ করিলে খেতাব "সি, এস্‌, আই॥"
হেদে ও-সহরবাসি আর কি হাসি হাসবি রেড়ো বলে?
দেখ না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব—
নাড়ীটেপা ফেরার সাহেব, বাবুটেল নায়েব॥
আর কেন লো ঘোমটা খোল, কবির কথা রাখো।
"লাইট" পেয়ে "রাইট" হয়ে, পার হও লো সাঁকো॥
ভয় কি তাতে লজ্জা কি তায়, কাল বদনখানি।
দেখ্‌বে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি॥
কজা তুলে দেখবে বাজু, দেখবে কাণের দুল,
দেখবে কণ্ঠি, কণ্ঠহার পিঠের ঝাঁপাফুল॥
আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণচাপ—
শিবের বিয়ে নয় লো ইহা ধরবে নাকো সাপ॥
এগিয়ে এসো বড় ঠাক্‌রুণ, সাত পোয়াতির মা।
ভক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না?
সোণার থালে হীরের মালা তাতে ঢাকাই ধুতি,
নজর দিয়ে, দেখাও খুলে বউ বিনুনো পুঁতি॥
বাহবা বুক, বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে,
রাজ্‌পুজাটি কল্লে ভাল, ফুলের মালা নিয়ে!
কোন্‌ শাস্ত্রে লেখে বল বামনের মেয়ে হয়ে।
রাজার ছেলের পা পুজিবে ফুলের সাজি লয়ে॥
এখন—দাঁড়াও সরে বুড় দিদি, হাসিল্‌ হলো কাজ—
দেখ্‌বো আমি ভাল করে আর এয়োদের সাজ॥
আয় না লো সব, একে একে, গোলাপী কাঞ্চন।
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকালি কেমন॥
ভয় করো না একলা আমি দেখতে নাহি চাই।
রাজার ছেলে আব্‌ডালেতে উঁকি মারবো ভাই॥
আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে?

বলতে কথা বাছা বাছা কদম ফুলের ঝাড় ।
ঘেঙ্গে আসি রাজকুমারে, ভাঙ্গলো কবির ঘাড় ॥
হীরার ঝলস, সোণার কলস, হাত ঝুম্‌কার বোল ।
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি, শাঁকের গণ্ডগোল,
বারাণসীর খস্‌খসানি, উঠলো মহা ধূমে ;
মাঝ্‌বেলেতে মলের ঠমক বাজ্‌লো ক্রমে ক্রমে ॥
কবি হৈল হতভোম্বা হিঁদুর পর্দ্দা ফাঁক ।
পালিয়ে যেতে পথ পায় না ঘোরে কলুর চাক ॥
বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন ।
বাঙ্গালী-কুলকামিনী হইল স্বাধীন ॥

সে নিশিতে কি সহরে কিবা পল্লীগ্রামে ।
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে ॥
গৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্নাহাটি ।
সারা নিশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি ॥
কহে কোন রাজনারী বিনায়ে বিনায়ে ।
শয়নগৃহের পাশে পতিকে শুনায়ে ॥
"খালি সাটিনের সাজ, ফেটিন্ হাঁকান ।
কেবল সেলাম্‌বাজি, লেবিতে বেড়ান ॥
দিন রাত ঘুরে ঘুরে মরেন কেবল ।
ঘোড় দৌড়ে, টাউন্ হলে, মুড়িয়া মক্‌বল ॥
ক্লাইব লাটের আমল হতে পেসা খোসামুদি ।
তাতেও গলদ্ এত—কি কব লো দিদি ॥
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি ।
চাঁদা দিতে চাঁদি ফাটে মানের গুড়ে বালি ॥"
শুনিয়া নারীর কথা মনে অভিমান ।
কর্ত্তাটি জানালা খুলে স্নিগ্ধ বায়ু খান ॥

অন্য কোন অট্টালিকা ভিতরে আবার ।
পতি পাশে কোন রামা করেন ঝঙ্কার ॥
"পর্ব্বটা কি, শুনেছ তো লজ্জা নাই মুখে ।
পোষাক খুলে চুপে চুপে শুতে এলে সুখে ॥
রাণীর ছেলে দেখে গেল হলুদমাখা হাত ।
সাতপুরুষে সভ্য মোরা হলেম গুদমজাৎ ॥
পড়্‌তে পারি, বলতে পারি, ইংরাজী ভাষায় ।
পিয়োনা বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায় ॥

'এন্ লাইটেন' সবার আগে, কর্ত্তা বিলেত যান।
তোমার গুণে গুণমণি হারালে সে মান ॥
পায়ে বুট, জোব্বা গায়ে, গলায় সোণার চেন।
তক্‌মাওয়ালা আড়দালিতে হয় না শুধু 'ফেম' ॥
বাপ পিতামোর নামে খালি হয় নাকো রাজভেট!
'টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট্ চাই ষ্ট্রেট ॥"
ধিক্ তোমারে ধিক্ সে তোমার হিরান্ডরি বুক।
এক মিনিটে বাগিয়ে কেমন লাগিয়ে দিলে হুক্ ॥"
খোঁটা খেয়ে অধোমুখে পতি তার চায়।
এইরূপ গঞ্জনায় সারা নিশি যায় ॥

বলে কোন ধনাঢ্যের অভিমানী নারী।
"বড় নাম, বড় জাঁক, বোঝা গেছে জারি ॥
দূর করে টেনে ফেল—টাকা দিও শয়ে।
এ হিড়িকে দাঁড়ালে না একটা কিছু হ'য়ে ॥
বাঁধা রোসনাই আলো সব কি গেল ফেঁসে।
রায় বাহাদুর নামটাও ছি না পাইলে শেষে ॥
সুযোগ বুঝে হুজুকে বামুন নাম কল্লে জারি।
তোমার কেবল আতস বাজি, মন্দ তুমি ভারি ॥"

জজের গৃহিণী কন ' ভ্যালা জজিয়তি।
নামে শুধু অনারেবল্, পদ বিলায়তি?
ছোট লাটে আজ্ঞাকারী তোমা হতে দেখি
লক্ষগুণ বড় লোক, বল দেখি এ কি?
কুঠি নিলে বাড়ী ছেড়ে সাহেব পাড়ায়—
তোমার কোর্টের উকিল তোমাকে হারায়!
ছি ছি, ছি ছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরি।
শুদ্ধ খালি মার্কামারা পেয়াদার 'লিবরি'
ভাবতেম বুঝি কেষ্ট বেষ্ট তুমি এক জন—
জরাসন্ধ রাজা কিম্বা লঙ্কার রাবণ
ও মা ও মা পড়া ভাগ্যি, উকিলের ওঁচা।
হাড় জ্বালাতে পারেন খালি এনে নথির গোচা ॥"
বলে—ঠোন্‌কা মেরে জজমহিলা বারাণ্ডায় যান।
মিত্র ভায়ার রাত্রি শেষ ভাঙ্গতে তার মান ॥

পোনা, পুঁটি, খয়রা, চেলা গিন্নি আর যত।
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত ॥

কেহ বলে আমার কর্ত্তাটি সে মুৎস্থদ্দি।
ফ্যাটা বেঁধে যান খালি এই বিদ্যা বুদ্ধি॥
বাপের কামানো টাকা বিলাতি চাটকে।
দিয়া, নিজে জুজু হয়ে ঢোকেন ফাটকে॥
তাঁর টাকা তাঁর কড়ি তাঁরি লোক জন।
মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন॥
শেষে যবে "হোমে" যায় দু বছর পরে।
বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে॥
এই তো বল্লেম তার বিদ্যার ওজন।
তা হ'তে আমার আর কি হইবে বোন॥
বলে দালালের মাগ দালালি ব্যাপারে।
আনে বটে ঢের কড়ি নিজ রোজগারে॥
পেটেতে কড়িটি ভোর কাল আঁচড় নাই।
সে কেমনে রাজপুত্র আনে বল ভাই॥
কাগজের এডিটরি করে মরে যারা।
তাহাদের কামিনীরা কেঁদে কেঁদে সারা॥
রাত্রি দিন এত খাটে হায় লো স্যাঙাৎ।
হপ্তায় মিনিট পাঁচ হয় না সাক্ষাৎ॥
এত লেখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে।
তবু পদ নাহি পায় অভাগীর পাপে॥
কবি বলে কামিনীরা কৃষ্ণনাম কয়।
ফিরিবে তোদের ভাগ্য শুন অতঃপর॥
ডিপুটীর ভার্য্যা কন আমাদের তিনি।
চৌকিদারী কাজে পটু, মফস্বলে "গিনি"॥
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার।
বল্‌বো কি লো ওলো দিদি অদৃষ্ট আমার—
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালি।
সাত শ টাকা মাইনে হলে হদ্দ ঠাকুরালি॥
মন্দ বড় তবু এতে চোক্‌রাঙানি কত।—
ঘুটের ঢিপে ভাবে দিদি দেখিলে পর্ব্বত॥
হোতাম যদ্যপি কোন উকিলের মাগ্।
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ॥
সে রমণী বলে "বোন" এ পিট ও পিট।
একি ছাঁচে ঢালা দুই সমান টিকিট॥
যে টাকাটি মাসে মাসে করে উপার্জ্জন।
চৌদ্দ ভূতে পড়ে করে অর্দ্ধেক ভোজন॥

কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজলাসে এজলাসে।
তিন তেরোটি লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে॥
বেশ্যার বেহদ্দ পেসা কথা বেচে খায়।
পদের আবার মান সম্ভ্রম কোথায়॥
আমি উকিলের মাগ্‌ কথা শোন বোন্॥
মুখুয্যের সঙ্গে কার করো না ওজন॥
বটে বোন্ বটে বটে মানি তোর কথা।
বলে ধীরে ধীরে এক নারী আসে সেথা॥
আমার কর্ত্তাটি দেখ সরকারি উকিল।
মুখুয্যের "সিনিয়র" উকিল সিবিল॥
বয়েসও হয়েছে কিছু, বুদ্ধিও পেকেছে।
ছোট বড় কর্ম্ম কাজ অনেক করেছে॥
পাকা হিন্দু প্রতি দিন দুর্গানাম করে।
তবুও রাণীর ছেলে ঢুকলো না লো ঘরে॥
ডাক্তারের নারী কহে ভারি ত মদ্দানি।
নাড়ী টিপে জারি কত, ঘরেতে শাসানি॥
পারেন কেবল পাড়ায় পাড়ায় পিটিতে ধম্বল,
মরণকালে শরণ "চিবর" "পার্টিজ" সম্বল॥
মরেন ঘুরে পথে পথে রোদে ধুকে ধুকে।—
ঘরে শুতে এলে এবার খেঙ্গরা দেব ঠুকে॥
কেরাণীর নারী যত পাঁদাড়ে ফোঁপায়।
মাষ্টারের "মিসট্রেসরা" গোবাঘরে যায়॥
কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায়॥
কান্তা আসি হাস্যমুখে বলে কই দেখি।
কি পাইলে কাব্য লিখে, সোণা কিম্বা মেকি॥
বড় জ্বালাতন কর জেগে সারা রাতি।
কালি ফেলে, কাগজ ছিঁড়ে, পুড়িয়ে মোমের বাতি॥
শয়নে সোয়াস্তি নাই, বিরাম নিদ্রায়।
সাত রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি বয়ে যায়॥
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা।
বুলু রিবন, চাকি চাকতি, কিম্বা জরির খোপা॥
কবি কবে পায় কিবা, কি দেখাবে ধনি?—
না বলিতে রাঙ্গা ঠোঁঠ ফুলায়ে তখনি॥
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গর্‌গরিয়ে যায়।
ফাঁপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল ফ্যাল চায়॥

॥ জীবন-ভাবনা ॥

জীবন-মরীচিকা

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে!
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে!
প্রভাতে অরুণোদয় প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা, কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ, ভূধর, দেশ ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী আকারে!
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।
কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত লুব্ধ আশা আসি স্নিগ্ধ করে আত্মারে।
"পৃথিবী ললামভূত, নিত্যসুখে পরিপ্লুত,"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে।
ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময় সংসারে॥
মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ, না থাকে কুসুমগন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত,
মনোগত সাধ তত ভাঙে চিত্তবিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা, লয়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য-বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।
জীবনেতে পরিণত এইরূপে হয় কত
মর্ত্ত্যবাসি-মনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতারে!

ধর্ম্মনিষ্ঠাপরায়ণ, সুচারু পবিত্র মন,
বিমলস্বভাব সেই যুবা এবে কোথা রে !
অসত্য কলুষলেশ, বিঁধিলে শ্রবণদেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।
বামাশক্তি বামাচার, শুনিলে শত ধিক্কার,
জ্বলিত অন্তরে যার সে তপস্বী কোথা রে ?
কোথা সে দয়ার্দ্রচিত্ত, সঙ্কল্প যাহার নিত্য
পরদুঃখবিমোচন এ দুরন্ত সংসারে।
অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে সংযমন,
না করিত যেই জন ভেদাভেদ কাহারে।
না মানিত অনুরোধ, না জানিত তোষামোদ
সে তেজস্বী মহোদয়-বাঞ্ছা এবে কোথা রে ॥
কত যুবা যৌবনেতে, চড়ি আশা-বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা-আভা রে।
তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গলঘট,
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য, বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য,
হ'য়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরারে।
স্বদেশ-হিতৈষী কেহ, ভাবিয়ে অসীম স্নেহ,
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে ॥
কার চিত্তে অভিলাষ, হবে সারদার দাস,
পীবে সুখে চিরদিন অমরতা-সুধা রে।
কালের করাল স্রোতে, ভাসে যবে জীবনেতে,
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে !
কিশোর গাণ্ডীবধারী, জামদগ্ন্য দৈত্যহারী,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।
কতই যুবতী বালা, গাঁথে মনোমত মালা,
সাজাইতে মনোমত প্রিয়তম সখারে।
হৃদয় মাজ্জিত ক'রে, আহা কত প্রেমভরে,
প্রিয়মূর্ত্তি চিত্র ক'রে রাখে চিত্ত-আগারে।
নব বিবাহিতা কত, পেয়ে পতি মনোমত,
ভাবে জগতের সুখ ভরিয়াছে ভাণ্ডারে।
এই সব অবলার, কিছু দিন পরে আর,
দেখ, মর্ম্মভেদী শেল দেয় কত ব্যথা রে।

দেখ গে কেহ বা তার, হয়েছে পঞ্জরসার,
শুষ্ক হ'য়ে মাল্যদাম শূন্যে আছে গাঁথা রে।
মনোমত নহে পতি, মরমে মরিয়ে সতী,
উদ্‌যাপন করিয়াছে পতিসুখ-আশা রে।
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে, দিবানিশি কেহ কাঁদে,
বিষম বৈধব্যদশা-নিগড়েতে বাঁধা রে।
দারুণ অপত্যতাপে, দেখ গে কেহ বিলাপে,
অন্নাভাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদারে।
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম.
তা হ'লে কি পড়িতাম আনায়ের মাঝারে!
কোথা গেল সে প্রণয়, বাল্যকালে মধুময়,
যে সখ্যতা-পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে।
সহপাঠী কেলিচর. অভেদাত্মা হরিহর,
এবে তাহাদের সঙ্গে কত বার দেখা রে।
পতঙ্গপালের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরত,
স্বকার্য্য সাধনে রত, কেবা ভাবে কাহারে।
আহা পুনঃ কতজন, করিয়াছে পলায়ন,
মর্ত্ত্যভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে।
গগন-নক্ষত্রবৎ, তাহারাই অকস্মাৎ,
প্রকাশে ক্বচিৎ কভু মৃদুরশ্মিমাখা রে।
আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পুর্ণিমা চাঁদ,
হেরিতে নক্ষত্র শোভা নীল নভঃ মাঝারে।
দিন দিন কতবার, জাগ্রতে নিদ্রিতাকার,
স্বপ্নে স্বপ্নে ভ্রমিতাম নদ-হ্রদ-কান্তারে।
বসন্ত বরষাকালে, পিকরব, মেঘজালে,
হেরিতে দামিনীলতা, কি আনন্দ আহা রে।
সে সাধ তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচালে জীবনের হেন রম্য ধাঁধা রে।
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, স্বর্গবাসী সিংহাসন
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধচিতা-অঙ্গারে।

পরশমণি

১

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?
এই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জ্বলে ?
বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশমণির সনে, লৌহ অঙ্গ পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি,
মাটির অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ!

২

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র শোভা গগনে ফুটিত!
কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জ্যোৎস্না ধ'রে,
তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে?
কেবা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল
ভারতভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে ?
কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু-অলো তুলে, সাজায়ে বিহঙ্গ কুলে,
কে রাখিত শিখি-পুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

৩

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল, হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী!
কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে,

না হয় মানবচিত্তে আনন্দদায়িনী !—
নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী,
পক্ষিপাখা উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কণী !
তাতেও আনন্দ হয়, অরণ্য কুঞ্জ,ঝাটিময়,
জলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী ।

৪

ইহাই পরশমণি পৃথিবী ভিতরে ;
ইহারি পরশ-বলে সখায় সখার গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে ;
শিখায়ে প্রেমের বেদ, ঘুচায় মনের ভেদ,
প্রণয়-আ হুক করে সুখের সাগরে ।
ধন্য এই ধরাতল, প্রেম-ভোগবতী-জল
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে ;
যুগল নক্ষত্র দুটি, যেখানে বেড়ায় ছুটি,
সখারূপে মনোসুখে পৃথিবী-উপরে ।
কোন্ পুণ্যে হেন নিধি, মানবে পায় রে বিধি—
গেল চলে চিরদিন অই আশা ধরে !

৫

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন !
স্নেহরূপ কত ফুল, ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন !
জননী-বদনইন্দু, জগতে করুণাসিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশী-রশ্মিমাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা,
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন,
সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব-জনম সার সফল জীবন ।—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

জীবন-সঙ্গীত

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন ;
(দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
বলে জীব করো না ক্রন্দন।)
মানব-জনম সার এমন পাবে না আর
বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয়
অহে জীব কর আকিঞ্চন।
করো না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ করো নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
(দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ;)
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসার-সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে
ভয়ে ভীত হইও না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান যায় যাবে যাক প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে অহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা করে হইও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত
একমনে ডাক ভগবান ;
সঙ্কল্প সাধন হবে ধরাতলে কীর্ত্তি রবে
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হবো বরণীয়।

সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার-সমরাঙ্গণ-মাঝে ;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

পদ্মের মৃণাল

১

পদ্মের মৃণাল এক, সুনীল হিল্লোলে,
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্মশতদলে গাঁথা,
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
এক দৃষ্টে কত ক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন,
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

২

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি !
রাজা রাজমন্ত্রী-লীলা, বলবীর্য্য স্রোতশীলা,
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি ?—
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি !
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহি কি নিস্তার তার,
কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী ?

লতা, পশু, পক্ষী সম মানবেরো পরাক্রম,
জ্ঞান, বুদ্ধি, যত্ন, বলে বাঁধা কি শিকলি ?
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি !

৩

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল ?
বল বীর্য্য পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল ?
বাঁধিয়ে পাষাণ স্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
দেখাইলা মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিসরবাসী কোথা সে সকল ?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ অবনীতে অপরূপ,
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল।

৪

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি ;
জ্বালিল উন্নতি-দীপ অরুণের ভাতি ;
অতুল্য অবনীতলে এখনো মহিমা জ্বলে;
কে আছে সে নরধন্য কুলে দিতে বাতি ?—
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি !
ম্যারাথন, থার্ম্মপলি হয়েছে শ্মশানস্থলী,
গিরীস আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি,—
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি !
যার পদচিহ্ন ধ'রে অন্য জাতি দম্ভ করে,
আকাশ পয়োধি নীরে ছড়াইছে ভাতি—
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি !

৫

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম ?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী, সিন্ধু, ব্যোম !
ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার ;
সহস্র বৎসরাবধি একাধি নিয়ম—

দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম !
সাহস ঐশ্বর্য্যে যার, ত্রিভুবন চমৎকার—
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম ?
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম !
কি চিহ্ন আছে রে তার, রাজপথ দুর্গে যার,
পৃথিবী বন্ধন ছিল, কোথায় সে রোম ?—
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম !

আরবের পারস্তের কি দশা এখন ?
সে তেজ নাহিক আর, নাহি সে তর্জ্জন !
সৌভাগ্য-কিরণজালে, উহারাই কোন কালে
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন ।—
আরবের পারস্তের কি দশা এখন !
পশ্চিমে হিস্পানীশেষ, পুবে সিন্ধু হিন্দুদেশ,
কাফর যবনবৃন্দে ক'রিয়া দমন—
উল্‌কা-সম অকস্মাৎ হইল পতন ।
'দীন' ব'লে মহীতলে, যে কাণ্ড করিলা বলে,
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন—
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন !

আজি এ ভারতে, হায়, কেন হাহাধ্বনি !
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী ।
তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমৃণালের মত,
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী !
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি !
জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি ।
বুদ্ধি বীর্য্য বাহুবলে, সুধন্য জগতী-তলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি ।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি ?

৮

কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস,
কোথা সে উন্নতি-আশা, কোথা সে উল্লাস!
দম্ভে বসুধার 'পরে, বেড়াইত তেজোভরে,
আজি তারা ভয়ে ভীত হয়েছে হতাশ—
কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস!
কত যত্নে কত যুগে, বনবাসে কষ্ট ভুগে,
কালজয়ী হলো ব'লে করিত বিশ্বাস—
হায় রে সে ঋষিদের কোথা অভিলাষ!
সে শাস্ত্র, সে দরশন, সে বেদ কোথা এখন?
পড়ে আছে ইন্দ্রালয়, ভাবিয়া হতাশ;—
কোথা বা সে হিমালয়, কোথা সে কৈলাস!

৯

নিয়তির গতি রোধ হবে নাকি আর?
উঠিবে না কেহ কি রে উজলি আবার?
মিসর পারস্য ভাতি, গিরীক রোমীয় জাতি,
ভারত থাকিবে কি রে চির অন্ধকার?
জাপান জিলঙে নিশি পোহাবে এবার!
যত্ন, আশা, পরিশ্রমে খণ্ডিয়া নিয়তি-ক্রমে,
উঠিয়া প্রবল হতে পাবে না কি আর;—
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার?
না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা এ কাঙ্গালে
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার;—
ভারত কিরণময় হবে কি আবার?

১০

তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী,
কোমল কুসুম-আভা প্রফুল্লবদনী।
এতদিনে বুঝি সতি, ফিরিল কালের গতি,
হ'লে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি!
সভ্য জাতি মাঝে তুমি সভ্যতার খনি।
হলো যবে মহীতলে রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল ক'রে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচিরযৌবনী।

ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবিলে
শিল্প নীতি নৃত্য গীত চকিত অবনী—
তোরো তবে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী।
বুঝি বা পড়িলে এবে কালের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে।

লজ্জাবতী লতা

১

ছুঁইও না ছুঁইও না, উটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ ক'রে, এক ধারে আছে স'রে,
ছুঁইও না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।
তরু লতা যত আর, চেয়ে দেখ চারিধার
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা!
আহা ওইখানে থাক, দিও না ক ব্যথা।
ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেও না উহার কাছে খাও মোর মাথা।
ছুঁইও না ছুঁইও না, ওটি লজ্জাবতী লতা!

২

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা, নাহি তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর।
যায় না কাহার পাশে, মান মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরন্তর।—
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর!
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর।—
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর!

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনীমণ্ডল লুটে,

শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন।
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত-প্রাণ,
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন ?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটি সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন ;—
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন !—
ছুঁইও না উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানসরঞ্জন।

জীবনের লীলা ফুরালো

শিশির জড়িত যথা লূতা-জাল,
ক্ষণ শোভাময় চারু শিশুকাল
কোলে কোলে সুখে কাটিল !
জগতের স্নেহে ভব-রাজ্য ভরি
বাজিতে লাগিল মোহন বাঁশরী,
শিশুর পরাণ ভুলিল !
বর্ষ চারি পাঁচ হেরি স্বপ্নবৎ
জীবময় এই অপূর্ব্ব জগৎ,
শৈশবের ঘোর ভাঙিল।—
জীবনের উষা ফুরালো।
সুখ দুঃখ ময় বাল্যকাল যায়।
হেসে খেলে কেঁদে— আশার শাখায়
তরুণ-মুকুল ফুটিল।
ভব অঙ্কে ঢালি কল্পনা-কুহেলি
সঙ্গীগণে মেলি কত খেলা খেলি
কাঁচে মণি-শোভা ধরিল !
খেলি কত রঙ্গে যার তার সঙ্গে,
ভাবি সম ভাব শার্দ্দূল কুরঙ্গে,
বিশ্বাসে হৃদয় ভরিল।

দিবস রজনী যত যায় আসে
জগতের চিত্র তত প্রাণে ভাসে,
নব রসে প্রাণ তিতিল।
এই বন্ধুভাব, এই ভালবাসা,
আবার কলহ— ফিরে মিষ্ট ভাষা,
বিষাদ বিরাগ ঘুচিল !
যা দেখি নয়নে করি তারি মত,
রন্ধন খেলন পূজা বার ব্রত—
ধূলাঘরে ভরি নিখিল !
ভবরাজ্য যেন কত মনোহর !
অভ্রময় এই জগত সুন্দর
নয়ন পরাণ ধাঁধিল !
জননী সহায়— প্রাণে নাহি ভয় !
অঞ্চলে লুকায়ে যমে করি জয়
অভয়ে নেহারি অখিল !
এ সুখের কাল ক'দিনের তরে
কিশোর জীবনে মেঘ রৌদ্র ক'রে
শরতের মত ফুরালো !
জীবন-প্রবাহ বহিল।

দেখা দিল এবে তরুণ যৌবন,
যুবার নয়নে অমরা-কানন
হ'য়ে ধরাতল সাজিল !
ভবরাজ্যময় আশার বাগান
ফুটিল কতই— প্রফুল্ল পরাণ
জীবনের তরু হাসিল ;
নব নব ফুল, নব নব পাতা
ফুটে ডালে ডালে নব নব প্রথা,
জগৎ সৌরভে ভরিল ;—
জীবন-প্রবাহ ছুটিল ।
প্রণয় স্বপনে আশার ছলনে
গেলো কিছুকাল মুদ্রিত নয়নে,
ইন্দ্রজাল ক্রমে ছাড়িল ;
শীত গ্রীষ্মতাপ বরিষা প্রথর
দেখা দিল ক্রমে জীবন ভিতর—
সুধাতে গরল মিশিল !
প্রণয়ের ফুল, প্রেম-নিদর্শন,
দিনে দিনে শুষ্ক— দিনে অদর্শন,
কৌটা পুট হ'তে সরিল !
কত আশা-লতা আশার মঞ্জরি
দিবস রজনী পড়ে ঝরি ঝরি,—
শুষ্ক-অশ্রুবিন্দু রহিল !
যৌবনের লীলা ফুরালো ।
শেষে প্রৌঢ়কালে নীরস জীবন,
ঝঞ্ঝা বায়ু ঘাত, ঘন বরিষণ,—
রবি-ছবি মেঘে ডুবিল !
নিজরূপে ধরা দিল দরশন,
চারিদিকে মাঠ বিকট ভীষণ,
জীবন-আলেয়া নিবিল !
ভব রাজ্যময় ছায়ার পুতলি
হাসিতে কাঁদিতে নিরখি কেবলি,—
স্মৃতি-রশ্মি খালি রহিল !
ছিল যে পরাণী অসুর সমান,
বিশ্ব পুরে যার শুনে আশা-গান,
বামনের বেশ ধরিল ;—
জীবনের লীলা ফুরালো !

কল্পনা

কি দেখিনু আহা আহা,
আর কি দেখিব তাহা,
অপূর্ব্ব সুন্দরী এক শুভ্র আলো করি,
চাঁদের মণ্ডল হাতে,
উঠিছে আকাশপথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি ।
ভাবভরা মুখখানি,
আহা মরি কি চাহনি,
কটাক্ষে ভুলায় নর অমর ঋষিরে ।
কি ললাট কিবা নাসা,
মনভাষা পরকাশা,
ওষ্ঠাধরে হাসিরেখা নৃত্য করি ফিরে,
বিচিত্র বসন গায়,
ইন্দ্রধনু শোভা পায়,
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায় ।
যেখানে উদয় হয়,
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক্ আমোদে পুরায়,
কখন শিখর-শিরে,
বসিয়া নির্ঝরতীরে,
মিশায়ে বীণার স্বরে গানে মত্ত হয় ।
কভু কোন(ও) কুঞ্জবনে,
প্রবেশি প্রমত্ত মনে,
নৃত্য করে নিজ মনে অধীরা হইয়া ।

কখন(ও) তটিনীনীরে,
ধৌত করি কলেবরে,
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া।
কভু মরুভূমি গায়,
ফুলোগ্যান রচি তায়,
শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ।
কভু কি ভাবিয়া মনে,
একাকী প্রবেশি বনে,
হাসে কাঁদে নিজ মনে উন্মাদ যেমন।
কখন(ও) মন্দিরে ধায়,
পূজা করে দেবতায়,
জগৎমাতানো গীত প্রেমানন্দে গায়।
কখন(ও) নন্দন-বনে,
অপ্সরী অমরী সনে,
খেলা করি কত রঙ্গে তাদের ভুলায়।
কখন(ও) অদৃশ্য হয়ে,
ছায়াপথে লুকাইয়ে,
দেখায় কতই ছলা কত রূপ ধরি।
সদাই আনন্দ মন,
সর্ব্বত্র করে গমন,
বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণি-দুঃখ হরি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
সব(ই) তার লীলাস্থল,
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে,
তিন লোকে আসে যায়,
সর্ব্বত্র আদর পায়,
সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি সকলেই জানে
কভু ছায়াপথ ছাড়ি,
আর(ও) শূন্যে দিয়া পাড়ি,
দেখায় অপূর্ব্ব কত ত্রিলোক মোহিয়া,
উঠিতে উঠিতে বালা,
দেখাইছে কত ছলা,
কত রূপে কত মতে নাচিয়া গাইয়া।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রাণী,
হেরিয়া আশ্চর্য্য মানি,
বিস্ফারিত নেত্রে সবে বামা পানে চায়।
ধরা উলটিয়া ফেলে,
স্বর্গ আনে ধরাতলে,
অমরাবতীর শোভা ধরাতে দেখায়।
চলে রামা বায়ুপথে,
পুরাইয়া মনোরথে,
যখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয়।
কখন(ও) পাতালপুরি,
আলোকে উজ্জ্বল করি,
ঘোর অন্ধকার হরি করে সূর্য্যোদয়,
মরুতে উগ্যান রচে,
ম'রে প্রাণী পুনঃ বাঁচে,
উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভানু স্নিগ্ধকায়।
চপলা চাপিয়া রাখে,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে,
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়।
কতই বিস্ময়কর
কার্য্য হেন হেরি তার,
সুচতুর বাজীকর জাদুর সমান।
হেলায় পুরায় সাধ,
সাগরে বাঁধিয়া বাঁধ,
অগাধ জলধিজলে ভাসায়ে পাষাণ।
পশু পক্ষী কথা কয়,
"বানরে সঙ্গীত গায়,"
গিরি-অঙ্গে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায়।
কখন(ও) নাবিকদলে
ছলিবারে কুতূহলে,
অতল সাগরজলে কমল ফুটায়।
ক্ষণ নিমেষের মাঝে,
মহানগরীর সাজে,
সাজায় কখনো বন গহন কাননে।

কখন(ও) বা মহারঙ্গে,
ভাঙ্গিয়া ধরণী-অঙ্গে,
সৌধমালা অট্টালিকা, মথয়ে চরণে।
কভু মহাশূন্য পারে,
সৌর জগতের ধারে,
দেখায় নূতন সূর্য্য নূতন আকাশ ;
নবীন মেঘের মালা,
নবীন বিজুলী-খেলা,
নব কলাধর-শশি-কিরণ প্রকাশ।
স্বর্গ শূন্য ধরা'পর,
কত হেন কল্পনার,
অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,
বিচরি ব্রহ্মাণ্ডময়,
হর্ষ-পুলকিত কায়,
হেরি কত অস্তোদয় হয় ধরণীতে।
ভাবি কত দূর যাই,
যেন তার অন্ত নাই,
শেষে না দেখিতে পাই
কোথা যাই চলে ,
সুদূর গগনগায়,
শেষে মিলাইয়া যায়,
চপলা চমকে যেন মেঘের মণ্ডলে।
সহসা চৌদিকে চাই,
তখন দেখিতে পাই,
সেই আমি সেই ধরা সেই তরু জল,
যাই নি, নিমেষ পল,
ছাড়িয়া এ ধরাতল,
তবুও ভ্রমিনু স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।
এ হেন প্রভাব যার,
প্রসাদ লভিলে তার,
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি।
প্রতি দিন কল্পনারে,
পাই যদি পুজিবারে,
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি।
এ চির মনের সাধ
মিটিল না, অপরাধ
লয়ো না দুঃখিনী মা গো, দৈব প্রতিকুল,
কমলা ঠেলিলা পায়,
রোষ কৈলা সারদায়,
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল।

অতৃপ্তি

বিধাতা হে, নাহি জানি,
প্রাণে কেন হেন গ্লানি,
মাঝে মাঝে বিরক্তি উদয়।
থাকিতে এ ভবনিধি,
পরাণে কেন এ ব্যাধি,
বল বিধি, বল হে আমায়॥
আজ নয় নহে কাল,
এই ভাব চিরকাল,
কেন মন হেন তিক্ত হয়।
ই না ধরে মনে,
অসাধ সদাই প্রাণে,
কিছুতেই সাধ নাহি রয়॥
আমোদ প্রমোদে হাসি,
সব(ই) যেন যায় ভাসি,
কিছুতেই মন নাহি বসে॥
নিকটে প্রাণের মিতা,
শুনায় রসের গীতা,
তাহাতেও চিত্ত নাহি রসে

সুত সুতা স্নেহভরে,
চিবুক তুলিয়া ধরে,
কণ্ঠ ধরে কোলে বসি হাসে।
তাতেও চেতনা নাই,
সে দিকে ফিরে না চাই,
যেন কোন অমঙ্গল-ত্রাসে॥
এ অতৃপ্তি কেন সদা,
ধন যশ কি প্রেমদা,
কিছুই সন্তোষকর নহে।
নাহিক আকাঙ্ক্ষা আশা,
নাহিক কোন(ও) লালসা,
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে॥
মুখে ব্যঙ্গ পরিহাস,
হৃদে খেদ বার মাস,
ফল্গু সম লুকাইয়া চলে।
বাহিরে আলোক পূর্ণ,
হৃদয়ে অঙ্গারচূর্ণ,
প্রাণে সদা বহ্নিশিখা জ্বলে॥
কেন হেন তিক্ত প্রাণ,
দিলে মোরে ভগবান্,
এত সুখ জগতে তোমার।
নাহি কি কিছুই তায়,
মম সাধ মিটে যায়,
কোন(ও) হেন সুন্দর সুতার॥
ফুলতরু কত জাতি,
কত বর্ণ কত ভাতি,
আছে এই জগতমণ্ডলে।
ধরা শূন্য শোভাকর,
কত পশু পক্ষী নর,
শৈবাল মৃণাল মীন জলে॥
আকাশে চাঁদের শোভা,
জগতের মনোলোভা,
মনোহর তারকা ঝলকে।
যেটি মনে ধরে যার,
সেটি আদরের তার,
চিরকাল এই ধারা লোকে॥
উদ্যানে কাহার(ও) সাধ,
কুসুমে কার(ও) আহ্লাদ,
কার(ও) সাধ প্রাসাদ ভবনে।
কেহ বা পাখীর গান,
শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ,
কেহ মুগ্ধ সঙ্গীত-শ্রবণে॥
কেহ ভুলে চিত্রপটে,
কেহ বা কবিতা-পাঠে,
কার(ও) মন সৌন্দর্য্যে মগন।
কেহ সুখী ধনার্জ্জনে,
কেহ সুখী ধন-দানে,
কার(ও) সাধ সমৃদ্ধি-সাধন॥
কেহ রত বিদ্যাভ্যাসে,
কেহ বা বেশ-বিন্যাসে,
বিলাস বাসনা করে কেহ।
ভোগ সুখ কেহ চায়,
কেহ অনাদরে তায়,
বনে যায় তেয়াগিয়া গেহ॥
হেন রূপে সর্ব্ব জন,
কোন না কোন বন্ধন,
হৃদয়ে বেঁধেছে সুখ আশে।
পূর্ণ করি সেই আশা,
জুড়ায় হৃদি-পিপাসা,
অকূল সাগরে নাহি ভাসে॥
আমারি হৃদি কেবল,
মায়াশূন্য মরুস্থল,
কোন(ও) বাসনায় বদ্ধ নয়।
এত শোভা ধরণীতে,
কিছুই না ধরে চিতে,
শূন্য প্রাণে দেখি সমুদয়॥

কি হেতু হে ভগবান্,
দিয়াছ এমন প্রাণ,
　　সুখের সাগরে সবে মজে।
স্থলে জলে ভূমণ্ডলে,
সুখের লহরী চলে,
　　কিসে সুখ আমি মরি খুঁজে॥

সহেছি অনেক দিন,
সব আর কত দিন,
　　দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে।
সত্বরে এ প্রাণ হরি,
এ দুঃখ ঘুচাও হরি,
　　এ যাতনা দিও না'ক কারে॥

॥ প্রকৃতি ও প্রেম ॥

চাতক পক্ষীর প্রতি*

১

কে তুমি রে বল পাখি,
সোনার বরণ মাখি,
গগনে উধাও হয়ে
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,
এত সুখে সুধামাখা সঙ্গীত শুনাও।

২

বিহঙ্গ নহ ত তুমি ;
তুচ্ছ করি মর্ত্ত্যভূমি
জলন্ত অনল-প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল-পথে সুস্বর ছড়াও।

৩

অরুণ উদয়কালে
সন্ধ্যার কিরণ-জালে
দূর গগনেতে উঠি,
গাও সুখে ছুটি ছুটি,
সুখের তরঙ্গ যেন ভাসিয়া বেড়াও

৪

আকাশের তারা সহ
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,
কিন্তু শুনি উচ্চ স্বরে
শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে ;
আনন্দ-প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও।

৫

একাকী তোমার স্বরে
জগত প্লাবিত করে,
শরতের পূর্ণ শশী
বিমল আকাশে বসি
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়।

৬

কবি যথা লুকাইয়ে,
হৃদয়ে কিরণ লয়ে,
উন্মত্ত হইয়ে গায়,
পৃথিবী মাতিয়ে তায়
আশা মোহ মায়া ভয় অন্তরে জড়ায়।

*শেলি-বিরচিত স্কাইলার্কের অনুকরণ

৭

রাজার কুমারী যথা
পেয়ে প্রণয়ের ব্যথা,
গোপনে প্রাসাদ 'পরে
বিরহ সান্ত্বনা করে
মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায় !

৮

যেমন খদ্যোত জ্বলে
বিরলে বিপিনতলে,
কুসুম তৃণের মাঝে
আতোষী আলোক সাজে
ভিজিয়া শিশির-নীরে আঁধার নিশায়

৯

পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা
গোলাপ অদৃশ্য যথা
সৌরভ লুকায়ে রয়,
যখনি পবন বয়,
সুগন্ধি উথলি উঠি বায়ুরে খেপায়।

১০

সেইরূপ তুমি, পাখি,
অদৃশ্য গগনে থাকি,
কর সুখে বরিষণ,
সুধাস্বর অনুক্ষণ,
ভাসাইতে ভূমণ্ডল সুধার ধারায়।

১১

কেবা তুমি জানি নাই,
তুলনা কোথায় পাই ;
জলধনু চূর্ণ হয়ে
পড়ে যদি শূন্য বয়ে,
তাহাও অপূর্ব্ব হেন নাহিক দেখায়।

১২

যত কিছু ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে—
নবীন মেঘের জল
মুক্তা মাখা তৃণদল—
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়

১৩

পাখী কিম্বা হও পরী
বল রে প্রকাশ করি
কি সুখ চিন্তায় তোর
আনন্দ হয়েছে ভোর ?
এমন আহ্লাদ আহা স্বরে দেখি নাই

১৪

সুধা প্রণয়ের গীত
প্রাণ করে পুলকিত—
তারো সুললিত স্বর
নহে এত মনোহর,
এত সুধাময় কিছু না হেরি কোথাই।

১৫

বিবাহ-উৎসব-রব
বিজয়ীর জয়-স্তব,
তোর স্বর তুলনায়
অসার দেখি রে তায়—
মেটে না মনের সাধ, পূর্ণ নাহি হয়

১৬

তোর এ আনন্দময়
সুখ-উৎস কোথা রয়,
বন কিম্বা মাঠ গিরি
গগন হিল্লোল হেরি—
কারে ভালবেশে এত ভুল সমুদয়।

১৭

তুমিই থাক রে সুখে
জান না ঔদাস্য দুখে,
বিরক্তি কাহারে বলে
জান না রে কোন কালে
প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কত।

১৮

আমরা এ মর্ত্ত্যবাসী
কভু কাঁদি কভু হাসি,
আগে পাছে দেখে যাই
যদি কিছু নাহি পাই
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত।

১৯

যত হাসি প্রাণ ভরে
যাতনা থাকে ভিতরে,
এ দুঃখের ভূমণ্ডলে
শোকে পরিপূর্ণ হ'লে
মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর!

২০

ঘৃণা ভয় অহঙ্কার
দূরে করি পরিহার,
পাখি রে তোমার মত
যদি না কাঁদিতে হ'ত—
না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর!

২১

গগনবিহারী পাখী
জগতে নাহি রে দেখি,
গীত বাদ্য মধুস্বর
হেন কিছু মনোহর
তুলনা হইতে পারে তোমার যাহায়!

২২

যে আনন্দে আছ ভোরে
তাহার তিলেক মোরে
পাখি তুমি কর দান,
তা হ'লে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতাতরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়!

যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল্
ওরে শতদল পদ্ম?
কি আছে ও শ্বেত বর্ণে,
কি আছে ও নীল পর্ণে,
যখনি নিরখি—আঁখি তখনি শীতল!
যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল্
ওরে প্রস্ফুটিত পদ্ম?

আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর
ফোটে রে আপনি আসি,
তোমারি হাসির হাসি
পরকাশে হৃদিতলে—আহা কি মধুর!
কেন, বল, হেরে তোরে হৃদয় বিধুর
ওরে সর-শোভা পদ্ম?

যখন সূর্য্যের রশ্মি মাখিয়া শরীরে,
হাসিটি ছড়ায়ে মুখে
ভাসো নীল বারি বুকে,
ঢল-ঢল তনুখানি কতই সুখী রে—
হেরিলে তখন কেন আমিও হাঁসি রে
ওরে মোহকর পদ্ম?

আবার যখন, আহা, শিশিরের জলে
ভিজিয়া মনের খেদে,
গোট করি কেঁদে কেঁদে
দলগুলি মোদ, ফুল গুণ্ঠনের তলে—
তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে
ওরে রে মুদিত পদ্ম?

দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে
পাই রে কতই ব্যথা!
মনে পড়ে কত কথা
ফুঠিত হৃদয়ে যাহা জীবন-উদয়ে—
খেলাত চঞ্চল মনে উন্মাদিত হয়ে!
ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম?

কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে
পত্রদলে, শতদল!
হৃদি তোর কি কোমল!
সেই জানে কোমলতা হৃদে যার ঝরে!—
আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে
কে কমলবাসী পদ্ম?

ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে
শুভ্র নীল লাল আভা,
কাহারও শরীর প্রভা
কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে?
এত সুখে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে
রে চিত্ত-মাদক পদ্ম?

দেখেছি ত পুষ্প তোরে আগেতে কতই
সেকালে খেলিছি যবে,
সখারা মিলিয়া সবে,
তৃণময় হ্রদতীরে বিহ্বলিত হই—
তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবি নি ত কই
ওরে ভাবময় পদ্ম?

এত যে লুকানো তোতে আগে ত জানি নে!
যৌবনেতে সুখোদয়
হায় রে সকলে কয়—
প্রৌঢ়-সুখ কাছে আমি সে সুখ মানি নে!
পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানি নে
ওরে মনোহর পদ্ম?

যে বাস তোমাতে, হায়,
সে বাস কি আর
আছে অন্য কোন ফুলে?
অমন সুবাস তুলে
ছোটে কি সুরভি গন্ধ জুঁই মল্লিকার?
তোরি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার
রে কুন্দলাঞ্ছন পদ্ম?

গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কামিনীর থরে
এত কি শোভে রে বন?
এত কি মোহে রে মন?
হেরে যবে তোরে ফুল্ল হ্রদের লহরে
কি যেন খেলে রে রঙ্গে হৃদয়-নির্ঝরে
হে সর-রঞ্জন পদ্ম!

কথাটি ত নাহি মুখে—জান না ত বাণী—
তবু, ওরে শতদল,
কেমনে প্রকাশ, বল্,
যে কথা হৃদয়ে তোর—কেমনে বা জানি,
ওরে গুপ্তভাষী পদ্ম?

কেও কি দেখে না আর এ তোর সরল
মাধুরী-প্রতিমাখানি!
কেও কি শোনে না বাণী
তোর ও কোমল মুখে?—আমিই পাগল!
আমিই একা কি মত্ত পিয়ে ও গরল
ওরে উন্মাদক পদ্ম?

কেন, বল, এইরূপে ঘুরি নিরন্তর
যেখানে তোমার দল
ফুটিয়া সাজায় জল?
না দেখিলে কেন হয় এরূপ অন্তর—
কেন দেখি শূন্য মহী যেন বা গহ্বর
বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম?

ঘুরি ত কতই স্থানে—কত দেখি, হায়,
রাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,
পাই ত কতই স্নেহ,
তবু কেন, বল্, চিত্ত তোরি দিকে ধায়
বল্ রে নিকটে তোর ধায় কি আশায়
ওরে চিত্তচোর পদ্ম ?

ধন, মান, বিভবের সৌরভ শোভায়
এত ত মোহে না হৃদি,
থাকে না ত প্রাণে বিঁধি
এমন সুরভি-শোভা সংসার-লীলায় !
ভ্রমেছি ত এত কাল খেলায়ে সেথায়
হে ক্রীড়াকুশল পদ্ম !

কত বার করি মনে ভুলিব রে তোরে,
ধরিব সংসারী-সাজ
ভাঁজিয়া হৃদয়-ভাঁজ,
অন্য সাধে হৃদে ধরি ঘুরি মর্ত্ত্য-ঘোরে—
ভুলে যাই শুক্লবর্ণ—ভুলে যাই তোরে !
হায়, মোহকর পদ্ম !

না পশিতে চিত্ততলে সে কল্পনা-মূল
শুখায় সে সাধ-লতা !
ভুলি রে সে সব কথা !
ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভুল—
কি মাধুরী-ডোর তোর, হায় রে, অতুল
ওরে মধুময় পদ্ম !

সত্য কিরে তোরি দেহে
এত শোভা বাস ?

কিম্বা সে আমারি মন,
প্রমাদে হয়ে মগন,
ভাবে আপনার প্রভা তোতে পরকাশ—
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ
ওরে জড়দেহ পদ্ম ?

যাই হোক্, যে বিধানে আমার হৃদয়
মিশুক মাধুর্য্যে তোর,
হ'লে জীবনের ভোর,
তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয়—
ভুলিব না তবু তোরে, রে সুষমাময়
সুগন্ধ-নিবাস পদ্ম !

ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন—
এত শোভা বাস যার
পঙ্কেতে জনম তার,
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধুজন !
জানি না বিধির, হায়, রহস্য কেমন
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম !

হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে
বাঁধিলা এ দেহপুটে ?
কলুষ-পঙ্কেতে ফুটে,
তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডোবে ভাসে বানে ?
বুঝেছি, রে শতদল, অচ্ছেদ্য বন্ধনে
তাই তুই আমি বাঁধা,
এক সঙ্গে হাসা কাঁদা,
তাই, ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে !
ভুলিব না তোরে, পদ্ম,
ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে !

গঙ্গা

কোথায় চলেছ তুমি গঙ্গে ?

— — —

শাল, পিয়াল, তাল,

— —

তমাল, তরু রসাল,

ব্রততী-বল্লরী-জটা;—

সুলোল-ঝালর-ঘটা,—

ছায়া করি সুশীতল

ঢেকেছে তোমার জল

চলেছে অচলরাজি ধারা-নীর-অঙ্গে

কোথায় চলেছ তুমি গঙ্গে ?

কল-কল-কলস্বর

ধারা-জলে নিরন্তর—

বিশাল বিস্তৃত ধারা,

সমতল তৃণহারা

ধরণী চলেছে সঙ্গে,

দু'ধারে নিবিড় রঙ্গে

বট, বেল, নারিকেল,

শালি-শ্যামা-ইক্ষু-মেল,

অরণ্য, নগর, মাঠ,

গবাদি-রাখাল-নাট

প্রফুল্ল করেছে কুল নীরধারা সঙ্গে—

কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

মন্দির দেউল মঠ

পাটিকেলে হর্ম্ম্যপট

কুলধারে সারি সারি,

ধারা-জলে নর নারী

ঢেকেছে সোপানকুল—

ঘাটে ঘাটে ফুটে ফুল !

কল-কল-নর-ভাষা

হৃদিকোষ-পরকাশা

হাস্যরব স্তুতিগানে

তুলেছে তোমার কাণে—

নগর পল্লীর সুখ, বিমল-তরঙ্গে ;—

কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

বাণিজ্য-বেসাতি-পোত

ভাসায়ে চলেছে স্রোত,

তরি ডিঙা ডোঙা ভেলা

বুকে করি, করি খেলা,

নাচায়ে চলেছ অঙ্গ—

ধবল ধীর তরঙ্গ

দুলিয়া দুলিয়া সুখে

নর-নারী-গ্রীবা-মুখে

ছড়ায়ে চিকুর-জাল ভ্রমিতেছে রঙ্গে ;—

কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?

ফুলদাম, ফুলথর,

দীপরাজি হৃদি'পর—

আকাশ-অলক-মালা

হৃদয়-মুকুরে ঢালা,

অরুণ-কিরণ-ভাতি,

শশধর-জ্যো'স্না-পাঁতি,

বায়ুগন্ধ, পরিমল,

পানিবক, মীনদল,

শঙ্খ, শুক্তি, কোলে করি

কোথা যাও রঙ্গে ?

কোথায় চলেছ তুমি বেগবতী গঙ্গে ?

বাঙ্গালায় প্রাণী নাই,

প্রাণী-দেহে প্রাণ নাই,

অস্থি নাই, শিরা নাই,

মেদ নাই, মজ্জা নাই,

অন্তঃহীন-চিন্তাহীন,

সাদাহ্লাদ—দার্ঢ্য-হীন—

জীবন-সঙ্গীত-হীন নর নারী বঙ্গে !
সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে গঙ্গে ?
কে বুঝিবে বিষ্ণুপদী
পুণ্যতোয়া তুমি নদী
কেন ছাড়ি নিজ স্থল
নামিলে এ ধরাতল ?
বিস্তারি গভীর জল
কেন কর কল কল ?
কি পাপে তারিতে এলে
কি পাপ তারিয়া গেলে,
কে বুঝিবে, দ্রবময়ি, সে মহিমা-রঙ্গে !—
কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী গঙ্গে ?
ভগীরথে দিয়ে কূল
উদ্ধারিলে পিতৃকুল—
এই কি শিখালে গতি
ভবে এসে ভাগীরথি ?—
দিয়ে তিল তব জলে
ঢালিলে অমৃত ব'লে।
দেহাঙ্গন নাহি রয়
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়
পতি পুত্র পিতা মাতা—তিলোদক সঙ্গে !
এই কি শিখালে তুমি ভবে এসে গঙ্গে ?
পরহিতে ব্রত করি
দ্রব হ'লে দেহ হরি,
বারিরূপে, সুমঙ্গলে,
শিখাইলে ধরাতলে—
শিখাইছ প্রতিপল—
ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফল,
দয়া করুণার রেখা
তোমার শরীরে লেখা,
পরহিত-চিন্তা-ব্রত
তরঙ্গিণি, তোমাগত,
তাই পুণ্যময় ধারা
হে গঙ্গে, পাতকহরা !
পতিতপাবনী তোমা সবে বলে রঙ্গে !
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?
পবিত্র তোমার জল,
পবিত্র ভারত-তল ;
সর্ব্ব দুঃখবিনাশিনী,
সর্ব্ব পাপসংহারিণী,
সর্ব্ব শোক-তাপ-হরা,
মুক্তিগতি নীরধারা,
নিস্তারিণী—ভাগীরথী
সুখদা মোক্ষদা সতী
"গঙ্গৈব পরমাগতি"—উদ্ধার গো বঙ্গে ?
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে ?
উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা
শিখাইয়া এই কথা—
ত্যজে স্বার্থ-আরাধনা
সাধুক নিজ-সাধনা ;
ত্যজে ফুল তিল ফল,
তুলুক তোমার জল
হৃদয়ে রক্ষণ করি—
তোমার দীক্ষা-লহরী,
চলুক তোমারি গতি—
স্রোতস্বতী—বেগবতী
বঙ্গের চিন্তার ধারা,
ঘুচুক চিত্তের কারা ;
উদ্ধার, উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে !
কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী গঙ্গে ?

যমুনাতটে*

১

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল !
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরু শাখা'পরে
ঝিরিঝিরি ঝিঁঝি ডাকে, জগত ঘুমায় ;
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

২

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল-মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ-অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ জ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট, পর্ব্বত-উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।
কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

৩

ভাসায়ে অকুল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু করে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

৪

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী ?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায় ?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায় ?
কেন বা উৎসবে মাতি
থাকি কভু দিবারাতি
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?

৫

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হ'লো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না !
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পুরিল,
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল !
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল !

---

* মূলে জোড় পংক্তিগুলি ডান দিকে সরিয়ে মুদ্রিত ছিল। সম্ভবত বিকল্প চরণের অন্ত্যানুপ্রাস দেখিয়ে দেবার জন্য।—সম্পাদক

অশোকতরু

১

কে তোমারে তরুবর, করে এত মনোহর,
রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য করে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী-ভিতরে !
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থর,
বিরাজে শাখীর'পর সদা হাস্যভরে—
সিন্দুরের ঝারা যেন বিটপী উপরে !
মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা,
আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অম্বরে ।—
কে আনিল হেন তরু পৃথিবী-ভিতরে ?

২

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর,
অন্তরও তোমার, কি হে, ইহারি মতন ?
কিম্বা শুধু নেত্রশোভা মানব যেমন ?
আমি দুঃখী তরুবর, তাপিত মম অন্তর,
না জানি মনের সুখ, সন্তোষ কেমন ;
তরুবর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ?
অরে তরু; খুলে বল, শুনে হই সুশীতল
ধরণীতে সদানন্দ আছে এক জন,—
না হয় সন্তাপে যারে করিতে ক্রন্দন ।

৩

জানিতাম, তরুবর, যদি হে তব অন্তর,
দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়—
মানবের মানচিত্রে কি আছে কোথায় !
কত মরু, বালুস্তূপ, কত কাঁটা, শুষ্ক কূপ,
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়—
সরসী, নির্ঝর, নদী, কিছু নাহি তায় ।
তা হলে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজি বাসভূমি,
নিত্য আসি কাঁদি বসি তোমার তলায় ;
ত্যজে নর; ধরি কেন তোমার গলায় ।

তুমি তরু নিরন্তর, আনন্দে অবনী'পর,
বিরাজ বন্ধুর মাঝে, স্বজন-সোহাগে;
তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগে।
ধরণী করান পান, সুরস সুধা-সমান,
দিবা নিশি বার মাস সম অনুরাগে,—
পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে।
স্রোতোধারা ধরি পায়, কুলুকুলু করি ধায়,
আপনি বরষা নীর ঢালে শিরোভাগে;
তরু রে, বসন্ত তোর স্নেহ করে আগে।

কলকণ্ঠ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে,
শুনাতে আনন্দে বসে কুহু কুহু রব;
তরুবর, তোমার কি সুখের বিভব।
তলদেশে মখমল, তৃণ করে ঢল ঢল,
পতঙ্গ তাহাতে সুখে কেলি করে সব,
কতই সুখেতে তরু, শুন ঝিল্লীরব!
আসি সুখে পাঁতি পাঁতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
খদ্যোত যখন তব সাজায় পল্লব—
কি আনন্দ তরু তোর হয় অনুভব!

তরু রে, আমার মন তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা;
আমি, তরু, জগতের স্নেহ-সুখ-হারা!
জায়া, বন্ধু, পরিবার সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা;—
মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসে না তাহারা!
এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের সুখ ভবের মন্দিরে।
এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু, তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এইরূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী-তীরে।
এক ভিক্ষা আছে আর, অন্য যদি কেহ আর,
আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
তরু, তারে দয়া ক'রে তুষিও পরাণে!

কোন একটি পাখীর প্রতি

ডাক্ রে অবার, পাখি, ডাক রে মধুর!
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ,
তোর সুললিত গান
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর।
আবার ডাক রে পাখি, ডাক রে মধুর!
বলিয়ে বদন তুলে,
বসিয়ে রসালমূলে,
দেখিনু উপরে চেয়ে আশায় আতুর!
ডাক্ রে আবার ডাক্ সুমধুর স্বর।

কোথায় লুকায়ে ছিল নিবিড় পাতায়;
চকিত চঞ্চল আঁখি,
না পাই দেখিতে পাখী,
আবার শুনিতে পাই সঙ্গীত শুনায়,
মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল,
এ সঙ্গীত নিরমল?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায়?
ডাক্ রে আবার ডাক্ পরাণ জুড়ায়!

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত,
কখনও আদর করে,
কভু অভিমান ভরে,
অমনি ঝঙ্কার করে লুকায়ে থাকিত।
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত!
নব অনুরাগে যবে,
ডাকিত প্রাণবল্লভে,
কেড়ে নিত প্রাণ মন পাগল করিত;
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত।

ধিক্ মোরে ভাবি তারে আবার এখন!
ভুলিয়ে সে নব রাগ,
ভুলে গিয়ে প্রেমযাগ,
আমারে ফকীর করে আছে সে যখন;
ধিক্ মোরে ভাবি তারে আবার এখন।
ভুলিব ভুলিব করি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন,
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন?

৫

ডাক্ রে বিহগ তুই ডাক্ রে চতুর ;
ত্যজে শুধু সেই নাম,
পুরা তোর মনস্কাম,
শিখেছিস্ আর যত বল সুমধুর !
ডাক্ রে আবার ডাক্ মনোহর সুর !
না শুনে আমার কথা,
ত্যজে কুসুমিত লতা,
উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর ;—
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর

প্রিয়তমার প্রতি

১

প্রেয়সি রে, অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে !
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে !
অই দেখ নব ঘন, গগনে আসিয়ে পুনঃ,
মৃদু মৃদু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে।
দেখ পুনঃ চাঁদ আঁকা, ময়ূর খুলিয়ে পাখা,
কদম্বের ডালে ডালে কুতূহলে নাচিছে।
পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল সুশীতল,
স্নেহ করে তৃণদল বুকে করে রাখিছে।
হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়,
যমুনা-জাহ্নবী-কায়া উথলিয়া উঠিছে।
চাতক তাপিত প্রাণ, পুলকে করিয়ে গান,
দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে !
প্রেয়সী রে সুখোদয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়,
কেবলি মনের দুখে এ পরাণ কাঁদিছে।

২

অই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল !
লতায় কুসুমদলে, পাতায় সরসীজলে,
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল।
শ্যামল সুন্দর ধরা, শোভা দিল মনোহরা,
শীতল সৌরভভরা বাসে বায়ু ভরিল,
মরাল আনন্দ মনে, ছুটিল কমল বনে,
চঞ্চল মৃণালদল ধীরে ধীরে দুলিল।

বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর,
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।
দামিনী মেঘের কোলে, বিলাসে বসন খোলে,
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করে উঠিল।
এ শোভা দেখাব কারে, দেখায়ে সন্তোষ যারে,
হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল!

৩

ত্যজিবে কি প্রাণসখি? ত্যজিতে কি পারিবে?
কেমনে সে স্নেহলতা এ জনমে ছিঁড়িবে?
সে যে স্নেহ সুধাময়, ঘেরিয়াছে সমুদয়,
প্রকৃতি পরাণ মন, কিসে তাহা ভুলিবে?
আবার শরত এলে, তেমনি কিরণ ঢেলে,
হিমাংশু গগনে কি রে আর নাহি উঠিবে?
বসন্তের আগমনে, সেরূপে সন্ধ্যার সনে
আর কি দক্ষিণ হতে বায়ু নাহি বহিবে?
আর কি রজনীভাগে, সেইরূপ অনুরাগে,
কামিনী, রজনীগন্ধ, বেল নাহি ফুটিবে?
প্রাণেশ্বরি! পুনর্ব্বার, নিশীথে নিস্তব্ধ আর
ধরাতল সেই রূপে নাহি কি রে থাকিবে?
জীব জন্তু কেহ কবে, কখন কি কোন রবে,
ভুলে অভাগার নাম কণ্ঠেতে না আনিবে?
প্রেয়সি রে সুধাময়, স্নেহ ভুলিবার নয়,
কাঁদালি কাঁদিলি শুধু পরিণামে জানিবে!

অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ধরিল।
শরতে সুন্দর মহী সুধা মাখি বসিল।
হরিত শস্যের কোলে, দেখ রে মঞ্জরী দোলে,
ভানুছটা তাহে কিবা শোভা দিয়া পড়েছে!
বহিলে মৃদুল বায়, ঢলিয়া ঢলিয়া তায়,
তটিনী-তরঙ্গলীলা অবনীতে খেলিছে।
গোঠে গাভী বৃষ সনে, চরিছে আনন্দ মনে,
হরষিত তরুলতা ফলে ফুলে সেজেছে।

সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ,
শরতে সুন্দর হয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।
আচম্বিতে দরশন, ঘন ঘন গরজন,
উড়িয়ে অম্বরে মেঘ ডেকে ডেকে চলেছে।
প্রেয়সি রে মনোহরা, এমন সুখের ধরা,
বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে!

আহা কি সুন্দর বেশ সন্ধ্যা অই আইল!
ভাঙা ভাঙা ঘনগুলি, ভানুর কিরণ তুলি,
পশ্চিম গগনে আসি ধীরে ধীরে বসিল।
অস্তগিরি আলো করি, বিচিত্র বরণ ধরি,
বিমল আকাশে ছটা উথলিয়া পড়িল।
গোধূলিকিরণমাখা, গৃহচূড়া তরুশাখা,
প্রেয়সি রে, মনোহর মাধুরীতে পূরিল।
কাদম্বিনী ধীরি ধীরি, হয়, তরু, গজ, গিরি,
আঁকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল!
দেখ প্রিয়ে সূর্য্য-আভা গঙ্গাজলে কিবা শোভা,
সুবর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের 'পরে, উঠিল আনন্দ ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধরে নভশ্চর ফিরিল।
এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
শূন্যমনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল।

আজি এ পূর্ণিমা নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে!
কার সনে প্রিয়ভাষে দেহ মন জুড়াবে!
এখনি যে সুধাকর, পূর্ণবিম্ব মনোহর,
পূর্ব্বদিকে পরকাশি সুধারাশি ছড়াবে।
এখনি যে নীলাম্বরে, শ্বেতবর্ণ থরে থরে,
আসিয়ে মেঘের মালা সুধাকরে সাজাবে।
তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল,
চাঁদের কৌমুদী মাখা কারে আজি দেখাবে!

প্রেয়সি অঙ্গুলি তুলি, কুসুম-কলিকাগুলি,
শিশিরে ফুটিছে দেখি কারে আজি সুধাবে—
"অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক,"
ব'লে সুধাইবে কারে, কে বাসনা পুরাবে!
তনু মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন,
তারে কাঁদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে!

দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে

সুধাংশু গগনবুকে শীতাংশু ঢাল্‌ছে সুখে,
জগৎ শীতল হ'য়ে সে আলোকে ভিজিছে,
সুধীর সমীর বয়, দুলিছে পল্লবচয়,
উদ্যানে রজনীগন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে;—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে!

স্বভাবের ভাবে ভোর, স্বপনে ছুটেছে জো'র,
পরাণ হৃদয় মন কত স্রোতে ডুবিছে;
আসাড় ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, বিশ্ব-প্রাণে যুড়ে প্রাণ
মধুর মুরলীগান, যেন শুধু শুনিছে!—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সে স্বপ্ন মুরলীধ্বনি সহসা ভুলি তখনি,
রমণী-কণ্ঠের স্বর কানে যেন পশিল—
"শেষ দেখা এইবার, এবে সে ব্রত উদ্ধার,
এখন বৈরাগ্যপথে সখী তব চলিল।"—
রমণীর ছায়া এক তরুতলে পড়িল।

নয়নে ঝরিল বিন্দু—কোথা বা কিরণ ইন্দু!—
যৌবনলীলার সিন্ধু স্মৃতিপথে খেলিল,
মনে হল সমুদয়—এইরূপে চন্দ্রোদয়,
যবে এই তরুতলে আমারে সে বলিল—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল!

বলিল "কপালে লেখা হবে পুনঃ হবে দেখা,
আজি হ'তে শেষ এই" ব'লে ফিরে চলিল।
ফুরায়েছে যত বর্ষ যত খেদ যত হর্ষ
সে দিন—সে সব(ই) আজ স্মৃতিপটে জ্বলিল।
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল।

যে ছবি হৃদয়ে ধ'রে ফিরেছি ভুবন 'পরে,
এসেছি—বসেছি ঘরে, ক'টী তার জাগিছে?
আশার মোহের ছল বাহুতে দিয়াছে বল—
এবে তার আছে ক'টী—ক'টী তার ফুটিছে?
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে!

উদাসে দেখিনু তায়, সে কান্তি কোথা রে, হায়,
যে কান্তি কল্পনা-পথ আলো ক'রে শোভিছে!
এই কি সে নিরুপমা প্রতিমা জিনিয়া রমা—
কিম্বা এ তরুর(ই) ছায়া—প্রতিবিম্বে ছলিছে?
সে যে এই—দ্বিধা হৃদে কিছুতে না ঘুচিছে!

চেয়ে দেখি যত বার হিয়া কাঁদে তত বার—
সে মুখের সনে যেন কত যুগ(ই) ফিরিছে!
"যাও"—বলিবারে তারে রসনা জুয়াতে নারে,
কি যেন কোথায় থেকে কণ্ঠ আসি রোধিছে!
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সুষুপ্ত প্রাণীর প্রায় "যাও"—শেষে দিনু সায়,
অমনি নয়ন-তটে বারিধারা বহিল,
ক্ষণেক না থাকে আর "এই শেষ—শেষ বার"
ব'লে অপাঙ্গের কোণে একবার চাহিল—
ধীরে ধীরে রজনীর ছায়া সনে মিশিল!

পুরুষ রমণী ছাঁচে প্রভেদ কি এত আছে?
একি সাধ দু'জনার হৃদিতল মথিছে,
এক বাঁচে মরে আর, একি লীলা বিধাতার—

পাষাণে কুসুমহার কেন বিধি গাঁথিছে,
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

যার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জগতের সুধা পিয়ে,
জেগেছি জগতীতলে—সে কোথায় কাঁদিছে?
আমি সেই তরুতলে ভ্রমি সেই ভ্রমছলে,—
হিয়া মাঝে তার ছায়া কতবার বসিছে?
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

আবার গগন-বুকে সুধাংশু উঠিছে সুখে,
জগৎ শীতল হ'য়ে সে আলোকে ভিজিছে,
সুধীর সমীর বয়, ঢুলিছে পল্লবচয়,
উদ্যানে রজনীগন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে,
কঠিন পুরুষ-প্রাণ সকলি ত সহিছে!—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

॥ নানা-প্রসঙ্গ ॥

রেলগাড়ী

এসো কে বেড়াতে যাবে—শীঘ্র কর সাজ্;
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!
শীঘ্র উঠ—ত্বরা করি,
বাক্স, ব্যাগ্, তল্পি ধরি;
এখনি বাজিবে বাঁশী,
ঠং-ঠং-ঠং কাঁসী
বাজিবে ইস্পাৎ-বোলে,
ছাড়িবে নিশান-দোলে,
শীঘ্র উঠ—পড়ে থাক্ ছড়ি, ঘড়ি, তাজ;—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!

ওই শুন টিকিটের ঘরে কিবা গোল!—
মানুষের গাঁদি যেন—ঠেকাঠেকি কোল!
টকস্ টকস্ নাদে
বাবুরা টিকিট ছাঁদে,
হাঁপায়ে হাঁপায়ে ছোটে,
শাড়ী, ধুতি, হ্যাট্, কোট
ঠেকাঠেকি—ছুটে যায়
কেহ কারে না সুধায়,
গ্যালো গ্যালো মুখে বোল্,
আয়, নে রে, খোল্, তোল্;
হের চলে কাণাকাণি
কিবা লাট্, রাজা, রাণী!
অই ফুকারিল বাঁশী,
ঠং-ঠং শেষ কাঁসী,
গাড়ীতে পড়িল চাবি—আর নাহি গোল,
ঢুলিল সবুজ-রঙা পতাকার দোল্।

চলিল পুষ্পকরথ ফুকারে ফুকারে,
এখনি নিশ্বাস ছাড়ি দেখ হে দু'ধারে—
হরিতবরণ মাঠ,
ধান্য, নীল, ইক্ষু, পাট,
আকাশ ঠেকেছে যেথা
দিগন্তে বিস্তৃত সেথা!
দেখ হে দু'ধারে চেয়ে
পশ্চাতে চলেছে ধেয়ে
সারি সারি নারিকেল,
তাল, বট আম, বেল,
জাঙ্গাল, পগার, বাঁধ,
বেড়, বাড়ী, নানা ছাঁদ,
সৌদামিনী-বাঁধা-হার
ছুটেছে তামার তার,
উড়িয়া চলেছে রথ
বেগেতে কাঁপিছে পথ—
পক্ষী মৃগ দূরে পড়ি মানিতেছে লাজ—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!

চলুক্ চলুক্ রথ—যে যার ভাবনা
ভাবো বসে নিরুদ্বেগে ছুটায়ে কল্পনা;
স্বভাবের প্রিয় যারা
হের গিরি বারিধারা,
নিবিড় ভূধর-গায়
হের খেলা কুয়াসায়,
নিশিতে নক্ষত্র পাঁতি
হের চন্দ্রমার ভাতি,
দেখ হে অনন্ত দৃশ্য ছড়ান মাথায়—
দেখ দিগন্তের কোলে কি শোভা খেলায়!

হের হের তীর্থ-মনে চলেছ যাহারা
পথের দু'ধারে তীর্থ—শীঘ্র নামো তারা,
গেলো চলে—গেলো রথ,
অই বৈদ্যনাথ-পথ,
গুছাতে সবে না দেরি,
কাজ নাই সঙ্গী হেরি,
দেখিতে দেখিতে যাবে
সীতাকুণ্ড আগে পাবে,
কিছু দূর আগে তার
বাঁকিপুর— গয়া-দ্বার,
দণ্ড কত যাক্ যান
পাবে কাশী তীর্থস্থান,
প্রয়াগ, অযোধ্যা ছাড়ি পাবে অগ্রবন—
মথুরা তাহার পরে হের বৃন্দাবন!

মানবজনম, হায়, সার্থক হে আজ—
সাবাস বাষ্পীয় রথ—সাবাস ইংরাজ!
আরো দূরে যাবে যারা
শীঘ্র রথে উঠ তারা,
হরিদ্বার, গঙ্গাঝরি,
পুষ্কর, দ্বারকাপুরী,
নর্ম্মদা, কাবেরী নদ,
কৃষ্ণা-গোদাবরী-পদ,
ইলোরা বৌদ্ধ-গহ্বর,
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর,
ভ্রমিবে নক্ষত্র-গতি,
পর্ব্বতশৃঙ্গেতে পথি
হেরিবে বিমানে চড়ি—ত্রেতায় যেমন
সীতারামে ইন্দ্ররথে সিন্ধু-দরশন!

এসো হে কে যাবে, চল ভারত-ভ্রমণে
দুয়ারে পুষ্পকরথ ছাড়িছে নিস্বনে!—
আর কেন বঙ্গবাসী
পায়ে বেঁধে রাখ ফাঁসী,—
বাঙ্গালীর যে দুর্নাম
ঘুচায়ে, সাধ হে কাম,
আর যেন স্ত্রৈণ ব'লে
বাঙ্গালীরে নাহি বলে,

এবে পরিষ্কার পথ
যাও যথা মনোরথ,
বোম্বাই কিম্বা কলিঙ্গ,
সিলং, তুর্জয়লিঙ্গ,
সিমিলা-পাহাড়-পাট,
কাশ্মীর, মারহাট্টা-ঘাট,
যেখানে ক'রে গমন
সাধিতে পার হে পণ
পুষ্পকবিমানে চ'ড়ে সেইখানে যাও-
বাঙ্গালীর লজ্জাকর তুর্নাম ঘুচাও!
ভারতভ্রমণে চলো শীঘ্র কর সাজ
তুয়ারে পুষ্পকরথ
বেঁধেছে ইংরাজ!

ধন্য রে বিমান ধন্য!
ধন্য হে ইংরাজ ধন্য!—
কলে জিনিয়াছ কাল,
অঙ্গারে জ্বালায়ে জ্বাল,
বহ্নিরে বেঁধেছ রথে,
পবনের মনোরথে
তুচ্ছ করি, কর খেলা
কি নিশি মধ্যাহ্ন-বেলা,
বেঁধেছ ভারত-অঙ্গ
লৌহজালে করি রঙ্গ,
অসুর-অসাধ্য কাজ সাধিতেছ জগতে!—
জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে,
পারো না কি বাঁচাইতে নির্জ্জীব ভারতে?

শিশুর হাসি

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে!
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্ত্ত্যে যার নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে, কি হে,
করিলে সৃজন?

সৃজিলে কি নিজ-সুখে?
কিম্বা, বিধি, নরতুখে
মনে ক'রে—ও হাসিটি করেছ অমন!

জানি না তুমিই কিনা আপনি ভুলিলে
সৃজনের কালে, বিধি?
গড়েছ ত এত নিধি,
উহার মতন, বল, কি আর গড়িলে?

নবনীর সর ছাঁকা
সুন্দর শরত-রাকা,
তরুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন?

কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশি অনুরাগে
সৃজন করিলে, বিধি, সৃজিলে যখন?

ফুলের লাবণ্য বাস
অথবা শিশুর হাস,
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ!

ছিল কি হে নরজাতি-সৃজনের আগে
এ কল্পনা তব মনে?
অথবা শশি-কিরণে
গড়িলে যখন—এরে গড় সেই রাগে?

দেখায়ে ছিলে কি উটি সৃজিলে যখন
অমৃত-পিপাসু দেবে?
কি বলিল তারা সবে,
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন?

অমৃত কি, অহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে?
তবে কেন ছাড়ে তারা
সুধা-অন্ধ দেবতারা—
অমৃত অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে?

কিম্বা চেয়েছিল তারা, তুমিই না দিলে;

দিয়াছ এতই, হায়,
চিরসুখী দেবতায়,
দুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
কে না ভোলে, কে না চায়
আবার দেখিতে তায় ?
একমাত্র আছে অই অখিল-মোহন—

জাতি দেশ বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই
শিশুর হাসির কাছে,
সবি প'ড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই।

নাহি পর, আপনার, নাহি দুঃখ সুখ,
দেখিলে তখনি মন
মাধুরীতে নিমগন,
কি যেন উথলি উঠে পূর্ণ ক'রে বুক !

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে
অই স্বরগের উষা,
অই অমরের ভূষা
তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে ভুলায়ে !

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী,
এক হৃদয়ের আলো
উহারে ক'রো না কালো
অতুলনা দীপ উটি—নিও না ও হাসি !

চাহি না শীতল বায়ু, মুকুল-অমিয়,
চন্দ্রকর বারি-কোলে
নাচিয়া নাচিয়া দোলে,
তাও নাহি চাই, বিধি,—ও হাসিটি দিয় !

ভাস রে চাঁদের কর—হাস রে প্রভাত,
ডাক্ পাখী প্রিয় স্বরে
দোল পাতা ঝুরে ঝুরে
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত ;

উঠুক মানব-কণ্ঠে ললিত সঙ্গীত,
বাজুক "অর্গান", বাঁশী,
তরল তালের রাশি
ছুটুক নর্ত্তকী-পায় করিয়া মোহিত ;—

কিছুই কিছুই নয়
ও হাসির তুলনায় ;
জগতে কিছুই নাই উহার মতন।
কি মধু মাখানো বিধি,
হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে ?

টীকা ও মন্তব্য

বৃত্রসংহার

'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের কাহিনী মহাভারত থেকে গৃহীত হয়েছে। মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত শততম এবং একাধিকশততম অধ্যায় দুটি থেকে হেমচন্দ্র আখ্যান সঙ্কলন করেছেন। এখানে সে অংশের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হল।

...সত্যযুগে কালকেয় নামে কতকগুলি যুদ্ধদুর্ম্মদ দানব বৃত্রাসুরকে অধিপতি করিয়া বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক মহেন্দ্র প্রভৃতি সুরগণকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। অমরগণ তখন বৃত্রাসুর বধে উৎসুক হইয়া পুরন্দরকে পুরঃসর করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার আরাধনা করিলেন। অনন্তর ভগবান কমলাসন দেবগণকে কহিলেন, "হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের অভিলষিত কার্য্য অবগত হইয়াছি, এক্ষণে যে উপায়ে বৃত্রাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কহিতেছি। দধীচ বলিয়া বিখ্যাত এক উদারধী মহর্ষি আছেন, তোমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিবে; সেই ধর্ম্মাত্মা যখন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, তখন তোমরা তাঁহাকে কহিবে, 'আপনি ত্রৈলোক্যের হিতের নিমিত্ত স্বীয় অস্থিসকল প্রদান করুন।' অনন্তর তিনি স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া অস্থি প্রদান করিবেন; তদ্দারা ষড়স্র ভীমনিস্বন সুদৃঢ় বজ্র বিনির্ম্মিত হইলে পুরন্দর সেই বজ্রে বৃত্রাসুরকে বধ করিবেন। আমি যাহা কহিলাম, তোমরা অনতিবিলম্বে সেই রূপ অনুষ্ঠান কর।"

অনন্তর দেবগণ পিতামহের অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক সরস্বতী নদীর পরপারে দধীচ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। নানাবিধ তরুরাজি ও লতাবিতানে যাহার সুষমা সম্পাদন করিতেছে, যাহাতে সামগানসদৃশ ষট্‌পদসমূহের সঙ্গীতধ্বনি জীবঞ্জীবক ও পুংস্কোকিলকুলের কলরবসহকারে উত্থিত হইতেছে, যাহাতে মহিষ, বরাহ, সৃমর ও চমরগণ শার্দ্দূল-ভয় পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃসঞ্চরণ করিতেছে, যাহাতে মদস্রাবী করিগণ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক করেণুকার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যাহাতে গুহাকন্দরশায়ী সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বনচরগণ ঘনঘটার ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে, দেবগণ সেই স্বর্গসদৃশ শোভমান আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, প্রভাকরপ্রভ দধীচ ঋষি পিতামহের ন্যায় দীপ্যমান কলেবরে

বিরাজ করিতেছেন। অনন্তর সুরগণ তাঁহার চরণ গ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া ব্রহ্মানির্দ্দিষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন।

দধীচ-মুনি অমরগণের প্রার্থনা শ্রবণপূর্ব্বক সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন, 'হে দেবগণ! আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও আপনাদিগের উপকার করিব; কোনক্রমেই অভিলষিত বরপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইব না।' হিতৈষী মহর্ষি এই কথা কহিয়া সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সুরগণ তাঁহার অস্থিসকল গ্রহণ করিয়া জয়লাভের নিমিত্ত হৃষ্ট চিত্তে বিশ্বকর্ম্মার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আপনাদিগের প্রয়োজন কহিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাহা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে প্রযত্নসহকারে দধীচ-মুনির অস্থিদ্বারা অতিশয় উগ্রকান্তি ভীষণদর্শন বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া পুরন্দরকে কহিলেন, 'হে দেবরাজ ইন্দ্র! এই বজ্র দ্বারা ভীষণ সুরারিগণকে নিধন করিয়া স্বগণ সমভিব্যাহারে সমুদয় স্বর্গরাজ্য নির্ব্বিবাদে শাসন করুন।' বিশ্বকর্ম্মার বাক্যাবসান হইলে পুরন্দর আনন্দিত হইয়া বজ্রগ্রহণ করিলেন।

অনন্তর পুরন্দর বজ্রগ্রহণপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন ও বলবান্ বলবান্ দেবগণ দেবরাজের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে বৃত্রাসুর স্বর্গ-মর্ত্ত্য আবৃত করিয়া রহিয়াছে; মহাকায় কালকেয়গণ শৃঙ্গশালী শৈলরাজের ন্যায় উদ্যতায়ুধ হইয়া তাহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে।

অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরগণ খড়্গোত্তলন করিয়া আঘাত করিবামাত্র সেই খড়্গ বিপক্ষ শরীরে নিপতিত হইয়া ভীষণ শব্দ উৎপাদন করিল এবং বীরগণের সমস্ত মস্তক বৃন্তশ্লথ তালফলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।

এইরূপ তুমুল সংগ্রামসময়ে কালকেয়-দানবগণ হেমকবচ পরিধান-পূর্ব্বক পরিঘাস্ত্র গ্রহণ করিয়া দাবদগ্ধ পর্ব্বতরাজির ন্যায় দেবগণকে আক্রমণ করিল। বেগবান্ অসুরেরা সাতিশয় দর্পভরে ধাবমান হইলে দেবগণঃ তাহাদিগের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন দেবগণকে ভয়ে পলায়ন করিতে ও বৃত্রাসুরকে বিবর্দ্ধমান হইতে অবলোকন করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সুরারি-ভয়ে ভীত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে সনাতন দেব বিষ্ণু তাঁহাকে মোহাবিষ্ট দৃষ্টিগোচর করিয়া স্বীয় তেজ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বলবর্দ্ধন করিলেন। নারায়ণ সুররাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করিলেন দেখিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তখন স্বীয় স্বীয় তেজধারণ করিলেন। এইরূপে

ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বিষ্ণু কর্ত্তৃক আপ্যায়িত এবং দেব ও ঋষিগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সমধিক বলবান্ হইয়া উঠিলেন।

বৃত্রাসুর সুরপতিকে এইরূপ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অতি ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহীতল, দিকসকল, অন্তরীক্ষ ও দেবলোক কম্পমান হইতে লাগিল। দেবরাজ তাঁহার ভীষণ নিনাদ শ্রবণে সমভিতপ্ত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সত্বরে কুলিশ পরিত্যাগ করিলেন। কাঞ্চনমাল্যধারী মহাসুর বৃত্র ইন্দ্রপ্রযুক্ত কুলিশ-পাতাভিহত হইয়া বিষ্ণুকরমুক্ত মহাগিরি মন্দরের ন্যায় নিপাতিত হইল। সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রভয়ে এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং বজ্রাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, ইহা একবারে বোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত পলায়ন করিলেন। তখন দেবগণ বৃত্রাসুরকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দভরে দেবরাজকে স্তব ও বৃত্রবধব্যাকুল অবশিষ্ট দৈত্যকুলকে নির্ম্মূল করিতে আরম্ভ করিলেন।

[কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ]

প্রথম খণ্ড : প্রথম সর্গ

[প্রথম সর্গের পরিকল্পনা মধুসূদনের "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য"-এর দ্বিতীয় সর্গের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। সেখানে সুন্দ-উপসুন্দাসুরের হাতে পরাজিত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মলোকের দ্বারদেশে সমবেত হয়ে পরামর্শ করছিল। এখানে তারা পাতালে পলায়িত।]

পৃষ্ঠা

১ বিধূনিত—কম্পিত। আদিত্যগণ—অদিতি এবং কশ্যপের দ্বাদশপুত্র : ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্যমা, রবি, পুষ, মিত্র, বরদমনু ও পর্জন্য। এখানে দেবগণ বোঝাতে গিয়ে শব্দটি প্রযুক্ত। ত্বিষাম্পতি—তেজোময় (সূর্য)। শব্দটি যোগারূঢ়; তবে এখানে সূর্যের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। আরাব—শব্দ। জীমূতবৃন্দ—মেঘগণ। সুর—দেবতা। দনুজ—কশ্যপ ও দনুর পুত্র। বিপ্রচিত্ত, নরক, বৃষপর্বা, নিকুম্ভ, প্রলম্ব, বনায়ু, কেতুমান্, বিরূপাক্ষ, কেশী, নমুচি, পুলোমা প্রভৃতি ৪০ জন দনু-পুত্র দানব বা দনুজ নামে পরিচিত। অজর—জরা বা বার্ধক্যজয়ী। শূর—বীর। স্বরভ্রষ্ট—স্বর্গচ্যুত। স্কন্দ—কার্তিক।

২ অমরা—স্বর্গপুরী। দগ্ধগিরি—আগ্নেয়গিরি। সুপৃষ্ঠে—পিঠে। মধুসূদনের অনুসরণে অকারণে সু বিশেষণের প্রয়োগ হেমচন্দ্রও বহুবার করেছেন। নিরয়—নরক। মার—কামদেবকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'মার' নামে অভিহিত করা হয়। রজঃ—ধূলি।

৩ অদৃষ্টের বশতায় ইত্যাদি—প্রত্যক্ষত মধুসূদনের এবং পরোক্ষত য়ুরোপীয় ক্লাসিক কবিদের প্রভাবে হেমচন্দ্রও অদৃষ্ট, নিয়তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলেছেন, কিন্তু খুবই স্থূল এবং অস্পষ্টভাবে। কোদণ্ড—ধনু।

৪ আহব—যুদ্ধ।

দ্বিতীয় সর্গ

৫ রতি—কাম এবং কামবধূ রতি উভয়কেই হেমচন্দ্র বৃত্রের একান্ত অনুগত সেবকরূপে চিত্রিত করেছেন। ব্রীড়া—লজ্জা। বসনবন্ধন ইত্যাদি—ভারতচন্দ্রের বর্ণনার প্রভাব। পীযূষ—অমৃত। সরিৎ—নদী।

৬ আলা—অবহেলিত। কৌস্তুভ—বিষ্ণুর বক্ষশোভাকারী পুরাণ-কথিত মণি।

৭ স্ফারিত—বিস্ফারিত। উরস—বক্ষ। কভু বীররস ইত্যাদি—বৃত্র-ঐন্দ্রিলার মিলনের পটভূমিতে এরূপ বীররসের পটভূমি রচনা রসাস্বাদে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

৮ উৎসঙ্গ—ক্রোড়।

তৃতীয় সর্গ

৮ কুবের—যক্ষপতি কুবেরকে বৃত্রসেবকরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। মন্দার—পারিজাত। কিন্নরগণ—দেবযোনি বিশেষ। ব্রহ্মার ছায়া থেকে এদের জন্ম। এরা গীতবিদ্যায় পারদর্শী। উর্ব্বশী ইত্যাদি—স্বর্গের বারঙ্গনা, অপ্সরা নামে পরিচিত। অপ্সরা—সমুদ্রমন্থনের সময়ে এরা উত্থিত হয়, কিন্তু দেব-দানব কেউ এদের গ্রহণ না করায় এরা স্বর্গ-বারঙ্গনারূপে গণ্য হয়। এদের যৌন-আবেদন মূলক সৌন্দর্য এবং নৃত্যগীতে পারদর্শিতার কথা প্রায় সব পুরাণেই বলা হয়েছে। যক্ষ—কুবেরের অনুচর, দেবযোনি বিশেষ। এদের বিকৃতাঙ্গ এবং বিকৃতস্বভাব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সিদ্ধ—যে সব মানব সাধনাবলে সিদ্ধিলাভ করে স্বর্গবাসী হয়েছে। বিদ্যাধর—নৃত্যগীত-পটু দেবযোনি বিশেষ।

৯ স্বতন্তরা—স্বাধীনা।

১০-১১ অংশু—কিরণ। সূর্যেরে রাখিব করি ইত্যাদি—রামায়ণের কাহিনীতে পাই, রাবণ স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রকে পরাভূত করেন এবং প্রধান দেবতাদের নিজের সেবায় নিয়োজিত করেন। বৃত্রের বাক্যে সে ঘটনার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ললামভূষিত—তিলক-সজ্জিত। হর্যক্ষ—সিংহ। এখানে জনৈক দানবসেনা-পতি। হর্যক্ষ বিপুলবক্ষ ইত্যাদি—তুলনীয় :

> ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,
> ভীমমূর্তি বিরূপাক্ষ রক্ষঃ দল-পতি,
> প্রক্ষেড়ন ধারী-বীর, দুর্বার সমরে।
> গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
> রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপাল পাণি!
> অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
> তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
> মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
> প্রমত্ত ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
> কঠিন!
>
> [মেঘনাদবধকাব্য]

হর্যক্ষ, ঐরাবণী, শঙ্খধ্বজ, সিংহজটা—বৃত্রের সেনাপতিদের নাম। দাপ—দর্প।

চতুর্থ সর্গ

১২ অন্তযৌবন—ইন্দ্রপত্নী শচী অনন্ত-যৌবনা, এরূপ পৌরাণিক প্রসিদ্ধি। আখণ্ডল—ইন্দ্র। কার্মুক—ধনু। তুই সে মেঘের সঙ্গে ইত্যাদি—চপলা বা বিদ্যুতকে

ইন্দ্রাণীর সহচরী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। নীরদ-আসন—মেঘের আসন। ইন্দ্রের মেঘবাহন উপাধির কথা মনে করা যেতে পারে।

১৩ মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা। হায় লজ্জা চপলারে ইত্যাদি—বাঙালির পারিবারিক ভাবনার প্রকাশ। সপ্তকী—কটিতে ব্যবহৃত সাতনলা হার জাতীয় অলঙ্কার বিশেষ। সুধাসদ্ম—অমৃতের আলয়।

১৫ প্রদ্যুম্ন—শিবরোষে ভস্মীভূত কাম মর্তে কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল। এখানে সে নামে সম্বোধন সঙ্গত হয় নি। আশীবিষ—সর্প।

১৭ অপাঙ্গ—কটাক্ষ। সারসন—কটিবন্ধ।

পঞ্চম সর্গ

১৮ স্ববশে স্বাধীন চিত্ত ইত্যাদি—নব্য যুগের স্বাধীন-চিত্ততার উল্লাস এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ছদ্মবেশে কদাচ না ইত্যাদি—আপন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের গৌরব ঘোষণা। উনবিংশ শতাব্দীর নব্য ভাবনার প্রকাশ। আস্য—মুখ। সেহ—সেও। মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় এরূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দ্রুমরাজি—বৃক্ষসকল। ধাবিল—ধাবিত হল। মধুসূদনের অনুসরণে হেমচন্দ্রও তাঁর কাব্যে নামধাতুর ব্যবহার করেছেন। মোদিত—আমোদিত। সরোজিনী-পুঞ্জ—পদ্মফুলগুলি।

১৯ হ্লাদিনী—বিদ্যুৎ, শচীসখী চপলা। পল্বল—বিল। কবচ—বর্ম। অঙ্গত্রাণ—বর্ম।

২১ আমায় সন্দেশবহ ইত্যাদি—ভীষণাদির সঙ্গে চপলার কথোপকথনের বক্রোজ্জ্বল লঘুচটুল ভাষায় ভারতচন্দ্রের ভঙ্গির প্রভাব পড়েছে। চন্দ্রক—ময়ূর পুচ্ছের চন্দ্রাকার চিহ্ন। ব্রততী—লতা। মধুলিহ—ভ্রমর।

২২ কন্ধর মূল—গ্রীবামূল। অন্তরে—ব্যবধানে।

ষষ্ঠ সর্গ

২২ অনীকিনী—সৈন্য দল। সাগর-সিকতা—সাগরের বালুকা। উরস্বান—বক্ষবিশিষ্ট। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রপুরী।

২৩ ত্রিদশ-আলয়—স্বর্গ। অর্ণব—সমুদ্র। ত্রিদশ—দেবতা। দৈবত—দেবসমূহ। সুজিষ্ণু—জিষ্ণু অর্থে বিজয়ী। সু বিশেষণের প্রয়োগ মধুসূদনের প্রভাবে। মাতঙ্গযূথ—হাতির দল।

২৪ অঙ্গজগণ—পুত্রগণ। স্বনামে যদি না ধন্য ইত্যাদি—নবযুগসুলভ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাবনা প্রকাশিত। ফেরুবৃন্দ—শৃগালপাল। শিরস—মস্তক। তোমা অদ্য করি অভিষেক ইত্যাদি—'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম সর্গের শেষভাগে যুদ্ধ-

যাত্রার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন রাবণ, তখন মেঘনাদ এসে সৈনাপত্য প্রার্থনা করেছিল। সেখান থেকে বর্তমান পরিস্থিতিটি ঋণস্বরূপ গ্রহণ করেছেন হেমচন্দ্র।

২৫ ভারতী—বাক্য। সন্দেশবহ—দূত। প্রবেশ—প্রবেশ কর। ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত।

২৬ কুমার-কল্প—রাজপুত্র রুদ্রপীড়ের বাসনা। আয়ুধ—অস্ত্র। সন্নিধি—নৈকট্য।

২৭ পাশী—বরুণের বিশেষণ। পাশ বরুণের বিশেষ অস্ত্র। প্রচেতা—বরুণ। নিবসতি—সংস্কৃত ক্রিয়াপদের এ-জাতীয় প্রয়োগ বাংলাভাষার স্বাভাবিকতাকে আঘাত করেছে।

সপ্তম সর্গ

২৮ বিটপ—শাখা। ক্ষৌণী—পৃথিবী। তুমি স্বরপতি ইন্দ্র ইত্যাদি—নিয়তির চরিত্রে একটু আগে যে নৈর্ব্যক্তিকতা দেখানো হয়েছিল এখানে তা নির্মমভাবে খণ্ডিত হয়েছে।

২৯ স্বপ্নদেব—নিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা প্রাচীন গ্রীক ভাবনার বৈশিষ্ট্য। মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব' এবং 'মেঘনাদবধ'-এ এই কল্পনার অনুগামী হয়েছেন। হেমচন্দ্র এরূপ ভাবনা গ্রহণ করেছেন মধুসূদন থেকে। পিনাকী—পিনাক নামক ধনু যাঁর অস্ত্র অর্থাৎ মহাদেব।

৩০ ধূর্জটি—মহাদেব।

অষ্টম সর্গ

৩০ তেঁহ—তিনি। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে, বিশেষ করে ব্রজবুলি রীতিতে প্রচলিত। আয়তি—সধবার লক্ষণ।

৩১ নেহালে—দেখে।

৩২ মীনকেতু—কামদেব। স্মর—কামদেব।

৩৩ মন্মথ—কামদেব।

৩৪ মৃগেন্দ্রী—সিংহী। স্রক—পুষ্পমাল্য। মৃগয়ী—শিকারী।

নবম সর্গ

৩৪ রোধ—বাধা। উরয়ে—অবতীর্ণ হয়। মধ্যযুগে বাংলা কবিতায় এরূপ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। মৃগেন্দ্র-শ্রুতি-আতঙ্ক—সেই শব্দ শুনে সিংহও ভীত হয়। অচলচয়—পর্বতকুল।

৩৫ স্বনন—শব্দ। উচ্চৈঃশ্রবা—ইন্দ্রের অশ্ব। সমুদ্রমন্থন কালে জলতল থেকে যে সব সামগ্রী উঠেছিল তার অন্যতম। এই অশ্ব অমৃত পান করত এবং অশ্ব শ্রেণীর মধ্যে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। সংরাব—ভীষণ শব্দ। ক্রীড়ন—ক্রীড়া বা খেলা। এখানে রণক্রীড়ায় যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

৩৬ হ্রাদ—ধ্বনি। কোদণ্ড—ধনুক। দ্রুঘণ—প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ। মুষল—গদা। শল্য—শেল। প্রক্ষ্বেড়ন—নারাচ বা লৌহ-বাণ। ভল্ল—বর্শা বিশেষ। করকা—শিলা। বিশ্বম্ভরা—পৃথিবী—নভস্বৎ—বায়ু।

৩৭ যাদঃপতি—সমুদ্র। তুলনীয়, মধুসূদনের 'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।' রাব—শব্দ।

৩৮ কৌমুদী—জ্যোৎস্না।

৩৯ বিবশা—বিহ্বলা। মিহির—সূর্য।

৪০ বিনতা-তনয় গরুত্মান ইত্যাদি—বিনতাপুত্র গরুড়ের সহিত কদ্রুপুত্র সর্পদের বিবাদ-বিষয়ক পুরাণ কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত।

৪১ কিম্বা যেন রাশীকৃত ইত্যাদি—তুলনীয়, মধুসূদনকৃত মৃত মেঘনাদের চিত্রাঙ্কন—
'শাম্বরশিম্ব মহাবল রহিলা ভূতলে।'
ছিলাশূন্য ইত্যাদি—গুণশূন্য ধনুর ন্যায় প্রাণহীন দেহ। উপমাটি সুপ্রযুক্ত এবং ভাবের স্বাদবাহী। কম্বুনাদ—শঙ্খের ধ্বনি। পুরাণে শঙ্খধ্বনির দ্বারা যুদ্ধজয় ঘোষণা এবং উৎসাহ-বর্ধনের কথা বলা হয়েছে।

৪৩ ত্রিপথগা—গঙ্গানদী স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী নামে তিন ধারায় প্রবাহিত এবং এ-কারণেই ত্রিপথগা নামে খ্যাত। অনন্ত—অসীম ভগবান, এখানে বিষ্ণুকে বোঝানো হয়েছে। স্বেদি—স্বেদন অর্থে ঘর্মস্রাব। এই শব্দটিকে নাম ধাতুতে পরিণত করা হয়েছে। বহিলা অনন্ত স্বেদি ইত্যাদি—মহাদেবের গান শুনে বিষ্ণু এত ভাবাকুল হলেন যে তাঁর চরণ দ্রবীভূত হল। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুধারা ব্রহ্মা কমণ্ডলুতে রক্ষা করলেন, তাই-ই হল গঙ্গা। ব্যোমকেশ-জটা ভেদি ইত্যাদি—হিমালয় থেকে গঙ্গা যখন সমতলে নেমে আসেন শিব সেই ধারা মস্তকে ধারণ করে পৃথিবী রক্ষা করেন। অবশেষে আপনার জটাজালে আবদ্ধ গঙ্গাকে শিব জটা ছিঁড়ে বের করে দেন। বিপুল তরঙ্গে ইত্যাদি—পুরাণ কাহিনীতে আছে ঐরাবত গঙ্গাধারাকে প্রস্তর বাধা মুক্ত করার পরিবর্তে সম্ভোগ করতে চেয়েছিল। গঙ্গার তরঙ্গাঘাতে ভেসে গিয়ে তাকে এই কামনার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। হাতির নাম ঐরাবণ নয়, ঐরাবত।

দশম সর্গ

৪৪ ইন্দ্রায়ুধ—শব্দটি বিশেষ করে রামধনুকে বোঝায়। এখানে ইন্দ্রের নানারূপ বিশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র বোঝাতে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। বিটপমণ্ডলী—বিটপীমণ্ডলী হওয়া উচিত ছিল। ইন্দ্র শাখা শ্রেণী দেখে নি, নিশ্চয় দেখেছিল বৃক্ষশ্রেণী। চন্দ্রমা বেষ্টিত চারি ইত্যাদি—উনবিংশ শতাব্দীর কবিরা কাব্যে জ্ঞানচর্চার পরিচয় দিতে উৎসুক ছিলেন। গ্রহ শনৈশ্চর ইত্যাদি—শনিগ্রহ সম্বন্ধে মধুসূদনের লেখা সনেটটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কলানিধি—চন্দ্র।

৪৫ অয়ন—পথ। শব্দশূন্য, বর্ণশূন্য ইত্যাদি—তুলনীয় কবির নিজের লেখা 'দশমহাবিদ্যা'য় মহাদেবের অনন্তরূপের সঙ্গে। ঐশ্বর্য-ভূষিত অষ্ট—যোগলব্ধ অষ্টবিধ অলৌকিক শক্তি, যেমন—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামবসায়িতা। বক্ত্র—মুখ। সুখ হইতে মানবের দুঃখ ইত্যাদি—হেমচন্দ্র একাধিক কাব্যে এই দুঃখ-তত্ত্বের প্রচার করেছেন। 'দশমহাবিদ্যা' দ্রষ্টব্য।

৪৬ ষড়ানন—কার্তিক। ভুঞ্জিলা—ভোগ করলে।

৪৭ ত্র্যম্বক—মহাদেব। অরাতি—শত্রু। হূতি—আহ্বান। যজ্ঞে যে অগ্নিকে আহ্বান করে প্রজ্বলিত করা হয় এই অর্থে।

৪৮ পুলোমজা—কশ্যপপুত্র পুলোমা বা পুলোমজের কন্যা শচী। বিষাণ—শিঙা। তুণ্ড—মুখ। রজত-গিরি-সন্নিভ—রৌপ্যবর্ণ পর্বতের ন্যায়। দধীচি—অর্থবা ঋষির পুত্র। অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরা পাঠিয়ে একবার ইন্দ্র তাঁর বিরাগভাজন হন। কিন্তু বৃত্রকে বধ করার জন্য ইন্দ্র তাঁর অস্থি চাইলে পূর্বের অপকার ভুলে গিয়ে তিনি আপন প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

একাদশ সর্গ

৪৯ চতুষ্পথ—চৌমাথা। ছুটিছে দেখিতে শচী ইত্যাদি—মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত নূতন জামাই দেখবার জন্য নারীদের আগ্রহের সঙ্গে এই বর্ণনা তুলনীয়। কঞ্চুলিকা স্তনাবরক বস্ত্র। রসনা—মেখলা বা কটি ভূষণ। শ্রোনি—নিতম্ব। দুটি শব্দের একই অর্থ। কবির ভাষা এখানে লক্ষ্যভ্রষ্ট। ভুজশির—বাহু। একাবলী—হার। কুণ্ডল—কর্ণভূষণ। মঞ্জীর—নূপুর। অলক্ত—আলতা। পৃক্ত—লগ্ন।

৫০ দুর্দ্ধর—সহ্য করা যায় না এরূপ। বিত্রস্ত—অতিশয় ত্রস্ত। সম্প্রহার—সম্যক প্রহার। ব্যাল—সর্প। ব্যালগ্রাহী—সাপুড়ে। ভাগে—ভাগ্যে। আঁচ—বাক্যটিতে প্রথম দুবার আঁচ শব্দটি ইঙ্গিত অর্থে এবং শেষ বারে আগুনের ঝাঁজ অর্থে প্রযুক্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড : দ্বাদশ সর্গ

৫৩ কহ মাতঃ শ্বেতভুজে ইত্যাদি —তুলনীয়, মধুসূদনের—

'ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভুজে ভারতি।'

মধুসূদন হোমর থেকে 'শ্বেতভুজা' বিশেষণটি গ্রহণ করেছিলেন 'হোয়াইট-আর্মড আথেনী'-র অনুসরণে। হেমচন্দ্র অনুসরণ করেছেন মধুসূদনকে।

৫৫ তো—তোমা। খগেন্দ্র—গরুড়।

৫৬ স্যন্দন—রথ। পূর্ণেন্দুমুখ—পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সুন্দর মুখশ্রী। শশাঙ্ক—চন্দ্র। উঠিল প্রাচীরে—প্রাচীরের উপর থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের এই বর্ণনায় মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের প্রভাব পড়েছে। হে কাশি—এ জাতীয় রচনাভঙ্গি মধুসূদনের প্রভাবজাত। পরশু—কুঠার। ফলক—ঢাল। তোমর—শাবলতুল্য যুদ্ধাস্ত্র। মহিষের ঘোরশব্দ—যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়া হাতি ব্যবহৃত হত, কিন্তু মহিষ কোন্ প্রয়োজন সাধন করত ?

ত্রয়োদশ সর্গ

৫৭ নগেন্দ্র—হিমালয়। অটবী—অরণ্য। সুরেশ—ইন্দ্র। খদ্যোত-দ্যুতি—জোনাকির আলো। দাম—মালা। পৌলোমীবল্লভ—শচীর স্বামী অর্থাৎ ইন্দ্র। শিখণ্ডী—ময়ূর। কুহুকণ্ঠ-রূপ—কোকিলের মূর্তি।

৫৮ হা কতকাল অদৃষ্ট ইত্যাদি—রাবণের ভয়ে ইন্দ্রাদি দেবতারা পক্ষীদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। রামায়ণ কাহিনীর আদর্শে এই প্রসঙ্গটি কবি গঠন করেছেন। জম্বুকী—শৃগালী। কেশরী—সিংহ। অজিন—মৃগচর্ম। বিশদ—স্পষ্ট।

৫৯ বাগীশ্বরী—সরস্বতী। জলধি-সম্ভবা—সমুদ্র থেকে উত্থিতা লক্ষ্মী। পৌরাণিক সমুদ্রমন্থন কাহিনী স্মর্তব্য। বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা। অনন্ত যৌবন ফল ইত্যাদি—এই কলহ-ফলের কল্পনামূলে গ্রীক পুরাণের 'অ্যাপ্‌ল অব ডিসকর্ড'-এর কাহিনীর প্রভাব আছে। কুটিল, কূট-কটাক্ষী, হত্যা ভয়ঙ্করী—মৃত্যুর এই ব্যক্তিরূপের সঙ্গে তুলনীয় ইলিয়াড মহাকাব্যে হোমরের বর্ণনা "And so was strife, the war-god's sister, who helps him in his bloody work. Once she begins, she cannot stop. At first she seems a little thing, but before long, though her feet are still on the ground, she has struck high heaven with her head. She swept in now among the Trojans and Achaeans, filling them with hatred of each other. It was the groans of dying men she wished to hear." [ই. ভি. রিউ কর্তৃক অনূদিত]

সুন্দর কার্মুক কাদম্বিনী কোলে ইত্যাদি—মেঘের কোলে ইন্দ্রধনুর শোভা। সহস্র অক্ষি—পুরাণ বর্ণনায় ইন্দ্রের হাজার চোখের কথা বলা হয়েছে। কোনো কোনো কাহিনী অনুযায়ী সদ্যসৃষ্ট তিলোত্তমার রূপমাধুর্য দর্শনে অতৃপ্ত ইন্দ্রের বাসনার ফলে তিনি সহস্রলোচন হয়েছিলেন। অপর কাহিনী অনুসারে অহল্যা হরণের পাপে ইন্দ্রের সর্বদেহে হাজার যোনিচিহ্ন প্রকাশ পায়। পাপ-মুক্তিতে এগুলি সহস্র চোখে রূপান্তরিত হয়। পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম।

চতুর্দশ সর্গ

৬১ দ্বৈপায়ন—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, মহাভারত রচয়িতা। দ্বীপের মধ্যে জন্ম বলে দ্বৈপায়ন খ্যাতি। আরম্ভিলা তারস্বরে ইত্যাদি—প্রাচীন বৈদিক গানের সঙ্গে বৈষ্ণব রসপুষ্ট বঙ্গদেশের হরিসঙ্কীর্তনকে এক আসনে বসিয়েছেন কবি।

৬২ বন্দী হবে ইন্দ্রজায়া ইত্যাদি—মেঘনাদবধ কাব্যের সীতার বন্দীদশার প্রভাবে কল্পিত। কে আছে ত্রিলোকমাঝে ইত্যাদি—নবযুগের স্বদেশপ্রেমের বাণী। কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা ইত্যাদি—সমকালীন পরাধীন ভারতের বেদনার সুর এখানে বেজেছে। নমুচি, পাকদৈত্য, বলাসুর—ইন্দ্র কর্তৃক নিহত দৈত্য-বীরদের নাম। এদের মধ্যে একমাত্র নমুচি হত্যার প্রসঙ্গটিই প্রসিদ্ধ।

৬৩ আবর্ত্ত, পুষ্কর—মেঘেদের নাম। রথচক্র নেমি—রথের চাকার পরিধি। ভাতিতে—উজ্জ্বল করতে। সৃক্কণে—অর্থাৎ সৃক্কণীতে, ওষ্ঠপ্রান্তে। হেরম্ব—গণেশ। অনঙ্গ মহিলা—কামপত্নী রতি।

পঞ্চদশ সর্গ

৬৫ অম্বুনিধি-নাদ—সমুদ্রগর্জন। চমূমুখে—সেনাবাহিনীর সামনে। অমরঠাট—দেবসৈন্য। ঘুরাই—ঘুরিয়ে। মার্তণ্ড—সূর্য। বাড়বাগ্নি—সমুদ্রগর্ভে প্রাকৃতিক কারণে জাত অগ্নি।

৬৬ রড়—দৌড়। অহিরাজ—বাসুকি। সমুদ্র-মন্থনের প্রসঙ্গ। বিশাই—বিশ্বকর্মা। মঙ্গলকাব্যে লৌকিক গ্রাম্য পরিবেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা হয়েছে বিশাই। এখানে এই শব্দের ব্যবহারে মহাকাব্যিক রসগাম্ভীর্যে চ্যুতি ঘটেছে। শ্বেত স্বচ্ছ অমরশোণিত—দেবরক্ত সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের কল্পনা। তুলনীয়, 'Out came the goddess's immortal blood, the ichor that runs in the veins of the happy gods, who eat no bread nor drink our sparkling wine and so are bloodless and are called immortals.' (হোমরের ইলিয়াড।) ইরম্মদ গতি—বিদ্যুতের

ন্যায় গতি বিশিষ্ট। দীঘল—শব্দটির ধ্বনি গাম্ভীর্য নষ্ট করেছে। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা।

৬৮ মৈনাক—সমুদ্রনিমজ্জিত মৈনাক পর্বত।

ষোড়শ সর্গ

[কবি যুদ্ধ-বর্ণনার গাম্ভীর্যকে কিছুটা তরল ও সহনক্ষম করে তুলবার জন্য এখানে লঘু ছন্দের আমদানি করেছেন।]

৬৮ নিশিগন্ধা—রজনীগন্ধা ফুল। পীন-পয়োধর—উন্নত স্তনযুগ্ম। শিরোপা—পুরস্কার।

৭১ রদন—দাঁত।

সপ্তদশ সর্গ

[এ সর্গে রুদ্রপীড়ের প্রতি বৃত্রের উক্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম সর্গের মেঘনাদ-রাবণের কথোপকথন স্মরণ করিয়ে দেয়। রুদ্রপীড়-ঐন্দ্রিলা সংবাদ এবং রুদ্রপীড়ের সঙ্গে ইন্দুবালার সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গ 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর পঞ্চম সর্গে বর্ণিত মেঘনাদ-মন্দোদরী এবং মেঘনাদ-প্রমীলা প্রসঙ্গ থেকে গৃহীত।]

৭৩ অরবিন্দ—পদ্ম অরিন্দম—শত্রুজয়ী। করিবে শিবের পূজা—'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ পুত্রের মঙ্গলের জন্য মন্দোদরী দেবার্চনা করেছিল। হেমচন্দ্র সেই আদর্শে এখানে ইন্দুবালাকে দিয়ে শিবপূজা করিয়েছেন পতির কল্যাণ-কামনায়।

অষ্টাদশ সর্গ

৭৮ তুম্বযন্ত্র—লাউয়ের খোলের দ্বারা নির্মিত বীণা।

৮১ বীরভদ্র—মহাদেবের আদেশে বীরভদ্র দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হয়েছিল 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ রাবণকে দেবার জন্য। হেমচন্দ্রের উপরে সেই কল্পনার প্রভাব পড়েছে। মহোরগ—মহাসর্প।

উনবিংশ সর্গ

[মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর তৃতীয় সর্গে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সুন্দউপসুন্দের নিধন-অস্ত্র 'তিলোত্তমা' গঠন করিয়েছিলেন। হেমচন্দ্র বিশ্বকর্মাকে দিয়ে বজ্র তৈরি করিয়েছেন। মধুসূদন বিশ্বকর্মার পুরীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল।

ঘন ঘনাকারে ধূম উড়ে হর্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত

স্রোতে বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যথা
মেঘাবৃত আকাশে……
……ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার। মূর্ত্তিমান দেব বৈশ্বানরে
পাই, সোহাগায় সোনা গলিছে সোহাগে
প্রেমরসে ; বাহিরিছে রজত জ্বলিয়া
পুটে,………
… · লৌহ যার তনু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি মহারাগে ধাতু
জ্বলে, অগ্নিসম তেজ, অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
জ্বলিছে।

হেমচন্দ্র অবশ্য এই সূত্রটিকে যথাসাধ্য ফেনিয়ে বড় করেছেন। মধুসূদন হোমর-কল্পিত হেফাএসটাস-এর আদর্শটি গ্রহণ করেছিলেন। হেমচন্দ্র মধুসূদনকে বিস্তারিত করে তুলেছেন। তবে হোমরের কিছুটা প্রত্যক্ষ প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।]

৮১ শূর্ম্মী—নেহাই।

৮২ শর্বলা—শাবল।

৮৩ বলনি—সুগোল বা সুডোল।

৮৪ রজতকুঞ্চিকা—রূপার তৈরি চাবি। ভোগবতী—পাতাল গঙ্গা। দিল ঘুরাইয়া চক্র—হোমরের ইলিয়াডে হেফাএসটাস্ কর্তৃক আকিলিসের বর্ম প্রস্তুত করবার যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে হেমচন্দ্রের কল্পনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। "…Hephaestus left her and went back to his forge, where he turned the bellows on the fire and bade them get to work. The bellows—there were twenty of them—blew on the crucibles and gave a satisfactory blast of varying force, which increased at critical moments and subsided at others, according to Hephaestus' requirements and the stage that the work had reached. He cast imperishable bronze on the fire, and some tin and precious gold and silver. Then he put a great anvil on the stand and gripped a strong hammer in one hand and a pair of tongs in the other."
কটাহ—কড়াই। তড়িত্তাপ যন্ত্র—বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র। হরিচন্দনত্বক—হরি চন্দন নামক গাছের বাকলে বজ্র ধরবার স্থানটি নির্মিত হল। বিবিধ বিচিত্র

চিত্র ইত্যাদি—হোমরও দেবশিল্পীকে দিয়ে আকিলিসের ঢালে নানাবিধ চিত্র আঁকিয়েছেন—"and he decorated the face of it with a number of designs." মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় দেবশিল্পী দেবী চণ্ডী বা মনসার কাঁচুলি তৈরী করতে এসে তাতে বিচিত্র চিত্র আঁকছেন। ভীষণ নরককুণ্ড পার্শ্বে যমদূত—'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অষ্টম সর্গের আদর্শ অনুসরণ করেছেন হেমচন্দ্র। নরক বর্ণনার অন্য কেনোরূপ সুযোগ এ কাব্যে তিনি করে নিতে পারেন নি।

৮৫ দণ্ড হাতে দাঁড়াইয়া ইত্যাদি—তুলনীয়,

…ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তকপ্রদেশে :
কাটে কৃমি ; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ি ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে ! আর্তনাদে পুরে দেশ পাপী।
[মেঘনাদবধ কাব্য]

কুম্ভীপাক ঘোর হ্রদ ইত্যাদি—তুলনীয়,

চল. রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে !
[মেঘনাদবধ কাব্য]

দম্ভোলি—বজ্র,

বিংশ সর্গ

৮৬ চাপ—ধনুক। পড়ে সৈন্যগণ সংখ্যা অগণন ইত্যাদি—অলঙ্কারটি মধুসূদন থেকে প্রায় হুবহু গ্রহণ করেছেন কবি। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম সর্গে আছে,

হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে !

মধুসূদন এজাতীয় উপমা গ্রহণ করেছিলেন হোমর-থেকে। "And now, like reapers who start from opposite side of a rich man's field and bring the wheat or barley tumbling down in armful till their swathes unite, the Trojans and Achaeans fell upon each other to destroy." [ইলিয়াড]

৮৭ বিশিখ—বাণ। কর্তরী—কাটারি।

৮৮ নেমি—চক্রের পরিধি। নাভি—চক্রের কেন্দ্র। ধুর—শকটের অগ্রভাগ, যা ঘোড়া প্রভৃতির দেহে সংলগ্ন থাকে। অথবা চাকার মধ্যের দণ্ড। সূত—সারথি।

৮৯ যাও শীঘ্রগতি নিবার সুতে ইত্যাদি—তুলনীয় 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সপ্তম সর্গের বর্ণনা—

বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ্‌লো, সখি, চাহি লঙ্কাপানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দয়!...
নিবার্ কুমারে, সই।

৯০ নিষঙ্গ—তূণ।

৯১ ধব—স্বামী। প্রলয়ের মূর্তি যেরূপ যার ইত্যাদি—'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর প্রথম সর্গে যম এবং বায়ু বিশ্ব নাশের প্রস্তাব করেছিল। যমের উক্তি—

এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, অতল জলতলে।

বায়ুর উক্তি—

দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর, দাঁড়াইয়া হেথা
এ ব্রহ্ম মণ্ডলে, দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
নিমেষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল সুন্দর,
বাহুবলে ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।

সিন্ধুপতি তারে করিলা বিরত ইত্যাদি—'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ অপর দেবতাদের সৃষ্টিনাশ থেকে বিরত করেছিল বরুণ এবং কুবের।

একবিংশ সর্গ

৯৫ মুরহর—মুর দৈত্য বিনাশ করায় বিষ্ণুর নাম হয় মুরারি বা মুরহর। শুনিতে শুনিতে জটা ইত্যাদি—এই কাব্যে পূর্বে একবার শিবের ক্রোধের চিত্র এঁকেছেন কবি। পুনরুক্তির ফলে এর রসাবেদন জীর্ণ হয়ে পড়েছে। কৈটভহারি—মধু এবং কৈটভ দৈত্যকে বধ করেছিলেন বিষ্ণু।

৯৬ ভাগ্যদেব—নিয়তি দেবী এবং ভাগ্যদেব এরূপ দ্বিবিধ কল্পনার কারণ অনুমান করা যায় না।

দ্বাবিংশ সর্গ

৯৭ ভামিনী—রমণী। শিবা—শৃগাল।

৯৮ পরুষ বাণী—কঠিন কথা। ভাক্ত—ছলনাপূর্ণ।

১০০ শীর্ণালস—ক্ষীণ এবং জড়তুল্য। পটহ—ঢাক। ভেরী—ঢাক। দামা—দামামা, ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। শুধুই ঢাকের কথা বলেছেন কবি বিভিন্ন প্রতিশব্দ চয়ন করে। কেতু—পতাকা। তরস—দ্রুতগতি। রতনসম্ভবা বিভা ইত্যাদি—ঠিক এই শব্দব্যূহই ব্যবহার করেছেন কবি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ।

১০১ মহেষ্বাস—বীর।

১০২ অঙ্গারক—কার্বন। কুজ—মঙ্গলগ্রহ। ভীম···কুজ—মহাশক্তিধর কার্বন পূর্ণ মঙ্গলগ্রহ। সৌরি—সূর্যপুত্র। বৈনতেয়—বিনতা। খগেশ্বর—গরুড়। নৈঋ্ত—নৈঋ্ত কোণকে দেবরূপে কল্পনা করা হয়েছে। পরাজিব—পরাজিত করব। সব্যসাচী—দুহাতে যিনি সমান ভাবে তীর ছুঁড়তে পারেন। কলম্ব—তীর।

১০৩ কুরঙ্গ—বায়ুদেবের বাহন হরিণ। তাঁর রথের বাহনরূপে হরিণকে কল্পনা করেছেন কবি। প্রভঞ্জন—বায়ুদেব। ধটিনী—কটিবস্ত্র। প্রস্থত—বিস্তৃত। চর্ম—ঢাল।

১০৪ গোকর্ণ, শালিবাহন, গাধি, ঘটোৎকচ, সোমধৃতি, তৃণগতি—বৃত্রের সেনাপতি-বৃন্দ।

১০৫ সুধন্বি—সার্থক ধনুর্বিদ।

১০৭ কর্ব্বুরপতি—রাবণ। এখানে রামায়ণে বর্ণিত জটায়ুর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

১০৯ দৈত্যকুলোজ্জ্বল রবি ইত্যাদি—তুলনীয়, মেঘনাদের মৃত্যু-বর্ণনা—

> লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
> নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
> শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
>
> [মেঘনাদবধ কাব্য]

কহিলা দানবী ঘোরস্বরে ইত্যাদি—তুলনীয়, মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্তর্গত "নীলধ্বজের প্রতি জনা"র পত্র। বিলাপের বহুদিন ইত্যাদি—এ

অংশটি মেঘনাদের মৃত্যুতে মন্দোদরীর প্রতি রাবণের উক্তির দুর্বল অনুকরণ মাত্র। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সপ্তম সর্গে রাবণ মন্দোদরীকে বলেছিল—

…বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি ?

১১১ তনুত্র—বর্ম।

চতুর্বিংশ সর্গ

১১৪ ধ্বান্তবিনাশী—অন্ধকার দূর করেন যিনি।

১১৫ অয়স—লৌহ। নিগাল—অশ্বের গলদেশ। তনুরুহ—লোম। বৈনতেয়—এখানে বিনতাপুত্র অরুণের (গরুড়ের জ্যেষ্ঠ) কথা বলা হয়েছে। সে সূর্যরথের সারথি।

১১৬ ক্ষীরোদসমুদ্র-জাত ইত্যাদি—উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া দেবদানব মিলে সমুদ্রমন্থন-কালে তুলেছিল।

১১৭ বিশ্বভৃৎ—বিশ্বপতি। পার্ষ্ণী—সৈন্যের পশ্চাৎভাগ।

১১৯ পরেত পতি—প্রেতলোকের অধিশ্বর যম।

১২১ ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

দশমহাবিদ্যা

[দেবী আদ্যাপ্রকৃতি দৈত্যবধের জন্য নানারূপে আবির্ভূত হয়েছেন পুরাণাদিতে এরূপ কথিত আছে। সাধকেরাও নানা মূর্তিতে দেবীকে কল্পনা করেছেন। তন্ত্র-গ্রন্থগুলিতে তার বিচিত্র বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এরূপ "দশলক্ষ মহাবিদ্যা স্তন্ত্রাদৌ কথিতা প্রিয়ে"। সাধক-ভক্তরা এইসব রূপের মধ্যে বিশেষ করে দশমহাবিদ্যার উপাসনা করেন। তাঁরা হলেন—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অবশ্য দেবীর দশমহাবিদ্যার রূপ ও নাম সম্বন্ধে সব তন্ত্র এবং শাক্ত-পুরাণগুলি একমত নয়। মধ্যযুগে বাংলা কাব্যে দশমহাবিদ্যার প্রসঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। ভারতচন্দ্রের এবং শাক্ত পদের কোনো কোনো লেখক দশমহাবিদ্যার রূপবর্ণনা করে কবিতা লিখেছেন।]

১২২ ছিন্ন হৈল সতীদেহ—শিবপত্নী সতী ছিলেন দক্ষের কন্যা। দক্ষ এক যজ্ঞানুষ্ঠানে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন না। সতী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে পিতাকে ভর্ৎসনা করেন। দক্ষ শিবের প্রচুর নিন্দা করেন। সতী দক্ষপ্রদত্ত দেহ ত্যাগ করলেন। শিব সতীর মৃত্যুসংবাদ শুনে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করলেন। অবশেষে সতীর দেহ নিয়ে তিনি প্রলয় নৃত্যে পৃথিবী পরিক্রমা করতে লাগলেন। তাতে সৃষ্টি বিনষ্ট হবার উপক্রম হল। বিষ্ণু তখন সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। নন্দী—শিবের অনুচর। মহর্ষি শিলাদ শিবের বরে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করে পুত্রলাভ করেছিলেন। সে-ই নন্দী। ত্রিপুরহর—শিব। ত্রিপুর দানবকে বধ করেছিলেন। প্রমথ—শিবের অনুচরবর্গ। কালিকা-পুরাণের মতে শিবমুখনির্গত ফেনা থেকে এদের জন্ম।

১২৩ শবহৃদি আসন—আদ্যাশক্তি শবরূপে কারণ সলিলে ভেসে যাচ্ছিলেন। সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তপস্যা করছিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঘৃণাভরে মুখ ফেরালেন। শিব পরম যত্নভরে শবটি তুলে তার উপরে আসন করে ধ্যান করতে লাগলেন। জলনিধি—সমুদ্র। জলনিধি মন্থনে ইত্যাদি—ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করেছিল দেব-দানবে মিলে। ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, লক্ষ্মী, অমৃত দেবতারা পেয়েছিলেন। শিব কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন মন্থনজাত বিষ, পৃথিবীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবার জন্য। পৌরাণিক কাহিনী।

১২৪ নরভাল—কঙ্কাল-করোটির পাত্র। আগম—তন্ত্রশাস্ত্র। বিধি হৃষিকেশ—ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু।

১২৫ নটন—নটের কাজ অর্থাৎ নৃত্যাভিনয় প্রভৃতি।

১২৬ মোক্ষদ—যে বাণী মোক্ষদান করে।

১২৭ আমারি এ ভ্রম ইত্যাদি—নব্যযুগের মর্ত্ত্যপ্রীতিরস এখানে প্রকাশ পেয়েছে। বিভাকর—সূর্য।

পরমাপ্রকৃতি পরমাণুমূল ইত্যাদি—হেমচন্দ্র শাক্ততন্ত্রের বিশ্বাসকেই এখানে ব্যক্ত করেছেন। তুলনীয়,—'পঞ্চদশী'তে কথিত—

শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তু নিয়ামকা।
আনন্দময়মারভ্যা গূঢ়া সর্ব্বেষু ভূতেষু॥

'প্রপঞ্চসার তন্ত্র'-এ আছে—

অণোরনীয়সী স্থূলাং স্থূব্যাপ্তচরাচর।
আদিত্যেন্দ্বগ্নি তেজোময় যদ্ যত্তন্ময়ী বিভুঃ॥

এই ব্রহ্মময়ীই আবার জীবকে আসক্ত ও আমোদযুক্ত করে তোলেন—

আমোদযুক্তং বাসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী॥ [কালিকাপুরাণ]

না পশি কথনো জঠরে—নারদ অযোনিসম্ভূত, ব্রহ্মার মানসপুত্র।

১২৮ ব্যোমকেশ—মহাদেব। মৌলি—মস্তক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপগ্রহণের যে বর্ণনা আছে তার প্রভাব এই চিত্রাঙ্কনের পেছনে কার্যকর ছিল।

১৩৫ জ্ঞানময় যত জীব ইত্যাদি—পুরাণ কাহিনীকে মানবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করবার চেষ্টা।

১৩৮ বীচি—তরঙ্গ। পন্নগ—সাপ।

১৪০ সৃক্কণী—ওষ্ঠপ্রান্ত, কষ। রুধির বদনা বামা ইত্যাদি—তুলনীয়,

'তন্ত্রসার' : করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদাম্॥

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল':

মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শব কর্ণপুরা॥
গলিত রুধির ধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥

১৪০ ভূতেশ—শিব।

১৪১ ক্ষেমঙ্কর—মঙ্গলদায়ক। তারামূর্তি—তুলনীয়,

'তন্ত্রসার': প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ।
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্॥
খড়্গকর্ত্তৃসমাযুক্ত-সব্যেতরভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাম্॥
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রয়-ভূষিতাম্॥
জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্॥
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরি স্থিতাম্।
অক্ষোভ্যোদেবী মূর্দ্ধন্যস্ত্রিমূর্ত্তিনাগরূপধৃক্॥

ভারতচন্দ্র: নীলবরণা লোলজিহ্বা করাল-বদনা।
সর্পবান্ধা উর্দ্ধ এক জটা-বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারিহাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥

উৎপল—নীলপদ্ম।

ষোড়শী—তুলনীয়,

'তন্ত্রসার': ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণোজ্জ্বলাম্।
জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্॥

পদ্মরাগপ্রতীকাশাং কুঙ্কুমারুণসন্নিভাম্।
স্ফুরন্মুকুটমাণিক্যকিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাম্ ॥
কালালিকুলসঙ্কাশকুটিলালকপল্লবাম্।
প্রত্যগ্রারুণসঙ্কাশবদনাম্ভোজমণ্ডলাম্ ॥
... ...
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্।
জগদাহ্লাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীম্ ॥

ভারতচন্দ্র এঁকে বলেছেন রাজরাজেশ্বরী :

রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর ॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চপ্রেত নিয়মিত বসিবার মঞ্চ ॥

১৪২ ভুবনেশ্বরী—তুলনীয়,

'তন্ত্রসার' : জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্।
চন্দ্ররেখাং জটাজুটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসীম্ ॥
নানালঙ্কারসুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্।
পাশাঙ্কুশ বরাভীতীধারয়ন্তীং শিবাংশ্রয়ো ॥

ভারতচন্দ্র : রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ-বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥

ভৈরবীমূর্ত্তি—তুলনীয়,

'তন্ত্রসার' : (ত্রিপুর ভৈরবীর মন্ত্ররূপে বর্ণিত)
উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং,
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্।
হস্তাব্জৈর্দ্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ং,
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দেসমন্দস্মিতাম্ ॥

ভারতচন্দ্র : রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ-ভূষণা ॥
অক্ষমালা পুথি বরাভয় চারিকর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট-উপর ॥

বৃতা—আবৃতা। মিহির—সূর্য।

মাতঙ্গীমূর্তি—তুলনীয়,

'তন্ত্রসার' : শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং
রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্ব্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম্॥

ভারতচন্দ্র : রক্তপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল-ফলকে।

ধূমাবতী—তুলনীয়,

'তন্ত্রসার' : বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণকুন্তলা রূক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিরূক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া॥

ভারতচন্দ্র : অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ রথারূঢ় ধূম্রের বরণ।
বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা॥

বগলা—তুলনীয়,

'তন্ত্রসার' : মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরি
গতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণম্ল্যবিভুষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি
ধৃত মুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রূন্
পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং
দ্বিভুজাং নমামি॥

ভারতচন্দ্র : রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা॥
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া উর্দ্ধ করি॥
চন্দ্রসূর্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন॥

ছিন্নমস্তা—তুলনীয়,

'তন্ত্রসার' : তৎপদ্ম কোষমধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্তবন্ধূকসন্নিভম্॥
রজঃসত্ত্ব তমোরেখাযোনিমণ্ডলমণ্ডিতম্।
মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্॥
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্।
প্রসারিত-মুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্॥
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজ কণ্ঠং-বিনির্গতাম্।
বিকীর্ণ কেশপাশাঞ্চ নানা পুষ্পসমান্বিতাম্॥
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রী মুণ্ডমাল্যবিভূষিতাম্।
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদে স্থিতাম্॥
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।
রতি কামোপবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ॥
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নত পয়োধরাম্।
বিপরীত রতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনোভরৌ॥

ভারতচন্দ্র : বিকশিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার-মাঝে।
তিনগুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে॥
বিপরীত রতে রত র ত কামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজমুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিনধার।
একধারা নিজমুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী॥
চন্দ্রসূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন॥

মহালক্ষ্মী—তুলনীয়,

'তন্ত্রসার' : (লক্ষ্মীমন্ত্র বলে উল্লিখিত)
কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তোৎ-
ক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং,
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥

ভারতচন্দ্র : স্থবর্ণ স্থবর্ণ-বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
চতুর্দ্দশ চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্ন-ঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥

ক্ষৌম—রেশমী বস্ত্র। করী—হস্তী।

১৪৪ ত্রিগুণা—সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা আদি প্রকৃতি। কৈলা—কহিলা। পুনু—পুনরায়। উমারূপ ধরিল—সতীর মৃত্যুর পরে হিমালয়-মেনকার কন্যারূপে আদ্যাশক্তি জন্মগ্রহণ করলেন, এই পুরাণ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন কবি।

কবিতাবলী

ভারত-সঙ্গীত

১৪৫ যুনানীমণ্ডলী - গ্রীসদেশ। অসভ্য জাপান—জাপানী-সভ্যতা সুপ্রাচীন। কাজেই এই বিশেষণটি ঐতিহাসিক নয়। আয়ত—দীর্ঘ। ঠাট—ভঙ্গি।

১৪৬ হাদে—ওই। তৈলঙ্গ—তেলেগুভাষাভাষী দেশ, বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ। গান্ধার—বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ।

ভারত-বিলাপ

১৪৭ রাজধানী এক—কলিকাতা মহানগরী। দুর্গ গড়খাই—ফোর্ট উইলিয়াম।

১৪৮ প্রদোষ—সন্ধ্যা। রুল ব্রিটানিয়া—'রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভ্‌স'—বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী গৌরবমুখর অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত। গৌরাঙ্গ—শ্বেতকায়; সাহেব। গোঁয়ালে—কাটালে। রূপে অনুপম নিখিল ধরায় ইত্যাদি—তুলনীয়, মধুসূদনের—

কে না লোভে ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভুপতিত তারারূপে নিশাকালে ঝলে?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে?—
হায় লো ভারতভূমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ নয়নি,
বিধাতা? রতনসিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি!

[চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী]

১৪৯ তোমারো ত বুকে ইত্যাদি—প্রাচীনকালে বিভিন্ন বিদেশি শক্তির কাছে বৃটেনের পরাভবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিধবা-রমণী

১৪৯ ভারতের পতিহীনা ইত্যাদি—কবিতার প্রারম্ভিক দুই চরণ এবং প্রতি স্তবকের শেষ চরণে ছন্দ-ব্যবহারের এই রীতি ভারতচন্দ্রের প্রভাবজাত। এ-রীতি যেমন লঘু তেমনি বিষয়ানুগ নয়। চিকুর—কেশ।

ভারত-কামিনী

১৫১ অবনীর সার—পৃথিবীর সেরা। বাঁধিয়া রেখেছ ইত্যাদি—এই স্তবকে বৈধব্যক্লেশের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। কুলীন সধবা ইত্যাদি—কৌলীন্য প্রথার সমালোচনা করেছেন কবি এই স্তবকে।

১৫২ না দেখিতে দাও ইত্যাদি—অবরোধপ্রথার প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে এই স্তবকে। আত্রেয়ী—প্রাচীন ভারতের অদ্বিতীয় বিদুষী মহিলা। প্রথম জীবনে বাল্মীকির এবং পরবর্তীকালে অগস্ত্যের শিষ্যারূপে তিনি বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে অতুলনীয় পাণ্ডিত্যলাভ করেছিলেন। খনা—জ্যোতিষশাস্ত্রে এই মহিলার খ্যাতি সম্ভবত কিম্বদন্তীমূলক। খনার বচন নামে কৃষি ও আবহাওয়া-বিষয়ক অনেকগুলি লৌকিক ছড়া প্রচলিত আছে। লীলাবতী—ভাস্করাচার্যকৃত গণিত-বিষয়ক গ্রন্থ। প্রবাদ, তাঁর কন্যার ঐ নাম ছিল। রাজোয়ারা—রাজস্থান।

১৫৩ য়ুনানী—গ্রীক। এখানে সমস্ত পাশ্চাত্যদেশমাত্রকে বোঝানো হয়েছে। পুরুষ-সেবিতা—পুরুষেরাও যাদের সম্মান দেয়।

ভারতে কালের ভেরী

১৫৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'দুর্ভিক্ষ'-বিষয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেখানে কিন্তু ব্যঙ্গের সুর মুখ্য—

হয় দুনিয়া ওলট্ পালট্,
আর কিসে ভাই! রক্ষা হবে?
আর কিসে ভাই! রক্ষা হবে?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পেড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া, শিক্কে ধোরে,
ভিক্ষে করে বেড়াই সবে।

১৫৫ নাশিতে সে দুরাচার ইত্যাদি—দুর্ভিক্ষ দূর করবার জন্য বৃটিশ সরকারের চেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কবি।

ইউরোপ এবং আসিয়া

১৫৬ হিন্দুকুশ-চূড়ে ইত্যাদি—আফগান যুদ্ধে বৃটিশের বিজয় উপলক্ষে কবিতাটি রচিত। বালাহিসার, সুতরগর্দ্দান—আফগান অঞ্চলসমূহ। হাইলণ্ডর—বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হাইলণ্ডর দল। প্যানেমাচল—পানামা যোজক। অতলান্ত— আটলাণ্টিক মহাসাগর। শান্ত সাগর—প্রশান্ত মহাসাগর।

বাঙালীর মেয়ে

১৬০ কবিতাটিতে "ভারত-কামিনী"-র বিপরীত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। ধারাপাতে মূর্তিমান ইত্যাদি—স্বল্পশিক্ষার প্রতি কটাক্ষ। কলাপাতা না এগুতে ইত্যাদি —নারী গ্রন্থকারদের শিক্ষার প্রতি ব্যঙ্গ।

১৬১ র‍্যাফেল-বধা—বিখ্যাত য়ুরোপীয় চিত্রকর র‍্যাফেলকে হার মানায় এমন ছবি। ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য।

১৬২ ঘাটে—ঘাট করে। দোষে—দোষ দেয়।

সাবাস হুজুক আজব সহর

১৬২ কলকাতার প্রথম পৌর নির্বাচন উপলক্ষে এই ব্যঙ্গ কবিতাটি রচিত। সেতম্বর—সেপ্টেম্বর।

১৬৩ ফ্রানচাইস—ভোটাধিকার। ভোরের কামানে—সেকালে কলকাতায় ভোরে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রে তোপ পড়ত।

নেভার-নেভার

৭০ এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ব্যঙ্গনক্শা Bransonism ('লোকরহস্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)-এর কথা স্মরণ করা চলে। ইংলিশম্যান্– বর্তমান স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার পূর্বসূরী ইংরেজি দৈনিক।

৭২ রিপনলাট—বড়লাট রিপনের আমলে ইলবার্ট বিল প্রবর্তিত হয়। এম্ফিবিয়স —উভচর। আন্দ্রূ পিন্দ্রূ—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের প্রতি ব্যঙ্গ।

হায় কি হলো?

৭৫ সফেদ—সাদা। সুরেন—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭৭ ইংলিস্ম্যান, পাইওনিয়ার—শাসকদের সমর্থক দুটি ইংরেজি দৈনিক।

দেশলাইএর স্তব

১৭৪ গৌরাঙ্গ—এখানে শ্বেতবর্ণ ইংরেজ। টীকা—তামাক সাজবার জন্য কয়লার গুঁড়োর জমানো চাকতি। দিয়া কাটি—দেশলাইএর কাঠি।

বাজিমাৎ

১৭৮ [এই কবিতা রচনার পেছনে একটু ইতিহাস আছে। কবির জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের ভাষায় তা বিবৃত করা হল। "১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে যুবরাজ (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন করেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী রাত্রিকালে তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থা করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর 'জেনানা' দেখিতে বোধ হয় যুবরাজের ইচ্ছা হয়। হাইকোর্টের জুনিয়র গভর্নমেণ্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর তখন বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি যুবরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ৩রা জানুয়ারি সন্ধ্যাকালে যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং যুবরাজও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যুবরাজকে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারস্থ মহিলাগণ অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপার লইয়া সে সময়ে হিন্দুসমাজে মহ আন্দোলন হয়।"]

কৈশবী—কেশব সেনের অনুগামী।

১৮১ পোনা, পুঁটি, খয়রা, চেলা গিন্নি—সাধারণ পরিবারের গৃহিণীরা।

১৮২ কেহ বলে আমার কর্তাটি ইত্যাদি—মঙ্গলকাব্যের "নারীগণের পতিনিন্দা' প্রসঙ্গটির বহিরঙ্গরূপরীতি গৃহীত হয়েছে। কুঠেল যবন—কুঠিয়াল সাহেব।

১৮৩ আমি উকিলের ইত্যাদি—ব্যঙ্গ এখানে কবির নিজের পেশাকেও স্পর্শ করেছে। খাঁটি ব্যঙ্গশিল্পী নিজের প্রতি শরক্ষেপেও সঙ্কুচিত নন।

জীবনমরীচিকা

১৮৪ ললাম—ভূষণ, শ্রেষ্ঠবস্তু, মঞ্জু-সুন্দর।

১৮৫ পীচে—পান করবে।

১৮৬ আনায়—জাল। কেলিচর—খেলার সঙ্গী। আগে ছিল কত সাধ ইত্যাদি—তুলনীয়, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের উক্তি, "যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্মের মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রারোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম তখন আনন্দ ছিল।……এখন জানিয়াছি এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে

জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে; ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্যহৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে।"

পরশমণি

১৮৭ [এই কবিতাটি রচনার বেশ কয়েক বছর পরে জীবনের শেষপ্রান্তে হেমচন্দ্র দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ছিলেন। এ কবিতায় নয়নরূপ পরশমণির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করেছেন কবি। রূপদ্রষ্টা ও ভোক্তা কবির কাছে অন্ধত্বের ব্যক্তিগত বেদনা তাঁর চিত্তবিকাশের কোনো কোনো রচনায় প্রকাশ পেয়েছে।]
শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া—ময়ূরের পুচ্ছের চক্রাকার বহুবর্ণমণ্ডিত চিহ্নগুলিকে চন্দ্রের সঙ্গে উপমিত করেছেন কবি।

১৮৮ চিক্কণী—চাকচিক্য। স্বসা—বোন।

জীবন-সঙ্গীত

১৮৯ বলো না কতর স্বরে ইত্যাদি—নব্যযুগসুলভ মানবপ্রেম ও মর্তমমতা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। দারাপুত্র পরিবার ইত্যাদি—শঙ্করাচার্য প্রমুখ মায়াবাদীদের মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত। শৈবালের নীর—শৈবালের উপরে জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী জীবন। মায়াবাদীরা পদ্মের পাপড়িতে পতিত জল বিন্দুর সঙ্গে জীবনকে উপমিত করেছেন।

পদ্মের মৃণাল

১৯১ পড়িয়া রয়েছে স্তূপ—কবি মিশরের পিরামিডের কথা বলেছেন। ম্যারাথন, থার্মপলি—প্রাচীন গ্রীক-ইরানীয় যুদ্ধে খ্যাত দুটি রণক্ষেত্র। গ্রীক স্বাধীনতার পাদপীঠরূপে কীর্তিত। গিরীস—গ্রীস দেশ। যার পদচিহ্ন ধরে ইত্যাদি—প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অনুসরণে য়ুরোপীয় জাতিসমূহের উন্নতি।

১৯২ দীন—(আরবী শব্দ) ধর্ম।

১৯৩ জিলণ্ড—নিউজিলণ্ড। ফরাসী-জননী—ফরাসী দেশের সমকালীন দুর্দশার কথা চিন্তা করে কবি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। সুচির যৌবনী—অনন্ত যৌবনা।

জীবনের লীলা ফুরালো

১৯৫ লূতাজাল—মাকড়সার জাল। ভিতিল—ভিজিল। অভ্রময়—অভ্রের ন্যায়

১৯৬ পুট—পাত্র।

কল্পনা

১৯৭ বানরে সঙ্গীত গায়—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অন্তর্গত পংক্তি। এখানে এটি সুপ্রযুক্ত হয় নি। কবিতার ভাবগাম্ভীর্য বিনষ্ট করেছে।

১৯৮ কমলা ঠেলিলা পায় ইত্যাদি—বিহারীলালের কবিতার সঙ্গে কিছু ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

চাতক পক্ষীর প্রতি

২০১ বিপিন—বন।

গঙ্গা

২০৬ ম্রক্ষণ—লেপন।

অশোকতরু

২০৮ বিটপী—বৃক্ষ।

২১০ বৈতরণী—জীবন ও মৃত্যুলোকের মাঝে প্রবাহিত কল্পিত নদী।

কোন একটি পাখীর প্রতি

২১৩ সরোরুহ—পদ্ম। কহ্লার—শ্বেত পদ্ম। নভশ্চর—পাখি।

দূরে কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে

২১৪ সুধাংশু, শীতাংশু—দুটি শব্দের অর্থই চন্দ্র। দ্বিতীয় শব্দটিকে কবি চন্দ্র-কিরণ অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

রেলগাড়ী

২১৭ জাঙাল—বাঁধ। পগার—ডোবা। সৌদামিনী ইত্যাদি—বৈদ্যুতিক তার। ত্রেতায়—ত্রেতাযুগে। সীতারামে ইত্যাদি—রামায়ণের প্রসঙ্গ। সীতা উদ্ধারের পরে রামসীতা পুষ্পক রথে চড়ে সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন।

শিশুর হাসি

২১৯ মুকুল-অমিয়—অমৃত ফলের মুকুল।

পরিশিষ্ট

[হেমচন্দ্রের ছুটি গুরুত্বপূর্ণ গীতিকবিতা প্রমাদবশত বাদ পড়েছে। প্রথমটি "কবিতাবলী" (১ম) এবং দ্বিতীয়টি "চিত্তবিকাশ" গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। সম্পাদক।]

॥ প্রেম ও প্রকৃতি ॥

হতাশের আক্ষেপ

১

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !
কাঁদাইতে অভাগা রে, কেন হেন বারে বারে,
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে !
তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে।
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !

২

অই শশী অইখানে, এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি !
কত বার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি !
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার,
আমারি কি দশা হবে, কি আশ্বাসে রয়েছি !

৩

কৌমার যখন তার, বলিত সে বারম্বার,
সে আমার আমি তার, অন্য কারো হবো না।
ওরে দুষ্ট দেশাচার. কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না।

৪

লোক লজ্জা মান ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল।
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।

৫

হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতকপ্রায়,
ধাইতে অমৃত-আশে বুকে বজ্র বাজিল ;—
সুধাপান-অভিলাষ অভিলাষ(ই) থাকিল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার,
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিহ্নাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদবাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।

৬

হায়, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল ;
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

৭

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে,
থাকি প'ড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা,
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না।
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান, অপমান—
অরে বিধি, তারে কিরে জন্মান্তরে পাব না ?

৮

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো,
দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম !
ভাবিতাম আমি দুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চখে দেখিলাম !

৯

এইরূপে চন্দ্রোদয়, গগন তারকাময়,
নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ;
একদৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখে চন্দ্রাননে
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে,
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে

১০

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে,
চিতহারা দুই জনে বাক্য নাহি সরে রে ;
কতক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি, নাথ" !
ব'লে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়ে পড়ে রে।

১১

বদন চুম্বন ক'রে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে,
শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।"—
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিল রে !

॥ জীবন ভাবনা ॥

বিভু, কি দশা হবে আমার ?

বিভু ! কি দশা হবে আমার ?
একটি কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,—
সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনী 'পরে,
চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥

আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্র,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে ॥

চৌদিকে নিরাশা ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে।
যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে ॥

কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান।
ভাবিতে সে সব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান॥

সব ঘুচাইল বিধি, হরে নিয়া চক্ষুনিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,
ক'রে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে॥

জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার,
চির-অস্তমিত দিনমণি॥

ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্য ভূমি অচল,
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার,
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশ দিক ঘোর অন্ধকার—
বিভু! কি দশা হবে আমার॥

প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে,
আমারি রজনী শেষ, হবে না কি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে॥

আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির বিন্দু জলে,
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে॥

বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে পাব না দেখিতে নেত্রে,
দেবতুল্য মানব-বদন॥

নিজ পুত্র-কন্যা-মুখ পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা ॥

কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন, হব না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার ॥

ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার —
বিভু ! কি দশা হবে আমার ॥

গ্রন্থপঞ্জী : [এক]

॥ স্বতন্ত্র গ্রন্থ ॥

হেমচন্দ্র। প্রথম খণ্ড। মন্মথনাথ ঘোষ। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ
হেমচন্দ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। মন্মথনাথ ঘোষ। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ
হেমচন্দ্র। তৃতীয় খণ্ড। মন্মথনাথ ঘোষ। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ
কবি হেমচন্দ্র। অক্ষয়চন্দ্র সরকার। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সাধক চরিতমালার তৃতীয় খণ্ডে গ্রথিত।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ
হেমচন্দ্র। রাজকুমার চক্রবর্তী। ১৩২৮ বঙ্গাব্দ
হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী। ভূমিকা। সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত।
মাইকেল ও হেমচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ১৯০০

॥ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আলোচনা। গ্রন্থবদ্ধ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ॥

The Literature of Bengal. । Ramesh Chandra Dutta । 1877,
বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। রাজনারায়ণ বসু। ১৮৭৮
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ২য় সংস্করণ।
রামগতি ন্যায়রত্ন। ১৮৭৮
বঙ্গভাষার লেখক। ১ম ভাগ। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত। ১৩১১ বঙ্গাব্দ
The English influence on Bengali literature । Baroda charan
Mitra.
ভিক্টোরিয় যুগের বাংলা সাহিত্য। হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
পুরাতন প্রসঙ্গ। কৃষ্ণকমল গোস্বামী।
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী।
আত্মচরিত। রাজনারায়ণ বসু।
আমার জীবন। নবীনচন্দ্র সেন।
বঙ্গবাণী। ২য় খণ্ড। শশাঙ্কমোহন সেন। ১৯১৫
আধুনিক বাংলা সাহিত্য। মোহিতলাল মজুমদার।
Western influence on Bengali literature । Priyaranjan Sen.
বাঙ্গালা সাহিত্যের বিকাশের ধারা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় খণ্ড। সুকুমার সেন।
বঙ্গ সাহিত্যে নবযুগ। শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
বঙ্গসাহিত্য পরিচয়। ১ম খণ্ড। কালিদাস রায়।
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা। ২য় ভাগ। ভূদেব চৌধুরী।

সাহিত্য-বিচিত্রা। রথীন্দ্রনাথ রায়

আধুনিক বাংলা কাব্য। তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা। মন্মথনাথ ঘোষের গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক মেঘনাদবধের সঙ্গে বৃত্রসংহারের তুলনা। "প্রবন্ধমঞ্জরী" ১৯০৫।

॥ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ॥

[হেমচন্দ্র-প্রসঙ্গে বৃত্রসংহার প্রকাশের পরবর্তীকালে, বিংশশতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বহুসংখ্যক প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষভাবে যেগুলি উল্লেখযোগ্য তাদের নির্দেশ এখানে দেওয়া হল।]

"বৃত্রসংহার ১ম খণ্ড"। "বঙ্গদর্শন" ১২৮১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"বৃত্রসংহার ২য় খণ্ড"। "বঙ্গদর্শন" ১২৮৪। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"কবিতাবলী" বিষয়ে "ক্যালকাটা রিভিয়ু" পত্রিকার আলোচনা।

"মেঘনাদবধ কাব্য" আলোচনা প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার। "ভারতী" ১২৮৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"কাব্যকথা"। "সাহিত্য" ১৩০৫। নিত্যকৃষ্ণ বসু।

"কবি হেমচন্দ্র"। "সাহিত্য" ১৩১৯। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেমচন্দ্রের স্বদেশ চিন্তা। "দেশ" পত্রিকা। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।

"আর্যদর্শনে" যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের প্রবন্ধ।

"হিতবাদী"তে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের প্রবন্ধ।

"বান্ধবে" কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রবন্ধ।

"মানসী" ১৩০৭। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বরদাচরণ মিত্র। চন্দ্রনাথ বসু। দীনেশচন্দ্র সেন। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়। অমৃতলাল বসুর রচনা ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও উল্লেখ্য।

"হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"। "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা" ১৩১০। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

"দশমহাবিদ্যা" বিষয়ে প্রবন্ধ—

"বঙ্গদর্শন" ১২৮৯। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

"বঙ্গদর্শন" ১২৮৯। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"নবপ্রভা" ১২৮৯। অজ্ঞাত।

"বান্ধব" ১২৮৯। নীলকণ্ঠ মজুমদার (সম্ভবত)।

"এডুকেশন গেজেট"। ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

"বেঙ্গল লাইব্রেরীর রিপোর্ট" (ইংরেজি) ১৮৮৩। চন্দ্রনাথ বসু।

"ক্যালকাটা গেজেট" (ইংরেজি) ১৮৮৩।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্রের মধ্যে কয়েকট চিঠি লেখালেখি হয়েছিল এই বিষয় নিয়ে। মন্মথনাথ ঘোষ-কৃত হেমচন্দ্রের জীবনীতে চিঠিগুলি সঙ্কলিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা চিঠি; কালীপ্রসন্ন ঘোষের কাছে। ১২৮৯ বঙ্গাব্দ। মন্মথনাথ ঘোষের গ্রন্থে উদ্ধৃত।

"চিত্তবিকাশ"। "প্রদীপ" ১৩০৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

"চিত্তবিকাশ"। "সাহিত্য" ১৩০৬। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

"দুই রকম কবি হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ"। যদুনাথ সরকার।

"মদনতত্ত্ব। স্মৃতিকথা : হেমচন্দ্র"। "প্রবাহিনী" ১৩২০।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

[দুই]

From Virgil to Milton—C. M. Bowra.

The Epic—Abercombie.

Epic and Romance—W. P. Ker.

এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য।

মহাকাব্যজিজ্ঞাসা—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য।

মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার—ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

[মহাকাব্যবিষয়ক আলোচনা]

মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত।

মধুসূদন রচনাবলী—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত-সম্পাদিত। [সাহিত্য সংসদ]

অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায়।

বৃহৎ তন্ত্রসার—আগমবাগীশ-সম্পাদিত।

The Iliad—Homer.

মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ-সম্পাদিত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী [বসুমতী]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী [বসুমতী]

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

• Encylopaedia of Literature Vol. I—Ed. by Steinberg.

সাধককবি রামপ্রসাদ [রচনাবলী সঙ্কলন]—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।